[পশ্চিমবঙ্গ-মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ্-নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসারে উচ্চমাধ্যমিক ও সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের জন্য]

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয়

[পরিবর্তিত নূতন সংস্করণ]

কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের লেক্‌চারার,
শ্রীপ্রশান্ত কুমার রায়, এম. এ.

ও

কলিকাতা সুরেন্দ্রনাথ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক,
শ্রীঅনিল বরণ তেওয়ারী, এম. এ.

প্রণীত

কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের লেক্‌চারার,
অধ্যাপক **নির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য**, এম.এ., এল.এল. বি., এম.এল. সি.
কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত।

ইণ্ডিয়ান্ বুক্ কনসান
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—৯

প্রকাশক ঃ শ্রী পি. ঘোষ
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা—৯

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
অক্টোবর, ১৯৬০

মূল্য ঃ ৮ টাকা

প্রিণ্টার ঃ
শ্রীতুলসী চরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

একাকিত্ব মানুষের কাছে এক দুর্বিষহ অভিশাপ। সেইজন্য মৃত্যুদণ্ড অপেক্ষা নির্বাসনদণ্ড অধিক ভয়াবহ। সঙ্গী ব্যতিরেকে ব্যক্তিজীবন ব্যর্থ, বিড়ম্বিত। সমাজের মাধ্যমেই ব্যক্তির পরিচয়, সমষ্টির মধ্যেই ব্যষ্টির বিকাশ। এই আসঙ্গলিপ্সা-হেতু আদিম অবস্থাতেও মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করিত। অভাবের তাড়নাও সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের প্রেরণা দিয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনের দৈন্য এবং দুর্বলতা সে সমাজ-জীবনের প্রাচুর্য এবং সবলতা দ্বারা জয় করিতে চাহিয়াছিল। আত্মরক্ষার তাগিদেই সমাজ-জীবনের সূচনা হয়। স্বীয় বাহুবলের উপরে নির্ভর করিয়া হিংস্র-শ্বাপদ-সরীসৃপ-সঙ্কুল ধরণীতে কোন ব্যক্তিই নিজেকে নিরাপদ অনুভব করিত না। নিশ্চিত নিরাপত্তা লাভের আশাই মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে প্রণোদিত করিয়াছিল, অনুন্নত এই পর্যায়ে সাংগঠনিক জটিলতা বিশেষ কিছুই ছিল না। প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে আহার্য, পানীয় এবং পরিধেয় সংগৃহীত হইত। উৎপাদনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। সমবেত প্রচেষ্টায় আহৃত দ্রব্যসম্ভার সমভাবে বণ্টিত হইত। এই অবস্থায় ব্যক্তির না ছিল সম্পদ, না ছিল স্বাতন্ত্র্য।

কিন্তু সমাজ সংগঠনের এই সরলতা দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিবর্তন হেতু সমাজেরও রূপান্তর ঘটিল। কৃপণা প্রকৃতির সীমাবদ্ধ দান ক্রমবর্ধমান জনসমষ্টির প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর হওয়ায় উৎপাদনের আবশ্যকতা দেখা দিল। পশুপালন এবং পরে কৃষি-কার্যের উদ্ভব হইল এবং আনুসঙ্গিক হিসাবে আসিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা। ইহার ফলে আদিম সমভোগী সমাজের মধ্যে দেখা দিল বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

পূর্বে যখন উৎপাদন ব্যবস্থা খুব সরল ও ক্ষুদ্রায়তন ছিল তখন উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত ভোগ। কিন্তু ক্রমশঃ বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন কার্য জটিল আকার ধারণ করে এবং তখন হইতে উৎপাদনের উদ্দেশ্য হইল বিনিময়। বিনিময়ের জন্য একটি সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যমের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ইহার ফলে আসিল অর্থ ও সৃষ্ট হইল এক জটিল অর্থনৈতিক সমাজ।

সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি এখন ভোগের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের ন্যায় একটি প্রবল কর্তৃত্বের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ইহার ফলে উদ্ভব হইল একটি জটিল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের।

রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির এখন অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ জীবন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যেই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অর্থনীতি ও পৌরনীতির পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করিয়াছেন। ইহার লক্ষ্য হইল (১) প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে দৈনন্দিন ও অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিতে আগ্রহশীল হয় সেই বিষয়ে সাহায্য করা, (২) সেই সঙ্গে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক করিয়া গড়িয়া তোলা ও (৩) ছাত্ররা যাহাতে ভবিষ্যতে দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে আগ্রহশীল হয় সেই বিষয়ে উৎসাহিত করা।

ইতিমধ্যে কয়েকখানি পুস্তক এই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের এই গ্রন্থখানি শুধু একটি সংখ্যাবৃদ্ধি নহে,—ইহা সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত এবং সুদীর্ঘ-অভিজ্ঞতা-প্রসূত।

প্রাচীন দার্শনিকদের মতে, মতের বিভিন্নতা, প্রত্যক্ষ আলোচনা ও তথ্যাদি আদান প্রদানের মাধ্যমেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। পুস্তকই হইল প্রত্যক্ষ আলোচনার পরবর্তী ও সার্থক সোপান এবং এই পুস্তক পৌরনীতি ও অর্থনীতির ব্যাখ্যায় উল্লিখিত সত্যকেই তুলিয়া ধরিতে সাহায্য করিয়াছে। যদিও এই পুস্তকে প্রচুর ঘটনা ও তথ্যের সমন্বয় করা হইয়াছে তথাপি তথ্যের পরিসংখ্যান দ্বারা ছাত্র ছাত্রীদের মনকে ভারাক্রান্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষতঃ বাংলায় যথোপযুক্ত পরিভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাসাধ্য সহজ ও সরল ভাষায় বিষয় বস্তুকে তুলিয়া ধরিতে প্রয়াসী হইয়াছি। প্রয়োজনমত রেখাচিত্র ব্যবহার করায় এবং প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তিতে সারাংশ ও আদর্শ প্রশ্নাবলী সংযুক্ত করায় ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যদি এই বইটী পাঠ করিয়া ছাত্রছাত্রীগণ উপকৃত হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হইবে।

সময়ের স্বল্পতার জন্য কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নহে, ভবিষ্যতে যাহাতে বইটীকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করা যায় সেদিকে আমরা যথেষ্ট লক্ষ্য রাখিব এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ যদি আমাদের উপদেশ দিয়া সাহায্য করেন তবে আমরা তাহা অবশ্যই গ্রহণ করিব।

গ্রন্থকারগণ

সূচীপত্র

পৌরবিজ্ঞান

[নবম শ্রেণী]

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

[দশম শ্রেণী]

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

[একাদশ শ্রেণী]

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ষড়বিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অর্থশাস্ত্র

[নবম শ্রেণী]

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

[দশম শ্রেণী]

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

[একাদশ শ্রেণী]

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

SYLLABUS FOR ELEMENTS OF ECONOMICS AND CIVICS

(A) CIVICS

[FOR CLASS IX]

1. The evolution of human society. The family. The patriarchal and matriarchal families. The Indian Joint Family.

2. The State : its origin and characteristics.

3. The Government. Forms of Government—Democracy and Dictatorship. Merits and Defects of Democracy. Unitary and Federal Government. Parliamentary and Presidential Government.

4. Organs of Government. Separation of Powers. Departments of Government.

5. Functions of Government.

6. The Individual and Society. Socialism.

7. The Nation. Right of Self-determination. United Nations.

[FOR CLASS X]

8. The citizen ; how citizenship is acquired and lost qualities of a good citizen ; hindrances to good citizenship.

9. The citizen's rights : The right to vote—its importance and implications.

10. The citizen's duties—to the family, to the community, to the State.

11. Rights and Duties.

12. Law and Liberty.

13. Public Services.

14. Public Opinion. Organs of Opinion.

15. Political Parties.

[FOR CLASS XI]

16. A brief outline of the Constitution of India with special reference to—

The Preamble.

Fundamental Rights—Directive Principles of State Policy.—The Indian Citizen. Franchise.

The Federation of India.

The Distribution of Powers.

The President—how he is elected. Powers of the President.

The Union Parliament. Control of the Executive by the Legislature.

The States. The Governor. The State Legislature.

Relation between the Centre and the States.

Heads of Revenues and Expenditures for Union and State Governments.

The Judiciary. The Supreme Court.

The Indian Political Parties.

17. Local Government.

18. Civics Problems. Village Improvement. Community Development Projects. Towns and Cities. Food. Housing. Sanitation Health.

19. Defence of India. The Army, the Navy, and the Airforce. Voluntary Defence Organisations. The National Cadet Corps.

(B) ECONOMICS

[FOR CLASS IX]

1. National Income and its distribution—per capita income—standard of living.

2. Broad factors determining national income—factors of production.

3. Population—population and food supply—population and national income—labour supply—Unemployment.

4. Natural resources—land and its productivity.

5. Capital—factors governing the accumulation of capital.

6. Technical skill—its importance—factors governing its formation.

7. Economic structure—main structural features of an under-developed economy—requirements for economic development.

[For Class X]

8. Forms of business organisation—single owner firm—partnership—joint-stock companies. Co-operation—principles—different types of co-operative societies and their main features. Small and Large scale industries.

9. Role of the Government—economic functions of the Government—Government and development planning—India's Five-Year Plans.

10. Government finances—taxation, expenditure and borrowing—financing of development.

11. Money—functions of money—monetary standards—creation of money—Banks—Commercial Banks—Central Bank—Functions of Banks—Bank money.

12. The general price-level—measurement of changes in the general price-level—simple index numbers—Inflation.

[For Class XI]

13. International Trade—territorial division of labour—Balance of Trade and Balance of Payments—Protection and Free Trade.

14. Markets—forms of markets : competition and Monopoly.

15. Price determination under different market conditions—factors governing demand : price changes and income variations, elasticity of demand—factors governing supply and supply price—increasing and diminishing returns.

16. Different types of factor incomes—wages, interest, rent and profit—collective bargaining and trade unions.

N. B. The subject is to be treated with special reference to Indian conditions.

পৌরবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র পরিচয়

প্রথম অধ্যায়

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং বিষয়বস্তু

(Definition and Subject-matter of Civics)

সমাজ-বিজ্ঞানের যে শাখায় নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির আচরণ আলোচিত হয় তাহাই **পৌরবিজ্ঞান** বলিয়া অভিহিত। এই 'নাগরিক' শব্দটির অর্থ কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছে। পুরাকালে পুর বা নগরের অধিবাসীই নাগরিক বলিয়া পরিচিত ছিল। প্রাচীন গ্রীসে ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের সদস্য নাগরিক আখ্যা পাইত। নগর-রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ব্যক্তি-জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নাগরিকতা এবং ব্যক্তিজীবন ছিল সম-ব্যাপক। তখন রাষ্ট্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগঠনই ছিল না, ছিল শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপৃত, অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় নিযুক্ত, নীতিবোধ জাগরণে এবং প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত এক ব্যাপক সমবায় প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবেই অর্থাৎ নাগরিক হিসাবেই ছিল ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয়। কাজেই তখনকার দিনে ব্যক্তির সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্কই ছিল পৌরবিজ্ঞানের একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

পূর্বে নাগরিক হিসাবেই ছিল ব্যক্তির একমাত্র পরিচয়।

কিন্তু ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রের যুগ আজ অতিক্রান্ত। নাগরিক শব্দটির অর্থও পরিবর্তিত হইয়াছে। নাগরিক বলিতে আমরা এখন বুঝি বহুজন-অধ্যুষিত, বহুযোজন-বিস্তৃত বৃহৎ জাতীয় রাষ্ট্রের অধিবাসীকে। ব্যক্তিজীবনের সামগ্রিক বিকাশ বর্তমান রাষ্ট্রের সাধ্যাতীত। ব্যক্তি জীবনে এই রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রধান হইলেও অনন্য নহে। ইহা সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান করে সত্য, কিন্তু সমাজ-জীবনকে সুন্দর এবং সম্পূর্ণ করিবার সামর্থ্য ইহার নাই। তাই ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন দিকের বিকাশ সাধনের জন্য রাষ্ট্র ছাড়াও নানা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত দৈন্যের জন্যই আজিকার পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা কেবলমাত্র ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

বর্তমানকালে ব্যক্তি রাষ্ট্র ছাড়া আরও বহু সংগঠনের সদস্য।

পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়বস্তুগুলি নিম্নে আলোচিত হইল—

(১)
ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের সম্পর্ক পৌরবিজ্ঞানের প্রথম আলোচ্য বিষয়।

রাষ্ট্রই আমাদের সমাজ-সংস্থার কেন্দ্রস্থল। রাষ্ট্র সামাজিক সংহতি বিধান করে বলিয়াই ব্যক্তি আত্ম-বিকাশের পথ খুঁজিয়া পায়। তাই রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির পারস্পরিক অধিকার এবং কর্তব্যের কথাই পৌরবিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচ্য বিষয়।

রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার জন্য আরও বহু প্রতিষ্ঠান মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে সচেষ্ট। সেইজন্য ব্যক্তির সহিত অন্যান্য সংঘের সম্পর্কও পৌরবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। যেমন

(২)
ব্যক্তির সহিত অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সম্বন্ধও পৌরবিজ্ঞানে আলোচিত হয়।

(ক) স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান—ব্যক্তিজীবনে ইহাদের প্রভাব অপরিসীম। দূরবর্তী অঞ্চলগুলির বিশিষ্ট সমস্যার সমাধান কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগে সম্ভব হয় না। এই উদ্দেশ্য সাধনে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্থানীয় সমস্যা, যথা—জন-স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, পানীয়জল ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া নাগরিক জীবনকে সুস্থ এবং সুন্দর করিতে সাহায্য করে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন ইত্যাদি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি হইল নাগরিকতার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। দায়িত্ব এবং আত্মনির্ভরতার প্রথম দীক্ষা নাগরিক এই স্থানেই গ্রহণ করে, ক্ষুদ্র পরিবেশে অর্জিত অভিজ্ঞতার জোরেই ব্যক্তি পরে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। এই সমস্ত স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের আলোচনা তাই পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

(খ) রাষ্ট্র এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া ব্যক্তি আরও বহু সংঘের সদস্য। এক একটি সংঘ ব্যক্তিজীবনের কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গড়িয়া উঠিয়াছে, যেমন শিক্ষা প্রসারের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মপালন এবং প্রচারের জন্য ধর্মীয় সংগঠন, শ্রমিক স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য ট্রেড্ ইউনিয়ন ইত্যাদি। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনাকালে ইহাদের কথা বাদ পড়িবার নয়।

(৩)
সমাজে রাষ্ট্রের স্থান কিরূপ তাহাও পৌরবিজ্ঞান আলোচনা করে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন সংঘের সমাবেশে সমাজ গঠিত। রাষ্ট্র অন্যতম সংঘ বা সংগঠন, একমাত্র সংগঠন নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। সংঘ হিসাবে রাষ্ট্রের প্রাধান্য হেতু পৌরবিজ্ঞানে নূতন এক বিষয়বস্তু সংযুক্ত হইয়াছে। তাহা হইল রাষ্ট্রের সহিত অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের সম্পর্ক।

আজিকার কোন রাষ্ট্রই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। কোন এক রাষ্ট্রে খাদ্যের ঘাটতি ঘটিলে আজ আর জনগণকে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করিতে হয় না। অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে খাদ্য আমদানি করিয়া এই সংকট অতিক্রম করা আজ সম্ভব। বর্তমানে পৃথিবীর এক প্রান্তের রাজনৈতিক গোলযোগ অন্য প্রান্তের পরিবেশকে আবিল করিয়া তোলে। এক অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিপর্যয় অন্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিঘ্নিত করে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আজ দূরত্বকে জয় করিয়াছে। রাজনৈতিক প্রভাব এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সমগ্র পৃথিবীকে একটিমাত্র অঞ্চলে পরিণত করিয়াছে। নাগরিক জীবনের উপর আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর প্রভাব অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক তাই পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার বহির্ভূত নয়।

(৪)
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথাও পৌরবিজ্ঞান উপেক্ষা করে না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে যে রাষ্ট্রসংঘের (U.N.O.) উদ্ভব হইয়াছে, প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতার উপরেই তাহার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্র কিছু সুবিধা ভোগ করে; যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার অধিকার। বিনিময়ে আন্তর্জাতিক আইন মান্য করিবার প্রতিশ্রুতি তাহাকে দিতে হয়। উভয়ের অধিকার এবং দায়িত্ব পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় স্থান পাইয়াছে, কারণ এই রাষ্ট্রসংঘের সফলতার উপরে নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা, সুখ ও শান্তি বহুলাংশে নির্ভর করিতেছে।

(৫)
রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং অধিকারের আলোচনাও পৌরবিজ্ঞানের অন্যতম বিষয়বস্তু।

আবার বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনাই সবটুকু নয়। বর্তমানকে উপলব্ধি করার জন্য অতীতকে আমাদের জানা প্রয়োজন। অতীতের আলোতেই বর্তমানের সত্যকার রূপ প্রতিভাত হইবে। আমরা কি হইয়াছি তাহা জানিবার জন্য আমরা কি ছিলাম তাহা জানা প্রয়োজন। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় তাই অতীতের সমাজ-ব্যবস্থাও বাদ পড়ে না। অতীতে কি ছিলাম এবং বর্তমানে কি হইয়াছি শুধু ইহা জানিয়াই আমরা পরিতৃপ্ত নই। কি হওয়া উচিত, তাহাও আমাদের আলোচনায় অপরিহার্য অঙ্গ। অতীতের ধারণা এবং বর্তমানের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা মহত্তর ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করিতে চাই, অর্থাৎ পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সর্বাঙ্গসুন্দর

(৬)
পৌরবিজ্ঞানে বর্তমান সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ, অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করা হয়।

সামাজিক পরিবেশ কি ভাবে গড়িয়া তোলা যায় তাহাও পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য।

॥ সারাংশ ॥

নাগরিক হিসাবে ব্যক্তির আচরণ যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাহারই নাম পৌরবিজ্ঞান। প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র ছিল নগরভিত্তিক। এই নগররাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের সমগ্র জীবন আবর্তিত হইত। রাষ্ট্রের সভ্য হিসাবেই ছিল নাগরিকের একমাত্র পরিচয়। প্রাচীন কালে তাই রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির সম্পর্কের আলোচনাই ছিল পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। নগর-রাষ্ট্রের যুগ আজ আর নাই। সমাজ-জীবন এখন ব্যাপক, জটিল এবং বৈচিত্র্যময়। আধুনিক বৃহদায়তন জাতীয় রাষ্ট্রে ব্যক্তিকে কেবলমাত্র নাগরিক বা রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে দেখাই যথেষ্ট নয়। জীবনের পূর্ণতর বিকাশের জন্য মানুষ আজ অন্যান্য সামাজিক সংগঠনেরও সভ্য। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব আজ অতিক্রান্ত। যুদ্ধ এবং শান্তির প্রশ্ন আজ আর কেবলমাত্র বৈদেশিক সম্পর্কের কথা নয়, প্রতিটি ব্যক্তির জীবন-মরণের প্রশ্ন। অর্থাৎ মানুষ আজ এক বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য বলিয়া গণ্য। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে পূর্বেকার পৌরবিজ্ঞানের ধারণা বর্তমানে অচল। পৌরবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে। আজিকার দিনে নাগরিক একাধারে রাষ্ট্রের, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের, অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের এবং আন্তর্জাতিক সমাজের সদস্য। এই ব্যাপক অর্থে নাগরিকের আলোচনাই বর্তমানে পৌরবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Define Civics and discuss its subject-matter.**

পৌরবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ণয় কর এবং উহার বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১-৩.]

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজ-জীবনের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

(Origin and development of Human Society)

সমাজের স্বরূপ (Nature of Society) : সাধারণ ভাবে সমাজজীবন বলিতে আমরা সংঘবদ্ধ জীবন বুঝিয়া থাকি, অর্থাৎ সংঘবদ্ধতাই সমাজের একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে হয়। এই অর্থে মৌমাছি প্রভৃতিও সমাজ-জীবন যাপন করে। কিন্তু, কেবলমাত্র সংঘবদ্ধ হইলেই সমাজ গড়িয়া উঠে না। সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিকে মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই সুচেতন মনোভাবই মানব সমাজকে নিম্নস্তরের জীবজন্তুর সংঘবদ্ধ জীবন হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করিয়াছে। উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমাজকে বিচার করিলে সংগঠন মাত্রেই সমাজ আখ্যা পাইতে পারে, যেমন আর্যসমাজ, কৃষকসমাজ, ছাত্রসমাজ প্রভৃতি।

সমাজের বৈশিষ্ট্য দুইটি (১) সংঘবদ্ধতা এবং (২) বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতা।

আজিকার দিনে পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে সমাজকে গ্রহণ করা হয়। এই অর্থে সমাজ, দেশ বা জাতির সমব্যাপক। দেশ বা জাতির অন্তর্গত, স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংঘ-সমষ্টিই হইল সমাজ। ধর্মীয় সংগঠন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য সংসদ ইত্যাদি বিভিন্ন সংঘের সমাবেশে সমাজ গড়িয়া উঠে। সমাজ-জীবনের মূলসূত্র নির্ধারণের জন্য গঠিত রাষ্ট্র সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমাজের ব্যাপক অর্থ

সমাজ-সংগঠনের উদ্দেশ্য (Purpose of Social Organisation) :— প্রকৃতিগত সঙ্গপ্রিয়তাই আদিমকাল হইতে মানুষকে সংঘবদ্ধ করিয়াছে। শুধু প্রকৃতির প্রেরণা নয়, প্রয়োজনের তাড়নাও মানুষকে সমাজ জীবন যাপনে বাধ্য করিয়াছে। এই প্রয়োজন দ্বিবিধ—পার্থিব এবং নৈতিক। পার্থিব প্রয়োজন বলিতে বোঝায় খাদ্যানুসন্ধান এবং প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধান।

পার্থিব এবং নৈতিক এই দুই জাতীয় প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সমাজের প্রতিষ্ঠা।

নৈতিক প্রয়োজন অর্থে সুখী এবং সুন্দর জীবনের সন্ধান। সহজাত নীতিবোধই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী হইতে পৃথক করিয়াছে। সমাজের মধ্যে ব্যক্তি সুন্দর এবং নৈতিক জীবনের সন্ধান পায়। অনুশাসন, রীতিনীতি, জনমত ইত্যাদির সহায়তায় সমাজ ব্যক্তি-মানসে অধিকার এবং কর্তব্যবোধ সঞ্চারিত করিয়া মহত্তর জীবনযাপনের

উপযোগী পরিবেশ রচনা করে। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, প্রেম, বন্ধুত্ব প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির বিকাশ এবং শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির সাধনাও এই সমাজ পরিবেশেই সম্ভব। সমাজের লক্ষ্য হইল জাতীয় জীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করা এবং এক বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় জীবনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা।

সমাজ-জীবনের ক্রমবিকাশ (Evolution of social life):

নাগরিক জীবনে বর্তমানের প্রভাবই সর্বাধিক, কেননা বর্তমানের সঙ্গেই সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু বর্তমানকে উপলব্ধি করার জন্যই অতীতকে জানা প্রয়োজন। স্বাভাবিক ভাবেই পৌরবিজ্ঞানের ছাত্রদের মনে প্রশ্ন জাগে: কখন এবং কি ভাবে সমাজ-জীবনের উদ্ভব হইল? উত্তরে বলা হয়, সংঘবদ্ধতা মানুষের প্রকৃতিগত। সে নির্জনতা নিয়ত এড়াইতে চায় এবং সঙ্গ সুখ কামনা করে। আবার পারস্পরিক সাহায্য ছাড়া মানুষের পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। অতএব দেখা যাইতেছে, সমাজ-সংগঠনের মূলে রহিয়াছে মানুষের প্রকৃতি এবং প্রয়োজন উভয়ই। স্বভাবের প্রেরণায় এবং প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে সমাজ গড়িতে হইয়াছে।

সমাজ গঠনের মূলে একদিকে রহিয়াছে স্বভাবের প্রেরণা, অন্যদিকে রহিয়াছে প্রয়োজনবোধ।

ইতিহাসের কোন্ সন্ধিক্ষণে মানুষ সর্বপ্রথম সমাজ-জীবন আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা অপরিজ্ঞাত। কিন্তু মানব সভ্যতার সূচনাতেই যে সমাজ-জীবনের সূত্রপাত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। অবশ্যই বর্তমান সমাজ বহু দিক দিয়াই প্রাচীন সমাজ হইতে স্বতন্ত্র।

আদিম সমাজ-ব্যবস্থা ক্রমবিকাশের বিভিন্ন রূপ অতিক্রম করিয়া বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। আবার বিভিন্ন অঞ্চলে বা দেশে এই বিবর্তনধারার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক গবেষকদের ধারণা, প্রতিটি কৃষ্টিগত অঞ্চলের স্বতন্ত্র সামাজিক ইতিহাস রহিয়াছে।

সমাজ সংগঠনের আদি রূপ কি—এই সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। প্রাচীন লেখকগণের মতে পরিবারই আদিমতম সমাজ-সংগঠন। গৃহস্বামীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইয়া দল বা গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। একাধিক গোষ্ঠীর সমাবেশে গড়িয়া উঠে উপজাতি। এই উপজাতিই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

কাহারও মতে পরিবারই আদিমতম সমাজ সংগঠন।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীগণ কিন্তু ভিন্নমত পোষণ করেন। তাহারা মনে করেন, গোষ্ঠী বা দলই হইল সমাজের আদি রূপ। আসঙ্গলিপ্সায় এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ প্রথম হইতেই সংঘবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত।

গোষ্ঠীই আদিমতম সমাজের রূপ—ইহাই আধুনিক যুগের ধারণা।

প্রথম অবস্থায় মানুষ যখন উৎপাদন করিতে শিখে নাই, শুধু প্রকৃতির দানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিত, তখনও তাহারা দলবদ্ধ ছিল। ফলমূল আহরণ এবং পশুপক্ষী শিকারই ছিল তাহাদের বৃত্তি। সমবেত প্রচেষ্টায় আহৃত দ্রব্যসম্ভার দলভুক্ত সকলে সমভাবে ভোগ করিত। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা-হেতু সঞ্চয় সম্ভবপর ছিল না এবং আত্মসচেতনতার অভাবহেতু সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগে নাই। এই অবস্থায় ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল না। ব্যক্তি ছিল গোষ্ঠীতে বিলীন। পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত তখন হয় নাই। গোষ্ঠীভুক্ত সকলেই ছিল নবজাতকের পিতামাতাস্বরূপ। খাদ্যান্বেষণে তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইত। ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উদ্ভব সেই যুগে হয় নাই। সমাজ-সংগঠন ছিল সহজ, সরল এবং বাহুল্যবর্জিত।

ফলমূল আহরণ এবং শিকারের যুগ : ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব।

কালক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। পশু শিকারের স্থলে পশুপালন হইল মানবগোষ্ঠীর নূতন বৃত্তি। খাদ্যবস্তুর অনিশ্চয়তা হইতে আংশিক মুক্তি মিলিল। পালিত পশুর মধ্যে তাহারা খাদ্যাতিরিক্ত অনেক কিছুর সন্ধান পাইল। পশু-দুগ্ধ এবং মাংসে তাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত, পশুচর্ম তাহাদের গাত্রাবরণের কার্য করিত; পশু যানবাহনেরও কার্য করিত, ফলে দূরবর্তী স্থানে সত্বর গমনাগমনের সুবিধা হইল। পশুপালক সম্প্রদায়েরও নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না। পশুখাদ্যের অন্বেষণে তাহাদিগকে নিয়ত স্থান পরিবর্তন করিতে হইত। এই পশুচারণ যুগেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা জন্মিল। পালিত পশুর উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতনতা এবং পশুর সহিত পালকের ঘনিষ্ঠ এবং স্থায়ী সংযোগহেতু এই জাতীয় ধারণার সঞ্চার হইয়াছিল। আপন-পরের পার্থক্য তখনই দেখা দিল।

পশুচারণের যুগ

ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্বাভাষ

পরবর্তীকালে এই ভেদ-জ্ঞান আরও প্রকট হইল। মানুষ কৃষিকার্য শিক্ষা করিল। এইবার খাদ্য সংগ্রহ করা নয়, খাদ্য উৎপাদন করা হইল তাহার জীবিকা। ভ্রাম্যমান জীবনের অবসান ঘটিল। ভূমির সহিত মানুষের স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হইল। স্থান নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে স্থায়ী গৃহনির্মাণ সম্ভব হইল।

কৃষিযুগ

এইভাবে পুরাতন সমাজব্যবস্থায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। পরিবর্তিত পরিবেশে নূতনতর সমাজ-সংগঠনের উদ্ভব হইল। আত্ম-সচেতন মানুষের সামাজিক স্পৃহা পরিবারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। পূর্বতন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ প্রথা অপ্রচলিত থাকায় সকল শিশুই গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে পালিত হইত। পিতা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকায় মাতাই নবজাতকের লালনপালন করিতেন এবং মাতার মাধ্যমেই ছিল সন্তানের পরিচয়। স্বাভাবিকভাবেই এক্ষেত্রে মাতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। নারীর পরিচালনাধীনে এই যে পারিবারিক সংগঠন, ইহাই মাতৃতান্ত্রিক পরিবার বলিয়া অভিহিত।

পরিবারের প্রতিষ্ঠা

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার

কৃষিজীবন সুরু হইবার পর কিন্তু নারীর অগ্রাধিকার ক্ষুণ্ণ হইল, তাহার প্রাধান্য খর্ব হইল এবং পুরুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হওয়ায় সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি জাগিল এবং বিনিময় ব্যবস্থার উদ্ভব হইল। উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে ব্যক্তি যাহা কিছু ক্রয় করিল তাহার মধ্যে প্রথম ছিল একটি নারী। এই নারীর উপর তাহার একক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। একজন পুরুষের সহিত স্থায়ীভাবে সম্পর্কিত নারী স্ত্রী হিসাবে অভিহিত হইল এবং তাহাকে পুরুষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইত। পুরুষের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই যে পারিবারিক সংগঠন গড়িয়া উঠিল তাহাই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। ইহা বর্তমান পরিবার প্রথার অনুরূপ। আধুনিক পরিবার স্বামী, স্ত্রী এবং কয়েকটি পুত্রকন্যা লইয়া গঠিত।

পিতৃতান্ত্রিক পরিবার

হিন্দু যৌথ পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের অন্যতম রূপ। পাশ্চাত্য দেশসমূহে স্বামী, স্ত্রী এবং নাবালক পুত্র কন্যা লইয়াই পরিবার গঠিত হয়। সেখানে পুত্র সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলে স্বতন্ত্র পরিবার গঠন করে।

হিন্দু যৌথ পরিবার

কিন্তু হিন্দু সমাজের রীতি পৃথক। মূল পরিবারের পুত্র, পৌত্র এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়রাও একান্নবর্তী হইয়া একই পরিবারে বাস করিতে অভ্যস্ত। এই পরিবারই যৌথ পরিবার বলিয়া পরিচিত। হিন্দু যৌথ পরিবারে ভ্রাতৃগণ স্ব স্ব পুত্রকন্যাসহ পিতার অধীনে একই পরিবারে বাস করে। গৃহস্বামীই হইলেন এই পরিবারের প্রভু। প্রত্যেকে তাহার উপার্জন গৃহস্বামীর হস্তে সমর্পণ করে এবং পরিবার তাহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। গৃহস্বামীর কর্তৃত্ব এখানে একক এবং অপ্রতিহত। পরিবারভুক্ত সকলের মঙ্গলই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

একই পূর্ব পুরুষের বংশধরদের একান্নবর্তী হইয়া বসবাসই হইল হিন্দু যৌথ পরিবারের স্বরূপ।

যৌথ পরিবারের প্রধান সুবিধা এই যে কোন ব্যক্তি হঠাৎ অক্ষম হইয়া পড়িলে, সে একান্ত অসহায় বোধ করে না। তাহার এবং তাহার স্ত্রী-পুত্রের ব্যয়ভার পরিবারই বহন করে। অসহায়া বিধবা এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুর আশ্রয়স্থল এই পরিবার। বহুজনের একত্র বসবাসের ফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচও হইয়া থাকে। যৌথ পরিবার জমির খণ্ডীকরণ এবং অসম্বদ্ধতা রোধ করিয়া যৌথ খামারের পথ নির্দেশ করে। এই পরিবারে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকে তাহার আয় সমর্পণ করে এবং প্রয়োজনের অনুরূপ সাহায্য লাভ করে।

যৌথ পরিবারের সুবিধা

অনেক ক্ষেত্রে এই প্রথা অলসতার প্রশ্রয় দেয়। উপার্জনক্ষম একজনের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া বহুজন আলস্যে কালাতিপাত করে। অমিতব্যয়িতা যৌথ পরিবারের অপর একটি ত্রুটি। সাধারণের সম্পদ স্বভাবতঃই অবহেলিত হয়। ইহা পরিবারভুক্ত ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইয়া উপার্জনের চেষ্টায় বাধাদান করে। পরিবারের দুরতিক্রম্য প্রভাব ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে পরিবারভুক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন অঞ্চলে আজ বসবাস করিতে বাধ্য হইতেছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রসার এই জাতীয় পরিবারকে প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে এই প্রথা ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

যৌথ পরিবারের অসুবিধা

পরিবারের মধ্যেই শিশু প্রথম সমাজের স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং সামাজিক শৃঙ্খলার প্রথম পাঠ আয়ত্ত করে। ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগের অভ্যাস এই স্থানেই গড়িয়া উঠে। পরিবারকে তাই সমাজ-জীবনের চিরন্তন শিক্ষালয় বলা হয়। ইহা যেন একটি সুবৃহৎ রত্নাগার যেখানে পূর্বপুরুষের কষ্টার্জিত ধন-সম্পদ এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত চরিত্রগত গুণাবলী ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য সঞ্চিত থাকে। শৃঙ্খলাবোধের দীক্ষা ব্যক্তি এই স্থানেই গ্রহণ করে এবং ভাবিতে শিখে যে শুধুমাত্র নিজেকে লইয়াই কেহ বাঁচিতে পারে না।

ব্যক্তি-জীবনে পরিবারের প্রভাব

কৃষিকার্য, শ্রমবিভাগ, বিনিময় ব্যবস্থা ইত্যাদির ফলে জটিলতর এক সমাজ-জীবনের সূচনা হইল। প্রতিটি পরিবার স্বীয় সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করিল। সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য গড়িয়া উঠিল নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষ বলিতে তখন একটি নির্দিষ্ট সমিতিকে বুঝাইত। এই সমিতি গঠিত হইত বিভিন্ন পরিবারের প্রধান ব্যক্তিবৃন্দকে লইয়া।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার্থে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা।

সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনবৈষম্যও বৃদ্ধি পাইল এবং কর্তৃত্বও সেই পরিমাণে সংহত এবং শক্তিশালী হইতে লাগিল। এই কারণেই বলা হয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে সম্পত্তি।

সামরিক শক্তি কালক্রমে রাজশক্তিতে রূপান্তরিত হইল।

বিভিন্ন পরিবার সাধারণ এক কর্তৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হইয়া উপজাতিতে পরিণত হইল। উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধ তখন ছিল প্রাত্যহিক ব্যাপার। তজ্জন্য যুদ্ধনায়ক ছিলেন অপরিহার্য। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যাঁহার প্রতিষ্ঠা হইল, সমাজ-জীবনকে সংযত করিবার জন্য তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। অর্থাৎ তিনি স্থায়ী রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। অতএব দেখা যাইতেছে 'যুদ্ধই রাজাকে জন্ম দিয়াছে'—এই উক্তি নিরর্থক নহে।

রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা

এই ভাবে বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বাসকারী জনসমষ্টি রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নীত হইল। প্রাথমিক রাষ্ট্রগুলি ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু তাহার কর্তৃত্ব ছিল ব্যক্তি-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রসারিত। এই যুগে সমাজ এবং রাষ্ট্র ছিল অভিন্ন। সমাজের সর্ববিধ দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন করিত।

সমাজ-জীবনের রূপান্তর

কিন্তু কালক্রমে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইল। আজ আর রাষ্ট্রকে সমাজের সমব্যাপক বলিয়া ধরা সম্ভব নয়। আজিকার সমাজ-সংগঠন বলিতে আমরা বুঝি রাষ্ট্র এবং আরও বহুবিধ সংঘকে। ব্যক্তির সামাজিক সত্তার স্ফুরণে ইহাদের সকলের অবদান রহিয়াছে। মানুষের প্রয়োজন এবং চিন্তাধারা পরিবর্তিত হইতেছে। সমগ্র মানবজাতিকে এক সমাজভুক্ত হিসাবে গণ্য করিবার সময় প্রায় সমুপস্থিত।

ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ (Relation between the Individual and Society) :

পূর্বে সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির কোন স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল না

সমাজ-সংগঠনের প্রথম পর্বে ব্যক্তির স্বতন্ত্রজীবন স্বীকৃত হয় নাই। ব্যক্তি গোষ্ঠীর মধ্যে বিলীন ছিল। এমনকি সামাজিক সংগঠন হিসাবে যখন পরিবারের আবির্ভাব হইল তখনও ব্যক্তি ছিল অপ্রধান। পরিবার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া ব্যক্তিকে দেখা হইত না। পরিবারের মধ্যেই ছিল ব্যক্তির সম্পূর্ণ পরিচয়।

ইহার পরবর্তী যুগে সমাজ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইল ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি। ব্যক্তির এই নব অভ্যুদয় আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। বহু শতাব্দীব্যাপী সামাজিক বিবর্তনের ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেই সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা হইয়াছে। আধুনিক সমাজ ব্যক্তিকে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যূথ-সত্তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার বিসর্জন বর্তমানে অনভিপ্রেত।

ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঘটনা।

মানবসন্তান যখন পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হইল, তখন সে ছিল সহায়-সম্বলহীন। সংঘবদ্ধ জীবনই সেই দুর্যোগময় মুহূর্তে তাহাকে মুক্তির সন্ধান দিয়াছিল। ব্যক্তিগত জীবনের দৈন্য মানুষ সমাজ-জীবনের প্রাচুর্য দ্বারা জয় করিয়াছে। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির কল্পনা করা যায় না। জীবন রক্ষার উদ্দেশ্যে এই সমাজের আবির্ভাব। সুখী এবং সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার নিমিত্ত ইহা ক্রমাগত রূপান্তর গ্রহণ করিতেছে। পরস্পরের মধ্যে বিরামহীন প্রতিযোগিতার স্থলে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে সহযোগিতা। দেওয়া নেওয়াই হইল সমাজজীবনের মূলমন্ত্র। একক প্রচেষ্টায় ব্যক্তির উন্নতি বিধান সম্ভব নয়। সামগ্রিক প্রচেষ্টাতেই প্রত্যেকের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

সমাজ ব্যতিরেকে ব্যক্তিজীবন অর্থহীন। ব্যক্তিজীবনের দৈন্য পূরণের নিমিত্তই সমাজের প্রতিষ্ঠা।

সহযোগিতার ভিত্তিতে সকলের কল্যাণ সাধনই সমাজের লক্ষ্য।

সামাজিকতার মূল্যস্বরূপ ব্যক্তিকে তাহার যথেচ্ছ আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইয়াছে। সমাজ হইতে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে সামাজিক অনুশাসন তাহাকে মান্য করিতে হয়। এই অনুশাসনই সমাজ-জীবনের ভিত্তি। সামাজিক অনুশাসন অরাজকতা দমন করিয়া শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে, যথেচ্ছাচারকে সংযত করিয়া সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সমগ্রের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ এই সমাজের লক্ষ্য।

সমগ্রের সামঞ্জস্য পূর্ণ বিকাশের জন্য সমাজ বিধিনিষেধ প্রণয়ন করিয়া ব্যক্তি-আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে।

ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ। প্রতিটি ব্যক্তির উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কখনও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যায় না। সামাজিক অনুশাসনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বকে খর্ব করা নয়, ব্যক্তিকে সত্যকার কল্যাণের পথ নির্দেশ করা।

ব্যক্তিত্বের বিনাশ নয়, বিকাশই সামাজিক অনুশাসনের লক্ষ্য।

অপরপক্ষে সমাজকে উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভব নয়। সমগ্রের উন্নতির মধ্যেই অংশের উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। অনগ্রসর একটি সমাজে কোন ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ কল্পনা করা যায় না। এহেন সমাজ ব্যক্তিকে সর্বদা নীচের দিকে টানিবে। সমাজের অমোঘ প্রভাব অতিক্রম করিবার সামর্থ্য ব্যক্তির নাই।

ব্যক্তির উন্নতি সমাজের উন্নতির উপর নির্ভর করে।

সমাজের দায়িত্ব হইল ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনা করা। আর ব্যক্তির কর্তব্য হইল সমাজ-কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আপন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা। এই ভাবেই ব্যক্তি-জীবন পূর্ণতা লাভ করিবে। সমাজ সংগঠনও সার্থকতা অর্জন করিতে পারে।

ব্যক্তি ও সমাজ তাই পরস্পর নির্ভরশীল।

॥ সারাংশ ॥

সমাজের স্বরূপ ঃ সংঘবদ্ধতা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতাই হইল সমাজের বৈশিষ্ট্য। এই অর্থে সংগঠন মাত্রেই সমাজ—যেমন ছাত্র সমাজ, কৃষক সমাজ ইত্যাদি। কিন্তু পৌরবিজ্ঞানের বর্তমান আলোচনায় জাতীয় সমাজ অর্থেই সমাজ কথাটি ব্যবহৃত হয়। স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত সংঘসমষ্টিকে সমাজ আখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্র এই সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান।

সমাজের উদ্দেশ্য ঃ আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষ সংঘবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত। প্রয়োজনের তাড়নাও সমাজ-জীবন যাপনে মানুষকে বাধ্য করিয়াছে। এই প্রয়োজন দ্বিবিধ ঃ—পার্থিব বা জৈবিক এবং নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। মহত্তর জীবন সম্ভব করিয়া তোলাই সমাজের লক্ষ্য।

সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশ ঃ আদিম অবস্থা হইতেই মানুষ সংঘজীবনে অভ্যস্ত। সমাজ-সংগঠনের আদি রূপ সম্বন্ধে মতবিরোধ রহিয়াছে। পরিবারকে আদি সমাজ-সংগঠন বলিয়া অনেকে অভিহিত করেন। কিন্তু আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীগণের ধারণা, গোষ্ঠীই সমাজ-সংগঠনের আদিমতম রূপ। প্রথমাবস্থায় গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ ফলমূল আহরণ এবং পশু শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। তখন মানুষের স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। ব্যক্তিগত ধনসম্পদের উদ্ভব হয় নাই। ইহার পরবর্তী যুগে পশুচারণ মানবগোষ্ঠীর নূতন বৃত্তি হইল। এই পর্যায়ে নির্দিষ্ট বাসস্থান না থাকিলেও, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির ধারণা জন্মিল। ইহার পর আসিল কৃষিযুগ। মানুষ খাদ্য উৎপাদন করিতে শিখিল। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে

গৃহ নির্মাণ করিল। পারিবারিক জীবনের সূচনা হইল। প্রথমাবস্থায় এই পরিবার ছিল মাতৃপ্রধান। অর্থাৎ বিবাহ-প্রথা প্রবর্তিত না হওয়ায় মাতার মাধ্যমেই ছিল সন্তানের পরিচয়। কাজেই পারিবারিক জীবনে মাতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে নারীর প্রাধান্যের অবসান হইল। পুরুষের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পিতৃ-তান্ত্রিক পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইল। হিন্দু যৌথ পরিবার এই পিতৃতান্ত্রিক পরিবারেরই এক বিশেষ রূপ। ব্যক্তিগত ধনসম্পদ রক্ষার্থে মানুষ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুভব করিল। সম্পত্তিজনিত বিবাদের মীমাংসার জন্য বিধিনিষেধ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইল। এই পরিবেশে যুদ্ধ ছিল প্রাত্যহিক ঘটনাবিশেষ। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিযুক্ত সমরনায়ক কালক্রমে স্থায়ী শাসকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। এইভাবে যুদ্ধের ফলে রাজার এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল।

ব্যক্তি এবং সমাজ ঃ—উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ব্যক্তিকে লইয়াই সমাজ। ব্যক্তির উন্নতিই হইল সমাজ-সংগঠন এবং সামাজিক অনুশাসনের লক্ষ্য। সমাজের সার্থকতা এখানেই। সমাজকে উপেক্ষা করিয়া, সামাজিক অনুশাসনকে লঙ্ঘন করিয়া ব্যক্তি কোনদিন নিজ মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে না—সামাজিক বন্ধনের মধ্যেই ব্যক্তি সত্যকার মুক্তির আস্বাদ পাইতে পারে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Give a brief description of the origin and development of human Society.
   মনুষ্যসমাজের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [পৃষ্ঠা ৬-১০]
2. What do you mean by the term 'Society'? Discuss the purpose of social organisation.
   'সমাজ' বলিতে কি বোঝ? সমাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৫-৬]
3. Discuss the relation between the Individual and Society.
   ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্পর্ক কি—তাহা আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১০-১২]
4. What is Family? How does Family influence the Individual?
   পরিবার কাহাকে বলে? ব্যক্তির উপর পরিবারের প্রভাব কিরূপ? [পৃষ্ঠা ৮-৯]
5. Write what you know about (i) Patriarchal and (ii) Matriarchal Families.
   পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [পৃষ্ঠা ৮]
6. Describe the nature, merits and defects of the Hindu Joint Family System.
   হিন্দু যৌথপরিবারের প্রকৃতি, সুবিধা এবং অসুবিধা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ৮-৯]

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(The State)

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of the State) ঃ

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানতঃ রাষ্ট্রকে লইয়া। মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব। মানুষের স্বভাবের মধ্যেই ইহার বীজ নিহিত আছে। প্রকৃতিগত সমাজ-প্রীতির জন্য মানুষকে কিছু মূল্য দিতে হয়। এই মূল্য হইল নিয়মানুবর্তিতা বা কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য। এই আনুগত্য এবং বাধ্যতার ধারণাকে বাস্তব রূপ দিবার জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি।

রাষ্ট্র অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাষ্ট্র জটিল সমাজ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। সামাজিক সংহতি বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, প্রতিটি ব্যক্তি বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রের সদস্য।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। বিভিন্ন সংজ্ঞার সমন্বয় সাধন করিয়া অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের যে ব্যাপক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য স্থান পাইয়াছে। গার্নার প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে **রাষ্ট্র হইল এমন একটি জনসমাজ যাহা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হইয়া একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে এমন একটি সুসংঠিত সরকারের অধীনে স্থায়ীভাবে বাস করে, যাহার প্রতি অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বভাবগত আনুগত্য প্রদান করিয়া থাকে।**

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of the State) : উপরিউক্ত সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে রাষ্ট্রের চারিটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের কোন একটির অবর্তমানে রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। বৈশিষ্ট্যগুলি হইল (১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা।

৪টি উপাদান লইয়া রাষ্ট্র গঠিত

জনসমষ্টি (Population) ঃ মানব সমাজের এক বিশিষ্ট সংগঠন এই রাষ্ট্র। মানুষের জন্য এবং মানুষকে লইয়াই ইহার প্রতিষ্ঠা। সুতরাং জনসমষ্টি রাষ্ট্রগঠনের একটি অপরিহার্য উপাদান।

এই জনসংখ্যা দুই অংশে বিভক্ত, যথা স্থায়ী বাসিন্দা বা রাষ্ট্রের সদস্য এবং অস্থায়ী বাসিন্দা বা বিদেশী। আবার রাষ্ট্রের সদস্যবৃন্দকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) যাহারা পরিপূর্ণভাবে পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে তাহারা নাগরিক বলিয়া অভিহিত এবং (২) যাহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার দরুণ অথবা অন্য কোন অযোগ্যতা হেতু রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত তাহাদিগকে অপূর্ণ নাগরিক বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

জনসমষ্টির শ্রেণীবিভাগ

এই জনসংখ্যার সঠিক সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। প্রায় ৬৫ কোটি লোক লইয়া চীন প্রজাতন্ত্র। আবার মাত্র ৫ লক্ষ লোকের বাসভূমি পানামা রাষ্ট্র। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ সীমাবদ্ধ জনসংখ্যাকেই সুশাসনের দিক হইতে কাম্য মনে করিতেন। এ্যারিষ্টটলের মতে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এত অধিক হইবে যাহাতে ইহা অর্থনৈতিক দিক হইতে আত্মনিভরশীল হয়; অপরপক্ষে জনসংখ্যা এত অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে ইহা সুশাসনের উপযোগী হয়। আবার হিট্লার, মুসোলিনী প্রমুখ সমরনায়কগণ ভাবিতেন, বিপুল জনসংখ্যাই রাষ্ট্রের শক্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করে। আসলে কোন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র জনসংখ্যার উপর নিভর করে না, নির্ভর করে সেই জনসমষ্টির চরিত্র, কর্মদক্ষতা, এবং দেশপ্রেমের উপর। ইংরাজ জাতির প্রাধান্যের কারণ তাহার জনসংখ্যা নয়, তাহার জাতিগত গুণাবলী। অনেক ক্ষেত্রে বিপুল জনসংখ্যার ফলে গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিলম্বিত রহিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক সংগঠনই হইল কাম্য জনসংখ্যা নিরূপণের মাপকাঠি। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যে পরিমাণ জনসংখ্যার পক্ষে পর্যাপ্ত, সেই পরিমাণ জনসংখ্যাই বাঞ্ছনীয়। আবার সুদৃঢ় রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য জনসমষ্টির মধ্যে জাতিগত ঐক্যের কথা অনেক রাষ্ট্রজ্ঞানী বলিয়াছেন।

কাম্য জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory) : আদিম অবস্থায় মানুষ যখন যাযাবর জীবন যাপন করিত, তখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নাই। কৃষিকার্য আরম্ভ হইলে পর মানুষের সঙ্গে মাটির স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক সংগঠন। একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই তাহার সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাহার কর্তৃত্বের পরিধি সুস্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন।

আঞ্চলিকতা রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষণ। সার্বভৌম শক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন।

এই ভূখণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে প্রচলিত কোন নিয়ম নাই। সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বৃহদায়তন রাষ্ট্র যেমন আছে, তেমনি সানমেরিনো, মোনাকো, কিউবা প্রভৃতি ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রেরও অভাব নাই। এমন এক সময় ছিল যখন বিস্তৃত ভূখণ্ড রাষ্ট্রের পক্ষে অভিশাপ স্বরূপ ছিল। যানবাহনের অপ্রতুলতা হেতু দূরত্ব ছিল অনতিক্রম্য। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ হিসাবে তাহার আঞ্চলিক বিস্তৃতির উল্লেখ করা হয়। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে বিস্তৃত ভূখণ্ড একই রাষ্ট্রের শাসনাধীনে রাখা সম্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের এক অঞ্চল যদি অপর অঞ্চল হইতে দুস্তর সমুদ্র অথবা পর্বতের ব্যবধান দ্বারা পৃথক থাকে, তাহা হইলে অতি অবশ্যই সে রাষ্ট্র সাংগঠনিক দিক দিয়া দুর্বল হইবে।

রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আয়তনে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হইতে পারে।

সরকার (Government): নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনসমষ্টি স্থায়ীভাবে বাস করিলেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় না। জনসমষ্টিকে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত হইতে হইবে। রাজনৈতিক সংগঠনের অর্থ শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা। জনসমষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করিবার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত থাকে সমষ্টিগতভাবে তাহাদিগকে সরকার আখ্যা দেওয়া হয়। কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য যেমন একটি কার্যনির্বাহক সমিতির প্রয়োজন হয়, সেইরূপ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হয় সরকারের। সরকারই হইল রাষ্ট্রের কার্যকরী রূপ।

মস্তিষ্ক যেমন মানুষকে পরিচালনা করে, তেমনি সরকার রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে।

বিভিন্ন দেশে এই সরকারের বা শাসন-ব্যবস্থার তারতম্য দেখা যায়। কোন রাষ্ট্র এককেন্দ্রীয়, আবার কোন দেশ যুক্তরাষ্ট্র পদ্ধতিতে সংগঠিত, কোথাও মন্ত্রীপরিষদের শাসন, অন্যত্র রাষ্ট্রপতির শাসন প্রচলিত। সংগঠন যেমনি হউক না কেন সরকারের প্রতি জনগণের অধিকাংশের স্বভাবগত আনুগত্য থাকা প্রয়োজন। ইহার অভাবে কোন সরকারই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না।

সরকারের স্থায়িত্ব জনগণের সমর্থনের উপর নির্ভর করে।

সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty): সার্বভৌমত্ব হইল চরমতম ক্ষমতা। এই ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র অন্যান্য সামাজিক সংগঠন হইতে পৃথক। রাষ্ট্র নিজস্ব অঞ্চলে সকল ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের উপর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী এবং সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে রাষ্ট্রের ইচ্ছাই চরম, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাহার আদেশের বিরুদ্ধে কোন

সার্বভৌমত্ব হইল রাষ্ট্রের চরম এবং অবিভাজ্য ক্ষমতা। এই ক্ষমতার দুইটি দিক—আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা যায় না। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা একক এবং অবিভাজ্য। আবার সার্বভৌম ক্ষমতা বলিতে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্তিও বোঝায়। আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্র সমমর্যাদাসম্পন্ন।

ভারতবর্ষ, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্র।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ (State of West Bengal), নিউইয়র্ক (State of Newyork) প্রভৃতি রাষ্ট্র নহে। সৌজন্যবোধে ইংরাজিতে ইহাদিগকে 'State' বলা হইলেও, ইহারা কোন ক্রমেই রাষ্ট্র নহে। এস্থলে 'State' বলিতে বৃহত্তর রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যকে বোঝায়। পশ্চিমবঙ্গ অথবা নিউইয়র্ক কাহারও সার্বভৌম ক্ষমতা নাই। দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক প্রভৃতি ব্যাপারে তাহারা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। পশ্চিমবঙ্গ ভারত ইউনিয়নের অন্তর্গত এবং নিউইয়র্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশমাত্র।

সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি রাষ্ট্র বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

রাষ্ট্রসংঘ (U. N. O.) রাষ্ট্র নহে। বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় এই সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রাষ্ট্রের সদস্য ব্যক্তি; রাষ্ট্রসংঘ রাষ্ট্র লইয়া গঠিত। কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। রাষ্ট্র সার্বভৌম বলিয়া তাহার উপর কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থাকিতে পারে না। প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই ইহার উদ্ভব হইয়াছে।

সদস্য রাষ্ট্রসমূহের সার্বভৌম অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা।

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society): রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করিতে হইলে সমাজের সহিত তাহার পার্থক্য কি তাহা জানা প্রয়োজন।

গ্রীক দার্শনিকগণ সমাজ এবং রাষ্ট্রকে অভিন্ন মনে করিতেন। একনায়কতন্ত্রেও এই পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। কাজেই এই জাতীয় রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজ এবং রাষ্ট্র অভিন্ন মনে করার অর্থ ব্যক্তিজীবনের সবক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ সম্ভব করিয়া তোলা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের সহিত সমাজের পার্থক্য উপেক্ষিত হইলেও গণতন্ত্রে তাহা স্বীকৃত এবং সুস্পষ্ট।

সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপক। একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টি বা জাতির অন্তর্গত যাবতীয় সংগঠন সমাজের অন্তর্ভুক্ত। এক একটি সংগঠন ব্যক্তিজীবনের কোন-না কোন দিকের বিকাশ সাধনের জন্য গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন।

সমাজের উদ্দেশ্য ব্যক্তি-জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করা। রাষ্ট্রের লক্ষ্য শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য সুশৃঙ্খল পরিবেশ ছাড়া আরও অনেক কিছুর প্রয়োজন। সুতরাং রাষ্ট্রের আদর্শ অপেক্ষা সমাজের আদর্শ ব্যাপক এবং গভীর।

রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের আদর্শ ব্যাপক এবং গভীর।

রাষ্ট্র এবং সরকার (State and Government): সাধারণ কথাবার্তায় রাষ্ট্র এবং সরকার অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজারা এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই। "আমিই রাষ্ট্র"—এই উক্তি ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুইয়ের। বিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক হবসের রচনায় রাষ্ট্র এবং সরকারের পার্থক্য ধরা পড়ে না।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজই রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ রচনা করা। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত এবং বাস্তবায়িত হয়। কোন সংগঠন পরিচালনার জন্য যেমন একটি কার্যনির্বাহক সমিতি থাকে তেমনি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রহিয়াছে সরকার।

(১) সরকার রাষ্ট্র নামক সংগঠনের পরিচালক 'সমিতি বিশেষ'।

রাষ্ট্র সমগ্র, সরকার তাহার অংশমাত্র। যে চারিটি উপাদানের সমাবেশে রাষ্ট্র গঠিত সরকার তাহাদের মধ্যে একটি। অংশ কখনও সমগ্রের সমান হইতে পারে না। জীবদেহের কোন একটি অঙ্গ সমগ্র জীবদেহ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

(২) সরকার রাষ্ট্র-গঠনের অন্যতম উপাদান।

দেশের সমগ্র জনসাধারণকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। কিন্তু সরকার বলিতে সমগ্র জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশকে বোঝায়। সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলিতে শুধু শাসনবিভাগ বা পরিচালন বিভাগ (Executive) কেই বোঝায়। ব্যাপক অর্থে সরকার হইল আইনসভা, শাসনবিভাগ এবং বিচারালয়ের সামগ্রিক পরিচয়। ব্যাপক অর্থে সরকারকে গ্রহণ করিলেও সরকারের সভ্যসংখ্যা কোন-ক্রমেই রাষ্ট্রের সমগ্র জনসংখ্যার সমান হইতে পারে না।

(৩) রাষ্ট্রের জনসংখ্যার এক মুষ্টিমেয় অংশের দ্বারাই সরকার পরিচালিত হয়।

রাষ্ট্র মাত্রেই একই উপাদানে গঠিত, কিন্তু সর্বত্র সরকারী সংগঠন এক রকমের নহে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের সরকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে মন্ত্রীপরিষদের শাসন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠিত। ফ্রান্সের সরকার এককেন্দ্রিক, সুইজারল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত।

(৪)
রাষ্ট্রের প্রকৃতি সর্বত্র একই রূপ, কিন্তু সরকারী সংগঠন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ।

স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল। সরকারের পতন অথবা পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের পতন অথবা পরিবর্তন হয় না। জারের পতনের পর সোভিয়েট রাশিয়ায় এবং চিয়াং কাইশেকের পলায়নের পর চীনদেশে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা ফারুকের সিংহাসনচ্যুতির পর মিশরে সামরিক শাসন চালু হয়। শাসকের পতনের ফলে রাশিয়া, চীন, মিশর প্রভৃতি রাষ্ট্রের পতন ঘটে নাই। তাহাদের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এক দলের পরিবর্তে অপর এক দলের শাসন-ক্ষমতাপ্রাপ্তি বিচিত্র কোন ঘটনা নহে। একই রাষ্ট্রে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে।

(৫)
রাষ্ট্র স্থায়ী, কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল।

রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, সরকার নহে। নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য সরকারকে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকার দেওয়া হয়। অস্থায়ী সরকার চিরন্তন ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না।

(৬)
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্র, সরকার নহে।

সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তির অধিকার থাকিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নহে। রাষ্ট্র সমস্ত অধিকারের উৎস। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অধিকারের অর্থ নিজের বিরুদ্ধে অধিকার। অপরপক্ষে সরকার যদি তাহার ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তি-অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে ব্যক্তি আইনতঃ সরকারের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারে।

(৭)
সরকারের বিরুদ্ধে ব্যক্তি অভিযোগ করিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পারে না।

রাষ্ট্র একটি ধারণামাত্র। সরকার ইহার বাস্তব রূপ। সরকারের মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রের কার্যকরী স্বরূপ প্রকাশ পায়। আকুমারিকা-হিমাচল-বিস্তৃত ভারত রাষ্ট্রকে আমরা শুধু কল্পনা করিতে পারি। ভারত সরকারের মাধ্যমেই তাহাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব।

(৮)
রাষ্ট্র ধারণামাত্র, সরকার তাহার কার্যকরী রূপ।

` , **রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (State and other associations) :** পূর্বেই বলা হইয়াছে সমাজ বহু প্রতিষ্ঠানের সমাবেশে গঠিত। মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি বিভিন্ন সংগঠনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য যেমন রাষ্ট্র রহিয়াছে, তেমনি অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আরও বহু সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে, যেমন সাহিত্য পরিষদ, শ্রমিক সংঘ, বণিক সমিতি, ধর্মীয় সংগঠন ইত্যাদি। রাষ্ট্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত অন্যতম সামাজিক সংগঠন। অন্যান্য সংঘ অনুরূপভাবে সমাজ হইতে উদ্ভূত হইলেও কতকগুলি মৌলিক পার্থক্যহেতু রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘ হইতে স্বতন্ত্র।

রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন

রাষ্ট্র একটি আঞ্চলিক সংগঠন। রাষ্ট্রের সহিত একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের পরিধি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু আঞ্চলিকতা অন্যান্য সংঘের বৈশিষ্ট্য নহে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রে শাখা বিস্তার করিয়াছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে, যেমন রেডক্রশ, রামকৃষ্ণ মিশন, রোটারী ক্লাব ইত্যাদি।

(১) অন্যান্য সংঘ রাষ্ট্রের মত অঞ্চলভিত্তিক নহে।

রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক। ব্যক্তিকে অবশ্যই কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে হইবে। সাধারণতঃ ব্যক্তি যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিক বলিয়া সে বিবেচিত হয়। অন্যান্য সংঘের সভ্যপদ আবশ্যিক নহে, ঐচ্ছিক। অর্থাৎ রাষ্ট্র ছাড়া অন্য যে কোন সংগঠনের সদস্য হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দিষ্ট করপ্রদানে ব্যক্তি বাধ্য। কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চাঁদা দেওয়া বা না দেওয়া তাহার ইচ্ছাধীন।

(২) রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সংঘ ইচ্ছামূলক।

ব্যক্তি একটিমাত্র রাষ্ট্রের সদস্য, অর্থাৎ কেহ এককালীন একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে না। অবশ্য এক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিহার করিয়া অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করা যায়। কিন্তু ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক সংঘের সদস্য হইতে পারে।

(৩) এককালীন বহু সংঘের কিন্তু একটি মাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া যায়।

অন্যান্য সংঘ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়। উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহাদের কার্যাবলীও পরিমিত, কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক। সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল তাহার লক্ষ্য। কাজেই অন্যান্য সংঘ অপেক্ষা রাষ্ট্রের কর্ম-পরিধি অধিকতর বিস্তৃত।

(৪) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অন্যান্য সংঘের তুলনায় ব্যাপকতর।

রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ক্ষণস্থায়ী হইতে পারে। কোন বিশেষ কার্য-সাধনের জন্য সাময়িকভাবে কোন সংঘের উদ্ভব হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে পর সেই সংঘের অবলুপ্তি ঘটিতে পারে। তাই বলিয়া সব সংঘই যে ক্ষণস্থায়ী, তাহা নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, পশ্চিমী যে কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা রোমান ক্যাথলিক চার্চ অধিক পুরাতন।

(৫)
স্থায়িত্ব রাষ্ট্রের ধর্ম, অন্যান্য সংগঠন সাময়িকভাবে গঠিত হইতে পারে।

প্রতিটি সংঘ পরিচালিত হয় কতকগুলি অনুশাসনের সাহায্যে। ইচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান নিয়মভঙ্গকারী সদস্যকে বহিষ্কৃত করিতে পারে, কিন্তু আর কোনরকম শাস্তি বিধান করিতে পারে না। রাষ্ট্র আইনভঙ্গকারীকে যে কোন শাস্তি দিতে পারে। অবস্থাভেদে মৃত্যুদণ্ডও রাষ্ট্র জারী করিতে পারে। বল-প্রয়োগের একচ্ছত্র অধিকার রাষ্ট্রের।

(৬)
বল প্রয়োগের একচেটিয়া অধিকার রাষ্ট্রকে অন্য সংঘ হইতে পৃথক করে।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে ব্যক্তির আনুগত্যের প্রতি রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার রহিয়াছে অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট হইতে রাষ্ট্রই সর্বপ্রথম তাহার পাওনা বুঝিয়া লয়। রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘকেও নিয়ন্ত্রণ করে। স্বীকৃতি বা সমর্থনের উপরেই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করে। সার্বভৌম শক্তির অধিকারবলে রাষ্ট্র যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি সাধন করিতে পারে অথবা নূতন কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারে। বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংসা করিয়া সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সংহতি রক্ষা করাই হইল রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব। এই বিশিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্যই রাষ্ট্র অন্যান্য সংঘের তুলনায় অধিকতর মর্যাদা এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৭)
রাষ্ট্র যে কোন প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে।

॥ সারাংশ ॥

সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। একটি বৃহৎ জনসমষ্টি সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া যখন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সুসংগঠিত সরকারের অধীনে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, তখন আমরা তাহাকে রাষ্ট্র বলি।

জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা—এই চারিটি রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌম ক্ষমতা হইল রাষ্ট্রের চরম, অবিভাজ্য ক্ষমতা। সার্বভৌম ক্ষমতার অভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি রাষ্ট্র আখ্যা পাইতে পারে না।

সরকার রাষ্ট্রের অন্যতম উপাদান। সরকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়। কাজেই সরকার এবং রাষ্ট্র অভিন্ন নহে। সরকার রাষ্ট্রের পরিচালক-সমিতি বিশেষ।

রাষ্ট্র অন্যতম সামাজিক সংগঠন। সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপক। বহু প্রতিষ্ঠান লইয়া সমাজ গঠিত, রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে একটি।

অন্যান্য সংঘের মত সমাজের মৃত্তিকা হইতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য সংঘের সহিত রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইচ্ছামূলক। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে রাষ্ট্র অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. "A State is a people organised for law within a definite territory"—Explain.
   "একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বাসকারী, আইন রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিই রাষ্ট্র"—ব্যাখ্যা কর।
   [পৃষ্ঠা ১৪-১৬]
2. What is a State? What are its essential characteristics?
   রাষ্ট্র কাহাকে বলে? রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি? [পৃষ্ঠা ১৪-১৬]
3. Is India a State? In what respects does a State differ from the State of West Bengal?
   ভারতবর্ষ কি রাষ্ট্র? রাষ্ট্রের সহিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পার্থক্য কোথায়?
   [পৃষ্ঠা ১৭ (পৃষ্ঠা ১৪-১৬-র সাহায্যও লইতে হইবে)]
4. How does a State differ from other types of social organisations?
   কি হিসাবে রাষ্ট্র অন্যান্য সামাজিক সংগঠন হইতে স্বতন্ত্র? [পৃষ্ঠা ২০-২১]
5. Distinguish between State and Government.
   রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে প্রভেদ কি তাহা লিখ। [পৃষ্ঠা ১৮-১৯]

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

(Origin of the State)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। রাষ্ট্রের ইতিবৃত্ত আজও তমসাবৃত। কখন এবং কি ভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভব নয়। নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব এবং তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা এই ব্যাপারে আলোকপাত করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে যুক্তিসহ ব্যাখ্যা দানে পর্যাপ্ত না হওয়ায় কল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। যুগবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত-বাদ প্রচারিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য মতবাদগুলি হইল—

অতীত অজ্ঞাত বলিয়া রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার প্রচার হইয়াছে।

(১) ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ, (২) সামাজিক চুক্তি মতবাদ, (৩) বলপ্রয়োগ মতবাদ, (৪) পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ এবং (৫) ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ আজিকার দিনে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্বীকৃত মতবাদ। উল্লিখিত মতবাদগুলির মধ্যে প্রথম চারিটি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু বর্জন করা হইয়াছে বলিয়া সেগুলি মূল্যহীন হইয়া পড়ে নাই। প্রতিটির মধ্যেই কোন না কোন সত্য নিহিত রহিয়াছে এবং প্রতিটি মতবাদই অতীতের রহস্য উদ্ঘাটনে আমাদিগকে সাহায্য করে। কোন একটি কল্পনাপ্রসূত মতবাদ বিশ্লেষণ এবং বর্জন করিতে যাইয়া আমরা সত্যের নিকটবর্তী হই। অন্ধকার অতিক্রম করিয়াই আলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলি হইতে যে সমস্ত সত্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাদের সমন্বয় সাধন করিয়া ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তন-বাদ প্রচারিত হইয়াছে।

বিবর্তনবাদই আধুনিক কালে রাষ্ট্রের উৎপত্তির স্বীকৃতমতবাদ

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ (Theory of Divine Origin) : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ইহাই প্রাচীনতম মতবাদ। এই মতবাদে বলা হইয়াছে যে (১) রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি; (২) রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র শাসন করেন; (৩) রাজা তাঁহার কার্যের জন্য একমাত্র ভগবানের কাছে দায়ী, অন্য কাহারও নিকট নহে। তাঁহার আদেশই আইন এবং তাঁহার প্রতিটি আচরণ বৈধ; (৪) প্রজা সাধারণের

বিধাতার সৃষ্ট রাষ্ট্র তাঁহারই প্রতিনিধি হিসাবে রাজা শাসন করেন।

কর্তব্য রাজার আদেশ নির্বিচারে পালন করা। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা অথবা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা শুধু অবৈধ নহে, তাহা অধর্মও।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই মতবাদ চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীনযুগে মানুষ বিশ্বাস করিত যে রাজশক্তি দৈবী শক্তিরই এক বিশেষ প্রকাশ। তাহারা রাজার সহিত অদৃশ্য কোন শক্তির এক নিগূঢ় সংযোগ কল্পনা করিত। নৃপতিগণ একাধারে পুরোহিত এবং শাসক বলিয়া অভিহিত ছিলেন। তখন ধর্ম এবং রাজনীতি ছিল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। শাসকের অধিকার যে ঈশ্বর-প্রদত্ত এবং ধর্মানুমোদিত—এই জাতীয় ধারণার সমর্থন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মপুস্তকে পাওয়া যায়। মহাভারতে বর্ণিত আছে—মাৎস্য ন্যায়ের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় জনগণ ঈশ্বরের নিকট একজন শাসক প্রার্থনা করে। ঐস্লামিক রাষ্ট্রগুলিও ছিল ধর্মীয় রাষ্ট্র। খৃষ্টধর্ম প্রচারের ফলে এই মতবাদে নূতন প্রাণ সঞ্চার হয়। মধ্যযুগে এই মতবাদ নবরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং "রাজাদের ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার" (Divine Right of Kings) এই নামে অভিহিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস্ ছিলেন এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক এবং সার রবার্ট ফিল্মার এই মতবাদকে দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিয়াছিলেন। প্রথম জেমস্ ঘোষণা করেন—'রাজা এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিকৃতি।'

বিভিন্ন ধর্মপুস্তকে এই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়

ঐশ্বরিক অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়ঃ রাজা ঈশ্বরানুমোদিত শাসক। তাঁহার কার্যের বৈধতা যাচাই করিবার অধিকার জনগণের নাই। রাজতন্ত্র বংশানুক্রমিক, পিতার অবর্তমানে জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনের অধিকারী। পোপের প্রাধান্য খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে নৃপতিগণ প্রথমে এই মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, পরে জাগ্রত জনমতের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই মতবাদকে প্রয়োগ করেন।

মূল্য বিচারঃ

(১)
ইহা অনৈতিহাসিক।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ সম্পূর্ণভাবে কল্পনা-প্রসূত ও অনৈতিহাসিক বলিয়া বর্তমান যুগে কেহ ইহা সমর্থন করে না।

এই মতবাদে চরম রাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোন শাসন ব্যাবস্থার উল্লেখ নাই। রাজতন্ত্রের যুগ আজ অতিক্রান্ত। গণতন্ত্র প্রায় সব দেশে প্রসার লাভ করিয়াছে, গণতন্ত্রের যুগে রাজতন্ত্র-সমর্থনকারী এই মতবাদ মূল্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

(২)
গণতন্ত্রের যুগে এই মতবাদ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে মানবীয় প্রতিষ্ঠান। মানুষের প্রয়োজনে মানুষকে লইয়াই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্রকে বিধাতার সৃষ্টি মনে করার অর্থ ইহাকে সকল প্রকার সমালোচনা ও পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে স্থান দেওয়া। এই মতবাদ বিপজ্জনক, যেহেতু ইহা রাজার যথেচ্ছাচারকে সমর্থন করে। শাসিতের প্রতি শাসকের দায়িত্বই ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার রোধ করিবার একমাত্র উপায়। শাসকের দায়িত্বহীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর।

(৩) রাষ্ট্রকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে স্থান দিয়া ইহা স্বেচ্ছাচারকে সমর্থন করে।

আমরা জানি সদা জাগ্রত থাকিয়া স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হয় এবং প্রতিরোধ করিবার সাহসই স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। কিন্তু এই মতবাদ, জনগণের বিদ্রোহের অধিকার অবৈধ এবং অন্যায়—এই ঘোষণার দ্বারা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিপন্ন করিয়াছে।

(৪) এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে।

রাজা মাত্রই সুশাসক নহেন। অত্যাচারী রাজার সংখ্যাই অধিক। মঙ্গলময় ঈশ্বর অত্যাচারী রাজাকে স্বীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন চরমতম ধার্মিকও তাহা বিশ্বাস করিবেন না।

(৫) অত্যাচারী শাসক মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া শ্রদ্ধা দাবী করিতে পারেন না।

সিংহাসন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তাই অযোগ্য, অক্ষম এবং অপদার্থ রাজার অভাব নাই। যোগ্যতার পরিবর্তে জন্ম যেখানে অধিকার নির্ধারণ করে, সেস্থলে অধিকারের অপপ্রয়োগ স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র।

(৬) রাজা মাত্রই দক্ষ শাসক হইবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই।

উল্লিখিত ত্রুটি সমূহের জন্য রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে এই মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। আদিম অবস্থায় মানুষ আইন শৃঙ্খলা মানিতে অভ্যস্ত ছিল না। রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করিয়া ধর্মভয়ে তাঁহার অনুশাসন মানিয়া চলিত। এইভাবে আদিম মানব নিয়মানুবর্তিতার প্রথম পাঠ আয়ত্ত করিয়াছিল।

বর্তমান যুগে এই মতবাদ ভ্রান্ত বিবেচিত হইলেও এক সময় ইহার উপযোগিতা ছিল।

রাজাকে বিধাতার প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার না করিলেও বলা যায়, মানুষের মনে যে সামাজিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা ঈশ্বরের দান। ঈশ্বরজাত এই প্রবৃত্তির প্রেরণায় মানুষ সংঘবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত।

মানুষের প্রকৃতিগত সমাজ-প্রীতি বিধাতারই দান।

তাহা ছাড়া এই মতবাদ শাসকদিগকে তাঁহাদের নৈতিক দায়িত্বের কথা স্মরণ

করাইয়া দেয়। এই মতবাদে রাজাকে ঈশ্বরের নিকট দায়ী করা হইয়াছে। ধর্মের নিকট, বিবেকের নিকট দায়িত্বই যথার্থ দায়িত্ব।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Theory of Social Contract) : রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির মধ্যে সামাজিক চুক্তি তত্ত্বই সমধিক প্রসিদ্ধ। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে প্রচারিত এবং সমর্থিত হইলেও এই মতবাদ তদপেক্ষা প্রাচীন। গ্রীসের প্রাচীন রাজনৈতিক রচনায় এবং আমাদের দেশে মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাষ্ট্র চুক্তির ফলে উদ্ভূত হইয়াছে

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির মাধ্যমে মানুষের দ্বারা রাষ্ট্র সৃষ্ট হইয়াছে—ইহাই এই মতবাদের মূল বক্তব্য। এই তত্ত্ব অনুসারে মানুষের ইতিহাসের দুইটি পর্ব। প্রথম পর্বটি রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত। দ্বিতীয়টির সূচনা হইয়াছে রাষ্ট্রসৃষ্টির পর। এই অবস্থান্তর ঘটিয়াছে একটি চুক্তির মাধ্যমে।

জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চুক্তির মাধ্যমে প্রাকৃতিক অবস্থা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিণত হইল।

রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে মানুষ যে বিশেষ অবস্থায় বাস করিত তাহাকে 'প্রাকৃতিক অবস্থা' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। প্রকৃতির এই রাজত্বে ব্যক্তি-জীবন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য কোন মানবীয় সংগঠন ছিল না, মনুষ্য-সৃষ্ট কোন বিধি বা অনুশাসন ছিল না। কালক্রমে জীবনের এই আদিম অবস্থা মানুষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। শান্তিপূর্ণ জীবনের আশায় আদিম মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া এক রাজনৈতিক সংগঠনের সৃষ্টি করিল। প্রাকৃতিক আইনের পরিবর্তে মনুষ্যকৃত আইনের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা অন্তর্হিত হইল ; মানুষ নিশ্চিত নিরাপত্তার আশ্বাস পাইল।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজ দার্শনিক হব্‌স এবং লক্‌ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো সামাজিক চুক্তি তত্ত্বকে বর্তমান রূপ দান করিয়াছেন।

হব্‌স (Hobbes) : ইংলণ্ডের ইতিহাসের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে হব্‌সের আবির্ভাব। সেই যুগের ধর্মান্ধতা এবং ষ্টুয়ার্ট রাজাগণের স্বৈরাচারের ফলে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম চার্লসের ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড হব্‌স প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই সমুদয় ঘটনা তাঁহার রাজনৈতিক দর্শনকে সম্যকভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

তাঁহার Leviathan নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার মতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ এক প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে

বাস করিত। এই অবস্থা ছিল আইনবিহীন অবস্থা। "জোর যার মুল্লুক তার"—এই ছিল তখনকার নিয়ম। সবল দুর্বলের উপর অবাধে অত্যাচার করিত। একে অন্যের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, ফলে আদিম মানুষের জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, কদর্য, পাশবিক এবং স্বল্পস্থায়ী"। এই দুঃসহ অবস্থা হইতে মানুষ অবশেষে মুক্তি পাইল পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া।

প্রকৃতির রাজ্য ছিল অরাজক অবস্থায়।

যে চুক্তির ভিত্তিতে সংগঠিত জীবনের সূচনা হইল হব্‌স তাহাকে সামাজিক চুক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রতিটি ব্যক্তি অপর সকলের সহিত একমত হইয়া কোন এক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমষ্টির হস্তে সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকার সমর্পণ করিল। আত্মরক্ষার অধিকার হস্তান্তরযোগ্য নহে বলিয়াই একটি মাত্র অধিকার অব্যাহত রহিল। ব্যক্তির এই শর্তহীন এবং সর্বাঙ্গীন আত্মসমর্পণের ফলে সার্বভৌম শক্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইল। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংসদের হস্তে সামগ্রিক এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হইল সে বা তাহাই হইল সার্বভৌম। শাসক চুক্তির অংশীদার নহে বলিয়া চুক্তিভঙ্গের অভিযোগে তাহাকে পদচ্যুত করা চলে না। তাহার শাসন দুঃসহ হইলেও তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবৈধ এবং অন্যায়। হবস্ কর্তৃক পরিস্ফুটিত সামাজিক চুক্তির মধ্যে এইভাবে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের সমর্থন পাওয়া যায়।

জনগণ চুক্তির দ্বারা রাজার হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলিয়া দিল। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবৈধ। হব্‌সের উদ্দেশ্য ছিল রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা।

লক্ (Locke): ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লবের সমর্থক লক্ সামাজিক চুক্তির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বা গণতন্ত্রের আভাষ পাওয়া যায়। লকের মতে রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে মানুষ যে প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিত, সেখানে ছিল শান্তি, সাম্য এবং স্বাধীনতা। সেখানে অরাজকতা ছিল না; প্রকৃতির আইন সর্বত্র বিরাজিত ছিল। অসুবিধা ছিল এই যে প্রাকৃতিক আইন ব্যাখ্যা এবং রক্ষা করিবার জন্য সর্বজনস্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণ চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি করিল।

প্রকৃতির রাজ্যে প্রাকৃতিক আইনকে কার্যকর করার মত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না।

লকের রচনায় দুইটি চুক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথম চুক্তি অনুসারে ব্যক্তি তাহার শাসনের অধিকার সমাজের হাতে সমর্পণ করিল। দ্বিতীয় চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল সমাজের সহিত শাসকের বা রাজার। এই চুক্তির পক্ষভুক্ত ছিলেন রাজা, তাই তাঁহার শাসন ক্ষমতা নিরঙ্কুশ নহে, শর্তাধীন। ব্যক্তি-জীবনের অধিকার, সম্পত্তির

সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং শর্তাধীন।

অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার সমর্পণ করে নাই। ব্যক্তির এই তিনটি প্রাকৃতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই সরকার শাসনক্ষমতা ভোগ করিবে। লকের মতবাদ অনুসারে চুক্তি-ভঙ্গকারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বৈধ এবং ন্যায়সঙ্গত।

রুশো (Rousseau)ঃ ফরাসী বিপ্লবের মন্ত্রগুরু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Contract Social'-এ সামাজিক চুক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রুশো-বর্ণিত প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল ভূস্বর্গতুল্য। কিন্তু এই সুখ, শান্তি এবং স্বাধীনতার জীবন দীর্ঘস্থায়ী হইল না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষিকার্য আবিষ্কার, ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির আবির্ভাব ইত্যাদি কারণে সাম্যের অবসান ঘটিল, প্রকৃতির রাজ্যে নানারূপ জটিলতার উদ্ভব হইল। অশান্তি এবং অসাম্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় মানুষ স্বেচ্ছায় স্বর্গরাজ্য হইতে নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিল। তাহারা চুক্তিবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিল। মানুষের স্বচ্ছন্দজীবনের সমাপ্তি ঘটিল। তাই রুশো বলিয়াছেন—মানুষ স্বাধীন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে সে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াছে।

প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভূস্বর্গ তুল্য কিন্তু পরে সাম্য অন্তর্হিত হওয়ায় দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হইল।

রুশো, হব্‌স এবং লকের মতবাদের সমন্বয় সাধন করিতে চাহিয়াছেন। হব্‌সকে অনুসরণ করিয়া তিনি সার্বভৌম কর্তৃত্বের প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন। আবার লকের অনুকরণে তিনি সেই সার্বভৌম শক্তিকে গণতান্ত্রিক আবাস বা আধার দান করিয়াছেন। তাঁহার মতে জনগণ পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হইয়া তাহাদের সর্altবিধ প্রাকৃতিক অধিকার বিনাশর্তে সমাজের হস্তে অর্পণ করিল।

সার্বভৌম ক্ষমতা জনসমাজের হস্তে অর্পিত হইল, রাজার হস্তে নয়।

সমাজের সাধারণ ইচ্ছাই হইল সার্বভৌম শক্তির প্রতীক। ব্যক্তি এককভাবে প্রাকৃতিক যে অধিকার বর্জন করিল, সমগ্রের সদস্য হিসাবে সে তাহা ফিরিয়া পাইল। অধিকন্তু লাভ করিল তাহার অধিকার সম্বন্ধে নিরাপত্তা এবং নিশ্চয়তা।

মূল্য বিচারঃ

রাষ্ট্রের উৎপত্তির বর্ণনা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে।

এই মতবাদের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। আমরা ইতিহাসে এমন একটি দেশেরও উল্লেখ পাই না যেখানে চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্র হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই। বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে।

**(১)
এই মতবাদ অনৈতিহাসিক**

এই তত্ত্বে বলা হইয়াছে, এমন একদিন ছিল যখন রাষ্ট্র বলিয়া কিছু ছিল না। কাজেই সে অবস্থায় মানুষের রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকা সম্ভব নয়। রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রসৃষ্টির প্রয়াস সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য।

(২) আদিম মানবের রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন ধারণা থাকা সম্ভব নয়।

চুক্তির ধারণা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আদিম অবস্থায় এই জাতীয় উন্নত আচরণ আশাতীত। তাহা ছাড়া চুক্তি একটি আইনসিদ্ধ কার্য, আইনের পরিবেশেই ইহা সংঘটিত হইতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশে চুক্তির ধারণা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

(৩) আইনের আবর্তনে চুক্তি সম্পাদিত হওয়া অবিশ্বাস্য ঘটনা

রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই মতবাদে বলা হইয়াছে জনগণ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের সদস্য হইয়াছে। এই জাতীয় ধারণা রাষ্ট্রের সংহতি এবং স্থায়িত্বের পরিপন্থী।

(৪) এই মতবাদ রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের পক্ষে বিপজ্জনক।

এই মতবাদে ধরা হইয়াছে যে প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যক্তি অধিকার ভোগ করিত, কিন্তু অধিকারের ভিত্তি হইল রাষ্ট্র, তাহার সমর্থন হইল আইন, এই দুয়ের অভাবে অধিকার থাকিতে পারে না। প্রকৃতির রাজ্যে ব্যক্তি যাহা ভোগ করিত, তাহা ক্ষমতা। কিন্তু আইনের দ্বারা সমর্থিত ক্ষমতাই অধিকার।

(৫) প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যক্তির অধিকার ছিল—এরূপ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা।

এই মত কারণে সামাজিক চুক্তি মতবাদ পরিত্যক্ত হইলেও ইহার মূল্য অনস্বীকার্য। ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিয়া এই মতবাদ মধ্যযুগীয় ধারণা হইতে মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে অব্যাহতি দান করিয়াছে। রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মানুষের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, এই মতবাদ তাহা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল্য : ইহা ঐশ্বরিক উৎপত্তি তত্ত্বের বিরোধী এবং গণতন্ত্রের পরিপোষক।

জনগণের সম্মতিই যে রাষ্ট্রের ভিত্তি—এই ধারণা প্রচার করিয়া সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশে সাহায্য করিয়াছে। সাধারণ ইচ্ছার ধারণাকে প্রচার করিয়া রুশো প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পথিকৃৎরূপে শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।

পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theories) : উভয় মতবাদের বক্তব্য হইল যে রাষ্ট্র পরিবারের সম্প্রসারিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অর্থাৎ পরিবারই বিস্তৃত হইয়া কালক্রমে রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। উভয় মতবাদই পরিবারকে আদিমতম সামাজিক সংগঠন বলিয়া স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রকে পারিবারিক জীবনের ক্রমবিকাশের ফল বলিয়া গণ্য করে।

পরিবার বিস্তৃত হইয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে—ইহাই এই দুই মতবাদের বক্তব্য।

মূল বক্তব্য এক হইলেও পরিবারের কর্তৃত্ব লইয়া উভয় মতবাদের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে। পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে প্রাচীন পারিবারিক সংগঠনের কর্তৃত্ব গৃহস্বামী বা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষের উপরেই ন্যস্ত ছিল।

অপরপক্ষে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থকেরা বলেন যে আদিম পরিবারে নারীই ছিলেন সর্বময়ী কর্ত্রী। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকগণ মাতৃতান্ত্রিক পরিবারকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পূর্ববর্তী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মূল্য বিচার ঃ

একমাত্র পরিবার কালক্রমে বড় হইয়া রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে—এই জাতীয় ধারণা রাষ্ট্রের উৎপত্তির যথার্থ ব্যাখ্যা হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না। এই মতবাদে রক্তের সম্পর্ককে রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, আত্মীয়তাবোধ বা রক্তের সম্বন্ধ রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম উপাদান সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র উপাদান নহে। তাহা ছাড়া অনেকে বলেন, পরিবার সমাজ-সংগঠনের আদিরূপ নহে। আদিমতম সমাজ সংগঠন হইল গোষ্ঠী, ইহার বহুপরে পরিবারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

আত্মীয়তাবোধ রাষ্ট্র-সৃষ্টির ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছে, কিন্তু ইহাই একমাত্র উপাদান নহে।

বলপ্রয়োগ মতবাদ (**The Theory of Force**)ঃ এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা। রাষ্ট্র-সৃষ্টির পূর্বে মানবসমাজ বহু গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল এবং প্রতিটি গোষ্ঠী পরিচালিত হইত একজন গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে। মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর এবং কলহপ্রিয়। সেই কারণে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের সংঘাত এবং পরিণামে নিয়ত সংঘর্ষই ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। গোষ্ঠীপতি অন্য দলকে বাহুবলে পরাস্ত করিয়া বিজিতদের উপর আপন আধিপত্য স্থাপন করিত। এইভাবে যখন একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর নায়ক অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীকে পরাভূত করিয়া পর্যাপ্ত আয়তনের নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া শাসন করিতে সুরু করিল, তখনই রাষ্ট্রের সূচনা হইল। এই কারণেই বলা হয় যুদ্ধের ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

সবল দুর্বলকে পরাভূত করিয়া যখন বিস্তৃত অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিল, তখনই রাষ্ট্রের সূচনা হইল।

এই মতবাদের সমর্থকেরা আরও বলেন যে বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বজায় রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তি যে আনুগত্য প্রদান করে, তাহার একমাত্র কারণ রাষ্ট্র অমিতশক্তির অধিকারী।

বলপ্রয়োগের দ্বারাই রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে রক্ষা করা হয়।

মূল্য বিচার ঃ

রাষ্ট্রের উদ্ভবের মূলে যে পশুবলের অবদান রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যুদ্ধ-বিগ্রহ রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান, একমাত্র উপাদান নহে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অন্যান্য উপাদানের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পশুবলের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের একমাত্র কারণ হিসাবেও পশুবলকে গ্রহণ করা যায় না। শাসকের অধিকার কেবলমাত্র পশুবলকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। ক্ষমতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অধিকারেরও সমাপ্তি ঘটে। রুশ বিপ্লব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আফ্রিকার নব জাগরণ এই চিরন্তন সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

শুধু ক্ষমতার দ্বারা রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা যায় না।

রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখিবার জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন অবশ্যই রহিয়াছে। আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করিয়া রাষ্ট্র সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ রচনা করে। তবে এ কথা মনে করা ভুল যে শাস্তির ভয়েই সকলে আইন মান্য করিয়া চলে। সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক আইন মান্য করে। অধিকাংশের এই স্বভাবগত আনুগত্যই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখিয়াছে। রাষ্ট্রের ভিত্তি শক্তি নয়, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন।

জনগণের স্বভাবগত আনুগত্যের জোরেই রাষ্ট্র টিকিয়া আছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (Historical or Evolutionary Theory) ঃ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে উপরিউক্ত মতবাদগুলির আলোচনা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে পূর্বোক্ত কোন একটি মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তির যথার্থ ব্যাখ্যা নয়। ইহাও অনস্বীকার্য যে প্রতিটি মতবাদের মধ্যে আংশিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। এই সমুদয় সত্যের সমন্বয়ের ফলেই একটি সাথক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বিবর্তনবাদ এই সমন্বয়ের সন্ধান দেয়।

কল্পনাপ্রসূত মতবাদগুলির অন্তর্নিহিত সত্যের সমাবেশে বিবর্তনবাদের বিষয়বস্তু গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিবর্তনবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তি প্রসঙ্গে স্বীকৃত মতবাদ। এই তত্ত্ব বলে যে, রাষ্ট্র বিধাতার দান নয়; পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বা চুক্তির ফলে ইহা গঠিত হয় নাই; বলপ্রয়োগের ফলে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই; ইহা পরিবারের সম্প্রসারিত রূপও নহে। রাষ্ট্র আদিম এবং অসম্পূর্ণ মানব সমাজের পরিণত রূপ। এক বিরামহীন বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে।

আদিম অবস্থা হইতেই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া কর্তৃত্বাধীনে বাস করিতে

অভ্যস্ত। কালক্রমে সামাজিক জীবনে জটিলতা দেখা দিল। সমস্যার অভিনবত্ব হেতু কর্তৃত্বেরও রূপান্তর ঘটিল। সমাজ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হইয়া রাষ্ট্র-রূপ লাভ করিল। বিরতিবিহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের এই ধারা কতকগুলি শক্তির দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রগঠনে কয়েকটি উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, যেমন রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তাবোধ, ধর্ম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা। এই উপাদান-গুলির কোন্‌টি ক্রমবিকাশের কোন্ স্তরে কিরূপ কার্যকরী ছিল সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা যায় না। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে আর একটি শক্তি বিশেষ-ভাবে কার্য করিতেছে। তাহা হইল জাতীয়তাবোধ।

বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে বহু পরিবর্তনের মধ্যদিয়া রাষ্ট্র ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে।

(১) **রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তা (Kinship or Blood Relationship)** সমাজ-সংগঠনের প্রথম পর্যায়ে আত্মীয়তাবোধের ভূমিকাই ছিল প্রধান। একই বংশোদ্ভূত—এই ধারণাই আদিম মানব-গোষ্ঠীকে একত্রিত করিয়াছিল। আদিমতম সমাজ সংগঠন—পরিবার রক্তের বন্ধনেই আবদ্ধ ছিল। এই পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তি নিয়মানুবর্তিতার প্রথম পাঠ আয়ত্ত করে। এই শৃঙ্খলা-বোধই হইল রাষ্ট্রের ভিত্তি।

বিবর্তনের প্রথম স্তরে রক্তের সম্পর্ক জনগণের মধ্যে বন্ধন আনয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

(২) **ধর্ম (Religion):** আত্মীয়তাবোধের পাশাপাশি অপর একটি শক্তি রাষ্ট্রের বিবর্তনে সাহায্য করিয়াছিল। তাহা হইল ধর্ম। গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা যখন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল, তখন রক্তের সম্পর্ক আর সংহতি সাধনে সমর্থ হইল না। আত্মীয়তাজনিত বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িলে ধর্ম নূতন করিয়া এই ঐক্যের প্রেরণা যোগাইল। আদিম মানুষ ধর্ম বলিতে বুঝিত প্রকৃতির এবং পিতৃপুরুষের পূজা। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী তাহার কাছে ছিল দুর্বোধ্য। ঝড়, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে দেবতার ক্রোধের প্রকাশ মনে করিয়া মুক্তির আশায় মানুষ পূজা পার্বণ অনুষ্ঠান করিত। অপরদিকে রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতিকে পূর্বপুরুষের অভিশাপের ফল মনে করিয়া বিরূপ পিতৃপুরুষের তুষ্টিবিধানের জন্য তাহারা পূজানুষ্ঠান করিত। প্রবীণতম ব্যক্তি হিসাবে গোষ্ঠীপতিই এই সমস্ত পূজার্চনা সম্পাদন করিতেন। গোষ্ঠীপতি এইভাবে একাধারে শাসক এবং পুরোহিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

রক্তের বন্ধন যখন শিথিল হইয়া আসিল তখন তাহার স্থান গ্রহণ করে ধর্মবোধ।

পুরোহিত হিসাবে তাঁহার সম্মান, শাসক হিসাবে তাঁহার অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। আনুগত্যবোধ সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্ম রাষ্ট্রের বিবর্তনের পথ সুগম করিয়াছে।

(৩) **যুদ্ধ-বিগ্রহ (War):** যুদ্ধ অথবা বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃই স্বার্থপর এবং কলহপ্রিয়। পশুচারণ পর্যায়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ প্রায় লাগিয়াই থাকিত। কৃষিযুগে এই সংঘর্ষ আরও ব্যাপক আকারে দেখা দিল। আত্মরক্ষার জন্য প্রতি গোষ্ঠী তৎপর হইয়া উঠিল। যুদ্ধ প্রাত্যহিক ঘটনায় পরিণত হওয়ার ফলে যুদ্ধনায়কও অপরিহার্য হইয়া উঠিল এবং সমাজ ব্যবস্থায় তিনি স্থায়ী আসন লাভ করিলেন। এইভাবে যুদ্ধ স্থায়ী রাজপদ সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছে।

যুদ্ধবিগ্রহও জনগণকে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করে।

(৪) **অর্থনৈতিক প্রয়োজন (Economic necessity):** চতুর্থ যে উপদান রাষ্ট্রের বিকাশে সহায়তা করিয়াছে, তাহা হইল ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব। সম্পদ, বিশেষ করিয়া ভূসম্পত্তিকে কেন্দ্র করিয়া যে সমস্ত বিরোধের সৃষ্টি হইল তাহাদের মীমাংসার জন্য এবং উত্তরাধিকার নির্ণয় করিবার জন্য আইনের প্রয়োজন অনুভূত হইল। ধনবৈষম্যের ফলে শ্রেণীবৈষম্য দেখা দিল। বিত্তশালী সম্প্রদায়, বিত্তহীন শ্রেণীর উপর স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য শাসনযন্ত্রের পত্তন করিল। এইভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রতিষ্ঠা লইল।

ধন-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইন এবং সরকারের প্রয়োজন অনুভূত হইল।

(৫) **রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (Political consciousness):** প্রথম পর্যায়ে রক্তের সম্পর্ক, ধর্মের বন্ধন অথবা শাস্তির ভয় গোষ্ঠীপতির শাসনকে অব্যাহত রাখিয়াছিল। সভ্যতার অগ্রগতি এবং শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সংগঠিত জীবনের প্রয়োজন এবং বশ্যতার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন হইল। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে তাহারা স্বেচ্ছায় আদেশপালনে প্রবৃত্ত হইল। এই স্বতঃপ্রণোদিত আনুগত্যের ফলেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্রের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়াই জনগণ তাহার আদেশ পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার সামর্থ্যই রাষ্ট্রকে স্থায়িত্ব দান করিয়াছে।

রাষ্ট্রের উদ্ভব এবং দায়িত্বের মূলে রহিয়াছে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা।

॥ সারাংশ ॥

কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা আমরা সঠিক জানিনা। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সমস্ত মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে ঐতিহাসিক

মতবাদ বা বিবর্তনবাদই বর্তমানে স্বীকৃত বা সমর্থিত। কল্পনাপ্রসূত বলিয়া অন্যান্য মতবাদ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ—এই মতবাদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্র বিধাতার নির্দেশে গঠিত, রাজা বিধাতার প্রতিনিধি এবং রাজার আদেশ অমান্য করা পাপ। এই মতবাদ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন করে বলিয়া গণতান্ত্রিক যুগে অচল। কিন্তু এই মতবাদের মধ্যে একটি সত্য নিহিত আছে,—যে সহজাত প্রবৃত্তির বশে মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহা বিধাতারই দান।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে হব্‌স, লক্‌ এবং রুশো কর্তৃক এই মতবাদ বিশেষভাবে পরিস্ফুটিত হয়। এই মতবাদের গোড়ার কথা হইতেছে, এমন একদিন ছিল যখন রাষ্ট্র বলিয়া কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। মানুষের জীবনের এই অবস্থাকে প্রাকৃতিক অবস্থা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে উক্ত তিনজন দার্শনিক একমত নহেন। কালক্রমে প্রকৃতির রাজ্যে নানা রকম অসুবিধা দেখা দিল। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য জনগণ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থা পত্তন করিল।

এই মতবাদ অনৈতিহাসিক। এমন কোন দেশের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যেখানে চুক্তির ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। এই মতবাদের পরিণাম অত্যন্ত বিপজ্জনক। কিন্তু ত্রুটি সত্ত্বেও ইহাতে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। ইহা ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের অসারতা প্রমাণ করিয়াছে এবং 'রাষ্ট্রের ভিত্তি সাধারণের সম্মতি' এই ধারণা প্রচার করিয়া, ইহা গণতন্ত্রের পথ সুগম করিয়াছে।

বলপ্রয়োগ মতবাদ—এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে শক্তি প্রয়োগের ফলে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার মূলেও রহিয়াছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা, যাহার নিকট প্রত্যেককে নতি স্বীকার করিতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং স্থায়িত্বের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের মূল্য অনস্বীকার্য। শক্তি রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান মাত্র, একমাত্র উপাদান নয়।

পিতৃতান্ত্রিক এবং মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ—এই দুইটি মতবাদের মূল কথা হইল, পরিবারের সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে আত্মীয়তাবোধ বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া আত্মীয়তাবোধ রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান নহে।

বিবর্তনবাদ—দীর্ঘকালের স্বাভাবিক বিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে রাষ্ট্রগঠনের মূলে কতকগুলি

উপাদান আছে : রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ, অর্থনৈতিক প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক চেতনা।

এই মতবাদই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. "The state is the result of brute force"—Discuss.

"রাষ্ট্র পশুশক্তির প্রয়োগের ফলে গঠিত হইয়াছে।" এই মতবাদের আলোচনা কর।

[পৃষ্ঠা ৩০-৩১]

2. Give a brief account of the Theory of Social Contract as an explanation of the origin of the state.

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সংক্ষেপে বিবৃত কর।

[পৃষ্ঠা ২৬-২৯]

3. Write a note on the Theory of Evolution as an explanation of the origin of the state.

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবর্তনবাদ বা ঐতিহাসিক মতবাদটি আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৩১-৩৩]

4. Discuss briefly the important theories regarding the origin of the State.

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য মতগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [সারাংশ দ্রষ্টব্য]

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ

(Departments of Government)

রাষ্ট্রীয় আদর্শ সরকারের মাধ্যমেই রূপায়িত হয়। সরকারই রাষ্ট্রের বাস্তব রূপ। ব্যাপক অর্থে কোন দেশের সরকার বলিতে সেই দেশের সমগ্র শাসন-ব্যবস্থাকে বোঝায়। শাসন-ব্যবস্থার লক্ষ্য সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ রচনা করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিটি সরকারকে ত্রিবিধ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। যথা—আইন প্রণয়ন, আইন অনুসারে শাসন এবং আইন-ভঙ্গকারীর বিচার। এই তিন প্রকার কার্য তিনটি বিভাগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই তিনটি বিভাগ যথাক্রমে—ব্যবস্থা বিভাগ, শাসন

সরকারের ব্যাপক অর্থ

বিভাগ এবং বিচার বিভাগ নামে অভিহিত। ব্যাপক অর্থে সরকার বলিতে আমরা এই তিনটি বিভাগকে একত্রে বুঝিয়া থাকি।

সরকারের সংকীর্ণ অর্থ

সঙ্কীর্ণ অর্থে সরকার বলিতে কেবলমাত্র শাসন বিভাগকে বোঝায়। সরকারের আলোচনাকালে আমরা ব্যাপক অর্থে সরকার কথাটি ব্যবহার করি।

ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি (Theory of Separation of Powers): এই নীতিতে বলা হয় যে সরকারী কার্য প্রধানতঃ তিনটি। এই তিনটি কার্যের দায়িত্ব তিনটি পৃথক প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের উপর অর্পণ করা উচিত। আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার যথাক্রমে আইন সভা, শাসন বিভাগ এবং বিচারালয় দ্বারা স্বতন্ত্র-ভাবে পরিচালিত হইবে—ইহাই এই মতবাদের মূলকথা।

সরকারের তিনটি কার্য তিনটি সম্পূর্ণ পৃথক বিভাগের দ্বারা সম্পন্ন হইবে—ইহাই ক্ষমতা বিভাজন নীতির মূলকথা।

ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অর্থ এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়:—

(১) একটি কার্যের জন্য একাধিক বিভাগ থাকিবে না বা একটি বিভাগ একাধিক কার্য করিবে না;

(২) একই ব্যক্তি একাধিক বিভাগের সদস্য হইবেন না;

(৩) এক বিভাগ অপর বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবে না। প্রতিটি বিভাগ থাকিবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিভাগগুলির মধ্যে কোনরূপ সংযোগ এই মতবাদ সমর্থন করে না। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে 'নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যের নীতি' (Theory of Checks and Balances) ক্ষমতা-বিভাজন নীতির বিরোধী।

ক্ষমতা-বিভাজন নীতির আলোচনা প্রাচীন হইলেও এই মতবাদকে বর্তমান রূপ দান করেন বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক মন্টেস্কু (Montesquieu)। ব্যক্তি-স্বাধীনতার দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি এই নীতি সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে একই ব্যক্তির হস্তে আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচারের সামগ্রিক ক্ষমতা থাকিলে ব্যক্তিস্বাধীনতার অবসান ঘটিবে। এমত অবস্থায় মাত্র একজনেরই স্বাধীনতা থাকা সম্ভব। তিনি হইলেন শাসক। অপর সকলে তাঁহার ক্রীতদাসে পরিণত হইবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে ক্ষমতার এই অপব্যবহার রোধ করিতে হইবে এবং তাহার একমাত্র উপায় বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এই ক্ষমতা বণ্টন বা বিভক্ত করা। বিভিন্ন বিভাগ পৃথক পৃথক কাজ করিলে বিভাগীয় দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে সমগ্র শাসন ব্যবস্থা উৎকর্ষ লাভ করিবে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম উপায় হইল এই ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ।

ইহার ফলে শাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

ক্ষমতা-বিভাজন নীতির প্রয়োগ

ইংলণ্ড ঃ—ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় এই নীতি গৃহীত হয় নাই, তথাকার রাণী আইন সভার অবিচ্ছেদ্য অংশ, শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এবং সমগ্র বিচারের উৎসরূপে বিবেচিত হন। পরিচালন ক্ষমতার অধিকারী মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ আইন সভার সদস্য এবং আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল। লর্ড সভা আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে, আবার সর্বোচ্চ আপীল আদালতের কার্যও করিয়া থাকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঃ—মার্কিন শাসনতন্ত্র ক্ষমতা-বিভাজন নীতিকে স্বীকার করিলেও পুরামাত্রায় ইহাকে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় নাই। সে দেশের রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। তথাপি দেখা যায় আইন প্রণয়নে রাষ্ট্রপতির প্রভূত প্রভাব রহিয়াছে। সিনেটও গুরুতর অপরাধের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত আইন এবং রাষ্ট্রপতি-সম্পাদিত কার্য শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বাতিল করিতে পারে। অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যের আদর্শের ফলে ক্ষমতা-বিভাজন নীতির পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় নাই।

ভারত ঃ—ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই। রাষ্ট্রপতি পরিচালন বিভাগের প্রধান, আইনসভার অপরিহার্য অঙ্গ এবং বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতারও অধিকারী। পার্লামেণ্টারী শাসনপদ্ধতি কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে গৃহীত হওয়ায় মন্ত্রীগণ আইনসভার সদস্য এবং আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল। শাসন বিভাগের হাতে জরুরী আইন প্রণয়নের অধিকার আছে। ইহা ছাড়া যদিও নির্দেশাত্মক নীতিতে বিচারবিভাগকে আইনবিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কথা বলা হইয়াছে, তবুও জেলা-শাসকের হাত হইতে বিচার ক্ষমতা এখনও অপসারণ করা হয় নাই। যাহা হউক, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের লক্ষ্য।

মূল্য বিচার ঃ—সরকারী কার্যাবলী পৃথক থাকা উচিত, একথা মানিয়া লইলেও বাস্তবক্ষেত্রে সরকারী কার্যের সূক্ষ্ম বিভাগ সম্ভব নয়। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষমতা-স্বতন্ত্রী করণ অবাস্তব পরিকল্পনা মাত্র।

(১)
আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার একই কার্যের ৩টি পর্যায় মাত্র।

আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার তিনটি পৃথক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্য নহে। এই তিনটি একই সামগ্রিক কার্যের তিনটি পর্যায় বা অংশমাত্র। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সরকারের কর্তব্য। এই ব্যাপক কর্তব্যের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে উক্ত তিনটি কার্য সরকারকে সম্পাদন করিতে হয়।

সরকার জীবদেহের সহিত তুলনীয়। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেরূপ পরস্পর নির্ভরশীল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগও সেইরূপ ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ। তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কচ্যুত করা অসম্ভব।

(২)
জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মত ৩টি বিভাগ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় কোথাও এই নীতি পরিপূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই। সর্বত্রই আইন প্রণয়নে শাসন বিভাগের নির্দেশ পালিত হয়, শাসন বিভাগ আইনসভার বিরতিকালে জরুরী আইন জারী করে, এবং উপ-আইন দ্বারা আইনসভা প্রণীত আইনের ফাঁক পূরণ করিয়া দেয়।

(৩)
কোন দেশেই এই পৃথকীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয় নাই।

এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হইলেও কাম্য নয়। বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতার উপরেই সরকারের সাফল্য নির্ভর করে। বিভাজনের ফলে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়িয়া উঠে এবং তাহার পরিণাম মঙ্গলকর নয়। এক বিভাগ অপর বিভাগকে সাহায্য না করিলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আইনসভা প্রণীত আইন শাসনবিভাগ যদি বিশ্বস্ততার সহিত প্রয়োগ না করে এবং বিচারালয় যদি শাসনবিভাগ কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রমাণিত অসদাচরণের দণ্ড বিধান না করে, তাহা হইলে সরকার পরিচালনা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

(৪)
সম্পূর্ণ ক্ষমতা-বিভাজন কাম্য নহে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ অপরিহার্য নহে। ইংলণ্ডে এই নীতি গৃহীত না হওয়ার দরুণ ইংলণ্ডবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জনগণের সদা-সতর্কতাই স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ।

(৫)
ক্ষমতা-পৃথকীকরণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে।

তাহা ছাড়া সরকারী বিভাগের সংখ্যা সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে। অনেকে বলেন বিভাগ আসলে ৩টি নহে—২টি। তাঁহারা বিচার বিভাগকে শাসনবিভাগের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ সরকারের ৫টি বিভাগের নির্দেশ দেন—(১) ব্যবস্থা বিভাগ, (২) শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ, (৩) শাসন বিভাগের সাধারণ কর্মচারীবৃন্দ, (৪) বিচার বিভাগ, (৫) নির্বাচকমণ্ডলী।

(৬)
সরকারী বিভাগের সংখ্যা সম্বন্ধে মতবিরোধের অবকাশ আছে।

এই মতবাদে প্রতিটি বিভাগ সমমর্যাদাসম্পন্ন কিন্তু আইনানুসারে শাসন এবং বিচার কার্য সম্পন্ন হয় বলিয়া আইনপ্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী ব্যবস্থা-বিভাগের গুরুত্ব সর্বাধিক। জাতীয় প্রতিনিধিসভা হিসাবেও ইহার প্রাধান্য অনস্বীকার্য।

(৭)
আইনসভা স্বাভাবিক ভাবেই অধিক প্রভাবশালী।

পরিশেষে বলা যায়---সম্পূর্ণ ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ অবাঞ্ছিত বিবেচিত হইলেও ইহার আংশিক প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য। আংশিক প্রয়োগ বলিতে বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা বোঝায়। বিচারবিভাগ যদি আইন অথবা শাসন-বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারকগণের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

বিচার বিভাগীয় স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান।

বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী ও সংগঠন

ব্যবস্থা বিভাগ (Legislature) ঃ কার্যাবলী (Functions)

(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্য

সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ রচনার জন্য আইন প্রণয়ন করা ব্যবস্থা বিভাগের প্রধান কার্য। অলিখিত শাসনতন্ত্রের দেশ ইংলণ্ডে (যুক্তরাজ্যে) পার্লামেণ্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইহা যে কোন আইন-প্রণয়ন অথবা বাতিল করিতে পারে, অপর পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। প্রত্যেক দেশেই ব্যবস্থাপক সভা সময়োপযোগী নূতন আইন প্রণয়ন করে এবং পুরাতন আইনগুলিকে সংশোধন অথবা বাতিল করিয়া থাকে।

(২) অর্থসংক্রান্ত কার্য

সরকারের আয়ের উৎস, পরিমাণ এবং বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ব্যবস্থাপক সভা নির্ধারণ করে। সরকারের আয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ের উপর আইনসভার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। কর ধার্য করা এবং ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করার একক অধিকার আইনসভার। জনগণের প্রতিনিধিদের সম্মতি ব্যতীত গণতান্ত্রিক দেশে কর আদায় করা যায় না এবং আদায়ীকৃত অর্থ ব্যয় করা যায় না।

(৩) শাসনসম্পর্কিত কার্য

মন্ত্রীপরিষদ-শাসিত দেশে আইনসভা মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ত্রিগণ আইনসভার সভ্যগণের মধ্য হইতেই সাধারণতঃ নিযুক্ত হন। আইনসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এবং নিন্দাসূচক অথবা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীসভাকে সংযত রাখে। রাষ্ট্রপতি-শাসিত দেশেও নিয়োগ এবং চুক্তি-অনুমোদন প্রভৃতি শাসন বিভাগীয় কার্য ব্যবস্থাপক সভা করিয়া থাকে।

ব্যবস্থাবিভাগ বিচার বিষয়ক কার্যও সম্পাদন করে। ইংলণ্ডের (যুক্তরাজ্যের) হাউস্ অব লর্ডস্ সর্বোচ্চ আপীল্ আদালত। ভারতীয় পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি, সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি প্রভৃতি উচ্চপদাধিকারীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার উচ্চ কক্ষ—সিনেট অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করে।

(৪)
বিচার বিষয়ক ক্ষমতা

কোন কোন দেশে আইনসভা সাধারণ আইনের মত শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিতে পারে, যেমন ইংলণ্ড। ভারতীয় পার্লামেণ্ট বিশেষ পদ্ধতিতে শাসনতন্ত্রের অধিকাংশ ধারা পরিবর্তন করিতে পারে। অনমনীয় শাসনতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও শাসনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে।

(৫)
সংবিধান সংক্রান্ত কায

আইনসভা সর্বশ্রেণীর জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এখানে জনমতের সত্যকার প্রতিফলন হওয়া সম্ভব। বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং জনগণের অভাব অভিযোগ পেশ করা হইল আইন সভার অন্যতম প্রধান কর্তব্য।

(৬)
অন্যান্য কার্য

আইনসভার গঠন (Organisation of the Legislature)—ব্যবস্থাপক সভার সংগঠন সর্বত্র একরূপ নহে। কোন রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভা এক পরিষদ বিশিষ্ট (Unicameral), আবার কোথাও দুইটি পরিষদ লইয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয় (Bicameral)। দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার প্রথম কক্ষটিকে নিম্ন পরিষদ (Lower Chamber) এবং দ্বিতীয়টিকে উচ্চ পরিষদ (Upper Chamber) বলা হয়। সর্বত্রই নিম্নকক্ষের সদস্যগণ জনগণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। উচ্চ কক্ষের সদস্যগণের নির্বাচন ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। যেমন ইংলণ্ডে (যুক্তরাজ্যে) হাউস অফ লর্ডসের অধিকাংশ সদস্যই বংশানুক্রমিক অধিকারে আসন লাভ করেন। মার্কিন সিনেটের সদস্যগণ জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভারতীয় রাজ্যসভার ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত এবং বাকী সদস্যগণ রাজ্য বিধানসভাগুলির দ্বারা নির্বাচিত হন। দ্বিপরিষদ-বিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। যুক্তিগুলি নিম্নে আলোচিত হইল।

আইনসভা একটি কক্ষ অথবা দুইটি কক্ষ লইয়া গঠিত হইতে পারে।

পক্ষে যুক্তি (Case for Bicameralism)—দ্বিতীয় পরিষদের অবস্থান প্রথম পরিষদকে সংযত রাখিতে সহায়তা করে। পরামর্শ অথবা বাধাদানের কেহ নাই—এই জাতীয় ধারণা নিম্ন কক্ষকে নিঃশঙ্ক করিয়া তোলে। ফলে ক্ষমতার অসদ্ব্যবহারের প্রবৃত্তি জাগে। দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে প্রথম পরিষদ স্বীয় আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবে।

(১) উচ্চকক্ষ নিম্নকক্ষের স্বেরাচার রোধ করে।

প্রথম পরিষদ বিশেষ বিচার বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা বশে বিল প্রণয়ন করিতে পারে। দ্বিতীয় পরিষদে উক্ত বিলের আলোচনাকালে ত্রুটিগুলি ধরা পড়ে। তাহার ফলে সংশোধনের অবকাশ পাওয়া যায়।

(২) দুইটি পরিষদ্ থাকার ফলে সুচিন্তিত আইন প্রণয়ন সম্ভব হয়।

উচ্চকক্ষে কোন একটি বিল পুনর্বিবেচিত হওয়ার ফলে যে অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত হয় তাহার মধ্যে জনমত গঠন করিবার সময় মেলে। জনমতের গতি প্রকৃতি নিম্নকক্ষের পরবর্তী কার্যক্রমের নির্দেশ দেয়।

(৩) দ্বিতীয় পরিষদ জনমত গঠনে সহায়তা করে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে উচ্চ কক্ষের সদস্যগণ নিম্ন কক্ষের সভ্যবৃন্দের তুলনায় অধিকতর অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা সম্পন্ন। তাঁহারা নিম্নকক্ষের সদস্যগণের উপর শুভ প্রভাব বিস্তার করেন। ইহার ফলে নিম্নকক্ষের উগ্র গণতান্ত্রিকতা খর্ব হয় এবং শাসন ব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় থাকে।

(৪) উচ্চ পরিষদের সদস্যবৃন্দের যোগ্যতাই উচ্চ কক্ষের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সমর্থন।

উচ্চ পরিষদে বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় বা স্বার্থের প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ, শিক্ষকবৃন্দ এবং স্নাতকগণ প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন। আবার উচ্চপরিষদেই উপযুক্ত অথচ নির্বাচন দ্বন্দে অবতীর্ণ হইতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে মনোনীত সদস্য হিসাবে স্থান দেওয়া যায়। ভারতবর্ষে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যগুলিতে রাজ্যপালগণ উচ্চকক্ষে কিছু সংখ্যক সদস্য মনোনীত করেন।

(৫) উচ্চ পরিষদ বিশেষ প্রতিনিধিত্বের অবকাশ দেয়।

গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আইনসভার দায়িত্ব এবং কর্তব্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আইনসভাকে বর্তমানে বহুবিধ কার্য করিতে হয়। এই জাতীয় পরিস্থিতিতে উচ্চকক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কমূলক বিলগুলি উচ্চপরিষদেই উত্থাপন এবং আলোচনা করিতে

(৬) উচ্চ কক্ষ থাকার ফলে নিম্ন কক্ষের দায়িত্বভার কিছুটা লঘু হয়।

পারে। ইহাতে নিম্ন পরিষদের কিছুটা সময় বাঁচিয়া যায়, যাহার ফলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দিকে তাহা মনোনিবেশ করিতে পারে।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় উচ্চকক্ষের বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় উচ্চ পরিষদ রাজ্যগুলির অধিকার রক্ষার নিমিত্ত অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহা অঙ্গরাজ্যগুলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নপরিষদের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যের ধারণা এবং উচ্চ কক্ষের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ধারণা কার্যকরী হয়।

বিপক্ষে যুক্তি (Case against Bicameralism) : ল্যাস্কি প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

(১) দ্বিতীয় কক্ষ অপ্রয়োজনায়।

উচ্চ পরিষদ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত একমত হয় তাহা হইলে ইহা বাহুল্যমাত্র; আর যদি ইহার সহিত নিম্নপক্ষের মতবিরোধ ঘটে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিতরূপে ক্ষতিকারক।

(২) ইহা জটিলতা, বিলম্ব এবং ব্যয় বাহুল্যের প্রশ্রয় দেয়।

দুইটি পরিষদ থাকার ফলে একটি বিল লইয়া উভয় পরিষদে আলাপ আলোচনা চলে। ইহাতে আইন প্রণয়ন ব্যাপারে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি হয় এবং অবাঞ্ছিত বিলম্ব ঘটে। কোন একটি আইন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও, তাড়াতাড়ি পাশ করান সম্ভব হয় না। ইহা ছাড়া, দুইটি পরিষদ রাখার জন্য ব্যয়ভারও বৃদ্ধি পায়। এই অর্থ অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যয়িত হইতে পারে।

(৩) উচ্চপরিষদ সংরক্ষিত স্বার্থ ও সংরক্ষণশীল মনোভাবের প্রতীক।

বিভিন্ন দেশের উচ্চকক্ষের সংগঠন আলোচনা করিলে দেখা যায়—কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্যই ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহার সদস্যগণ সংরক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহারা সাম্যবিধায়ক প্রস্তাব অথবা প্রগতিমূলক পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া থাকেন।

(৪) নিম্নপক্ষের বিরুদ্ধে হঠকারিতার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

একটি মাত্র কক্ষ থাকিলে অবিবেচনাপ্রসূত আইন প্রণীত হইতে পারে—এইরূপ অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা। বহু আলাপ-আলোচনার ফলেই আইনের উদ্ভব হয়। ইহা সত্ত্বেও আইনের মধ্যে যদি ত্রুটি থাকিয়া যায় তাহা হইলে প্রায় সর্বত্রই পরিচালন বিভাগীয় প্রধান (Executive Head) 'ভেটো' প্রয়োগ করিতে পারেন। এমত অবস্থায় দ্বিতীয় পরিষদের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র এবং যুক্তরা বিচারালয়ের সাহায্যে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কাজেই উচ্চপরিষদ তথায় অপরিহার্য বিবেচিত হয় না। ইহা ছাড়া বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ কক্ষের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থের ব্যাপারে ইহা মোটেই সচেতন নয়।

(৫)
যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় ইহা অপরিহার্য নয়।

দুইটি পরিষদ থাকিলে দায়িত্ব বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং একে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইতে চাহিবে। বিভক্ত দায়িত্ব দায়িত্বহীনতার নামান্তর।

(৬)
দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা দায়িত্বহীন।

গণতান্ত্রিক দেশে নিম্নকক্ষ অবশ্যম্ভাবীভাবে অধিকতর ক্ষমতার অধিকার পাইবে। জনপ্রতিনিধি সভা হিসাবে ইহা সত্যই অপরাজেয়। উচ্চ কক্ষ ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। প্রায় সব গণতান্ত্রিক দেশে নিম্নকক্ষ উচ্চকক্ষের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করে।

(৭)
নিম্ন পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সামর্থ্য উচ্চ পরিষদের নাই।

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে দ্বিপরিষদ ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করিতেই হয়, তাহা হইলে তাহার সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। নিম্নকক্ষের অপূর্ণতা উচ্চ কক্ষ মারফৎ পূর্ণ করিতে হইবে। নিম্নকক্ষে সাধারণভাবে বিশেষ দক্ষতা বা যোগ্যতার অভাব রহিয়াছে। যদি দক্ষ শাসক, বিবেচক রাজনীতিবিদ্‌ প্রভৃতিকে লইয়া উচ্চ পরিষদ গঠিত হয়, তাহা হইলে ইহার সামাজিক সমর্থন মিলিবে। উচ্চ পরিষদের প্রকৃত ক্ষমতার উৎস শাসনতন্ত্রের ধারা নয়, তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠা।

উচ্চকক্ষের কাযকারিতা সামাজিক স্বীকৃতি এবং সমর্থনের উপর নির্ভর করে।

শাসন বিভাগ (The Executive)

কার্যাবলী: আইনের উপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশ রচনা করার দায়িত্ব শাসন বিভাগের। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য পুলিশবাহিনী এবং অন্যান্য বিভাগে কর্মচারী নিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ করা এবং হাজত জেলখানা প্রভৃতি পরিচালনা করা শাসন বিভাগের কার্য। তিনটি বিভাগের মধ্যে একমাত্র শাসন বিভাগের সহিত জনগণের সম্পর্ক ঘনিষ্ট এবং ইহার দক্ষতা এবং সততার উপরেই রাষ্ট্রের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে।

(১)
আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই শাসন বিভাগের প্রধান কার্য।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধানের ভার শাসন বিভাগের হস্তে ন্যস্ত। এই উদ্দেশ্যে শাসন বিভাগই স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীর নিয়োগ এবং পরিচালন কার্য সম্পাদন করে। যদিও যুদ্ধ ঘোষণা এবং শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ভার আইন সভার হস্তে থাকে, তবুও উভয় ব্যাপারেই শাসনবিভাগকে অগ্রণী হইতে হয়।

(২) সেনাবাহিনীর সংগঠনের দায়িত্ব শাসন বিভাগের।

অন্য রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সেই উদ্দেশ্যে তথায় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, অন্য রাষ্ট্র হইতে দূত গ্রহণ, নূতন রাষ্ট্র বা সরকারকে স্বীকৃতি জ্ঞাপন প্রভৃতি কার্য শাসনবিভাগই করিয়া থাকে।

(৩) কূটনৈতিক কার্যাদি শাসন বিভাগই সম্পাদন করে।

যদিও কর ধার্য এবং ব্যয়বরাদ্দ আইন সভাই করিয়া থাকে, তবুও কর ধার্যের প্রস্তাব এবং ব্যয় বরাদ্দের দাবী শাসনবিভাগের তরফ হইতেই আসে। তাহা ছাড়া কর আদায় এবং বিভিন্ন খাতে ব্যয় শাসনবিভাগই করিয়া থাকে।

(৪) কর আদায় এবং আদায়ীকৃত অর্থ ব্যয়—শাসন বিভাগের মাধ্যমেই করা হয়।

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত ব্যবস্থায় শাসনবিভাগই আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করে, স্থগিত রাখে এবং প্রয়োজনবোধে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। ইহা ছাড়া মন্ত্রিগণ প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থাতেও শাসনবিভাগ পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করে। কার্যতঃ আইনের খসড়া শাসনবিভাগের নিকট হইতেই আসে। জরুরী প্রয়োজনে শাসনবিভাগ জরুরী আইনও জারী করিয়া থাকে।

(৫) আইন সংক্রান্ত নানাবিধ কার্য শাসনবিভাগ করিয়া থাকে।

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাসনকর্তৃপক্ষের দ্বারা মনোনীত হন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন। আবার পরিচালন বিভাগীয় প্রধানের হাতে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে মার্জনা করিবার, তাহাদের শাস্তির পরিমাণ কমাইয়া দিবার অথবা শাস্তি স্থগিত রাখিবার অধিকার থাকে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালগণ অনুরূপ ক্ষমতা ভোগ করেন।

(৬) শাসন বিভাগের হস্তে বিচার বিভাগীয় কিছু ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে।

ভারতবর্ষে জেলা-শাসক জেলার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন।

বর্তমান যুগে সর্বত্রই পুলিশীরাষ্ট্রের ধারণা বর্জন করা হইয়াছে। তাহার পরিবর্তে সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের ধারণা প্রসার লাভ করিয়াছে। প্রতি রাষ্ট্র আধুনিককালে নানাবিধ সাম্য বিধায়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে, শিল্পসমূহের জাতীয়করণ করা হইতেছে। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার অর্থ শাসনবিভাগের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়া; কেন না রাষ্ট্রের এই জাতীয় ক্রিয়াকলাপ শাসনবিভাগের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়।

শাসন বিভাগের অন্যান্য দায়িত্ব

বিচার বিভাগ (The Judiciary)

কার্যাবলী : ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অথবা রাষ্ট্রের বা সরকারের সহিত ব্যক্তির বিরোধ বিচারালয়ের দ্বারাই নিষ্পত্তি করা হয়। আইন-সভা কর্তৃক রচিত আইনগুলিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করার দায়িত্ব আদালতের। এই আইনের সাহায্যে আদালত একদিকে যেমন ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির বিবাদের মীমাংসা করে, অন্যদিকে তেমনি শাসনবিভাগ কর্তৃক অভিযুক্ত আসামীর বিচার করিয়া শাস্তিবিধান অথবা মুক্তিদান করিয়া থাকে।

(১) প্রচলিত আইন অনুসারে বিবাদের নিষ্পত্তি করা বিচার-বিভাগের প্রধান কায।

আদালত অথবা বিচারককে আইনের ব্যাখ্যাকর্তা বলিয়া অভিহিত করা হয়। প্রচলিত আইনগুলির ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করিয়া বিচারপতিগণ সেইগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিচারকগণ একই আইনের ব্যাখ্যা করিয়া নূতনতর অর্থ আরোপ করেন।

(২) প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা বিচার বিভাগের অন্যতম কায।

কোন বিরোধের মীমাংসা প্রচলিত আইনের সাহায্যে সম্ভব না হইলে বিচারপতিগণ কখনও বিচার করিতে অসম্মত হন না। তাঁহারা যদি দেখেন যে কোন বিষয় প্রচলিত আইনের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত নয় তাহা হইলে তাঁহারা বিবেক এবং ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করিয়া থাকেন। এইভাবে বিচারকগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নূতন আইনেরও সৃষ্টি করেন।

(৩) বিচারপতিগণ অনেক সময় রায়দানের মাধ্যমে নূতন আইনের সৃষ্টি করেন।

বিচার বিভাগকে গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষক বলিয়া বিবেচনা করা হয়। শাসনকর্তৃপক্ষ অথবা আইনসভা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার যদি

লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে নাগরিক আদালতের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারে।

(৪)
নাগরিকগণের অধিকার রক্ষা করা বিচারবিভাগের অপর দায়িত্ব।

কোন ভারতীয় নাগরিক যদি মনে করে যে, তাহার সংবিধান প্রদত্ত অধিকার আইন অথবা শাসন বিভাগীয় কার্যের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা হইলে সে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আদালতে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র চরম আইন বলিয়া বিবেচিত হয়। এই শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে কেন্দ্র এবং রাজ্যের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা হয়। উভয় কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক স্বাধীনতাই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিরোধ উপস্থিত হইলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত শাসনতন্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়া এই জাতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় একটি নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত অপরিহার্য; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ প্রভৃতি রাষ্ট্রে সুপ্রীমকোর্টের অনুরূপ ভূমিকা রহিয়াছে।

(৫)
শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে আদালতের ভূমিকা

(৬)
পরামর্শ দান

ভারতবর্ষে সুপ্রীমকোর্ট আইনসংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির আবেদনক্রমে পরামর্শ দান করিয়া থাকে।

বিচার বিভাগের সংগঠন (Organisation of Judiciary): গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার সদা-সতর্ক প্রহরী হিসাবে বিচার বিভাগের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিচারকগণের দক্ষতা এবং নিরপেক্ষতাই হইল কোন একটি শাসনব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি। বিচারকগণের ন্যায় এবং পক্ষপাত-শূন্য বিচারের উপরেই গণতন্ত্রের সার্থকতা নির্ভর করে। এই জন্য প্রয়োজন বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা। যদি শাসনবিভাগ বিচারবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে বিচারকগণের নিকট হইতে নিরপেক্ষ বিচার আশা করা যায় না। উপযুক্ত বেতন এবং কার্যকালের স্থায়িত্ব, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে অপরিহার্য।

নিরপেক্ষ বিচারের জন্য প্রয়োজন বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা।

অধিকাংশ দেশেই উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিগণ শাসন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণকে নিয়োগ করেন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধানধর্মাধিকরণ এবং মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। অবশ্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বিচারপতিগণের কি কি যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয় তাহার উল্লেখ করা

শাসনকর্তৃপক্ষের দ্বারা বিচারক নিয়োগ

হইয়াছে। বিচারকগণ নিযুক্ত হইবার পর একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। সাধারণতঃ শাসনবিভাগ যথেচ্ছভাবে তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারে না। চাকুরীর সর্তাদির এই নিশ্চয়তা এবং কার্যকালের স্থায়িত্ব থাকার ফলে বিচারবিভাগ শাসনবিভাগের প্রভাবাধীন না থাকিয়া পক্ষপাতশূন্য বিচার করিতে পারে। ভারতবর্ষে প্রধান ধর্মাধিকরণ এবং মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণ এইরূপ নিরাপত্তা ভোগ করেন।

তাঁহারা কার্যকালের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত।

বিচারপতি নিয়োগের অপর দুইটি পদ্ধতি আছেঃ (ক) বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি এই যে ইহার ফলে আইনসভা বিচারবিভাগের উপর অবাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

আইনসভার দ্বারা অথবা জনগণের ভোটে বিচারক নিয়োগের পদ্ধতি ত্রুটিবহুল

(খ) বিচারপতিগণ অপরপক্ষে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইতে পারেন। কিন্তু ইহার ফলে বিচারপতি নিয়োগের ব্যাপারে রাজনৈতিক দলাদলি দেখা দিবে। তাহা ছাড়া সাধারণ ভোটদাতার পক্ষে সুযোগ্য বিচারপতি নিয়োগ করা মোটেই সম্ভব নয়। নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা এবং আইনের জ্ঞান—এইগুলি হইল বিচারকের যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি। এইগুলি যাচাই করিবার মতো বুদ্ধি বা জ্ঞান সাধারণ ভোটারের থাকা সম্ভব নয়।

॥ সারাংশ ॥

সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলিতে শুধু শাসনবিভাগকে বোঝায়। ব্যাপক অর্থে সরকার বলিতে আইনসভা, শাসনকর্তৃপক্ষ এবং বিচারবিভাগ এই তিনটিকে একত্রে বোঝায়।

ক্ষমতা-বিভাজন নীতিতে বলা হয় যে সরকারের তিনটি কার্য্য, যথা আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার তিনটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এই তিনটি বিভাগ পৃথক পৃথক ব্যক্তির দ্বারা সংগঠিত হইবে এবং পরস্পর স্বাধীনভাবে কার্য করিবে। একই ব্যক্তির হস্তে একাধিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিলে ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার হইবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে।

এই নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে তিনটি বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ সম্ভব নয় এবং সম্ভব হইলেও কাম্য নয়। এই তিনটি বিভাগ এইরূপ

ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক করার প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাহা ছাড়া এই তিনটি বিভাগের সহযোগিতার উপরেই সরকারের দক্ষতা এবং সাফল্য নির্ভর করে। তবে গণতান্ত্রিক দেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

আইনসভার কার্য ঃ—(১) আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন করা, (২) সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা, (৩) শাসক সম্প্রদায়কে সংযত রাখা, (৪) বিচার বিভাগীয় বিশেষ কর্তব্য সম্পাদন করা, (৫) শাসনতন্ত্রের সংশোধনে অংশ গ্রহণ করা, (৬) জনগণের অভাব অভিযোগ শাসকবর্গের কর্ণগোচর করা।

আইনসভার সংগঠন ঃ—ব্যবস্থাপরিষদ একপরিষদ অথবা দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট হইতে পারে। দ্বিপরিষদ ব্যবস্থার স্বপক্ষে বলা হয় যে, ইহা (১) এক কক্ষের স্বৈরাচার রোধ করে, (২) সুচিন্তিত আইন প্রণয়নে সাহায্য করে, (৩) যোগ্য ব্যক্তির মনোনয়নে সহায়তা করে, (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির অধিকার রক্ষা করিয়া থাকে, (৫) জনমত গঠনে সাহায্য করে।

এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বলা যায় যে (১) ইহা ব্যয়বহুল এবং আইন প্রণয়নে অযথা বিলম্ব ঘটায়; (২) নিম্নপরিষদের সহিত একমত হইলে উচ্চ পরিষদ বাহুল্যমাত্র, দ্বিমত হইলে ইহা নিশ্চিতরূপে ক্ষতিকারক; (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ শাসনতন্ত্র এবং বিচারালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত হয়, কাজেই তথায় উচ্চপরিষদ অপ্রয়োজনীয়; (৪) গণতান্ত্রিক দেশে নিম্নকক্ষকে সংযত করিবার সামর্থ্য উচ্চকক্ষের নাই।

শাসনবিভাগের কার্য ঃ—(১) আইনসভা প্রণীত আইন অনুসারে আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং তদুদ্দেশ্যে পুলিশ বাহিনী এবং অন্যান্য বিভাগ সংগঠন করা, (২) বৈদেশিক সম্পর্ক নিরূপণ করা, (৩) নিরাপত্তা বিধানের জন্য সামরিক বাহিনী গঠন এবং পরিচালনা করা, (৪) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কিছু কার্য করা এবং প্রয়োজনবোধে জরুরী আইন জারী করা, (৫) বিচার সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করা এবং (৬) সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে বহুবিধ কল্যাণজনক কার্য পরিচালনা করা।

শাসন বিভাগের গঠন ঃ—ইংলণ্ড (যুক্তরাজ্য), ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে একজন রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। তিনি কিন্তু আসল শাসক নহেন। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রীমণ্ডলীর হস্তে থাকে।

আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনবিভাগীয় সমুদয় কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। তিনি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

বিচার বিভাগীয় কার্য :—(১) বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আইনকে প্রয়োগ করিয়া বিরোধের নিষ্পত্তি করা এবং অপরাধীকে দণ্ডদান করা, (২) প্রচলিত আইনের ব্যাখ্যা করা, (৩) নূতন আইন সৃষ্টি করা, (৪) শাসনতন্ত্রের চরমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং রাজ্যকে নিজস্ব সীমার মধ্যে সংযত রাখা, (৫) গণতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তি-অধিকার রক্ষা করা।

ন্যায় এবং পক্ষপাতশূন্য বিচারই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ। বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে করা হয়।

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বিচারপতিগণ শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন। আইন সভার দ্বারা অথবা জনগণের ভোটে বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা বাঞ্ছিত নয়। উপযুক্ত মাহিনা এবং কার্যকালের স্থায়িত্ব বিচারকগণের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার একমাত্র উপায়।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **What are the different organs of Government? Describe their respective functions.**

   সরকারের কি কি বিভাগ আছে ? তাহাদের কার্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

   [সারাংশ—পৃষ্ঠা ৪৭-৪৯]

2. **Give a critical estimate of the Theory of Separation of Powers.**

   ক্ষমতা বিভাজন নীতি বিশদভাবে আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮]

3. **What do you mean by Separation of Powers? Discuss the extent of the application ot this principle in the Constitution of India.**

   ক্ষমতা বিভাজন বলিতে কি বোঝ ? ভারতীয় শাসনতন্ত্রে এই নীতি কি পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭]

4. **Discuss the reasons for the existence of Second Chamber.**

   দ্বি-পরিষদ বিশিষ্ট আইনসভার পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে তাহা আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৪১]

5. **"The function of the Legislature is not merely the making of laws." What other functions does the Legislature in a democratic country discharge?**

   "আইন প্রণয়নই আইনসভার একমাত্র কাজ নহে।" গণতান্ত্রিক দেশের আইনসভা আর কি কি কর্তব্য সম্পাদন করে ? [পৃষ্ঠা ৩৯]

6. **What are the functions of the Judiciary? What is its importance in a democracy?**

   বিচার বিভাগের কার্য কি কি ? গণতান্ত্রিক দেশে বিচার বিভাগের গুরুত্ব কিরূপ ?

   [পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী

(Different Forms of Government)

প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই মৌলিক উপাদানে গঠিত। কিন্তু সর্বত্র সরকারী সংগঠন এক রূপ নহে। দেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক পরিবেশ, জনগণের জীবনাদর্শ ইত্যাদি সরকার গঠনে সমধিক প্রভাব বিস্তার করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিষ্টটল দুইটি নীতির ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থার শ্রেণী বিন্যাস করিয়াছেন। প্রথমতঃ শাসনের উদ্দেশ্যকে মানদণ্ডরূপে ধরিয়া তিনি সরকারকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—স্বাভাবিক এবং বিকৃত সরকার। যে শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য জনসাধারণের মঙ্গল, তাহাকে তিনি 'স্বাভাবিক' আখ্যা দেন। আর যে সরকার শাসকের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরিচালিত হয় তাহাকে তিনি 'অস্বাভাবিক' বা 'বিকৃত' বলিয়া অভিহিত করেন।

আরিষ্টট্‌লের শ্রেণী বিভাগ

দ্বিতীয়তঃ শাসকের সংখ্যা অনুসারে তিনি উপরিউক্ত দুইটি প্রধান শ্রেণীর প্রতিটিকে তিনটি উপশ্রেণীতে ভাগ করেন। স্বাভাবিক সরকার একজন, অল্প কয়েক-জন অথবা বহুজনের দ্বারা পরিচালিত হইলে তাহা যথাক্রমে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং 'পলিটি' নামে অভিহিত হয়। এই তিনটি শ্রেণীর বিকৃতরূপ হইল যথাক্রমে স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্র।

অ্যারিষ্টট্‌লের শ্রেণী বিভাগ অত্যন্ত সরল। বর্তমানে মিশ্র এবং জটিল শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণের পক্ষে ইহা পর্যাপ্ত নহে।

আধুনিক যুগে সরকারকে প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। রাষ্ট্র-পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব যখন একজনের হস্তে থাকে, তখন তাহাকে একনায়কতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়। অপরপক্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যখন কোন একজন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না থাকিয়া সর্বসাধারণের হস্তে থাকে, তখন সেই শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় গণতন্ত্র।

আধুনিক সরকারের শ্রেণী বিভাগ : একনায়কতন্ত্র এবং গণতন্ত্র।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে আবার দুইটি নীতির ভিত্তিতে কয়েকটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে, প্রথম নীতিটি হইল কেন্দ্র এবং অঞ্চলের মধ্যে সম্পর্কের

প্রকৃতি। যখন সমগ্র দেশের শাসন একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের অধীনস্থ থাকে, তখন তাহাকে বলা হয় এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government)। অপর পক্ষে যে শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকার উভয়েই নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বপ্রধান তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government) নামে অভিহিত করা হয়।

গণতন্ত্র এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্র এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

দ্বিতীয় নীতিটি হইল আইন সভার সহিত শাসন বিভাগের সম্পর্কের স্বরূপ। যে সরকারী ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তাহার কার্যাদির জন্য আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল নহে, তাহাকে বলা হয় রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার। এইরূপ শাসন ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধান শাসক। তিনি অথবা তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রীবর্গ আইন সভার সদস্য নহেন। তাঁহারা আইন সভার নিকট তাঁহাদের অনুসৃত নীতি বা কার্যাবলীর জন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। অপর পক্ষে, রাষ্ট্র পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা যখন আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীপরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে, তখন তাহাকে বলা হয় পার্লামেণ্টারী শাসন অথবা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার অথবা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। মন্ত্রী-পরিষদ-শাসিত সরকারের শীর্ষদেশে কোথাও থাকেন একজন রাজা বা রাণী। তাঁহার অধিকার বংশানুক্রমিক। এইরূপ সরকার সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Limited Monarchy) অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) নামে অভিহিত।

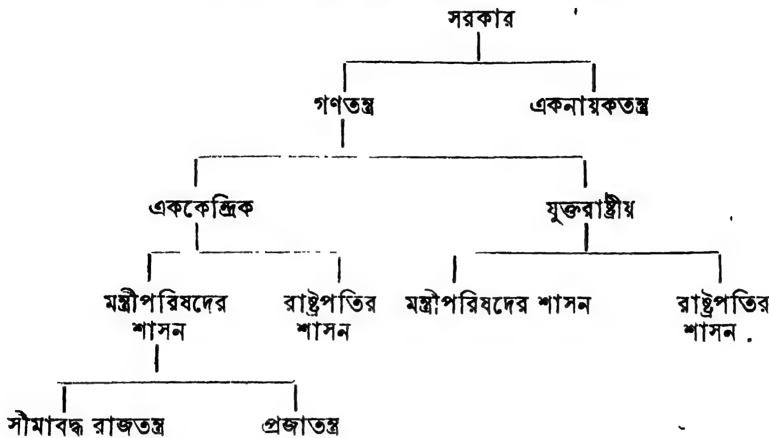
গণতন্ত্রের আবার দুইটি রূপ: সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত।

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের দুইটি রূপ—সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র।

আবার কোথাও মন্ত্রীপরিষদ শাসিত রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি অধিষ্ঠিত থাকেন। এইরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র (Republic) নামে পরিচিত।

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের অধিপতি নামমাত্র শাসক। তাঁহার নামে মন্ত্রী পরিষদের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে শাসন ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক সরকারের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নরূপ



রাজতন্ত্র (Monarchy) ঃ যে শাসন ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা উত্তরাধিকার সূত্রে একজন শাসকের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাহাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। রাজাই এখানে অব্যাহত ক্ষমতার অধিকারী। আইন প্রণয়ন, শাসন এবং বিচার—সরকারের এই তিনটি কার্য তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য মন্ত্রী মণ্ডলী থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা রাজার অনুগত ভৃত্য মাত্র। রাজার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এই জাতীয় শাসন-ব্যবস্থার নাম অসীম রাজতন্ত্র (Unlimited Monarchy)। অসীম রাজতন্ত্র বর্তমানে বিরল। প্রায় সর্বত্রই লিখিত শাসনতন্ত্র অথবা প্রথাগত বিধান রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে, ইহাই সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (Limited Monarchy) এবং ইহা গণতন্ত্রেরই এক বিশিষ্ট রূপ।

রাজতন্ত্র অসীম এবং সসীম উভয় প্রকারই হইতে পারে।

অসীম রাজতন্ত্রের গুণ ঃ রাজতন্ত্রে সরকারী সংগঠন খুবই সরল। রাজাকে অপর কাহারও সহিত পরামর্শ করিতে হয় না বলিয়া, সত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দ্রুত কার্য করা সম্ভব হয়।

(১) সাংগঠনিক সরলতা জনিত সুবিধা

রাজা বংশগত অধিকারে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন, কোন বিশেষ দলের সমর্থনে তাঁহার প্রয়োজন নাই। রাজনৈতিক দলগুলির উর্ধ্বে থাকিয়া ন্যায় এবং নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ পূর্বক তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষের পরিপূর্ণ আনুগত্য অর্জন করিতে পারেন। ইহা জাতীয় ঐক্যের সহায়ক।

(২) দল নিরপেক্ষ শাসন

রাজা যদি সুশাসক হন, তাহা হইলে জনগণ নানাভাবে উপকৃত হইতে পারে। তিনি দক্ষ এবং নিঃস্বার্থ কর্মী শাসন কার্যে নিয়োগ করিবেন। একমাত্র রাজার নিকট তাঁহারা দায়ী থাকেন। একাধিক কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করিতে হয় না বলিয়া তাঁহারা স্বাধীনভাবে ন্যায় এবং নীতি সম্মত কার্য সম্পাদন করিতে পারেন। ইহাতে শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

(৩)
ইহা জনকল্যাণের উপযোগী দক্ষ শাসন ব্যবস্থা।

রাজা দীর্ঘদিন শাসনে অধিষ্ঠিত থাকার ফলে আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয়বিধ ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়।

(৪)
সরকারী নীতি সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া থাকে।

অসীম রাজতন্ত্রের ত্রুটি : প্রজানুরঞ্জক নৃপতি জনগণের মঙ্গল বিধান করিতে পারেন সত্য। কিন্তু রাজা যদি অসৎ, লোভী ও নিষ্ঠুর হন, তাহা হইলে জনগণের দুঃখ দুর্দশার সীমা থাকিবে না, কেন না তাঁহাকে সংযত করিবার মত কেহ নাই। দায়িত্বহীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেয়।

(১)
ইহা দায়িত্বহীন শাসন-ব্যবস্থা

বংশগত অধিকারে যেখানে সিংহাসন প্রাপ্তি ঘটে, সেখানে যোগ্যতার কোন নিশ্চয়তা নাই। অযোগ্য নৃপতির উদাহরণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। এই অযোগ্যতা হেতু শাসন ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দেয়। দেশ অরাজকতায় ভরিয়া উঠে।

(২)
দক্ষতার অভাব ঘটে।

রাজতন্ত্রে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে স্থায়ী ব্যবধান রচিত হয়। একজনের দান এবং দাক্ষিণ্যের উপর অপর সকলকে নির্ভর করিতে হয়।

(৩)
ইহা সাম্যের বিরোধী।

রাজার কার্যের সমালোচনার অধিকার জনসাধারণের নাই। রাজার আদেশ নির্বিচারে পালন করাই তাহাদের একমাত্র কর্তব্য। ইহার ফলে তাহাদের কর্মোদ্যম নষ্ট হয়, চিন্তার স্বাধীনতা লোপ পায়। তাহাদের আত্মোপলব্ধির সম্ভাবনা চিরতরে অন্তর্হিত হয়।

(৪)
ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হয়

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) :—জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ যখন দেশ শাসনের অবাধ অধিকার ভোগ করে, তখন সেই শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় অভিজাততন্ত্র। এই ব্যবস্থায় শাসকগোষ্ঠী কুলগত কৌলিণ্য, বুদ্ধিমত্তা, সামরিক দক্ষতা ইত্যাদি যে কোন একটি গুণের ভিত্তিতে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন।

অভিজাততন্ত্র মুষ্টিমেয়ের শাসন

গুণ : শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত বলিয়া এই জাতীয় সরকার ব্যক্তি স্বার্থে নিয়োজিত না হইয়া জনগণের মঙ্গল সাধনে প্রযুক্ত হয়। ইহা দক্ষ শাসন ব্যবস্থা। জ্ঞানী গুণী দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া শাসন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধিত হয়।

দোষ : অভিজাততন্ত্র কালক্রমে ধনিকতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। সকলের সমান অধিকার স্বীকার করে না বলিয়া ইহা গণতান্ত্রিক মনে সাড়া জাগাইতে পারে না। সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় বলিয়া তাহারা রাজনৈতিক চেতনাও হারাইয়া বসে। তাহা ছাড়া তথাকথিত জ্ঞানী গুণীরা যে শাসন ব্যাপারে দক্ষ হইবেন, এমন কোন নিশ্চয়তা নাই।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা (Democratic Form of Government) :

গণতন্ত্র এমন একটি সমাজ সংগঠনের নির্দেশ দেয়, যাহা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে শাসন ব্যবস্থায় সমগ্র জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার তাহাই গণতান্ত্রিক সরকার নামে পরিচিত। সর্বশ্রেণীর নাগরিককে শাসনের অধিকার দান করিয়া গণতন্ত্র শাসক এবং শাসিতের ব্যবধানকে অস্বীকার করে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্রের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। ("ইহা জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনগণের শাসন।") কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা পরিচালিত হইলেও সার্বিক কল্যাণ এই শাসন ব্যবস্থার লক্ষ্য।

ইহা জনগণের শাসন এবং ইহার লক্ষ্য সর্বসাধারণের মঙ্গল।

গণতন্ত্রের লক্ষণ :

(১) ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তিজীবনকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করিবার পক্ষপাতী নহে। ব্যক্তি অবাঞ্ছিত সরকারী নিয়ন্ত্রণের হাত হইতে নিরাপত্তা ভোগ করে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ ইহার লক্ষ্য।

(২) সমানাধিকার।

গণতন্ত্রে আইনের চক্ষে সকলেই সমান। প্রতিটি ব্যক্তিকে সমান সুযোগ দান গণতন্ত্রের লক্ষ্য। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার অবশ্যই ব্যক্তির নিজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে। সাম্যের অর্থ স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ নহে। সমান সুযোগের ভিত্তিতেই ব্যক্তি-প্রতিভার স্বরূপ প্রকাশ পায়।

(৩) সহিষ্ণুতা।

গণতন্ত্রে বিরোধের অবকাশ আছে। এই বিরোধ পরিচালিত হয় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে। সরকার-বিরোধী মত প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যায়। গণতন্ত্র বিশ্বাস করে—কোন একটি মত বা পথই যথার্থ নহে। সরকার-অনুসৃত নীতি অভ্রান্ত হইতে পারে না। তাই সমালোচনার

অবকাশ আছে। বিরুদ্ধ দলের অবস্থান গণতন্ত্রের প্রধান লক্ষণ, সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের অন্যতম ধর্ম।

গণতন্ত্র বলপ্রয়োগের নীতিতে বিশ্বাসী নহে। যুক্তির শক্তি, তরবারির শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী—গণতন্ত্র এই সত্যে আস্থা রাখে। আবেদন আদেশ অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ—ইহাই গণতন্ত্রের ধারণা। গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তির উৎস জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য।

(৪) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য।

গণতন্ত্রের প্রধানতঃ দুইটি রূপঃ প্রত্যক্ষ এবং প্রতিনিধিমূলক। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ একত্রিত হইয়া আইন প্রণয়ন, সরকারী কর্মচারী নিয়োগ এবং আয়-ব্যয় নির্ধারণ প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে নাগরিকগণের দ্বারা শাসিত হইত। নগররাষ্ট্রের আয়তন এবং জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকার ফলে এই জাতীয় শাসন সফল হইয়াছিল। বর্তমান কালে একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডের কোন কোন ক্যাণ্টন বা প্রদেশে এইরূপ শাসন ব্যবস্থা চালু আছে।

পূর্বে নাগরিকগণ সরাসরিভাবে শাসন কার্য পরিচালনা করিত।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে অচল। রাষ্ট্রগুলির আয়তন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধিই তাহার প্রধান কারণ। তাহা ছাড়া সাধারণ একজন নাগরিকের পক্ষে বর্তমানের জটিল শাসন ব্যবস্থার ব্যাপক দায়িত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই কারণে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। নাগরিকগণ এখন আর সরাসরিভাবে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে না। তাহারা অল্পসংখ্যক ব্যক্তির উপর শাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। এইভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণের ভোটে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ শাসন ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহারা শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন।

বর্তমানে প্রতিনিধি মারফৎ এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়।

নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁহার কার্যকালের মধ্যে যাহাতে ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করিতে না পারেন এবং যাহাতে তিনি গণদাবীর প্রতি উদাসীন না থাকেন—তাহার জন্য প্রত্যক্ষ কতকগুলি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। নির্বাচক মণ্ডলী প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদের কার্যকালের মধ্যেও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

এই তিনটি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হইল—গণভোট, গণ-উদ্যোগ এবং প্রতিনিধি প্রত্যাহার ঃ

(১) **গণভোট ঃ** এই পদ্ধতি অনুসারে আইনসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত বিল বিধিবদ্ধ করিবার পূর্বে তাহার উপর জনমত সংগ্রহ করিতে হইবে এবং জনসাধারণের অধিকাংশ ইহা সমর্থন করিলে পর তাহা আইন বলিয়া গণ্য হইবে। এই ভাবে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত গ্রহণকে গণভোট বলিয়া অভিহিত করা হয়।

গণভোট দুই শ্রেণীর : বাধ্যতামূলক এবং ইচ্ছামূলক।

গণভোট বাধ্যতামূলক বা ইচ্ছামূলক হইতে পারে। আইনসভা যখন প্রতিটি আইন সমর্থনের নিমিত্ত জনগণের নিকট পেশ করিতে বাধ্য থাকে, তখন তাহাকে বাধ্যতামূলক গণভোট বলা হয়। সুইজারল্যাণ্ডে শাসনতন্ত্রের সংশোধন ব্যাপারে এইরূপ বাধ্যতামূলক গণভোটের ব্যবস্থা আছে। আবার নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তির আবেদনক্রমে কোন একটি বিল বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর যদি গণভোটকে গ্রহণ করা হয়, তা হইলে তাহাকে বলা হয় ইচ্ছামূলক গণভোট।

(২) **গণ-উদ্যোগ ঃ** এই ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া একটি আইনের খসড়া আইন সভায় প্রেরণ করিতে পারে। আইন সভা ঐ মর্মে আইন পাস করিতে সম্মত না হইলে, খসড়াটির উপর গণভোট গ্রহণ করা হয়। অধিকাংশ ভোটারের দ্বারা সমর্থিত হইলে তাহা আইন বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৩) প্রতিনিধি প্রত্যাহার ঃ নির্বাচিত হইবার পর প্রতিনিধি যদি পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে কার্য না করেন, যদি নির্বাচক মণ্ডলীর স্বার্থকে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জনসাধারণ তাঁহার পরিবর্তে নূতন প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারেন।

গণতন্ত্রের গুণাবলী (Merits of Democratic Government) ঃ

গণতান্ত্রিক সরকারই জনকল্যাণের উপযোগী একমাত্র শাসন-ব্যবস্থা। ব্যক্তির অধিকার এবং স্বার্থ তখনই নিরাপদ হয়, যখন তাহার নিরাপত্তা বিধানের ভার থাকে ব্যক্তির নিজের উপর। গণতন্ত্রের শাসক জনগণের দ্বারাই নিযুক্ত হন। নির্বাচিত সরকার জনগণের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না, কেননা এই উদাসীনতার শাস্তি পরবর্তী নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয়।

(১) গণতন্ত্র ব্যক্তির স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষার উপযোগী

শুধু দক্ষতা শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি নহে। শ্রেষ্ঠ শাসন তাহাই যাহা উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়তা করে। গণতন্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে মানুষ

নিজের চেষ্টায় যাহা অর্জন করে, অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহা অপরের মহৎ দান অপেক্ষাও মহত্তর। আত্মশক্তিতে বলীয়ান, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং স্বার্থত্যাগের মহিমাদীপ্ত নাগরিক সৃষ্টি করিয়া গণতন্ত্র তাহার সাফল্যের প্রমাণ দেয়।

(২)
সুনাগরিক সৃষ্টিতে গণতন্ত্র সহায়তা করে।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচন শাসিতের প্রতি শাসকের দায়িত্বশীলতা পরীক্ষা করিবার উপায় মাত্র। গণতান্ত্রিক সরকার সম্ভাব্য পরাজয়ের আশঙ্কায় গণদাবীর প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না।

(৩)
দায়িত্বশীলতা গণতন্ত্রের ধর্ম।

গণতন্ত্র সাম্যের পূজারী। জাতি, ধর্ম, বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্যের নীতি গণতন্ত্রবিরোধী। বিশেষ সুযোগ বা সংরক্ষিত স্বার্থ গণতন্ত্র সমর্থন করে না। সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের মতকেই গণতন্ত্র সমান মূল্য দেয়।

(৪)
গণতন্ত্রের ভিত্তি সাম্য

অবাঞ্ছিত সরকারী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিয়া এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য কতকগুলি অধিকার স্বীকার এবং সংরক্ষণ করিয়া গণতন্ত্র একদিকে ব্যক্তিকে তাহার প্রতিভার স্ফুরণের অবকাশ দেয়, অপরদিকে সরকারী কর্মক্ষেত্রের সীমা নির্দ্ধারণ করে।

(৫)
গণতন্ত্র ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্রষ্টা

সত্যের প্রবেশ পথ গণতন্ত্র উন্মুক্ত রাখে। গণতন্ত্র বিশ্বাস করে যে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়াই সত্যের প্রকাশ হয়। তাই বিরুদ্ধ মত এখানে দমন করা হয় না। সরকারী অনুসৃত নীতি অভ্রান্ত এবং বলপূর্বক তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—এইরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ গণতন্ত্র কর্তৃক নিন্দিত। বিভিন্নতা এবং অভিনবত্বকে সমর্থন করিয়া গণতন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতিতে সহায়তা করে।

(৬)
গণতন্ত্র প্রগতির পরিচায়ক।

গণতন্ত্র জনগণের চিত্তের প্রসারতা ঘটায়। রাজনৈতিক অধিকার ব্যক্তিকে রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলে। সরকার এবং বিরুদ্ধ পক্ষের নিয়ত প্রচারের মাধ্যমে দেশীয় সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার সুযোগ জনগণ পাইয়া থাকে।

(৭)
গণতন্ত্র গণশিক্ষার সহায়ক।

‘সরকার আমার সৃষ্টি’—এই ধারণাই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের প্রতি সদা অনুগত রাখে। ইহার ফলেই রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির মমত্ববোধ জাগে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থাৎ গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের বিরাগভাজন সরকারকে পরিবর্তন করা যায় বলিয়া, গণতন্ত্রে বিপ্লব সংঘটিত হয় না। ইহা বিদ্রোহের প্রতিষেধক।

(৮)
গণতন্ত্র দেশপ্রেমের জনক এবং বিপ্লব বিরোধী।

গণতন্ত্রের ত্রুটি :

(১)
গণতন্ত্র মূর্খের রাজত্ব।

সাধারণ নাগরিকের পক্ষে শাসন ব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য। অধিকাংশ ব্যক্তিই অশিক্ষিত এবং রাজনৈতিক জ্ঞান শূন্য। তাহাদের শাসন অযোগ্য এবং অক্ষমের শাসন ছাড়া আর কিছুই নহে। সংখ্যার গুরুত্বই এখানে সমধিক। গুণ অথবা যোগ্যতার মূল্য এখানে উপেক্ষিত।

(২)
গণতন্ত্র ভ্রান্ত সাম্যের ধারণার প্রচারক।

সাম্যের ধারণা প্রচার করিয়া গণতন্ত্র জনগণকে শ্রদ্ধাহীন করিয়া তোলে। ব্যক্তি নিজেকে সর্বজ্ঞ বিবেচনা করে। ফলে সত্যকার গুণীজনকে সম্মান করা সে আত্ম-অবমাননাকর বলিয়া জ্ঞান করে। এমন কি অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত নাগরিকও শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের সমালোচক হইয়া দাঁড়ায়। শ্রেষ্ঠত্ব যেখানে অস্বীকৃত, সে পরিবেশ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের সাধনা এবং সৃষ্টির উপযোগী নহে।

(৩)
গণতন্ত্র অনন্যসাধারণ প্রতিভার বিরোধী।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব অথবা যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে গণতন্ত্র সন্দেহের চক্ষে দেখে। যীশুখ্রীষ্ট, সক্রেটিস প্রভৃতি বরেণ্য ব্যক্তিদের নিষ্ঠুর হত্যালীলা গণতন্ত্রের সন্দেহ-প্রবণতার অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর।

(৪)
গণতন্ত্র সময় এবং সম্পদের অপচয় ঘটায়।

গণতন্ত্র সময়-সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল শাসন ব্যবস্থা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে অধিক বিলম্ব ঘটে। আবার ঘন ঘন নির্বাচন, আইন সভা, মন্ত্রীসভা প্রভৃতির ব্যয় সংকুলান করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই বলা যায়—দরিদ্র দেশের দুর্বল স্কন্ধ গণতন্ত্রের গুরুভার বহনে অসমর্থ।

(৫)
গণতন্ত্র ধনতন্ত্রবাদের পরিপোষক।

অনেকে অভিযোগ করেন—গণতন্ত্র সংরক্ষিত স্বার্থের সমর্থক। আইনের জটিলতাজনিত বাধাহেতু বহুবাঞ্ছিত সংস্কার বিলম্বিত হয় এবং নির্বাচনের ব্যয়বাহুল্য বিত্তবান-দিগকে স্থায়ীভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করে।

(৬)
গণতন্ত্র কার্যতঃ সংখ্যা-লঘুর শাসন।

গণতন্ত্রকে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন বলা হইলেও, কার্যতঃ তাহা নহে। কোন একটি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি অধিকাংশ ভোটদাতার সমর্থন পুষ্ট নাও হইতে পারেন। আবার প্রতিনিধিদিগের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে জনগণের এক মুষ্টিমেয় অংশের প্রতিনিধি।

গণতন্ত্রের সফলতার শর্ত (Conditions for the success of Democracy) :

গণতন্ত্রের দুর্বলতার মূল কারণ জনগণের রাজনৈতিক অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতা যে পরিমাণে দূর হইবে, গণতন্ত্র সেই পরিমাণে সার্থক হইবে। গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্য কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল সার্থক সরকারের তিনটি শর্তের উল্লেখ করিয়াছেন :

(১) গণতন্ত্রের সফলতার তিনটি প্রধান শর্ত।

(ক) জনগণ ইহা কামনা করিবে,

(খ) তাহারা ইহাকে রক্ষার জন্য ইচ্ছুক এবং সচেষ্ট হইবে,

(গ) তাহারা ইহার আদর্শ রূপায়নের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা করিবার সামর্থ অর্জন করিবে।

গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের জন্য তাই প্রয়োজন জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, গণতন্ত্রের জন্য একান্ত কামনা এবং দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য।

(২) যথোপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন।

গণতন্ত্রে জনসাধারণ শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে। কার্যকর অংশ গ্রহণ সম্ভব করিতে হইলে জনগণকে ন্যূনতম শিক্ষার অধিকারী হইতে হইবে। নাগরিকগণকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করা গণতান্ত্রিক সরকারের পবিত্র দায়িত্ব।

(৩) গণতন্ত্রের অপর দুইটি অপরিহার্য শর্ত : স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতা।

চিন্তার স্বাধীনতা এবং মতামত প্রকাশের অধিকার গণতন্ত্রের সফলতার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। সরকারের সমালোচনা করিবার অধিকারই দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। কাজেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কাম্য। সরকার যদি মুদ্রাযন্ত্রের একমাত্র মালিক হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

(৪) অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠা।

অর্থনৈতিক অধিকারের অভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক অধিকার বলিতে বোঝায়—অভাব এবং অনিশ্চয়তার হাত হইতে মুক্তি, রুচি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কর্ম পাইবার এবং বিনিময়ে জীবনধারণোপযোগী মজুরী পাইবার অধিকার। নিত্য দারিদ্র্যের দ্বারা যে লাঞ্ছিত, ভোটাধিকার তাহার নিকট অর্থহীন সান্ত্বনা মাত্র।

(৫) জনপ্রিয়তার সহিত শাসন দক্ষতার সামঞ্জস্য বিধান।

জনপ্রিয় প্রতিনিধিবর্গ জনকল্যাণ কামনা করেন সত্য কিন্তু তাঁহাদের স্বপ্নসাধ পূরণের জন্য প্রয়োজন বিশেষ জ্ঞান এবং কর্মকুশলতা। প্রতিনিধিবর্গকে শাসন কার্যে সাহায্য এবং পরামর্শ দানের জন্য তাই বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন অনুভূত হয়। অর্থাৎ

গণতান্ত্রিক আদর্শের সার্থক রূপায়ন তখনই সম্ভব যখন নির্বাচিত শাসক স্থায়ী এবং কুশলী কর্মচারীর সহায়তা লাভ করেন।

সরকারের স্থায়িত্ব এবং শক্তি সুদৃঢ় রাজনৈতিক দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। সরকারের সহিত জনসাধারণের সংযোগও এই দলের মাধ্যমেই রক্ষা করা হয়। আবার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত দলকে সংযত রাখিবার জন্য শক্তিশালী বিরোধী পক্ষকে অপরিহার্য গণ্য করা হয়। গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ উপেক্ষা করিবে না। তেমনি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলও সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মান্য করিতে অনিচ্ছুক হইবে না। উভয়পক্ষের এইরূপ উদারতা গণতন্ত্রের সাফল্যের সূচনা করে।

(৬) সুস্থ দলপ্রথা গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম শর্ত

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship): রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা যখন একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তখন তাহাকে একনায়কতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয়। একনায়কতন্ত্র রাজতন্ত্রের ন্যায় একব্যক্তির শাসন হইলেও, রাজতন্ত্রের সহিত ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। রাজা বংশানুক্রমিক অধিকারে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। একনায়কের শাসনাধিকার হয় নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা আহৃত। রাজতন্ত্রে সমর্থনকারী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বর্তমানকালের একনায়কগণ সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের দ্বারা সমর্থিত।

একনায়কতন্ত্রের সহিত রাজতন্ত্রের পার্থক্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে একনায়কতন্ত্রের সূচনা হয়। যুদ্ধ শেষ হইলে পর বিধ্বস্ত দেশ গুলি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হইল। দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, বিশেষ করিয়া, বেকার সমস্যার সমাধানই ছিল প্রতিষ্ঠিত সরকারগুলির প্রধানতম দায়িত্ব। কিন্তু তৎকালীন সরকার এই কর্তব্যপালনে ব্যর্থ হয়। ইহার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করা হয় এবং তাহার প্রতি জনগণের অনাস্থা সূচিত হয়। গণতন্ত্রের-এই দুর্দিনে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়।

আধুনিককালে তিন শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে:

(১) ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র অথবা নাৎসী একনায়কতন্ত্র,

(২) সামরিক একনায়কতন্ত্র, (৩) সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র।

প্রথম শ্রেণীর একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল ইটালী এবং জার্মাণীতে। মুসোলিনী এবং হিটলার উভয়েই নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা লাভ করেন। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিলোপ সাধন করিয়া একনায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

একনায়কতন্ত্রের তিনটি রূপ: ফ্যাসিষ্ট, সামরিক ও বিত্তহীন শ্রেণীর।

দ্বিতীয়টি সাম্প্রতিক কালের অতি পরিচিত ঘটনা। প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক সরকারের দুর্নীতি এবং দুর্বলতার সুযোগে সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক যখন দেশের শাসনক্ষমতা দখল করেন, তখন সামরিক একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। এই সামরিক শাসন কালক্রমে আইনসিদ্ধ সার্বভৌমে রূপান্তরিত হন। উদাহরণস্বরূপ স্পেনে ফ্রাঙ্কোর আবির্ভাব, মিশরে নাসেরের ক্ষমতাপ্রাপ্তি, ইরাকে কাসেমের প্রতিষ্ঠা, পাকিস্থানে আয়ুবখাঁর সরকার দখল প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র সোভিয়েট রাশিয়া এবং প্রজাতন্ত্রী চীনে পরিদৃষ্ট হয়। উভয় দেশেই কম্যুনিষ্ট পার্টি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়া শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পার্টির অবিসংবাদী নেতা একনায়কপদে আসীন এবং তাঁহার শাসন বিত্তহীন শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র নামে পরিচিত। অপর দুইটি শ্রেণীর সহিত ইহার প্রধান পার্থক্য এই যে মার্ক্সীয় দর্শনে ইহাকে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবসানের ভিত্তিতে শ্রেণীহীন সমাজের সৌধ নির্মিত হইবে।

একনায়কতন্ত্রের স্বরূপ ঃ

(১) একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাব সর্বত্রই শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কলঙ্কিত।

(২) এই জাতীয় রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী। ব্যক্তিজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি রাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

(৩) ইহা অসহিষ্ণু শাসন ব্যবস্থা। সরকারবিরোধী সমস্ত শক্তিগুলিকে দমন করা হয়। বিরুদ্ধ মত, বিরোধী দল এখানে অবাঞ্ছিত।

(৪) ইহা উগ্র জাতীয়তাবাদী। (৫) সামরিক শক্তিই ইহার সম্বল।

একনায়কতন্ত্রের গুণ (Merits of Dictatorship) ঃ

(১) একনায়কই রাষ্ট্রের একমাত্র শাসক। তাঁহার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। আলাপ-আলোচনায় অযথা সময় নষ্ট হয় না। ইহা ছাড়া তাঁহার অধীনে বিশ্বস্ত একটি দল থাকায় কোন একটি পরিকল্পনা অতি সত্বর বাস্তবায়িত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব। ক্ষিপ্রতা এই শ্রেণীর শাসনের ধর্ম। অনুন্নত দেশের উন্নয়ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের পুনর্গঠন ব্যাপারে ইহা আশু ফলপ্রদ ব্যবস্থা।

ইহার দ্বারা রাষ্ট্রীয় উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

(২) জাতির দুর্যোগময় মুহূর্তে ইহাই মুক্তির পথ নির্দেশ করিতে পারে। যুদ্ধ বা আপৎকালে গণতান্ত্রিক দেশেও সাময়িকভাবে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহা জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণে সমর্থ

ব্যক্তিত্ব এবং যোগ্যতাসম্পন্ন একনায়ক জাতীয়তাবাদ প্রচার করিয়া গৃহযুদ্ধে লিপ্ত একটি রাষ্ট্রকে সংহত এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারেন। একটি লুপ্ত এবং আত্মবিস্মৃত জাতিকে কর্মচঞ্চল করিয়া তুলিতে হইলে একনায়কতন্ত্রের শরণ লইতে হয়।

(৩) ইহা শক্তিশালী জাতি গঠনে সহায়তা করে।

দেশে গণতন্ত্র যখন ব্যর্থ হয়, রাজনৈতিক দলগুলি যখন জাতীয় স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, স্বার্থ-পরতা যখন দেশপ্রেমের স্থান গ্রহণ করে, পৌরজীবন যখন গ্লানিময় হইয়া উঠে, তখন একনায়কতন্ত্রই জাতিকে নবজাগরণের ইঙ্গিত দিতে পারে।

(৪) ইহাই অধঃপতিত জাতির মুক্তির একমাত্র পথ।

একনায়কতন্ত্রের ত্রুটি (Defects of Dictatorship):

একনায়কতন্ত্র রাষ্ট্রকে লক্ষ্য এবং ব্যক্তিকে উপায় রূপে গ্রহণ করে। এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিকে বলি দেওয়ার পক্ষপাতী।

(১) ইহা ব্যক্তিত্বকে বিনষ্ট করে।

একজন ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনার উপর সমগ্র জাতির ভাগ্য নির্ভর করে। তাঁহার ভুলের জন্য সারাটা দেশকে মাশুল দিতে হয়। সমালোচনা এবং বিরোধের অভাবে একনায়ক-অনুসৃত নীতির সংশোধন সম্ভব নহে।

(২) ইহা বিপজ্জনক শাসন ব্যবস্থা।

ইহার ভিত্তি পশুবল। শক্তির এইরূপ নির্লজ্জ প্রকাশ অন্যত্র বিরল। বল-প্রয়োগের দ্বারা মহত্তর কোন সৃষ্টি সম্ভব নহে। ক্ষুরধার যুক্তি নহে, অস্ত্রই একনায়কত্বের সম্বল।

(৩) ইহা সন্ত্রাসের রাজত্ব।

একনায়কতন্ত্রে একজনই মাত্র স্বাধীন, অপর সকলে তাঁহার অনুগত ভৃত্য মাত্র। সকলের জন্য চিন্তা করিবার একমাত্র অধিকার তাঁহার। অপর সকলে তাঁহারই নির্দেশে নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করিবে। চিন্তার মৌলিকতা, কর্মের স্বাধীনতা এখানে অচিন্ত্যনীয়। জনগণের এই মানসিক দৈন্যই একনায়কতন্ত্রের নির্মম অভিশাপ।

(৪) ইহার ফলে জনগণ ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

উগ্র জাতীয়তাবাদ সমর্থন করিয়া ইহা যুদ্ধের এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রেরণা যোগায়।

(৫) ইহা উগ্র জাতীয়তাবাদী।

একনায়ক যোগ্য উত্তরাধিকারী তৈরী করিতে অক্ষম। তাঁহার জীবদ্দশায় অপর সকলে তাঁহার উপর একান্ত-ভাবে নির্ভরশীল থাকায় আত্মচিন্তা তাহারা বিস্মৃত হয়। একনায়ক অপর কাহাকেও শাসন ব্যাপারে বিশ্বাস না করায় কেহই শাসন ব্যাপারে

(৬) নায়কের অবসানের পর যোগ্য শাসক পাওয়া যায় না।

অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে না। তাই তাঁহার মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের অভাবে দেশ নিরাশ হয়।

একনায়কতন্ত্রের গতি গণতন্ত্র অপেক্ষা দ্রুততর। ইহার চমকপ্রদ সৃষ্টি জনগণকে বিভ্রান্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিতে পারে না।

এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা (Unitary and Federal forms of Government):

কেন্দ্র এবং অঞ্চলের সম্পর্কের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

এই শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের অধীনস্থ।

এককেন্দ্রিক সরকার: যখন সমগ্র দেশ একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে শাসিত হয়, তখন তাহাকে কেন্দ্রগত শাসন বলা হয়। এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। তাহারা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের অধীন। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্র কর্তৃক সংগঠিত হয়। কেন্দ্র তাহাদিগকে অধিকতর ক্ষমতা দান করিতে পারে অথবা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। এইপ্রকার রাষ্ট্রে কার্যতঃ একটি সরকারই বিদ্যমান এবং তাহা হইল কেন্দ্রীয় সরকার। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এককেন্দ্রিক শাসনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এককেন্দ্রিক সরকারের গুণ:

(১)
এককেন্দ্রিক সরকার দৃঢ় এবং শক্তিশালী।

ইহা শক্তিশালী সরকারের পরিচায়ক। শাসনক্ষমতা বণ্টন করা যায় না বলিয়া তাহা দুর্বল হইয়া পড়ে না। সমগ্র ক্ষমতার একক অধিকারবলে কেন্দ্র যে কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে পারে। আভ্যন্তরীণ শাসনে এবং বৈদেশিক নীতি পরিচালনায় ইহার দৃঢ়তা সুস্পষ্ট।

(২)
দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট।

ক্ষমতা অবিভক্ত বলিয়া, দায়িত্বও অবিভাজ্য। কেন্দ্র দায়িত্ব এড়াইবার জন্য অন্য কোন কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করিতে পারে না।

(৩)
শাসন ব্যবস্থা সরল এবং সর্বত্র অনুরূপ।

সমগ্র দেশে একই রূপ শাসননীতি অনুসরণ করা সম্ভব। একই শাসননীতি রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং সংহতি রক্ষার সহায়ক। শাসন ব্যবস্থা জটিলতাবর্জিত, কাজেই বিরোধের সম্ভাবনাহীন।

শাসন পরিচালনার ব্যয় বহুলাংশে সংক্ষিপ্ত। একটি মাত্র আইনসভা এবং মন্ত্রীসভা অথবা রাষ্ট্রপতি দ্বারা পরিচালিত হয় বলিয়া সরকারী ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম হয়।

(৪)
ব্যয়সঙ্কোচ করা সম্ভব।

অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে অতি সহজে শাসন ব্যবস্থার রদ-বদল করা যায়। প্রয়োজনবোধে কেন্দ্র আঞ্চলিক সরকার গঠন করিতে পারে এবং তাহাদের উচ্ছেদ সাধনও করিতে পারে।

(৫)
নমনীয়তা এই শাসন ব্যবস্থার ধর্ম।

এককেন্দ্রিক শাসনের ত্রুটি : বৃহদায়তন রাষ্ট্র একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সুশাসিত হইতে পারে না। সমস্ত সমস্যাই জাতীয় সমস্যা নহে। কেন্দ্র আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে অক্ষম। দূরবর্তী অঞ্চলগুলির বিশিষ্ট সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা কেন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নহে।

(১)
বৃহদায়তন দেশ শাসনের পক্ষে ইহা অনুপযুক্ত।

সমগ্র দেশে একটিমাত্র সরকার থাকায় জনসংখ্যার অতি অল্প অংশ শাসন ব্যবস্থার সহিত জড়িত থাকে। ফলে সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে দুরতিক্রম্য ব্যবধান গড়িয়া উঠে। সরকারের সঙ্গে শাসিতের এই দূরত্ব হেতু জনগণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা সরকার লাভ করিতে পারে না। ইহা সরকারের দুর্বলতা সূচনা করে।

(২)
ইহা জনগণের স্বভাবগত আনুগত্য লাভে বঞ্চিত।

বৈচিত্র্যবহুল দেশের পক্ষে এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থা মোটেই উপযুক্ত নহে। আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য এখানে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। কেন্দ্র অসম অবস্থায় একই রূপ নীতি অনুসরণ করে। আঞ্চলিক সরকারের অবর্তমানে, অথবা আঞ্চলিক সরকারের যথার্থ ক্ষমতার অভাবে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সংরক্ষণ সম্ভব নহে।

(৩)
ইহা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের বিরোধী

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of a Federation) :

যুক্তরাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর সরকার থাকে—সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঞ্চলগুলির জন্য আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকার। উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা শাসনতন্ত্র দ্বারা এমনভাবে বণ্টন করা হয় যাহার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাপারে রাজ্য এবং রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করিতে না পারে। যে সমস্ত বিষয়ের সহিত সমগ্র দেশের স্বার্থ জড়িত, যেমন দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, ডাক, তার, মুদ্রা ইত্যাদি—সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। আর যে সমস্ত বিষয়ের উপর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে, সেগুলি থাকিবে রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে।

(১)
কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন।

শাসনতন্ত্রের দ্বারা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করা হয় বলিয়া এই শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রাধান্যের অর্থ, সংবিধান চরম আইন বলিয়া গণ্য হইবে এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয়বিধ সরকারের ক্ষমতার সীমা ইহার দ্বারা নিরূপিত হইবে। কেন্দ্রীয় আইনসভা অথবা রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন শাসনতন্ত্র বিরোধী হইলে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। এই শাসনতন্ত্র লিখিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে কেন্দ্র এবং রাজ্যের অধিকার সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হইবে না। যাহা অলিখিত, তাহা অস্পষ্ট। অস্পষ্টতা বিরোধের পথ খোলা রাখে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে অবাঞ্ছিত বিরোধ এড়াইতে হইলে তাহাদের ক্ষমতা এবং অধিকার লিখিত থাকা প্রয়োজন। এই শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হইবে। আইনসভা সাধারণ আইনের মত ইহার সংশোধন করিলে, ইহার চরমতা বা প্রাধান্য ব্যাহত হইবে। তাহা ছাড়া কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক আইনসভা যদি এককভাবে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়, তাহা হইলে রাজ্য অথবা কেন্দ্রের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা থাকে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য অপেক্ষাকৃত জটিল এবং কষ্টসাধ্য পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

(২)
শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য অব্যাহত রাখার জন্য তাহা লিখিত এবং অনমনীয় হওয়া আবশ্যক।

লিখিত শাসনতন্ত্রের ধারাবলীর একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর। তাই এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যাহার মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্ভাব্য শাসনতান্ত্রিক বিরোধের মীমাংসার জন্য একটি নিরপেক্ষ সংস্থা অপরিহার্য। এই দুইটি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রে আবশ্যিকভাবে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত বা সুপ্রীম কোর্ট থাকিবে। কেন্দ্র অথবা রাজ্য নিজস্ব সীমা লঙ্ঘন করিয়া যাহাতে শাসনতন্ত্রের অবমাননা করিতে না পারে তাহার জন্য এই আদালত সদা দৃষ্টি রাখিবে।

(৩)
যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় গঠন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা দ্বিপরিষদবিশিষ্ট হইবে। একটি কক্ষ জনগণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে এবং অপরটি রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করিবে। এই রাজ্যসভায় প্রতিটি অঙ্গ রাজ্যের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার থাকিবে।

(৪)
দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা।

দ্বৈত নাগরিকতা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের অধিবাসী একাধারে অঙ্গরাজ্যের এবং রাষ্ট্রের নাগরিক। রাজ্য এবং কেন্দ্র—উভয়বিধ

সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষে দ্বৈত নাগরিক বিধি গৃহীত হয় নাই। রাজ্যের নাগরিকতা বলিয়া এখানে কিছুই নাই।

(৫)
রাজ্য এবং রাষ্ট্রের নাগরিকতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা (Federal Government)ঃ যে শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার পরস্পর স্বাধীনভাবে নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে, তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলা হয়। কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের এই পারস্পরিক স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার সম্পর্কই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিচায়ক।

এই শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার দুই ধরণেরঃ প্রথমতঃ কতকগুলি পাশাপাশি অবস্থিত রাষ্ট্র পরস্পর মিলিত হইয়া তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা বিসর্জন দিয়া একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সুশাসনের জন্য একটি বৃহদায়তন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রকে কিছুটা দুর্বল করিয়া আঞ্চলিক সরকারগুলিকে স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীন ক্ষমতা দান করা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতবর্ষ।

যুক্তরাষ্ট্র দুই ভাবে গঠিত হইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শর্ত (Conditions for the formation of a Federation): যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি সমবায় যাহার ফলে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। জাতীয় ঐক্যের সহিত আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় সাধনের একটি রাজনৈতিক প্রচেষ্টারূপে যুক্তরাষ্ট্রকে বর্ণনা করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য দুইটি অবস্থা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ পাশাপাশি অবস্থিত কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হইতে চাইবে। অর্থাৎ এই সমুদয় রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা কল্পে মিলন কামনা করিবে। এই মিলন সম্ভব হইবে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে।

পাশাপাশি অবস্থিত রাষ্ট্রগুলি মিলিত হইবে সত্য, কিন্তু মিলিয়া একাত্ম হইয়া যাইবে না।

দ্বিতীয়তঃ তাহারা মিলিয়া সম্পূর্ণভাবে এক হইয়া যাইবে না। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তা সম্বন্ধে তাহারা সচেতন থাকিবে। তাহাদের এই স্বাতন্ত্র্যের ধারণা বাস্তবায়িত হইবে আঞ্চলিক সরকারগুলির সাহায্যে।

অর্থাৎ জাতীয় ঐক্যের আদর্শ এবং আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ধারণা এই দুইটি আপাত-বিরোধী মনোভাবের সমন্বয়ের ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্ত (Conditions for the success of a Federation) : যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য থাকা প্রয়োজন। একটি অঞ্চল যদি দুস্তর সমুদ্র অথবা পর্বতের ব্যবধান দ্বারা রাষ্ট্রের অপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় সংহতি ব্যাহত হইবে।

(১) অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য।

বিভিন্ন রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের প্রবল বাসনা থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্র শুধু রাষ্ট্রীয় মিলন নহে। জনগণের মিলনের উপরেই ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। শুধু মাত্র ঐক্যের প্রেরণায় যুক্ত-রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় না। তাহার অপর একটি শর্ত হইল উদগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের অবর্তমানে এক-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

(২) জনগণ জাতীয় ঐক্য একান্ত ভাবে কামনা করিবে, আবার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যও বিস্মৃত হইবে না।

স্থায়ী যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অঙ্গ রাজ্যগুলির আয়তন, জনসংখ্যা এবং সম্পদের গুরুতর বৈষম্য না থাকে। একটির অস্বাভাবিক শক্তিবৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই অবশিষ্ট গুলিকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবে। এই সন্দেহ-প্রবণতা যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতার সূচনা করিবে।

(৩) অঙ্গরাজ্যগুলি যথাসম্ভব সমশক্তিসম্পন্ন হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রকে সফল করিতে হইলে লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কর্মক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করিতে হইবে। উভয়ের ক্ষমতা হইবে সীমাবদ্ধ। শাসনতন্ত্রই হইবে চরম আইন। শাসনতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে একটি নিরপেক্ষ যুক্ত-রাষ্ট্রীয় বিচারালয় গঠন করা প্রয়োজন। কেন্দ্র এবং রাজ্য অথবা রাজ্যগুলির মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিরোধের মীমাংসা করিয়া এই আদালত রাষ্ট্রীয় ভারসাম্য রক্ষা করিবে।

(৪) শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য অপর একটি অবস্থার প্রয়োজন। রাজ্যগুলি ইচ্ছামত কেন্দ্র হইতে স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারিবে না। আবার কেন্দ্রও খুসীমত রাজ্যগুলির কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারিবে না।

(৫) কেন্দ্রের নিশ্চয়তা রাজ্যগুলির নিরাপত্তা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত জটিল। এই শাসনের স্বরূপ এবং দ্বৈত নাগরিকতার অর্থ উপলব্ধি করার মত রাজনৈতিক জ্ঞান জনগণের থাকা চাই। ইহা ছাড়া বহুবিধ সরকার পরিচালনার জন্য দক্ষ শাসকের সরবরাহ পর্যাপ্ত হওয়াও প্রয়োজন।

(৬) উন্নততর রাজনৈতিক চেতনা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুবিধা (Merits of Federal Government) :

(১)
ইহার দ্বারা বৃহৎ এবং বৈচিত্র্য বহুল দেশ সুশাসিত হইতে পারে।

বৃহদায়তন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ শাসনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রই প্রকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা।' রাজ্য সরকার থাকার ফলে কেন্দ্র হইতে বহুদূরে অবস্থিত অঞ্চলগুলি সুশাসিত হইতে পারে এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিকাশ লাভ করিতে পারে।

একাধারে ঐক্য এবং বৈচিত্র্য বজায় রাখিবার ইহাই সার্থক উপায়।

(২)
ইহা বৃহত্তর জাতি গঠনের সহায়ক।

যে সমস্ত বিষয়ে সমগ্র দেশে একই রকম নিয়ম থাকা প্রয়োজন, সেই সমস্ত বিষয়ে একই নিয়ম প্রবর্তন করিয়া এবং যে সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে পার্থক্য থাকা বাঞ্ছনীয়, এমন সব বিষয়ে বিভিন্নতার অবকাশ রাখিয়া যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন জন সমাজকে একই রাষ্ট্রীয় পরিবেশে একটি বৃহত্তর জাতিতে পরিণত হইবার সুযোগ দান করে।

একটি মাত্র সরকার থাকিলে জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশই তাহাতে অংশ গ্রহণ করে।

(৩)
ইহা রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আঞ্চলিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু সংখ্যক লোককে শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের সুযোগ দান করে। আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের ভার স্থানীয় লোকদের উপর অর্পণ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রাজনৈতিক শিক্ষার পথ সুগম করিয়াছে। স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তন করিয়া ইহা জনগণকে আত্ম-নির্ভরশীলতায় দীক্ষিত করে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মিলনের ফলেই সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাহারা একত্রিত।

(৪)
ইহার ফলে দুর্বল রাষ্ট্র নিরাপত্তার আস্বাদ পায়।

এককভাবে তাহারা দুর্বল এবং আত্মরক্ষায় অসমর্থ। কিন্তু তাহারা সংঘবদ্ধ হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করার ফলে তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। তাহারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও সম্মান অর্জন করে, এবং নিশ্চিত নিরাপত্তা লাভ করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের অসুবিধা (Defects of Federal Government) :

(১)
ইহা দুর্বল শাসন ব্যবস্থা।

এককেন্দ্রিক সরকারের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল। ক্ষমতা বিভক্ত হওয়ার ফলে দুর্বল হইয়া পড়ে। এই দুর্বলতা আভ্যন্তরীণ শাসন এবং বৈদেশিক ব্যাপার উভয় ক্ষেত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে দায়িত্ব বিভক্ত থাকে বলিয়া দায়িত্ব এড়ান সহজসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। একে অপরের উপর দোষারোপ করিয়া দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে।

(২)
ইহা দায়িত্বহীনতার প্রশ্রয় দেয়।

একই বিষয়ের উপর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আইন চালু থাকিতে পারে। তাহার ফলে একজন নাগরিক বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক্ আইনের অধীন হইয়া পড়ে। ইহাতে নানারূপ অসুবিধা ও গোলযোগের সূত্রপাত হয়।

(৩)
অঞ্চলে পরস্পর বিরোধী আইন প্রচলিত থাকে।

একটি মাত্র সরকারের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিটি রাজ্যে স্বতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইহার ফলে শাসন যন্ত্র জটিল হইয়া পড়ে এবং বহুবিধ সরকারের পরিচালন ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

(৪)
জটিলতা এবং ব্যয়বাহুল্য দোষে এই ব্যবস্থা দুষ্ট।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় বলিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিয়ত বিরোধের আশঙ্কা রহিয়াছে। এই বিরোধ যখন সংঘর্ষের রূপ ধারণ করে, তখন যুক্তরাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হয়।

(৫)
ইহার স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আধুনিক কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চিত। বিবদমান বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সমক্ষে তাহারা সদা শঙ্কিত। তাহাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অর্থনৈতিক সমস্যাও তাহাদিগকে বিপর্যস্ত করিতেছে। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনই এই সমুদয় সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিতে পারে। তাই সর্বত্র যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে প্রবণতা দেখা যায়। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এই প্রবণতার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিপুল প্রসার

এই প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের একটি বিশেষ সাংগঠনিক পরিবর্তনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি প্রতিটি যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় শক্তি বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশী রাষ্ট্রের ধারণার অবসান এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের আবির্ভাব, যুদ্ধের ভয়, অখণ্ড পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, পরিবহন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি এবং দ্রুত শিল্পায়ণ ইত্যাদি বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে কেন্দ্র অবশ্যম্ভাবীভাবে সমধিক প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ।

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার (Cabinet and Presidential Forms of Government) : আইনসভা এবং শাসন বিভাগের সম্পর্কের প্রকৃতি অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থাকে মন্ত্রীপরিষদ চালিত এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত—এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

মন্ত্রীপরিষদের শাসন (Cabinet Forms of Government) : এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিচালন বিভাগীয় ক্ষমতা একটি মন্ত্রীপরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকে। এই সরকারের শীর্ষস্থানে একজন বংশানুক্রমিক রাজা অথবা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি থাকেন। তাঁহারই নামে সরকার পরিচালিত হইলেও, তিনি আসল শাসক নহেন। তিনি আনুষ্ঠানিক অধিপতি মাত্র।

নাম মাত্র শাসক থাকিলেও প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রী পরিষদের হস্তে ন্যস্ত।

মন্ত্রীপরিষদের সদস্যবৃন্দ আইন সভার সভ্যদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হন। আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাষ্ট্রাধিপতি প্রধান মন্ত্রী সিহাবে গ্রহণ করেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীগণ নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। আইনতঃ সব সদস্য সমক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও, প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত, তিনিই মন্ত্রীপরিষদের নিয়ামক। নিজস্ব পদত্যাগপত্র পেশ করিয়া তিনি সমগ্র মন্ত্রীসভার পতন ঘটাইতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার এই ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মন্ত্রীগণ তাঁহাদের অনুসৃত নীতি এবং কার্যাদির জন্য ব্যক্তিগত এবং যৌথভাবে আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন। আইনসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, অনাস্থা প্রস্তাব ইত্যাদির মাধ্যমে মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করে। মন্ত্রীদের এই দায়িত্বশীলতার কারণে এই শাসন ব্যবস্থা দায়িত্বপূর্ণ সরকার (Responsible Government) নামে পরিচিত। আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনই সরকারের শক্তি এবং স্থায়িত্বের উৎস।

মন্ত্রীরা আইন সভা হইতে নিযুক্ত এবং আইন সভার নিকট দায়ী।

যৌথদায়িত্ব বলিতে বুঝায় যে, কোন একজন মন্ত্রীর দোষত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রীপরিষদ দায়িত্ব স্বীকার করিবে। একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের অর্থ—সমগ্র মন্ত্রীপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন। দলগত ঐক্য এই যৌথ দায়িত্বের স্বরূপ অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

যৌথ দায়িত্বের অর্থ

আইনসভা এবং শাসন বিভাগ এই শ্রেণীর সরকারে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে আবদ্ধ থাকে। শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের আইনসভায় আসন আছে, ভোটাধিকার আছে। উভয়ের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা হয় না।

ইহা ক্ষমতাবিভাজন বিরোধী

আইন সভার প্রাধান্যহেতু এই জাতীয় সরকার সংসদীয় শাসন (Parliamentary Government) নামেও অভিহিত হয়। সংসদীয় শাসনের অন্যতম অপরিহার্য লক্ষণ হইল সংসদে আইনসভায় বিরোধী পক্ষের অবস্থিতি। বিরোধী পক্ষই বিকল্প সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি বহন করে। ইহার অভাবে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের সূচনা হয়।

বিরোধী দলের উপস্থিতি

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ এবং আরও বহু রাষ্ট্র এই পদ্ধতিতে শাসিত হয়।

মন্ত্রীপরিষদ চালিত সরকারের গুণ (Merits of Cabinet Government) : এই জাতীয় শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগকে আইনসভা হইতে পৃথক করা হয় না। উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার ফলে শাসন কার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। শাসন বিভাগের বাস্তব অভিজ্ঞতা আইন প্রণয়ন ব্যাপারে প্রযুক্ত হইয়া আইনসভা প্রণীত আইনগুলিকে বাস্তবধর্মী করিয়া তোলে। আবার শাসন বিভাগ অনেক সময় পরিবর্তিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য নূতন আইনের প্রয়োজন অনুভব করে। আইন সভার সহিত শাসন বিভাগের ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে এই আইন সহজেই প্রণীত হয়। ফলে শাসন বিভাগও কর্মকুশলতা দেখাইতে সমর্থ হয়।

(১)
আইনসভা এবং শাসন-বিভাগের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে।

মন্ত্রীপরিষদ চালিত সরকারে শাসনবিভাগ তাহার অনুসৃত নীতি এবং কার্যাদির জন্য আইন সভার নিকট দায়ী। আইন সভার আস্থার উপরেই এই সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। এই ব্যবস্থায় সরকার প্রত্যক্ষভাবে জনপ্রতিনিধি সভার নিকট এবং পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট দায়ী। এই দায়িত্বই গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র।

(২)
ইহা দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা

শাসনের অধিকার কোন একজন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া একটি মন্ত্রী পরিষদের হস্তে থাকে বলিয়া ক্ষমতার অসদ্ব্যবহারের আশঙ্কা থাকে না। তাহা ছাডা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বহুজনের মধ্যে আলাপ আলোচনার ফলে। ইহাতে সরকারী নীতি যথাসম্ভব নির্ভুল হইবারই কথা।

(৩)
ইহাতে ভুল হইবার আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত কম।

পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে সরকারের মতই বিরোধীপক্ষেরও স্থান আছে। আইন-সভায় সরকার-পক্ষ-সমর্থনকারী দল যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনই সরকারের ভুল ভ্রান্তি দেখাইবার জন্য বিরুদ্ধদলও অপরিহার্য। আইন সভায় বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ মন্ত্রীগণকে সরকারী কার্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন এবং সরকারী

নীতির ব্যর্থতা প্রচার করা তাঁহাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ। এই সমালোচনার ভয়ই মন্ত্রীগণকে সংযত করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া আইন সভায় সরকার এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া জনগণকে রাজনীতি বিষয়ে সচেতন করিয়া তোলে।

(৪)
বিরোধীপক্ষের সমালোচনা একদিকে সরকারকে সংযত রাখে, অপর দিকে রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করে।

মন্ত্রীপরিষদ চালিত সরকারের ত্রুটি (Defects of Cabinet Government): এই শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলা হয় যে ইহার ফলে মন্ত্রীপরিষদের হস্তে শাসন এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। মন্ত্রীগণ বিভিন্ন সরকারী দপ্তর পরিচালনা করেন। আবার আইন সভায় তাঁহারাই বিল উত্থাপন করেন। ক্ষমতা এইভাবে একই হস্তে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যাহত হয়।

(১)
ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষে হানিকর।

আইন সভার নিকট মন্ত্রীসভার দায়িত্ব নামমাত্র। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সমর্থন পুষ্ট মন্ত্রীসভা সত্যই অপরাজেয়। প্রধান প্রধান সদস্যদের লইয়া মন্ত্রীসভা গঠিত হয় বলিয়া দলভুক্ত সাধারণ সদস্যগণ তাঁহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন না। দল হইতে নির্বাসনের ভয়েই তাঁহারা মন্ত্রীসংসদের প্রতি নিয়ত অনুগত থাকেন। প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অবিসংবাদী নেতা হিসাবে কার্যতঃ একনায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এইভাবে মন্ত্রী পরিষদের শাসন এক নূতন স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

(২)
ইহার ফলে এক নব্য স্বৈরাচারের উদ্ভব হইয়াছে।

আইনসভার বিরাগ-ভাজন হইলেই মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। সরকারের স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা হেতু আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় না। ইহা ছাড়া বহু দল বিশিষ্ট আইন সভায় কোন একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে স্থায়ী সরকার গঠন করিতে পারে না। এমত অবস্থায় ঘন ঘন সরকারের পরিবর্তন হয়।

(৩)
ইহা অস্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা।

মন্ত্রীপরিষদের শাসনকে অনভিজ্ঞের শাসন (Government by Amateurs) বলা হয়।

(ক) মন্ত্রীগণ তাঁহাদের কার্যকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তা তাঁহাদের দক্ষতা অর্জনের পথে প্রথম বাধা।

(৪)
শাসনকার্যে দক্ষতার অভাব ঘটে

(খ) মন্ত্রীগণ নির্দিষ্ট দপ্তরেই যে স্থায়ীভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, এমন কোন নিয়মই নাই। দপ্তর পুনর্বণ্টনের ফলে এক বিভাগীয় মন্ত্রীকে অপর বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। ইহার ফলেও তাঁহাদের কর্মকুশলতা হ্রাস পায়।

(গ) মন্ত্রীগণকে আইন সভা এবং দলীয় সংগঠন উভয়ের সমর্থন লাভের আশায় সদা সচেষ্ট থাকিতে হয়। ফলে নিজস্ব বিভাগে তাঁহারা একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন না।

(৫)
ইহা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুপযোগী।

এই ব্যবস্থায় সরকারী নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব কোন একজন ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না থাকিয়া একটি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকে। বহু জনের মধ্যে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন হয় বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বিলম্ব ঘটে। কাজেই আপৎকালীন ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষে এই শ্রেণীর শাসন অনুপযুক্ত।

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার (Presidential Government): এই শাসন ব্যবস্থায় পরিচালন বিভাগীয় সর্বময় কর্তৃত্ব একজন রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত থাকে।

শাসন এবং আইন বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক অধিনায়ক এবং প্রধান শাসক। তিনি জনগণের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আইন সভার নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। আইন সভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে পারে না। অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে পর নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁহাকে অপসারণ করা যায়। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রীসভা থাকে। এই মন্ত্রীসভার সভ্যবৃন্দ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত ভৃত্য মাত্র। তাঁহারা রাষ্ট্রপতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, আইন সভার নিকট তাঁহাদের কোন দায়িত্ব নাই। রাষ্ট্রপতির অথবা তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রীগণ আইন সভার সদস্য নহেন এবং তাঁহাদের আইন সভার কার্যে সরাসরি যোগদান করিবার অধিকার নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুরূপ শাসন প্রচলিত।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের গুণ (Merits of Presidential Government): রাষ্ট্রপতি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক। শাসন সম্পর্কিত সমুদয় ক্ষমতার একক

(ক)
ইহা বলিষ্ঠ শাসন পদ্ধতি

অধিকার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকে বলিয়া সরকার দৃঢ় এবং শক্তিশালী হয়। বহুজনের সম্মতি আদায়ের জন্য আপোষ করিবার প্রয়োজন নাই। কাজেই বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে এবং আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনায় সরকারকে অযথা বেগ পাইতে হয় না।

দেশ বিপদাপন্ন হইলে অথবা অন্য কোন কারণে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে রাষ্ট্রপতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন এবং তদনুযায়ী ক্ষিপ্রতার সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। আলাপ আলোচনায় বৃথা সময় নষ্ট হয় না।

(২) ইহা জরুরী অবস্থায় বিশেষ উপযোগী।

রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। আইনসভার সদা পরিবর্তনশীল মতামতের দ্বারা তাঁহার ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে না। কার্যকালের এই স্থায়িত্বের জন্য একদিকে তিনি শাসনকার্যে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পান, অপরদিকে সরকারী নীতির নিরবচ্ছিন্নতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

(৩) ইহার অপর একটি গুণ হইল স্থায়িত্ব।

আইনসভা এবং শাসন বিভাগ প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কর্মে রত থাকে বলিয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা থাকে না। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রপতি ঐ আইন প্রয়োগের কার্যে ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া আইন এবং শাসন উভয়েরই উৎকর্ষ সাধিত হয়।

(৪) পৃথকীকরণহেতু শাসনকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়।

শাসন বিভাগের সর্বাধিনায়ক হিসাবে রাষ্ট্রপতি শাসন-সম্পর্কিত সর্ববিধ কার্যের জন্য দায়ী। ক্ষমতা বিভক্ত হয় নাই বলিয়া দায়িত্বও অবিভক্ত। বহুজনের হস্তে দায়িত্ব থাকিলে তাহা মূল্যহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু একজনের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট, তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব।

(৫) নির্ভুলভাবে দায়িত্ব নিরূপণ করা সম্ভব।

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ত্রুটি (Defects of Presidential Government): রাষ্ট্রপতি একমাত্র শাসক বলিয়া তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা এবং সামর্থ্যের উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। তাঁহার অক্ষমতা ও অযোগ্যতার শাস্তি সমগ্র জনসাধারণকে বহন করিতে হয়। সেইজন্য একজন ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনার উপর একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সঁপিয়া দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়।

(১) একমাত্র শাসকের অক্ষমতার দরুণ সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাষ্ট্রপতি তাঁহার অনুসৃতনীতি এবং কার্যাদির জন্য আইন সভার নিকট দায়ী নহেন। অপসারণের কষ্টসাধ্য পদ্ধতির অনুসরণ ব্যতীত তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার উপায় নাই। ইহার ফলে তিনি স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হন।

(২) ইহা দায়িত্বহীন শাসনব্যবস্থা।

রাষ্ট্রপতি আইন সভায় অনুপস্থিত থাকার ফলে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা আইনে স্থান পায় না। ফলে আইনসভা প্রণীত আইন অনেক

ক্ষেত্রে বাস্তবধর্মী হয় না। আবার আইনসভা রাষ্ট্রপতি-আকাঙ্ক্ষিত আইন রচনা করিতে অস্বীকৃত হইয়া রাষ্ট্রপতির শাসনকুশলতাকে ক্ষুণ্ণ করে। এইভাবে আইন সভা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে শাসন ব্যবস্থায় অচল অবস্থার উদ্ভব হয়।

(৩) বিভাগীয় বিরোধ শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার সূচনা করে

॥ সারাংশ ॥

শাসনক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্য এবং শাসকের সংখ্যা—এই দুইটি নীতির ভিত্তিতে অ্যারিষ্টট্‌ল রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং পলিটি—এই তিনটি স্বাভাবিক, আর স্বৈরতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্র—এই তিনটি বিকৃত সরকারের উল্লেখ করিয়াছেন।

সরকারী সংগঠনের অভিনবত্ব এবং জটিলতা হেতু আধুনিক কালে অ্যারিষ্টট্‌ল বর্ণিত শ্রেণীবিন্যাস অচল। বর্তমান সরকারের দুইটি প্রধান রূপ:—একনায়কতন্ত্র এবং গণতন্ত্র। কেন্দ্র এবং অঞ্চলের সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতন্ত্র এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। আইন সভার সহিত শাসন বিভাগের সম্পর্ক অনুসারে গণতন্ত্র পার্লামেণ্টারী অথবা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার নামে অভিহিত হয়।

রাজতন্ত্র: বংশানুক্রমিক অধিকারে রাজা অথবা রাণী যখন শাসনের সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তখন সেই শাসন ব্যবস্থাকে বলা হয় চরমতম রাজতন্ত্র। গুণ:—(১) সাংগঠনিক সরলতা, (২) নিরপেক্ষতা, (৩) দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব। ত্রুটি:—(১) দায়িত্বহীনতা, (২) ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলোপ।

অভিজাততন্ত্র: ইহা অল্পসংখ্যক জ্ঞানীগুণীর শাসন। গুণ:—দক্ষ এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের শাসন বলিয়া ইহা জনকল্যাণকর। দোষ—জ্ঞানী ও গুণী জন যে সুশাসক হইবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। সাধারণ নাগরিক অধিকারশূন্য হইয়া পড়ে। অভিজাততন্ত্রের বণিকতন্ত্রে রূপান্তরিত হইবার প্রবণতা দেখা যায়।

গণতন্ত্র: জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত জনগণের নিজস্ব শাসনই গণতন্ত্র। এই ব্যবস্থায় সমগ্র জনসাধারণ সার্বভৌম ক্ষমতার অংশীদার। গণতন্ত্রের দুইটি রূপ—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। আধুনিক বৃহদায়তন রাষ্ট্রে সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে সরাসরি-ভাবে সরকার পরিচালনা করা অসম্ভব বলিয়া প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

গুণ: (১) আত্মশাসন-বলিয়া ইহা সত্যকার কল্যাণসাধনে সমর্থ, (২) সরকার দায়িত্বশীল, (৩) সাম্য এবং স্বাধীনতা ইহার ভিত্তি, (৪) সহিষ্ণুতা ইহার ধর্ম,

(৫) ইহা ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী মুক্তপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে, (৬) ইহা দেশপ্রেমের জন্মদাতা রাজনৈতিক শিক্ষার সহায়ক এবং বিপ্লববিরোধী।

ত্রুটি ঃ (১) ইহা অশিক্ষিত জনতার শাসন, (২) ইহা অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা, (৩) ইহা দলীয় স্বার্থের পরিপোষক, (৪) ইহা ব্যয়বহুল এবং বিলম্বিত শাসনব্যবস্থা, (৫) ইহা সংরক্ষিত স্বার্থ এবং সংরক্ষণশীল মনোভাবের সমর্থক।

সাফল্যের শর্ত ঃ (১) জনগণ ইহার জন্য আগ্রহশীল হইবে এবং ইহার আদর্শ রূপায়নে সমর্থ হইবে, (২) প্রয়োজনীয় শিক্ষায় জনগণ শিক্ষিত হইবে, (৩) স্বাধীনতা এবং সহিষ্ণুতা এই দুইটি মূলনীতি মান্য করা হইবে, (৪) অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীভূত হইবে, (৫) মতামত প্রকাশের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে, (৬) সুসংগঠিত এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বিরোধী দল থাকিবে।

একনায়কতন্ত্র ঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে একনায়কতন্ত্রের অবির্ভাব হয়। বিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠন ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী সরকারের ব্যর্থতাই একনায়কতন্ত্রের পথ সুগম করিয়াছিল।

একনায়কতন্ত্রের তিনটি রূপ—(১) ফ্যাসিষ্ট একনায়কতন্ত্র, (২) সামরিক একনায়কতন্ত্র, (৩) বিত্তহীন শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র। একজন ব্যক্তির নিরঙ্কুশ শাসনাধিকারই এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ইহা একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের একাধিপত্যে বিশ্বাসী। বিরোধ বা সমালোচনার অবকাশ এখানে নাই।

গুণ ঃ (১) ইহা আশুফলপ্রদ ব্যবস্থা ; (২) ইহা যুদ্ধ প্রভৃতি বিপজ্জনক পরিস্থিতির উপযোগী, এবং পুনর্গঠন কার্য ক্ষিপ্রতার সহিত সমাধা করিতে পারে ; (৩) ইহা কর্মচঞ্চল শক্তিশালী জাতি গঠনে সহায়তা করে।

ত্রুটি ঃ (১) ইহার সৃষ্টি চমকপ্রদ হইলেও ক্ষণস্থায়ী ; (২) ইহার ভিত্তি পশুবল, জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য নহে ; (৩) সমালোচনার সুযোগ না থাকায় ফলে একনায়ক-অনুসৃত নীতি ভ্রান্ত হইলেও তাহার সংশোধন সম্ভব নহে ; (৪) উগ্রজাতীয়তাবাদ সমর্থন করিয়া ইহা যুদ্ধের উন্মাদনা যোগায় ; (৫) ব্যক্তিজীবনের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করিয়া ইহা ব্যক্তিত্বকে পঙ্গু করে।

এককেন্দ্রিক সরকার ঃ এই ব্যবস্থা অনুযায়ী সমগ্র দেশ একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক সরকারগুলি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ।

গুণ ঃ (১) ইহা রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার সহায়ক, (২) শাসন ব্যবস্থা সরল এবং শক্তিশালী হয় এবং দায়িত্ব স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

ত্রুটি ঃ (১) ইহা বৃহদায়তন দেশ শাসনের অনুপযোগী ; (২) ইহা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের বিরোধী।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ঃ যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্য মধ্যে এমনভাবে বণ্টন করা হয় যাহাতে উভয় সরকার নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে কার্য করে তখন তাহাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শর্ত ঃ (১) একদিকে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার মনোভাব থাকিবে, (২) অপর দিকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, (৩) অঞ্চলগুলির মধ্যে ভৌগোলিক সান্নিধ্য থাকিবে।

বৈশিষ্ট্য ঃ (১) লিখিত এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য, (২) সুস্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় গঠন।

গুণ ঃ (১) জাতীয় ঐক্য এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় সাধন করে বলিয়া ইহা বৃহদায়তন এবং বৈচিত্র্যবহুল দেশ শাসনের উপযোগী, (২) আঞ্চলিক শাসন প্রবর্তন করিয়া ইহা রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসারে সহায়তা করে।

দোষ ঃ (১) ইহা দুর্বল শাসন ব্যবস্থা, (২) দায়িত্ব বিভক্ত বলিয়া অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়, (৩) বিরোধের আশঙ্কা সদা বর্তমান, (৪) ইহা জটিল এবং ব্যয়বহুল শাসন পদ্ধতি।

পার্লামেণ্টারী শাসন—ইহা মন্ত্রীপরিষদের শাসন এবং দায়িত্বশীল শাসন বলিয়াও পরিচিত। শাসনক্ষমতা আইন সভার নিকট দায়িত্বশীল এক মন্ত্রীপরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

গুণ ঃ (১) আইনসভা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার ফলে শাসনকার্য সুচারুভাবে নিষ্পন্ন হয়, (২) ইহা দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা।

ত্রুটি ঃ (১) ক্ষমতাবিভাজন নীতির অস্বীকৃতির ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত হয় ; (২) ইহা একনায়কতন্ত্রের অভিনব সংস্করণ, (৩) ইহা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুপযোগী (৪) ইহা অস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রপতির শাসন—ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সরকারে শাসনক্ষমতার অধিকারী হইলেন জনগণের দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত একজন রাষ্ট্রপতি—আইন সভার নিকট যাঁহাকে অনুসৃত নীতি এবং কার্যাদির জন্য জবাবদিহি করিতে হয় না। তিনি অথবা তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রীসভা, আইনসভার সদস্য নহেন অথবা আইনসভার নিকট দায়ী নহেন।

গুণ ঃ (১) ইহা শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা এবং জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বনে অত্যন্ত উপযোগী, (২) ইহার স্থায়িত্ব আছে বলিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে একই নীতি অনুসরণ করা যায়।

ত্রুটি ঃ (১) রাষ্ট্রপতির দায়িত্বহীনতা তাহাকে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত করে। (২) আইনসভা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে সংযোগ না থাকার ফলে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Define Democracy. Distinguish between Direct and Indirect Democracy.
গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গণতন্ত্রের পার্থক্য আলোচনা কর।
[পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫]

2. Point out the merits and defects of Representative Democracy.
প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৫৫-৫৮]

3. What do you mean by Democracy? Compare it with Dictatorship.
গণতন্ত্র বলিতে কি বোঝ? গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা কর।
[পৃষ্ঠা ৫৪ ও ৬০]

4. What is Dictatorship? Discuss its merits and defects.
একনায়কতন্ত্র কাহাকে বলে? ইহার গুণাগুণ আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৬০-৬২]

5. Discuss the merits and defects of Democracy as a form of Government.
সরকারী সংগঠন হিসাবে গণতন্ত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃঃ ৫৬-৫৮]

6. What are the conditions for the success of modern democracy?
আধুনিক গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তগুলি কি তাহা লিখ। [পৃষ্ঠা ৫৯-৬০]

7. Distinguish between Unitary and Federal forms of Government. Illustrate your answer.
এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য উদাহরণসহ নির্দেশ কর। [পৃষ্ঠা ৬৩ ও ৬৬]

8. Compare the advantages and disadvantages of a Unitary Government with those of a Federal Government.
এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণের তুলনামূলক আলোচনা কর।
[পৃষ্ঠা ৬৩-৬৪ ও ৬৮-৬৯]

9. What is a Federal Government? Discuss its chief characteristics.
যুক্তরাষ্ট্র সরকার কাহাকে বলে? ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।
[পৃষ্ঠা ৬৬, ৬৪-৬৫]

10. What do you mean by a Federation? Discuss the conditions for the formation of a Federation.
যুক্তরাষ্ট্র বলিতে কি বুঝ? যুক্তরাষ্ট্র গঠনের শর্তগুলি আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৬৬]

11. What are the conditions of success of a Federation? What according to you, are the reasons for the present tendency towards Federation?
যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্তগুলি কি কি? তোমার মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দিকে সাম্প্রতিক প্রবণতার কারণগুলি কি কি? [পৃষ্ঠা ৬৭ ও ৬৯ (অনুঃ ৫]

12. How will you distinguish Parliamentary Government from Presidential Government? Illustrate your answer and discuss their respective merits and defects.
কি ভাবে পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা হইতে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পার্থক্য নির্দেশ করিবে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর এবং ইহাদের গুণাগুণের তুলনামূলক আলোচনা কর।
[পৃষ্ঠা ৭০-৭৪]

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্রের কার্যাবলী

(Functions of State)

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নাই। এই মতানৈক্যের মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণার বিভিন্নতা।

কেহ কেহ রাষ্ট্রকে সমাজ সংগঠনের শ্রেষ্ঠ রূপ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র এবং সমাজ অভিন্ন। এই জাতীয় রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী। ইহার কর্মক্ষেত্রের পরিধি অপরিমিত। জার্মাণ দার্শনিক হেগেলের মতে রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যক্তি তাহার শ্রেষ্ঠ সত্তার সন্ধান পায়। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রকে সমাজের অন্যতম সংগঠন বলিয়া জ্ঞান করেন। ল্যাস্কি বলেন—'আমার নাগরিকতা আমার সমগ্র জীবনের সমব্যাপক নহে'। ম্যাকাইভারের অভিমত এই যে প্রকৃতিগত সীমাবদ্ধতার জন্য রাষ্ট্র সমাজের সর্ববিধ উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ। ইহার উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ, কাজেই ইহার অধিকারও সীমিত। রাষ্ট্র সমাজ-জীবনের মূল সূত্র নির্ধারণ করে সত্য, কিন্তু সমাজ-জীবনকে সম্পূর্ণতা দানের সামর্থ্য তাহার নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—রাষ্ট্র জনমত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। বলপ্রয়োগের দ্বারা জনমত প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। একই কারণে সমাজের নীতিজ্ঞান এবং প্রথাগত বিধান পরিবর্তনের ব্যাপারে রাষ্ট্র বিফলমনোরথ হয়।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণার বিভিন্নতা।

বর্তমান রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে দুইটি সুস্পষ্ট মত আছে—একটি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য-বাদ, অপরটি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন—রাষ্ট্রের কাজ যত কম হইবে ততই মঙ্গল। অপরপক্ষে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ রাষ্ট্রের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র দাবী করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism) : ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আবির্ভাব হয়। যখন রাষ্ট্র ব্যক্তিজীবনের সকল ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করিতে উদ্যত হইল, তখন স্বাধীনতাকামী মানুষ এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে অবাঞ্ছিত জ্ঞান করিল। রাষ্ট্রকে সংযত এবং তাহার কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করার মনোভাবই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদে ব্যক্ত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জেমস্ ষ্টুয়ার্ট মিল এবং হার্বার্ট স্পেনসারের রচনায় এই মতবাদ পরিস্ফুটিত হয়। মিলের মতে নিজের উপর, দেহ এবং চিত্তের উপর মানুষের পূর্ণ অধিকার

আছে। কেবলমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ব্যক্তির অবাধ অধিকার নিয়ন্ত্রিত করা যুক্তিযুক্ত। তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য তাহার উপর বলপ্রয়োগ শুধু অবাঞ্ছিত নহে, অন্যায়।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী মিল এবং স্পেনসারের অভিমত।

হার্বার্ট স্পেনসার বলেন—মনুষ্যসমাজ যে এখনও আদিম বর্বরতা অতিক্রম করিতে পারে নাই, তাহারই নির্ভুল সাক্ষ্য এই রাষ্ট্র। তিনি রাষ্ট্রকে দেখিয়াছেন পারস্পরিক নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সমবায় সংগঠন হিসাবে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করেন না। রাষ্ট্রকে অকল্যাণকর জ্ঞান করিলেও তাঁহারা ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না। মানুষের স্বভাবগত স্বার্থপরতা এবং কলহপ্রিয়তাই রাষ্ট্রকে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে। নৈরাজ্যবাদী-গণের অনুকরণে তাঁহারা রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করেন না। তাঁহারা বলেন—রাষ্ট্র তাহার কর্মক্ষেত্রকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিয়াই তাহার সার্থকতা প্রমাণ করিবে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণ রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় অথচ দুষ্টগ্রহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে সব কাজ অপরিহার্য—যেমন বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধান করা এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখা—তাহাই শুধু রাষ্ট্র করিবে। নিরাপত্তা বিধানই হইবে রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য। কল্যাণসাধন তাহার দায়িত্ব বহির্ভূত, এই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলেই রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করিবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র হইবে পুলিশীরাষ্ট্র, তাহার কার্য হইবে কেবলমাত্র নিবারণ-মূলক, গঠনমূলক নহে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি ঃ

(১)
নৈতিক যুক্তি

ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই রাষ্ট্র ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। ব্যক্তিকে তাহার নিজস্ব ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ দিয়াই রাষ্ট্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে। সব ব্যাপারেই রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিকে সাহায্য করে, তাহা হইলে সে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে। সে নির্ভরশীলতা দাসত্বেরই নামান্তর।

(২)
মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি

নিজের ভালমন্দ প্রতিটি ব্যক্তিই বোঝে। ব্যক্তি-জীবনের বিচিত্র প্রয়োজন রাষ্ট্রের পক্ষে উপলব্ধি করা এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নয়। কাজেই রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল ব্যক্তিকে অবাধ অবকাশ দেওয়া।

আদাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা 'Laissez-faire' অর্থাৎ 'ছাড়িয়া দাও' এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন—পূর্ণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর। ইহার ফলেই ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থই সংরক্ষিত হয়। মালিক এবং শ্রমিক উভয়েই লাভবান হয় এবং দেশও আর্থিক দিক দিয়া উন্নত হয়। অতএব অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অসঙ্গত।

(৩) অর্থ নৈতিক যুক্তি।

প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature) অনুযায়ী বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রত্যেককেই প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়। এই জীবন সংগ্রামে (struggle for existence) যোগ্যতমই শুধু টিকিয়া থাকে। রাষ্ট্র যদি অক্ষম এবং অপদার্থকে সাহায্য-দান করিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে। অতএব প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে কাজ করা রাষ্ট্রের পক্ষে অনুচিত।

(৪) বৈজ্ঞানিক যুক্তি।

রাষ্ট্র বলিতে কার্যকরী অর্থে আমরা সরকারকে বুঝি। সরকার মুষ্টিমেয় লোকের সমষ্টি। তাহাদের কর্মক্ষমতার একটা সীমা আছে। তাহা ছাড়া সরকারী কর্মপদ্ধতি অযথা বিলম্বিত এবং স্বজনতোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা দোষে দুষ্ট।

(৫) বাস্তব অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক যুক্তি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমালোচনা ঃ

বিরুদ্ধবাদীগণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থনে ব্যবহৃত যুক্তিসমূহের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন।

(১) ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে রাষ্ট্রকে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিলে চলিবে না। ব্যক্তিকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া এবং সুযোগ-সুবিধা দান করিয়াই রাষ্ট্র তাহার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে পারে।

(২) ব্যক্তি তাহার ভালমন্দ সব সময় বুঝে না। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়ম পালনের ব্যাপারে ব্যক্তির অজ্ঞতা প্রকটভাবে দেখা যায়। এই ব্যাপারে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৩) অর্থনীতিক্ষেত্রে যে পূর্ণ প্রতিযোগিতার কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাহা ছাড়া প্রতিযোগিতা সমানে সমানেই সম্ভব। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশ্যই দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করিবে।

(৪) প্রাকৃতিক নিয়মের নিষ্ঠুরতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্যই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা হ্রাসের জন্যই সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ-জীবন পরিচালিত হয়। কাজেই নির্মম প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর।

(৫) সরকারী কার্যাদির যে সমস্ত ত্রুটি দেখান হইয়াছে তাহার জন্য সরকারকে সঙ্কুচিত না করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সরকার গঠন করাই বাঞ্ছিত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল্য।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নানাভাবে সমালোচিত হইলেও ইহার মূল্য অনস্বীকার্য। অবাঞ্ছিত সরকারী হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিয়া ইহা ব্যক্তিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে। ইহা ব্যক্তিকে আত্মসচেতন, স্বাবলম্বী এবং উদ্যোগী হইতে শিক্ষা দেয়। রাষ্ট্রের লক্ষ্য যে আদর্শ নাগরিক সৃষ্টি এবং মুক্ত পরিবেশ রচনা করিয়াই যে সেই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব —এই আদর্শ প্রচার করিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার বিকাশে সহায়তা করিয়াছে।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের ত্রুটি—অসাম্য এবং শ্রেণীসঙ্ঘাত।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Socialistic theory) : পুলিশী রাষ্ট্র কখনই ব্যক্তির প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে সমাজ-জীবনে নানাবিধ অন্যায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ধনবৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, সংগঠিত মালিক সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শ্রমিকশ্রেণী বিপর্যস্ত হইতেছে, উৎপাদনের লক্ষ্য ভোগকারীর চাহিদা পূরণ না হইয়া মুনাফার লোভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী।

এই সমস্ত অন্যায় এবং অসাম্যের দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রকে অগ্রণী হইতে হইবে। সমাজতন্ত্রবাদীগণ বলেন রাষ্ট্রপ্রণীত আইন স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে না; সমাজ-জীবনে স্বাধীনতাবিরোধী যে সমস্ত অশুভ শক্তি রহিয়াছে তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করে মাত্র। এই নিয়ন্ত্রণই ব্যক্তিকে যথার্থ মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তিকে অবাধ স্বাধীনতা দিলেই সে সুখী হইবে না। রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে তাহার সেবা করিয়াই তাহাকে সত্যকার স্বাধীনতার আস্বাদ দিতে পারে।

উৎপাদনের মূল উপাদান-গুলি রাষ্ট্রের করায়ত্ত হইবে।

অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার বিষময় প্রভাব হইতে সমাজ-জীবনকে রক্ষা করিতে হইলে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে এবং বণ্টনের দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। উৎপাদনের মূল উপাদানসমূহের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ এই মতবাদের লক্ষ্য।

ব্যক্তিকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা অযৌক্তিক। সমাজের উন্নতির মধ্যেই ব্যক্তির উন্নতি নিহিত রহিয়াছে। অনুন্নত একটি সমাজে কোন একজন ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ কখনই সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের সর্বাত্মক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সমাজের সামগ্রিক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

ব্যক্তি সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত।

বর্তমান যুগে ব্যক্তিজীবন নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন। এককভাবে সে অত্যন্ত অসহায়। প্রতি পদক্ষেপে সে রাষ্ট্রের সাহায্য কামনা করে। রাষ্ট্র হইবে তাহার সর্বকালীন বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং দার্শনিক। অতএব শুধু রক্ষামূলক কাজে রাষ্ট্রকে ব্যাপৃত থাকিলে চলিবে না, সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কল্যাণময় হস্ত প্রসারিত হওয়া উচিত।

বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যক্তি রাষ্ট্রের উপর নির্ভর করে।

মোট কথা, সমাজতান্ত্রিক মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান। তাহার কর্মক্ষেত্র যত প্রসারিত হইবে, ততই মঙ্গল। রাষ্ট্র অসাম্য দূরীভূত করিয়া অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, ব্যক্তিকে নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করিয়া, শ্রেণীহীন ও শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবে।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইলেই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ (Different forms of Socialism) :

সমাজতন্ত্রবাদের মূল লক্ষ্য—শোষণের অবসান এবং শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব এবং সমাজ সংগঠনই বা কি রকম হইবে—এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। এই মতানৈক্যহেতু ভিন্ন প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব হইয়াছে, যথা—রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ বা সমষ্টিবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ।

রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ বা সমষ্টিবাদ (State Socialism or Collectivism)—এই মতবাদের সমর্থকগণ বলেন ধনবৈষম্য দূর করিয়া সুখী এবং শোষনহীন সমাজ গঠন করিতে হইবে। উৎপাদনের মূল উপাদানগুলি (যেমন জমি, খনি প্রভৃতি) সর্বসাধারণের তরফ হইতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনিতে হইবে। রাষ্ট্র সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধীরে ধীরে এই মালিকানা কায়েম করিবে। এইভাবে উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে। ভারত এবং অধিকাংশ প্রগতিশীল রাষ্ট্র এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছে।

সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism)—ইহাও শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্গঠনের পক্ষপাতী। এই মতবাদে যে রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হয়,

তাহা উৎপাদন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিবে না। শিল্প পরিচালনার ভার থাকিবে শ্রমিকসংঘগুলির উপর। প্রতিটি শিল্প, সেই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনের মাধ্যমেই পরিচালিত হইবে। আবার ভোগকারীগণও নিজস্ব সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবে অর্থাৎ সংঘবাদী রাষ্ট্র পরিচালিত হইবে উৎপাদক বা শ্রমিক এবং ভোগকারী বা ক্রেতাদের প্রতিনিধিমণ্ডলীর দ্বারা।

যৌথ ব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Syndicalism): রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদকল্পে এই মতবাদে বিশ্বাসীগণ অর্থনৈতিক বিপ্লবকে স্বাগত জানাইয়াছেন। শিল্প পরিচালনার একমাত্র অধিকার তাঁহারা শ্রমিক সংঘের উপর অর্পণ করিতে চাহেন। বিভিন্ন শিল্প পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রমিকসংঘগুলির সমাবেশে যে বৃহত্তর শ্রমিক সংগঠনের উদ্ভব হইবে তাহাই জাতীয় জীবনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করিবে।

সাম্যবাদ (Communism): সাম্যবাদীগণ রাষ্ট্রকে শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে সর্বহারা শ্রেণীকে দমন করার উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহারা সেইজন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিলুপ্তি কামনা করেন। তাঁহারা বলেন, রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র বিপ্লবের। সর্বহারা শ্রেণী বলপ্রয়োগের দ্বারা ধনিকশ্রেণীকে উৎখাত করিয়া তাহাদের একাধিপত্য কায়েম করিবে। এই অবস্থায় রাষ্ট্র বিলুপ্ত হইবে না। তবে রাষ্ট্রশক্তি শ্রমিকশ্রেণীর করায়ত্ত হইবে এবং উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে। সাম্যবাদীগণ বলেন ইহা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা মাত্র। কায়েমী স্বার্থকে প্রতিহত করিবার জন্যই ইহার প্রয়োজন। কালক্রমে প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলি নিঃশেষিত হইবে এবং রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন ফুরাইবে। তাহার স্থলে গড়িয়া উঠিবে এক সাম্যবাদী সমাজ যেখানে প্রত্যেকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিবে এবং বিনিময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য পাইবে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা: আধুনিক প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রের গতি সমাজতন্ত্র অভিমুখে। সমাজতন্ত্রবাদ নূতনতর সভ্যতার সন্ধান দিয়াছে—এ কথা মানিয়া লইলেও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি অস্বীকার করা যায় না।

(১) **ইহা ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করে।**

সর্বগ্রাসী এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যক্তিকে যন্ত্রে পরিণত করে। রাষ্ট্রনির্দেশে নিয়ত পরিচালিত হইয়া সে স্বাধীন চিন্তা-বিস্মৃত হয়। নিজে উদ্যোগী হইয়া কোন কিছু করিবার অবকাশ সে পায় না। বহুবিধ আইনকানুন তাহার চলার পথকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলে। ব্যক্তি রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়। ব্যক্তিগত মুনাফার লোভেই পরিচালক স্বীয় উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলে। এই লাভের আশাই ব্যক্তির কর্মোদ্যমের প্রেরণা। সমাজতন্ত্রবাদ এই মুনাফা অর্জনের পথ রুদ্ধ করিয়া দেশের আর্থিক অগ্রগতিকে বাধা দেয়। মাহিনা করা ম্যানেজারের নিকট হইতে শিল্প মালিকের মত একনিষ্ঠ আয়াস আশা করা যায় না।

(২) ইহা অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী।

সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের যেরূপ বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের নির্দেশ দেয় তাহার উপযোগী হওয়া যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই অসম্ভব। রাষ্ট্রের কার্য সম্পাদিত হয় সরকার বা পরিচালকমণ্ডলীর মাধ্যমে। তাহাদের হস্তে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিলে অপরিহার্য কার্যগুলিও তাহারা যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে না।

(৩) সমাজতন্ত্রবাদ-নির্দিষ্ট বিপুল কর্মভার বহনে রাষ্ট্র অসমর্থ।

সরকারী কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার অর্থ স্বজন পরিপোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি পক্ষপাতমূলক কার্যের সুযোগ দেওয়া। তাহা ছাড়া সরকারী কর্মপদ্ধতি নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ, কাজেই বিলম্বিত।

(৪) সরকারী কাজে অযথা বিলম্ব ঘটে এবং বহুবিধ অন্যায় প্রশ্রয় পায়।

আধুনিক সরকারের কার্যাবলী (Functions of Modern State) :

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দিন গত হইয়াছে এবং সমাজতন্ত্রবাদ ক্রমাগত প্রসারলাভ করিতেছে—ইহা ধরিয়া লইলেও এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে আজিকার পৃথিবীতে পুলিশী রাষ্ট্র যেমন বিরল, সেইরূপ পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যাও নগণ্য। রাশিয়া, চীন প্রভৃতি গুটিকয়েক রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোথাও এই মতবাদের পরিপূর্ণ রূপায়ন পরিদৃষ্ট হয় না।

আধুনিক রাষ্ট্রের গতি সমাজতন্ত্র অভিমুখে।

বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই দুইটি আদর্শের মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া চলে। অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্র শুধুমাত্র নিবারণমূলক কাজেই আবদ্ধ থাকে না। জনকল্যাণ সাধনের জন্য বহুবিধ গঠনমূলক কার্যও সম্পাদন করিয়া থাকে। আবার ব্যক্তিকে নিরুৎসাহ করা হয় না। এই জাতীয় রাষ্ট্র 'সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্র' (Social Welfare State) নামে অভিহিত। সমাজের সেবার উদ্দেশ্যে ইহার কর্মক্ষেত্র দিন দিন প্রসারিত হইতেছে। ভারতরাষ্ট্র ইহার উদাহরণ। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে

বর্তমানে শুধুমাত্র রক্ষামূলক কাজে কোন রাষ্ট্র আবদ্ধ থাকিতে পারে না।

সমাজ সংগঠনই ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আদর্শ। এই আদর্শের কথাই ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে নির্দেশাত্মক নীতির মাধ্যমে ঘোষিত হইয়াছে।

আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ দুই শ্রেণীর—মৌলিক এবং ইচ্ছামূলক।

আধুনিক রাষ্ট্র দুই শ্রেণীর কাজ করিয়া থাকে। কতকগুলি কাজ আছে তাহা না করিলে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতা বিপন্ন হয়। এই কাজগুলি অপরিহার্য বলিয়া গণ্য হয়। অবার কতকগুলি কাজ আছে যাহা না করিলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকে, কিন্তু জনগণের যথার্থ উন্নতি সাধিত হয় না, এই সমস্ত কাজ ইচ্ছামূলক বলিয়া বিবেচিত হয়।

বাধ্যতামূলক কার্য (Essential or Constituent Functions): রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যাহা না করিলেই নহে, তাহাই বাধ্যতামূলক কাজ। সার্বভৌমিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আবশ্যিকভাবে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে হয় এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বিধান করিতে হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার রাষ্ট্রই এই কাজগুলিকে অবশ্য করণীয় বলিয়া গ্রহণ করে।

সার্বভৌমিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অবশ্য-করণীয় কাজ।

প্রথমোক্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রকে স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনী উপযুক্ত সংখ্যায় মোতায়েন রাখিতে হয়। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপন অধিকার অব্যাহত রাখিবার জন্য রাষ্ট্রকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং আইন ভঙ্গকারীর বিচার করিতে হয়। এই তিনটি কাজ পরিচালিত হয় যথাক্রমে আইনসভা, পুলিশবাহিনী এবং আদালতের মাধ্যমে।

ইচ্ছাধীন কার্য (Non-essential or Optional Functions): এই কাজগুলি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অপরিহার্য না হইলেও, সভ্য এবং উন্নত রাষ্ট্র এইগুলিকে করণীয় বলিয়া বিবেচনা করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ইহা সমর্থন করে না। বর্তমানকালে প্রত্যেক রাষ্ট্রই জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে অল্পবিস্তর এই কাজ করিয়া থাকে। যে রাষ্ট্র যত বেশী পরিমাণে এই শ্রেণীর কাজ করে, সেই রাষ্ট্র তত বেশী পরিমাণে প্রগতিবাদী বলিয়া বিবেচিত হয়।

জনগণের কল্যাণ সাধনের জন্য যাহা করা কর্তব্য।

নিম্নলিখিত কার্যগুলি এই পর্যায়ভুক্ত :—

(১) শিক্ষাবিস্তার, (২) জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান, (৩) সংবাদ আদান প্রদান এবং পরিবহন সংক্রান্ত ব্যবস্থা, (৪) উৎপাদন এবং বিনিময় ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ, (৫) শ্রমিক-

স্বার্থ সংরক্ষণ, (৬) গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জাতীয়করণ, (৭) বেকার, অসুস্থ এবং বৃদ্ধ অবস্থায় নাগরিককে সাহায্যদান, (৮) পরিকল্পনা অনুযায়ী কৃষির উন্নতি, দ্রুত শিল্পায়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং বেকার সমস্যার সমাধান।

গৌণ-কাজগুলির উপরে মুখ্য কাজগুলি বহুলাংশে নির্ভরশীল

এই কাজগুলি ইচ্ছাধীন বলিয়া অভিহিত হইলেও এই কাজগুলির গুরুত্ব কম নহে। অপরিহার্য কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে হইলে কল্যাণমূলক কাজগুলি উপেক্ষা করা চলে না। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিবারণের জন্য সেনাবাহিনীই যথেষ্ট নহে। তাহার জন্য অর্থনৈতিক প্রাচুর্য থাকা বাঞ্ছিত। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রের প্রভূত দায়িত্ব রহিয়াছে।

উপরন্তু যে সমাজে অধিকাংশ লোক বেকার এবং অশিক্ষিত, শুধু পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় শান্তি এবং শৃঙ্খলা বিধান করা যায় না। সুশৃঙ্খল পরিবেশ রচনার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যাপক শিক্ষার আয়োজন এবং বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

॥ সারাংশ ॥

রাষ্ট্রের কর্তব্য কর্ম কি—এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। হেগেল্ প্রমুখ দার্শনিকগণ সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। আধুনিক লেখকগণ রাষ্ট্রের সীমা নির্দেশ করেন।

রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রধান মত দুইটি—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন, রাষ্ট্র যত কম কাজ করে ততই মঙ্গল, রাষ্ট্রের অগ্রগতি ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে। তাঁহাদের মতে রাষ্ট্র দেশরক্ষা এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান ছাড়া অন্য কোন কল্যাণমূলক কাজ করিবে না। এই মতবাদের সমর্থনে নানা যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কঠোরভাবে সমালোচিত হইয়াছে। বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন, এই মতবাদ ভ্রান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ বর্তমানে সমর্থিত না হইলেও ইহার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ এই মতবাদের লক্ষ্য। ব্যক্তিজীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যক্তির উদ্যমকে বিনষ্ট করে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতিবাদ হিসাবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উদ্ভব হয়। অবাধ স্বাধীনতার ফলে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে যে সমস্ত অন্যায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা নির্মূল করিবার জন্য রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রবাদীগণ বলেন, রাষ্ট্র যত বেশী কাজ করে ততই মঙ্গল। শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা কল্পে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিজীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহার কল্যাণময় হস্ত প্রসারিত করিতে হইবে।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের বহু প্রকারভেদ আছে। তাহার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সমাজ-তন্ত্রবাদ, সংঘমূলক সমাজতন্ত্রবাদ, যৌথব্যবস্থামূলক সমাজতন্ত্রবাদ এবং সাম্যবাদ—এই চারিটি প্রধান।

সমাজতান্ত্রিক মতবাদের ত্রুটিগুলি উপেক্ষণীয় নহে। (১) ইহা রাষ্ট্রকে সর্বজ্ঞ এবং সর্বকর্মপারদর্শী বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদ-নির্দিষ্ট বিপুল কর্মভার বহন করা যে কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষেই অসম্ভব, (২) ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী, (৩) ইহা অর্থনৈতিক উন্নতির পরিপন্থী, (৪) সরকারী কার্য যত প্রসারিত হইবে, পরিজন পরিপোষণ, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি অন্যায় তত প্রবল হইবে।

আধুনিক রাষ্ট্র সমাজকল্যাণকর, ইহা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যপন্থা অনুসরণ করে। ইহার কার্য দুই প্রকার—বাধ্যতামূলক এবং ইচ্ছাধীন।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে আবশ্যিকভাবে যাহা করিতে হয় তাহাই বাধ্যতামূলক কাজ, যথা—দেশরক্ষার এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা।

আর যে সমস্ত কাজ জনকল্যাণের জন্য আধুনিক রাষ্ট্র করণীয় বলিয়া জ্ঞান করে তাহা ইচ্ছামূলক বা গৌণ কর্তব্য, যেমন—শিক্ষাবিস্তার, সংবাদ আদান প্রদান এবং পরিবহন সংক্রান্ত ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য বিধান ইত্যাদি।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **What do you mean by Individualism and Socialism ?**
   ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে কি বুঝ ? [পৃষ্ঠা ৭৯, ৮২]
2. **"Not command but service is the prominent characteristic of the State." Discuss in the light of this statement the functions of the State.**
   "আদেশ নহে, সেবাই রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য"—এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬]
3. **Enumerate the essential and non-essential activities of the State.**
   রাষ্ট্রের অপরিহার্য এবং ইচ্ছাধীন কার্যগুলি কি কি ? [পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭]
4. **What do you mean by a "Social Welfare State ?" What are its functions ?**
   "সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র" বলিতে কি বুঝ ? ইহার কাজ কি কি ? [পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬]
5. **What should, in your opinion, be the functions of a modern State ?**
   তোমার মতে আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ কিরূপ হওয়া উচিত ? [পৃষ্ঠা ঐ]

অষ্টম অধ্যায়

জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতা

(Nation, Nationalism and Internationalism)

জাতি (Nation) : পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় 'জাতি' শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন কোন জনসমাজ একাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া অন্যান্য জনসমষ্টি হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে, তখন তাহাকে "জাতীয় জনসমাজ" (Nationality) আখ্যা দেওয়া হয়। জাতীয় জনসমাজ গঠনে পরস্পর বিরোধী দুইটি মনোভাব কাজ করে। এক দিকে জাতীয় জনসমাজের অন্তর্গত জনসমষ্টি নিজেদের মধ্যে গভীর ঐক্য অনুভব করে এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠে, অপর দিকে অন্যান্য মানব গোষ্ঠী হইতে তাহারা তাহাদের স্বতন্ত্র সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়।

ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টিই হইল জাতীয় জনসমাজ।

জাতীয় জনসমাজ যখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে অথবা আত্মশাসনের সুতীব্র কামনার মধ্যে সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাহাকে বলা হয় জাতি (Nation)। রাজনৈতিক চেতনা এবং সংগঠনই জাতীয় জনসমাজকে জাতি রূপ দান করে।

স্বাধীন অথবা স্বাধীনতা-কামী জাতীয় জনসমাজ জাতি নামে খ্যাত।

জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদান (Elements of Nationality) :

জনসমষ্টির মধ্যে সমচেতনা এবং সমভাব সৃষ্টিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি সহায়তা করিয়া থাকে, যথা—(১) নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস, (২) কুলগত ঐক্য, (৩) একই ধর্মে বিশ্বাস, (৪) ভাষাগত অভিন্নতা, (৫) আচার আচরণে সমতা।

জাতিগঠনের সহায়ক বাহ্যিক উপাদান।

একই অঞ্চলে বহুদিন ধরিয়া একত্র বসবাসের ফলে অধিবাসীদের মনে একাত্মবোধ জাগ্রত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ভৌগোলিক সান্নিধ্যের অবর্তমানেও যে জাতীয়তার আবির্ভাব হয়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইহুদী জাতি। বহু শতাব্দী যাবৎ তাহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে ঐক্য বোধের অভাব ঘটে নাই। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর পিতৃভূমি প্যালেষ্টাইনে তাহারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবার মুসলমানগণ একই ভারতভূমিতে হিন্দুদের পাশাপাশি সুদূর অতীত হইতে বাস করিলেও, তাহারা সামগ্রিক ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয় নাই।

(১)
ভৌগোলিক ঐক্য।

যখন কোন জনসমষ্টি মনে করে যে তাহারা একই বংশ হইতে উদ্ভূত, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাহাদের মধ্যে জাতীয় ভাবের সঞ্চার হয়। তাই বলিয়া কুলগত ঐক্য জাতি গঠনের অপরিহার্য উপাদান নহে।

(২) কুলগত ঐক্য।

বর্তমানে কোন জাতিই রক্তের বিশুদ্ধির দাবী করিতে পারে না। জার্মান, ইতালীয় এবং ফরাসী—এই তিন শ্রেণীর লোক লইয়া সুইস জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আবার ইংরাজ এবং জার্মান একই টিউটন বংশ সম্ভূত হওয়া সত্ত্বেও একই জাতিতে পরিণত হয় নাই।

একই ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের ফলে সহজেই একতার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতি গঠনে ভাষার ভূমিকা মূল্যবান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষার বিভিন্নতার ফলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হইবে একথা বলা যায় না।

(৩) ভাষাগত ঐক্য।

ভারতবর্ষ, কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে বহু ভাষা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তার বন্ধন শিথিল হয় নাই। আবার একই ভাষাভাষী হইয়াও পূর্বপাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণ পৃথক জাতি বলিয়া গণ্য হয়।

একই ধর্মে অনুরাগী ব্যক্তিগণ নিজদিগকে একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া জ্ঞান করে। এই স্বাতন্ত্র্যবোধের ফলেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিও ধর্মপ্রধান। কিন্তু পৃথিবীর অপর কোন জাতি শুধুমাত্র ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত হয় নাই।

(৪) ধর্মগত ঐক্য।

আধুনিক কালে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা প্রবল হওয়ার ফলে জাতীয় মানসের উপর ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন ধর্মের সহাবস্থিতি জাতীয় ঐক্যকে বিঘ্নিত করে নাই। আবার পাকিস্তানী এবং আফগান উভয় জনসমষ্টিই ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, তাহাদের মধ্যে বিরোধের সমাপ্তি ঘটে নাই।

বাহ্যিক উপাদানগুলি মূল্যবান কিন্তু অপরিহার্য নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে উল্লিখিত উপাদানগুলির কোনও একটি জাতীয় ঐক্যের জন্য অপরিহার্য নহে। আবার ইহাদের একত্র সমাবেশও কোথাও ঘটে নাই।

জাতীয় চেতনা অন্তরের সামগ্রী, কোন একটি বাহ্যিক উপাদানের উপর এই সমভাব নির্ভর করে না। বিশিষ্ট মানসিক পরিবেশেই ইহার জন্ম। একই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের দ্বারা যদি কোন জনসমষ্টির অতীত জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকে, বিগত ঘটনাবলীর স্মৃতি রোমন্থন করিয়া যদি তাহারা একই রূপ গৌরব বা গ্লানি অনুভব

জাতীয়তার মূল উপাদান ভাবগত বা আধ্যাত্মিক।

করে, যদি বর্তমানে একই জীবনাদর্শে তাহারা অনুপ্রাণিত হয়, তাহা হইলে শত আপাত বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক অখণ্ড জাতীয় মানস জন্মলাভ করিবে। এইরূপ সমচেতনাসম্পন্ন জনসমষ্টিকে বলা হয় জাতীয় জনসমাজ। জাতীয় ঐক্যবোধের সহিত রাজনৈতিক সংগঠনের সংযুক্তির ফলেই জাতির জন্ম হয়।

জাতি ও রাষ্ট্র (Nation and State) :

সাধারণ কথাবার্তায় জাতি ও রাষ্ট্র অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। "সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ" এবং "রাষ্ট্রসংঘ" বলিতে আমরা একই প্রতিষ্ঠানকে বুঝি। কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দুইটি শব্দ ভিন্নার্থক। রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনসমষ্টি একই জাতীয় চেতনা সম্পন্ন হইবে—এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি একই রাষ্ট্রভুক্ত ছিল। কিন্তু তথায় জাতিগত অভিন্নতা ছিল না। আবার এমন অনেক জাতির সন্ধান পাওয়া যায় যাহারা এখনও রাষ্ট্রীয় সত্তা লাভ করে নাই অথবা যাহাদের সার্বভৌমিকতা পরবর্তী কালে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানী এবং জাপান মিত্রশক্তির দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জার্মান এবং জাপানী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই।

জাতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য।

সম্প্রতি এশিয়া এবং আফ্রিকার বহু পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। ঔপনিবেশিকতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জাতি ও রাষ্ট্রের পার্থক্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

আত্মনির্ধারণের অধিকার (Right of Self-determination) :

আত্মশাসন প্রতিটি আত্মসচেতন জনসমষ্টির লক্ষ্য। জাতির নিজস্ব রাজনৈতিক ভাগ্য নিরূপণের অর্থাৎ সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠনের দাবীই 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' (one nation, one state) নামক মতবাদের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মাধ্যমেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতালাভই জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য।

জাতির রাষ্ট্রসত্তা অর্জনের দাবীই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নামে অভিহিত।

উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়ক জন ষ্টুয়ার্ট মিল ঘোষণা করেন যে প্রত্যেক রাষ্ট্র একটি মাত্র জাতীয় জনসমাজের সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত হইবে। অর্থাৎ জাতি এবং রাষ্ট্র হইবে সমব্যাপক। এই মতবাদ অনুসারে বহু-জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রগুলি (Polinational States) কে ভাঙ্গিয়া এক-জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র (Mono-national States) গঠন করিতে হইবে।

মিলের অভিমত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তদানীন্তন আদর্শবাদী মার্কিন রাষ্ট্রপাত উড্রো উইলসন, যে চৌদ্দ দফা শান্তি প্রস্তাব পেশ করেন, তাহার মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। এই উদার নীতি প্রচারের ফলে মিত্র রাষ্ট্রগুলি পরাধীন জাতি সমূহের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করে। যুদ্ধ শেষে যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়, তদনুযায়ী জাতীয়তার ভিত্তিতে ইউরোপে বহু নূতন রাষ্ট্রের পত্তন হয়।

উইলসনের শান্তি প্রস্তাব এবং তদনুযায়ী ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্গঠন।

আত্মনির্ধারণের অধিকারের সপক্ষে যুক্তিঃ (১) সার্বভৌম সংগঠনের মাধ্যমেই জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা বাস্তব রূপ লাভ করে। জাতির ভাষা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভে সমৃদ্ধ হয়। তাহার প্রথা ও রীতি-নীতি আইনের মর্যাদা লাভ করিয়া সুস্পষ্টরূপ গ্রহণ করে। এই ভাবে মৃতকল্প একটি জাতি নব জীবনের সন্ধান পায়।

(২) চিন্তার অভিনবত্ব এবং ধ্যান ধারণার বিভিন্নতাই সভ্যতার লক্ষণ। এই বিভিন্নতা স্বতন্ত্র সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকাশিত এবং পরিপুষ্ট হয়। ভাব সম্পদে সমৃদ্ধ জাতিগুলির অবদানের দ্বারা পৃথিবীর সভ্যতার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়।

(৩) মিলের মতে বহুজাতি-অধ্যুষিত রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। আত্মকলহে ক্লান্ত জনসমষ্টি গণতন্ত্রের একমাত্র সমর্থন—প্রবল জনমত গঠন করিতে পারে না। ইহা সরকারের দুর্বলতার সূচনা করে।

(৪) বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রে সবল বা জনবল জাতি শাসনযন্ত্র দখল করিয়া দুর্বল জাতিগুলির উপর উৎপীড়ন চালায়। ফলে তাহাদের ভাষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বিপন্ন হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই অসন্তুষ্টিই পরে প্রবল আকার ধারণ করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তিকে ক্ষুণ্ণ করে। যুদ্ধক্লান্ত ইউরোপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার মানসে তাই অতৃপ্ত জাতীয় আত্মার তুষ্টি বিধানের আয়োজন করা হয় জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আত্মনির্ধারণের অধিকারের বিপক্ষে যুক্তিঃ এই নীতির অবাধ প্রয়োগ সম্ভব নহে এবং কাম্যও নহে। আত্মনির্ধারণের অধিকার এমন একটি অস্ত্র যাহার দুই দিকেই ধার। ইহা ঐক্যের প্রেরণা যোগায়। আবার বিচ্ছিন্নতারও প্রশ্রয় দেয়।

(১) জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য পৃথক রাষ্ট্র সর্বদা কাম্য নহে। একত্র বসবাসের ফলেই বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সহযোগিতার ভিত্তিতেই ইহার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। বিচ্ছিন্নতা আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচায়ক। আত্মকেন্দ্রিকতা আত্মবিকাশের লক্ষণ নহে।

(২) দুর্বল এবং অনুন্নত জাতিগুলির পক্ষে সবল এবং উন্নত জাতিগুলির সহিত সংযুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। সভ্য জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়াই তাহারা ভাবৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ এবং প্রাণপ্রাচুর্যে সজীব হইয়া উঠিতে পারে।

(৩) লর্ড অ্যাক্টন প্রমুখ চিন্তাবীরগণ বলেন—বহুজাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠ। বহু জাতির মিলনের ফলে এক উন্নত জাতির এবং বৈচিত্র্যময় সভ্যতার আবির্ভাব হয়। একে অপরের ত্রুটি সংশোধন করিয়া, অভাব পূরণ করিয়া সামগ্রিক উন্নতির সূচনা করে। এই সমন্বয়ের অপর একটি শুভ প্রভাব এই যে ইহা ভ্রান্ত জাত্যাভিমানকে সংযত করে।

(৪) এই নীতির প্রয়োগের ফলে বহু প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র বহুধাবিভক্ত হইবে। ফলে অসংখ্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে নিত্য কলহ অবশ্যম্ভাবী। এই নীতি অনুযায়ী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পুনর্বিন্যাস করিতে হইলে বর্তমানের ২৮টি রাষ্ট্রের পরিবর্তে ৬৮টি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইবে। ইহার ফলে যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবে এবং শান্তির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইবে।

(৫) জাতীয় চেতনা রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র উপাদান নহে। স্থায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আত্মরক্ষার সামর্থ্য এবং অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরশীলতা। জাতিগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামর্থ্যের অভাবে জাতীয় গুণাবলীর বিকাশ সাধন করিতে পারিবে না এবং অচিরেই তাহাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা হারাইয়া সাম্রাজ্যবাদী কোন রাষ্ট্রের তাঁবেদারে পরিণত হইবে। প্রথম-মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপে নবগঠিত রাষ্ট্রগুলিই তাহার সাক্ষী।

(৬) কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ সম্পূর্ণ অসম্ভব। একই জাতির অন্তর্গত জনসমষ্টি যদি দুরতিক্রম্য নৈসর্গিক ব্যবধানের দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে একত্রিত করিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

(৭) এই নীতির প্রয়োগের দ্বারা সংখ্যালঘু সমস্যার কোনদিনই সমাধান হইবে না, বিভিন্ন জাতি বর্তমানে এরূপ সংমিশ্রিত ভাবে বাস করে যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা অলস কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই নীতি অনুযায়ী ভারত বিভক্ত হইয়াছে, কিন্তু সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয় নাই।

(৮) জাতীয়তাবাদের এই অশোভন পরিণতি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সংকীর্ণ করে, রাজনীতি নিছক গ্রাম্য দলাদলিতে পর্যবসিত হয়, আত্মকলহ আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকে কলুষিত করে।

এই দাবীর পরিপূর্ণ প্রয়োগ অসম্ভব এবং অবাঞ্ছিত বিবেচিত হইলেও, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ইহাকে মানিয়া লইয়াই রাষ্ট্রনায়কগণ বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিবেন।

ঐতিহ্য সম্পদে সমৃদ্ধ, পরপদানত একটি সুমহান জাতির স্বাধিকার লাভের উদগ্র কামনাকে বলপ্রয়োগের দ্বারা দমন করা কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত নহে।

উপসংহার

বহু জাতির সমন্বয়ে সংগঠিত রাষ্ট্রে আত্মনির্ধারণ নীতির অকুণ্ঠপ্রয়োগ বাঞ্ছিত না হইলেও প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের মৌলিক দাবীগুলি পূরণ করা উচিত। সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি সমূহের ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আচার ব্যবহার রক্ষার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। দেশ-শাসনের ব্যাপারে সকল শ্রেণীর মানুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে সম্ভাব্য স্থলে যুক্তরা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া আঞ্চলিক সরকারের মাধ্যমে জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষার ব্যবস্থা করাই বিধেয়।

জাতীয়তার অধিকার (Rights of Nationalities)

জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ (Nationalism and Internationalism): সবল রাষ্ট্রব্যবস্থার সহিত প্রবল জাতীয় চেতনার সংযুক্তির ফলেই আধুনিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছে। পরাধীন থাকাকালীন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাই জাতির একমাত্র কামনা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতীয়তাবাদ দেশপ্রেমে পরিণতি লাভ করে।

জাতীয়তাবাদের স্বরূপ

কালক্রমে এই দেশপ্রেম আত্মশ্লাঘায় পরিণত হয়। জাতির অন্তর্গত জনগণ তখন এক ভ্রান্ত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণায় উন্মত্ত হইয়া অপর সব জাতিকে ঘৃণা করিতে সুরু করে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ তাহার স্বাভাবিক ঔদার্য হারাইয়া বিকৃত রূপ ধারণ করে। এই গর্বোদ্ধত এবং বিকারগ্রস্ত জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর। ইহা আত্মবিকাশের উপায় নহে, আত্মহত্যার পথ। হিট্‌লারের অধীনে জার্মানী এবং মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইটালী এইরূপ অনুদার জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হইয়া ধ্বংসের আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। এই বিকৃত জাতীয়তাবাদ ব্যক্তিত্বের বিনাশ সাধন করে এবং সমষ্টিগত স্বার্থপরতাকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে প্রচার করিয়া ব্যক্তিমানসে বিদ্বেষবোধকে প্রবল করিয়া তুলে।

জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ

কিন্তু বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ কখনই বিশ্বমানবতা-বিরোধী নহে। সত্যকার দেশপ্রেমিক বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারে না, সে অন্য জাতিকে পদানত রাখিবার কল্পনা করিতে পারে না। যে মন একান্তভাবে শ্রদ্ধাপ্রবণ, ঘৃণা তাহাতে স্থান পায় না। স্বাদেশিকতা আসলে বিশ্বমানবতারই পূজা। জাতির আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজন জাতিতে জাতিতে সহ-অবস্থান, সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা।

জাতীয়তাবাদ এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ পরস্পর বিরোধী নহে।

সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের দিন গত হইয়াছে। কোন জাতিই আজিকার দিনে রক্তের বিশুদ্ধির বড়াই করিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে দূরত্ব আজ অতিক্রান্ত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমগ্র পৃথিবী একমাত্র অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। সহাবস্থিতি তাই আজ শুধু আদর্শ নহে, বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র পথ। দেশপ্রেম এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব এই দুয়ের সমন্বয়ের মধ্যে সত্যকার মুক্তির সন্ধান মিলিবে।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রুত প্রসার।

জাতিসংঘ (League of Nations): প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের চিন্তাধারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাবে বিশ্বশান্তির সম্ভাবনা যে সুদূরপরাহত, এই সত্য রাষ্ট্রনায়কগণ নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলেন। ভার্সাই সন্ধিচুক্তি অনুসারে ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন জাতিসংঘের জন্ম হয়। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুইটি: (১) বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং (২) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য।

পরিষদ্ (Assembly), কার্যনির্বাহক সমিতি (Council) এবং দপ্তরখানা (Secretariat) এই তিন বিভাগের মাধ্যমে জাতিসংঘের কার্য নির্বাহ হইত। ইহা ছাড়াও হেগ সহরে আন্তর্জাতিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল।

জাতিসংঘের সংগঠন।

শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মানব কল্যাণসাধনে জাতিসংঘের প্রয়াস প্রশংসনীয়। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে পারিলেও জাতিসংঘ যুদ্ধ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হইলে জাতিসংঘ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

জাতিসংঘের বিলোপ।

সদস্য রাষ্ট্রগুলির স্বার্থপরতা এবং সাংগঠনিক ত্রুটির ফলে জাতিসংঘ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। জাতিসংঘের সনদ (League Covenant) ভার্সাই সন্ধিচুক্তির অঙ্গীভূত হওয়ায় বিজিত রাষ্ট্রগুলি বরাবরই ইহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে। এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতি ইহার দুর্ভাগ্যের সূচনা করিয়াছিল। ইটালী, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশে একনায়কতন্ত্রের আবির্ভাবে জাতিসংঘের সম্ভাবনাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। জাতিসংঘের আদর্শ রূপায়ণের জন্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতার

বিলোপের কারণ।

একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহারা পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনে অস্বীকৃত হওয়ায় জাতিসংঘের দৈন্য প্রকট হইয়া উঠে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রসংঘ (The United Nations Organisation): দ্বিতীয় মহাসমরের ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রসংঘের উদ্ভব হয়। অতলান্তিক সনদ (Atlantic Charter) এবং মস্কো আর তেহেরাণ ঘোষণার (Moscow and Teheran Declarations) মূলনীতিগুলিকে বাস্তব রূপ দিবার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনের ডাম্বারটন ওকস্ নামক স্থানে ১৯৪৪ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখে একটি সম্মেলন আহূত হয়। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া এবং জাতীয়তাবাদী চীনের প্রতিনিধিবর্গ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর জাতিসংঘের (League of Nations) পরিবর্তে সম্মিলিত জাতি-পুঞ্জ (U. N. O.) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো নগরীতে এক সম্মেলনে মিলিত হন। ২৬শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শাসনতন্ত্র বা সনদ (U. N. Charter) সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এবং স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর ২৪ অক্টোবর তারিখে নূতন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে জন্মলাভ করে। এই দিনটি রাষ্ট্র-সংঘের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত এবং উদ্‌যাপিত হয়। কেহ কেহ রাষ্ট্রসংঘকে প্রাক্তন জাতিসংঘের নবতর সংস্করণ বলিয়া জ্ঞান করেন এবং ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হন।

রাষ্ট্রসংঘের আবির্ভাব।

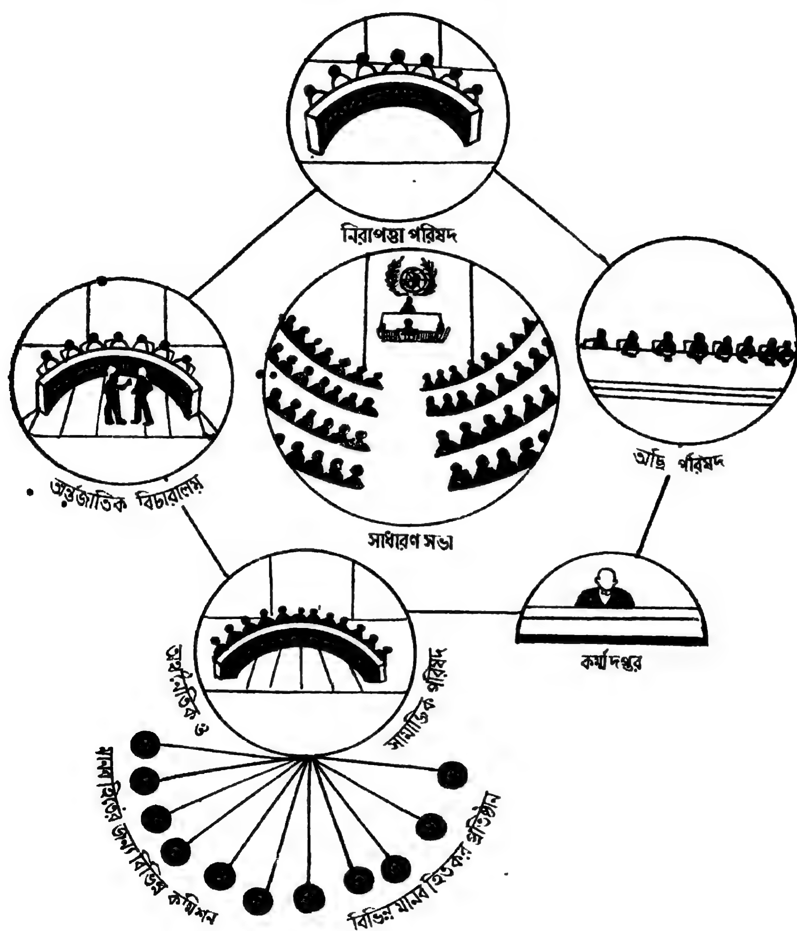
রাষ্ট্রসংঘ সনদের প্রস্তাবনায় ইহার উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে। সনদের ১নং ধারায় ইহার কার্যাবলীর পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বিধান করা, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা এবং আঞ্চলিক সংহতি অক্ষুন্ন রাখা, পরাধীন জাতিগুলির স্বায়ত্ব শাসনের দাবী এবং মানবতার মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্যার সমাধানকল্পে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাব গঠন করাই হইল এই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

রাষ্ট্রসংঘের লক্ষ্য এবং কার্যাবলী।

রাষ্ট্রসংঘের প্রধান বিভাগ ছয়টি: (১) সাধারণ সভা, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) দপ্তরখানা, (৪) অভিভাবক পরিষদ, (৫) অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা এবং (৬) আন্তর্জাতিক বিচারালয়।

রাষ্ট্রসংঘের সংগঠন।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ


নিরাপত্তা পরিষদ
আন্তর্জাতিক বিচারালয়
সাধারণ সভা
অছি পরিষদ
কর্মদপ্তর
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ
মানবহিতের জন্য বিভিন্ন কমিশন
বিভিন্ন মানবহিতকর প্রতিষ্ঠান

.(১) **সাধারণ পরিষদ বা সভা** (General Assembly): রাষ্ট্রসংঘের প্রতিটি সদস্যের প্রতিনিধি লইয়া এই সভা গঠিত। রাষ্ট্রসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৯৯। চীন সাধারণতন্ত্রের অবর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের সার্বজনীনতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোন ব্যাপার লইয়া এই সভা আলোচনা করিতে পারে এবং সেই মর্মে নিরাপত্তা পরিষদ এবং সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে সুপারিশ করিতে পারে। ইহা বিশ্বশান্তি-বিঘ্নকারী ঘটনাবলীর প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। সম্প্রতি ইহার গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিভাগগুলির বিস্তৃত আলোচনা।

(২) **নিরাপত্তা পরিষদ** (Security Council): ইহাই রাষ্ট্রসংঘের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইহা এগারজন সদস্য লইয়া গঠিত, তন্মধ্যে জাতীয়তাবাদী চীন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থায়ী সদস্য। বাকী ছয়জন সভ্য সাধারণ সভার ভোটে দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য 'ভেটো' (Veto) প্রয়োগের অধিকারী অর্থাৎ ইহাদের কোন একজনের অসম্মতিতে নিরাপত্তা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে না।

আন্তর্জাতিক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা ইহার প্রাথমিক কর্তব্য। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব এই পরিষদের হস্তে ন্যস্ত। আক্রমণকারীর সহিত সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য ইহা সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। প্রয়োজনবোধে সামরিক শক্তি প্রয়োগের অধিকারও ইহার আছে। বিশ্বশান্তির অভিভাবক হিসাবে এই পরিষদকে কেহ কেহ স্বস্তি-পরিষদ (Peace Council) আখ্যা দিতে ইচ্ছুক।

(৩) **দপ্তরখানা** (The Secretariat): কার্যপরিচালনার সুবিধার জন্য একটি দপ্তরখানা স্থাপিত হইয়াছে। সাধারণ সম্পাদক (Secretary-General) হইলেন রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কর্মকর্তা, নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ক্রমে সাধারণ সভার দ্বারা তিনি নির্বাচিত হন। অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক নিযুক্ত হন। গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করা তাঁহার অন্যতম কর্তব্য।

(৪) **অছিপরিষদ** বা **অভিভাবক পরিষদ** (Trusteeship Council): কতকগুলি অনুন্নত দেশ রাষ্ট্রসংঘের অভিভাবকত্বে শাসিত হয়। ইহাদিগকে স্বায়ত্ত শাসনের উপযোগী করিয়া তোলাই রাষ্ট্রসংঘের লক্ষ্য। তত্ত্বাবধান কার্যে রত রাষ্ট্রগুলি, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যগণ এবং সাধারণ সভা কর্তৃক মনোনীত কিছু সংখ্যক সভ্য লইয়া এই পরিষদ গঠিত।

(৫) **অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা** (Economic and Social Council): আন্তর্জাতিক শান্তি অব্যাহত রাখার জন্য অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান অপরিহার্য। রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এই সব সমস্যার নিরসন কল্পে অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ইহার সভ্যসংখ্যা আঠার জন। সভ্যগণ সাধারণ সভা কর্তৃক তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য কতকগুলি সহকারী কল্যাণবিধায়ক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (ILO), খাদ্য এবং কৃষি সংগঠন (FAO), জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতিগত প্রতিষ্ঠান (UNESCO), আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF), পুনর্গঠন এবং উন্নয়নমূলক বিশ্ব ব্যাঙ্ক (IBRD), বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), বিশ্ববাণিজ্য প্রতিষ্ঠান (ITO) উল্লেখযোগ্য।

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা কর্তৃক মানবতার মৌলিক অধিকার নির্ধারণ কল্পে নিযুক্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সাধারণ সভা মানবতার মৌলিক অধিকার একটি ঘোষণা দ্বারা স্বীকার করে।

(৬) **আন্তর্জাতিক আদালত** (International Court of Justice): নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভা কর্তৃক মনোনীত ১৫ জন বিচারপতি লইয়া আন্তর্জাতিক বিচারালয় গঠিত। বিচারপতিগণ নয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রসংঘ সনদ সংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়ের উপর ইহার বিচারের অধিকার আছে। যে কোন সদস্য রাষ্ট্র এখানে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে এবং ইহার রায় সকলের উপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত হইবে।

মূল্যায়ন: দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসরের ঘটনাবহুল জীবনে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থতা এবং সফলতা দুয়েরই আস্বাদ পাইয়াছে। হাঙ্গেরী এবং তিব্বতে মৌলিক মানবীয় অধিকার রক্ষায়, কাশ্মীর এবং কঙ্গো সমস্যার সমাধানে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যের প্রতিকারে, পরাধীন জাতিসমূহের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, ঔপনিবেশিকতার সামগ্রিক উচ্ছেদ সাধনে, বিভক্ত জার্মানীর সংহতি বিধানে এবং নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘ সফলকাম হইতে পারে নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র বিশ্বশান্তির এই দুই প্রধান অভিভাবকের মধ্যে বিরোধ আন্তর্জাতিক আবহাওয়াকে আবিল করিয়া তুলিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations) বাস্তবিকই বিভক্ত জাতিপুঞ্জে (Disunited Nations) পর্যবসিত হইয়াছে। এমত পরিবেশে রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

কিন্তু কঠোর সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসংঘের কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা প্রাপ্তির ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্যালেষ্টাইনে আরব এবং ইহুদীদের মধ্যে দীর্ঘদিন ব্যাপী সংগ্রামের পরিসমাপ্তি ঘটে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায়। কোরিয়ার যুদ্ধ যে বিশ্বযুদ্ধে পর্যবসিত হয় নাই, তাহার মূলেও ছিল রাষ্ট্রসংঘের সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ। ইন্দোচায়নার সমস্যা সমাধানে, মিশরে ইঙ্গফরাসী জঙ্গীবাদের প্রতিকারে রাষ্ট্রসংঘ প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়াছে। ঠাণ্ডা লড়াই যে শত উত্তেজনা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ রাষ্ট্রসংঘের অবস্থিতি। আলাপ আলোচনার অবকাশ দিয়া বিরুদ্ধ পক্ষীয় রাষ্ট্র নায়কগণের একত্র সমাবেশ ঘটাইয়া রাষ্ট্রসংঘ পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষের তীব্রতা হ্রাসে সাহায্য করিয়াছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের কৃতিত্ব চমকপ্রদ না হইলেও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের দান অপরিসীম। বাস্তুহারাগণের পুনর্বাসনে, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলির পুনর্গঠনে এবং অনুন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রসংঘের অবদান অনস্বীকার্য। রাষ্ট্রসংঘ বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অবশ্যম্ভাবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করিয়াই রাষ্ট্রসংঘ ইহার সদুত্তর দিতে পারে।

আন্তর্জাতিক সেনাদল গঠন করিয়া স্থায়ী বিশ্বশান্তি বিধান করা সম্ভব নহে। ইহার জন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের মনে বিশ্বমানবতা বোধ জাগরিত করা। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপ হইতে পৃথিবীকে মুক্তি দান করিতে পারে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সার্থকতার উপরেই বর্তমান সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইহার বিলুপ্তির অর্থ মানব সভ্যতার অপমৃত্যু, মানুষের সব কিছু সৃষ্টির সমূহ বিনাশ।

॥ সারাংশ ॥

জাতীয় জনসমাজ ও জাতি ঃ সমচেতনাসম্পন্ন জনসমষ্টিকে জাতীয় জনসমাজ নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপ ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি যখন রাষ্ট্রসত্তা অর্জন করে অথবা অর্জন করিবার উদগ্র কামনায় সংগঠিত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় জাতি।

জাতি গঠনের সহায়ক বাহ্যিক উপাদানগুলি হইল—রক্তের সম্পর্ক, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, ভাষার অভিন্নতা এবং ধর্মগত ঐক্য। জাতীয় চেতনার উন্মেষ সাধনে এই উপাদানগুলির ভূমিকা মূল্যবান সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের কোনও একটি অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। আসলে জাতীয়তাবোধ একটি বিশেষ মানসিক

প্রবৃত্তি। জাতীয় চেতনা সম্পন্ন জনসমষ্টি রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন এবং সংগঠিত হইয়া জাতিতে পরিণত হয়।

আত্মনির্ধারণ নীতি ঃ আত্মসচেতন প্রতিটি জাতির স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠাই এই মতবাদের লক্ষ্য। প্রত্যেক জাতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করিবে এবং একই রাষ্ট্র সীমার মধ্যে একাধিক জাতি বাস করিবে না,—এই মতবাদের আবেদন অবশ্যই মর্মস্পর্শী। কিন্তু ইহার অবাধ প্রয়োগ অবাঞ্ছিত এবং অবাস্তব। তবে উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই নীতিকে মান্য করিয়াই রাষ্ট্রনায়কগণ সভ্যতার সঙ্কট দূরীভূত করিতে সক্ষম হইবেন।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা ঃ পরাধীন অবস্থায় জাতীয় চেতনা আত্মনির্ধারণ দাবীর মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীনতা লাভের পর ইহা দেশপ্রেমে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু কালক্রমে স্বাদেশিকতা তাহার স্বাভাবিক উদারতা হারাইয়া উগ্র এবং অসহিষ্ণু রূপ ধারণ করে। এইরূপ বিকারগ্রস্ত জাতীয়তাবাদ মানব সভ্যতার পক্ষে আশীর্বাদ নহে, অভিশাপ। কিন্তু সত্যকার জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতা-বিরোধী নহে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ফলে বিশ্বমানবতাবোধ দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

জাতিসংঘ ঃ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম সার্থক রূপায়ন হইল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘ। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপনই ছিল জাতিসংঘের লক্ষ্য। কিন্তু জাতিসংঘ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। সদস্য রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার অভাবে জাতিসংঘ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

রাষ্ট্রসংঘ ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম শুভফল হইল সম্মিসিত জাতিপুঞ্জের আবির্ভাব। যুদ্ধ নিবারণ, প্রত্যেক রাষ্ট্রের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা, পরাধীন জাতি-সমূহকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দান, মানবতার মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সমর সজ্জার হ্রাস, সহযোগিতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধান প্রভৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়।

রাষ্ট্রসংঘ একটি বিরাট সংগঠন। ইহার প্রধান অঙ্গ ছয়টি ঃ সাধারণসভা, নিরাপত্তাপরিষদ, দপ্তরখানা, অভিভাবক পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা। এই ছয়টি বিভাগ ছাড়া আরও বহু ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রসংঘের আদর্শ রূপায়নে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

পনের বছর আগে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিশ্বপরিস্থিতির প্রভূত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে বিরাট সম্ভাবনা লইয়া এই অভাবনীয়

প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। যুদ্ধকালীন মিত্রশক্তিগুলির মধ্যে যে সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ তিক্ত বিদ্বেষে পর্যবসিত হইয়াছে। বিশ্বশান্তির অভিভাবক বৃহৎ রাষ্ট্রগোষ্ঠী আজ বিপুল এবং ভয়াবহ সমর সজ্জায় সজ্জিত। এমত পরিবেশে রাষ্ট্রসংঘের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। সভ্যতার অপমৃত্যু রোধ করিতে হইলে রাষ্ট্রসংঘকে উজ্জীবিত করিতেই হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন বিশ্বমানবতাবোধে দীক্ষা। জাগ্রত বিশ্বজনমতই রাষ্ট্রনায়কগণের দুরভিসন্ধি প্রতিহত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির সূচনা করিবে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. What do you understand by 'Nation' and 'Nationality'? Illustrate your answer.
   'জাতি' ও 'জাতীয় জনসমাজ' বলিতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ৮৯-৯০]
2. What are the elements of Nationality? What are the essential factors that go to create the consciousness of a common nationality?
   জাতীয়তার উপাদান কি কি? জাতীয়তাবোধের উন্মেষ সাধনে কি কি উপাদান অত্যাবশ্যকীয়? [পৃষ্ঠা ৮৯-৯০]
3. Distinguish between State and Nation. Give illustration.
   উদাহরণ সহযোগে রাষ্ট্র এবং জাতির মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [পৃষ্ঠা ৯১]
4. Is Nationality a satisfactory basis of modern State?

   Or

   Explain the principle—"One nation, one state".
   বর্তমান যুগে জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন কি বাঞ্ছনীয়?

   অথবা

   "এক জাতি, এক রাষ্ট্র"—এই মতবাদটি ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ৯১-৯২]
5. What do you mean by the 'Right of Self-determination'? Is there any limit to this right? Give reasons for your answer.
   'আত্মনির্ধারণের অধিকার' বলিতে কি বুঝ? এই অধিকার কি অবাধ? যুক্তিসহ তোমার অভিমত ব্যক্ত কর। [পৃষ্ঠা ৯১ ও (বিপক্ষ যুক্তি) পৃষ্ঠা ৯২-৯৪]
6. Describe the composition and functions of the U. N. O.
   রাষ্ট্রসংঘের সংগঠন এবং কার্যাবলী বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ৯৬-৯৯]
7. What are the principal organs of the U. N. O.? Indicate the importance of the Security Council.
   রাষ্ট্রসংঘের প্রধান বিভাগ কি কি? নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্ব নির্ধারণ কর। [পৃষ্ঠা ৯৬-৯৯]
8. Give an account of the achievements and failures of the United Nations.
   রাষ্ট্রসংঘের কৃতিত্ব এবং ব্যর্থতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [পৃষ্ঠা ৯৯-১০০]

দশম শ্রেণীর পাঠ্য

নবম অধ্যায়

নাগরিকতা

(Citizenship)

নাগরিক (Citizen) **:** সাধারণ কথাবার্তায় নাগরিক বলিতে বুঝায় নগরের অধিবাসী। প্রাচীন গ্রীসে নগর এবং রাষ্ট্র ছিল অভিন্ন। এই নগররাষ্ট্রের যে সব অধিবাসী শাসন পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে বলা হইত নাগরিক। ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত থাকায় নাগরিকতা সম্বন্ধে এরূপ ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। গ্রীক সমাজে অসংখ্য ক্রীতদাস দৈহিক শ্রমসাধ্য সর্ববিধ কার্য সম্পাদন করিত বলিয়া মুষ্টিমেয় লোক রাষ্ট্রীয় কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিত। নাগরিকতা তাই ছিল আভিজাত্যের প্রতীক।

নাগরিকতা সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা।

গণতান্ত্রিক ধারণা প্রসারের ফলে নাগরিক শব্দটির অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। গ্রীক সভ্যতার ক্রীতদাস প্রথা অথবা সামন্ত যুগের ভূমিদাস প্রথা লোপ পাইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের প্রতিটি সদস্য বা স্থায়ী বাসিন্দা নাগরিক বলিয়া পরিচিত।

আধুনিক অর্থে নাগরিকতার লক্ষণ।

আধুনিক রাষ্ট্র বৃহদায়তন এবং জনবহুল। এইজন্য সমস্ত নাগরিকের পক্ষে শাসন ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করা সম্ভব নহে। তাই শাসনকার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ বর্তমানে নাগরিকতার ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যই আধুনিক নাগরিকতা বিচারের কষ্টিপাথর। এই আনুগত্যের বিনিময়ে নাগরিক কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, যাহা বিদেশীর প্রাপ্য নহে। এই বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলিকে "রাজনৈতিক অধিকার" (Political Rights) বলা হয়। রাজনৈতিক অধিকার বলিতে নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার বুঝায়। আইনগত অর্থে 'নাগরিকতা' রাজনৈতিক অধিকারের সামিল।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ।

কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অধিকার অপেক্ষা কর্তব্যের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। কর্তব্য পালনের যোগ্যতার উপরেই অধিকার ভোগের যাথার্থ্য নির্ভর করে। প্রত্যেক নাগরিক নিজ শুভবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সমাজ-কল্যাণে তৎপর হইবে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে—"নাগরিকতা হইল সমষ্টিগত জীবনের উন্নতিকল্পে আপন জ্ঞান-প্রসূত

ল্যাস্কি প্রদত্ত নাগরিকতার সংজ্ঞা

বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ।" সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য নাগরিককে অতি অবশ্যই বিবেকী এবং শিক্ষিত হইতে হইবে। অতএব নাগরিক হইল রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত এবং সমাজ-জীবনের সমৃদ্ধি সাধনে তৎপর ব্যক্তি।

'প্রজা' শব্দটির অর্থ।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সদস্যমাত্রেই নাগরিক আখ্যা পায়, যদিও সকলে পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না। অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তি ভোটাধিকার বা নির্বাচিত হইবার অধিকার পায় না। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই শ্রেণীর দেশবাসীগণকে 'প্রজা' (Subject) নামে অভিহিত করেন।

নাগরিক এবং বিদেশী (Citizen and Alien): নাগরিক কথাটির অর্থ স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে হইলে নাগরিকের সহিত বিদেশীর পার্থক্য নিরূপণ করা প্রয়োজন।

(১)
রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকের বন্ধন স্থায়ী, বিদেশীর সম্পর্ক সাময়িক।

নাগরিক রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, বিদেশী অস্থায়ী আবাসিক মাত্র। রাষ্ট্রের সহিত নাগরিক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। বিদেশী বিশেষ কোন কর্ম উপলক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাস করে মাত্র। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে রাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে।

(২)
রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য দ্বিধাহীন এবং পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু বিদেশীর আনুগত্য অস্থায়ী এবং অপূর্ণ।

রাষ্ট্রের প্রতি স্থায়ী এবং পূর্ণ আনুগত্যই নাগরিকতার পরিচায়ক। বিদেশীর অকুণ্ঠ আনুগত্য তাহার নিজ রাষ্ট্রের প্রাপ্য, যদিও সে পর রাষ্ট্রে অবস্থান-কালে তাহার প্রতি সাময়িক আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই সাময়িক আনুগত্যের অর্থ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ না করা, নিয়মিত কর দেওয়া এবং আইন কানুন মানিয়া চলা। কিন্তু রাষ্ট্ররক্ষার জন্য নাগরিকের মত তাহাকে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যবাহিনীভুক্ত করা যায় না, যদিও অবাঞ্ছিত বিদেশীকে রাষ্ট্র বহিষ্কৃত করিতে পারে।

(৩)
সামাজিক অধিকার উভয়েই ভোগ করে।

আধুনিক সভ্য রাষ্ট্রে বিদেশীগণ নাগরিকদের প্রাপ্য সমস্ত সামাজিক অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। তবে শত্রুপক্ষীয় বিদেশী (Enemy alien) গণের সামাজিক অধিকার সব দেশেই সঙ্কুচিত করা হয়।

(৪)
রাজনৈতিক অধিকারই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে।

নাগরিক রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের অধিকারী। ভোটদানের এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার তাহার আছে। কিন্তু বিদেশীকে এই অধিকার দেওয়া যায় না। বিদেশী তাহার নিজ রাষ্ট্রে অনুরূপ অধিকার ভোগ করে।

বিদেশী যে দেশে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে, সে দেশ হইতে প্রস্থান করিলে তাহার প্রতি রাষ্ট্রের আর কোন রকম দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু নাগরিক রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন, সে সর্বত্র নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য দাবী করিতে পারে। সব সময়েই তাহার জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের পবিত্র দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহন করিতে হয়।

(৫) **নাগরিক এবং বিদেশীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব একই রূপ নহে।**

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি (Method of Acquisition of Citizenship):

নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি প্রধানতঃ দুইটি: জন্মগত অধিকার এবং অনুমোদন। জন্মের দ্বারা ব্যক্তি যখন নাগরিকতা লাভ করে তখন তাহাকে স্বাভাবিক নাগরিক (Natural born citizen) এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে ব্যক্তি যখন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে গৃহীত নাগরিক (Naturalised citizen) বলা হয়।

নাগরিক দুই শ্রেণীর: স্বাভাবিক নাগরিক এবং গৃহীত নাগরিক।

স্বাভাবিক নাগরিকতা বা জন্মসূত্রে নাগরিকতা লাভের (Acquisition of Citizenship by birth) **মূলনীতি দুইটি:** (১) রক্তের সম্পর্ক নীতি (Jus Sanguinis) এবং জন্মস্থান নীতি (Jus Soli or Jus Loci)।

প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী শিশু যে কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে তাহার পিতামাতার দেশের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। ভারতীয় পিতামাতার সন্তান বিদেশী রাষ্ট্রে ভূমিষ্ঠ হইলেও সে ভারতীয় নাগরিকতার অধিকারী হইবে। নাগরিকতা অর্জনের এই পদ্ধতি স্বাভাবিক এবং চিরাচরিত বলিয়া সর্বত্র অনুসৃত হয়। কিন্তু ইহার ত্রুটি এই যে সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারণ করিতে গিয়া পিতামাতার নাগরিকতা নির্ণয়ের সমস্যা দেখা দেয়।

(১) **রক্তের সম্পর্ক নীতি।**

দ্বিতীয় নিয়ম অনুসারে শিশু যে রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে তাহার পিতামাতার নাগরিকতা বিচার না করিয়া জন্মভূমি বিচার করিয়াই নাগরিকতা স্থির করা হয়। মার্কিন পিতা-মাতার সন্তান যদি ভারত ভূখণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে এই নীতি অনুযায়ী তাহাকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হইবে। সমুদ্র বক্ষে ভাসমান জাহাজে কোন শিশুর জন্ম হইলে সেই জাহাজের পতাকাই তাহার নাগরিকতার ইঙ্গিত দান

(২) **জন্মস্থান নীতি।**

করিবে। অর্থাৎ জাহাজটি যে রাষ্ট্রের পতাকা সম্বলিত, নবজাতককে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। এই নীতি কিন্তু বৈদেশিক দূতাবাসের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না। ইহার প্রধান আকর্ষণ হইল ইহার সারল্য। কিন্তু ইহা প্রয়োগ করিলে অনেক সময় বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। ধরা যাউক্ বিদেশ ভ্রমণরত কোন পাকিস্থানী দম্পতীর পাঁচটি সন্তান পাঁচটি রাষ্ট্রে জন্মলাভ করিল। জন্মস্থাননীতি অনুসারে একই পিতামাতার সন্তান হইয়াও তাহারা ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

নাগরিকতা সংক্রান্ত নিয়ম সর্বত্র একরূপ নহে। আবার ভারত, ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একই সঙ্গে উভয় নীতি প্রয়োগ করিয়া থাকে। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুসৃত নাগরিকতাবিধির পার্থক্য হেতু অনেক সময় বিরোধের উদ্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একজন ভারতীয়ের সন্তান জাপানে জন্মিলে, রক্তের সম্পর্ক অনুযায়ী সে হইবে ভারতীয় নাগরিক, আবার জন্মস্থান নীতি অনুসারে জাপানী নাগরিকতা তাহার প্রাপ্য। এক্ষেত্রে উভয় দেশই তাহাকে নাগরিক বলিয়া দাবী করিবে। অবশ্য সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলে, সে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন একটি দেশের নাগরিকতা স্বীকার করিবে।

উভয় নীতির প্রয়োগ।

(খ) **গৃহীত বা অনুমোদিত নাগরিক হইবার পদ্ধতি (Acquisition of Citizenship by naturalisation) :**

সকল রাষ্ট্রেই বিদেশীকে নাগরিকতা দানের রীতি প্রচলিত আছে। এক দেশের জন্ম সূত্রে নাগরিক যখন তাহার স্বাভাবিক নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়া পর রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে, তখন তাহাকে গৃহীত বা অনুমোদিত নাগরিক বলা হয়।

গৃহীত নাগরিক কথাটির অর্থ।

বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয়, সরকারী চাকুরী গ্রহণ, সামরিক বাহিনীতে যোগদান, দীর্ঘদীন ধরিয়া সৎভাবে বসবাস, ইত্যাদি যে কোন একটি উপায়ে বিদেশী যখন ভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করে, তখন "অনুমোদন" (Naturalisation) কথাটি ব্যবহার করা হয় ব্যাপক অর্থে।

ব্যাপক অর্থে "অনুমোদন"।

সংকীর্ণ বা বিশিষ্ট অর্থে অনুমোদন বলিতে আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে নাগরিকতা অর্পণকে বুঝায়। অর্থাৎ বিদেশী যে রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভে ইচ্ছুক, তাহাকে সেই রাষ্ট্রের শাসন অথবা বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে হয়। তাহাকে অবশ্যই রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট শর্ত পালন করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া

সঙ্কীর্ণ অর্থে অনুমোদন।

তাহাকে নাগরিকতা অর্পণ করিতে পারে অথবা অসম্মতিও জ্ঞাপন করিতে পারে। সাধারণতঃ অনুমোদন-প্রার্থীকে নির্দিষ্ট সময় রাষ্ট্রমধ্যে বসবাস করিতে হয়, স্থায়ী ভাবে বসবাসের প্রতিশ্রুতি দিতে হয় এবং সচ্চরিত্র বলিয়া প্রমাণিত করিতে হয়; কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী রাষ্ট্রের প্রচলিত ভাষা সম্বন্ধে তাহার সন্তোষজনক জ্ঞান থাকার প্রয়োজন হয়।

অনুমোদন-সিদ্ধ নাগরিকতার দুইটি রূপ—পূর্ণাঙ্গ এবং অসম্পূর্ণ।

যখন অনুমোদিত নাগরিক স্বাভাবিক নাগরিকের সম মর্যাদা পায়, তখন নাগরিকতা অর্জন পূর্ণাঙ্গ (Grand) হইয়াছে বলা হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে এই দুই শ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে কোন রকম তারতম্য করা হয় না। তাহারা উভয়ে সম অধিকার ভোগী, কিন্তু যখন গৃহীত নাগরিক জাত নাগরিকের প্রাপ্য সর্ববিধ অধিকার পায় না তখন এইরূপ নাগরিকতা অর্জনকে অসম্পূর্ণ (Partial) বলিয়া জ্ঞান করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন অনুমোদনসিদ্ধ নাগরিক রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারে না।

সমষ্টিগত অনুমোদন

অনুমোদনের উপরি-উক্ত পদ্ধতিকে ব্যক্তিগত অনুমোদন বলা হয়। অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে কোন একজন আবেদনকারীকে বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার দান করা হয়। অনুমোদনের আর একটি রূপ হইলে সমষ্টিগত অনুমোদন (Group naturalisation)। নূতন ভূভাগ কোন রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত হইলে সেই অঞ্চলের অধিবাসীগণ উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকতা প্রাপ্ত হয়।

নাগরিকতার বিলোপ (Loss of Citizenship):

বিভিন্ন কারণে নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটে।

(১) অনুমোদনের ফলে

অনুমোদিত নাগরিক তাহার স্বাভাবিক নাগরিকতা হারায়। ভারতীয় নাগরিক যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করে, তাহা হইলে তাহার ভারতীয় নাগরিক অধিকারের অবসান ঘটে।

(২) ঘোষণার দ্বারা

জন্মস্থান নীতি এবং রক্তের সম্পর্ক নীতির পার্থক্য হেতু অনেক সময় বিরোধের উদ্ভব হয় এবং একই ব্যক্তিকে উভয় রাষ্ট্রই আপন নাগরিক বলিয়া দাবী করে। এরূপ ক্ষেত্রে নাগরিক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঘোষণার দ্বারা এক দেশের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়া অপরটির নাগরিকতা বজায় রাখিতে পারে।

সৈন্যদল হইতে পলায়ন, পররাষ্ট্র প্রদত্ত উপাধি বা সম্মান গ্রহণ, রাষ্ট্রদ্রোহিতা-মূলক কার্যে যোগদান প্রভৃতি কারণে নাগরিককে রাষ্ট্র হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়।

(৩)
গুরুতর অপরাধের কারণে

(৪)
দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি ও অন্যান্য কারণে

কোন নাগরিক যদি দীর্ঘকাল যাবৎ স্বরাষ্ট্রে অনুপস্থিত থাকে, বা অপর দেশে জমি ক্রয় করে, বা বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে নিজ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়।

(৫)
বিবাহের ফলে

কোন মহিলা একজন বিদেশীকে বিবাহ করিলে তাহার জন্মসূত্রে নাগরিকতা লোপ পায় এবং সে স্বামীর দেশের নাগরিকতা অর্জন করে।

॥ সারাংশ ॥

নাগরিক ঃ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নাগরিক বলিতে নগরবাসীকে বুঝায়। কিন্তু পৌরবিজ্ঞানে ইহা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন গ্রীসের মত বর্তমানে শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ নাগরিকতার ভিত্তি বলিয়া বিবেচিত হয় না। রাষ্ট্রের প্রত্যেক সদস্যই নাগরিক। আনুগত্য আধুনিক নাগরিকতা বিচারের মাপকাঠি। এই আনুগত্যের বিনিময়ে সে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ নাগরিকের কর্তব্যের উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে নাগরিকতার অর্থ হইল রাষ্ট্রকল্যাণে সুচিন্তিত মতামত দানের ক্ষমতা।

নাগরিক ও বিদেশী ঃ নাগরিক রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী এবং রাষ্ট্রের প্রতি তাহার আনুগত্য দ্বিধাহীন। বিদেশী অস্থায়ী বাসিন্দা, তাহার আনুগত্য সাময়িক এবং সীমাবদ্ধ। ফলে অধিকার ভোগের ব্যাপারেও উভয়ের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। সামাজিক অধিকার উভয়ে সমভাবে ভোগ করিলেও রাজনৈতিক অধিকার শুধুমাত্র নাগরিকই পাইয়া থাকে। বিদেশী রাষ্ট্রসীমা লঙ্ঘন করিলে, তাহার প্রতি রাষ্ট্রের আর কোনরূপ দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু নাগরিক যেখানেই থাকুকনা কেন, সে সর্বদা নিজ রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা দাবী করিতে পারে।

নাগরিকতা অর্জন ঃ নাগরিক দুই শ্রেণীর ঃ স্বাভাবিক এবং অনুমোদনসিদ্ধ। স্বাভাবিক নাগরিকতা অর্জনের উপায় দুইটি ঃ রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং

জন্মভূমিসূত্রে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়া কেহ বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিলে, তাহাকে গৃহীত বা অনুমোদিত নাগরিক বলা হয়। 'অনুমোদন' কথাটি ব্যাপক এবং সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। বিবাহ, সম্পত্তি ক্রয় ইত্যাদি যে কোন উপায়ে নাগরিকতা অর্জনই ব্যাপক অর্থে অনুমোদন। সংকীর্ণ অর্থে অনুমোদন বলিতে বিশেষ আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে নাগরিকতা প্রাপ্তিকে বুঝায়।

নাগরিকতার বিলুপ্তি ঃ অনুমোদনের ফলে জন্মগত নাগরিকতা লোপ পায়। বিবাহ, দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতি, রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যে যোগদান, বৈদেশিক সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ প্রভৃতি কারণেও নাগরিকতার বিলোপ সাধিত হয়।

॥ আদর্শ প্রশ্ন ॥

1. **Define Citizenship. Distinguish between a citizen and an alien.**
   নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। নাগরিক এবং বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য কি তাহা আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১০৩-১০৫]
2. **Explain the different modes of acquiring citizenship.**
   নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১০৫-১০৭]
3. **How is citizenship lost ?**
   কি ভাবে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় ? [পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮]
4. **Distinguish between a natural and a naturalised citizen.**
   স্বাভাবিক এবং অনুমোদিত নাগরিকের মধ্যে প্রভেদ কি ? [পৃষ্ঠা ১০৫-১০৭]

দশম অধ্যায়

সুনাগরিকতা

(Good Citizenship)

অতীতে রাজার ব্যক্তিগত বুদ্ধি বিবেচনার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করিত। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকা ছিল না। তাহারা ছিল রাজার আশ্রিত এবং অনুগৃহীত প্রজামাত্র। কালক্রমে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাজশক্তি বর্তমানে গণশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতকেই বিধাতার নির্দেশরূপে মান্য করা হয়। নাগরিকগণই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক। তাহাদের যোগ্যতার উপরেই রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ভর করে, সুনাগরিকই গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ। সুনাগরিক তাহাকেই বলা চলে, যে আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন এবং কর্তব্য পালনে তৎপর।

আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা।

বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইস, সুনাগরিকের তিনটি প্রধান গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। "বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম এবং বিবেক এই তিনটি গুণের সমাবেশে নাগরিক জীবন সমৃদ্ধ এবং সার্থক হইয়া উঠে।

সুনাগরিকের প্রধান গুণ তিনটি

(১) বুদ্ধিমত্তা।

গণতান্ত্রিক আদর্শের রূপায়নের দায়িত্ব নাগরিকের। এই গুরু দায়িত্ব পালনের উপযোগী বুদ্ধি ও জ্ঞান তাহাদের থাকা চাই। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের জটিল সমস্যা সম্পর্কে তাহাদিগকে অবহিত হইতে হইবে।

(২) আত্মসংযম।

গণতন্ত্র হইল আত্মশাসন। ব্যক্তিগত লোভ লালসাকে সমাজের বৃহত্তম স্বার্থে সংযত করিতে হইবে। গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতা এবং ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াও সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে অসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার মত মানসিক উদারতা।

(৩) বিবেক।

স্বার্থবুদ্ধিকে দমিত রাখিয়া নিষ্ঠা ও সততার সহিত কর্তব্যপালন সুনাগরিকতার অপর একটি লক্ষণ। ভোটদান, করপ্রদান এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে বিবেক-সম্মত আচরণ সুনাগরিকতার অন্যতম ধর্ম।

সুনাগরিকতার পথে অন্তরায় (Hindrances to Good Citizenship) **:**

স্বাধীনচিত্ততা, বুদ্ধিমত্তা, সহনশীলতা এবং কর্তব্যজ্ঞান—সুনাগরিকতার এই সমস্ত লক্ষণের অনুপস্থিতি ভ্রষ্ট এবং আদর্শচ্যুত নাগরিক জীবনের ইঙ্গিত দান করে। স্বাধীনতা স্পৃহার অভাবে নাগরিক অতি সহজেই অপরের নতি স্বীকার করে এবং অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলেও তাহার মনে প্রতিশোধের বাসনা জাগে না। এইরূপ অবসন্নচিত্ততা প্রজাসুলভ মনোভাবের লক্ষণ। বুদ্ধিমত্তার অভাবে নাগরিক তাহার দায়িত্বের প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে পারে। এই অজ্ঞতা তাহাকে ভ্রান্তপথে পরিচালনা করে। আবার নাগরিকের অনুদারতা এবং অসহিষ্ণুতার ফলে গণতন্ত্রের সাভল্যের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। তাহা ছাড়া, নাগরিক যদি বিবেকের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা প্ররোচিত হয়, তাহা হইলে তাহার কর্তব্যে শিথিলতা দেখা দিবে এবং সমষ্টিগত স্বার্থ ব্যাহত হইবে।

সুনাগরিকতার পরিচায়ক গুণাবলীর অভাবে নাগরিক জীবন ব্যর্থ এবং বিড়ম্বিত হইয়া পড়ে

সুনাগবিকতাব বাধা তিনটি।

লর্ড ব্রাইস বলেন—উদ্যমহীনতা (Indolence) স্বার্থপরতা (Self interest) এবং দলীয় মনোভাব (Party spirit)—এই তিনটিই হইল নাগরিক জীবনের সুস্থ বিকাশের পথে বাধা।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে উদাসীনতার অর্থ আপন অধিকারের প্রতি উপেক্ষা এবং কর্তব্য পালনে অবহেলা। নাগরিকগণের এইরূপ মানসিক অবসাদের সুযোগে একনায়কতন্ত্র প্রসার লাভ করে। সাধারণের কার্যে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অবকাশ সীমাবদ্ধ বলিয়া অনেকসময় সমষ্টিগত ব্যাপারে ব্যক্তি কোন রকম আগ্রহ বা উৎসাহ প্রকাশ করে না। সে মনে করে নাগরিক কর্তব্য পালনের জন্য আরও বহু লোক রহিয়াছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সে জুরীর কার্যে যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং ভোটদানে বিরত থাকে, অথবা আপন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ না করিয়া বন্ধুর পরামর্শে বা নেতার নির্দেশে ভোটাধিকার ব্যবহার করে। ইহার ফলে চতুর, অসৎ এবং বাক্‌সর্বস্ব ব্যক্তিগণ শাসনক্ষমতা দখল করে। সরকারী কর্মচারীগণও নাগরিকদের এই নির্লিপ্ততার সুযোগে স্বার্থসিদ্ধির নেশায় মাতিয়া উঠে, উদ্যমহীন নাগরিক স্বৈরাচারের পথ সুগম করে।

(১) উদ্যমহীনতা এবং তাহার কুফল।

উদ্যমহীনতার কারণ : নানাকারণে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নাগরিকগণের অনুৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

পরোক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। এই জাতীয় শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের একটিমাত্র রাজনৈতিক কার্য সম্পাদনের আহ্বান জানান হয়। তাহা হইল ভোটদান। কিন্তু নির্বাচনের পর প্রতিনিধিমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন ক্ষমতা তাহাদের হস্তে না থাকায় ভোটদানের ব্যাপারে তাহারা কোনরূপ উৎসাহ বোধ করে না।

(ক) প্রতিনিধিমূলক শাসনব্যবস্থা।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ বিপুলায়তন, তাহাদের জনসংখ্যাও অগণিত। ফলে ব্যক্তি আর আপনাকে অপরিহার্য জ্ঞান করিতে পারে না। সে অসহায় এবং নিতান্ত নগণ্য—এই ধারণাই রাষ্ট্রীয় কার্যে তাহাকে নিরুৎসাহ করিয়া তুলে।

(খ) আধুনিক রাষ্ট্রের বিপুল জন-সমষ্টি।

নিত্য অভাবের তাড়নায় বিব্রত ব্যক্তির কাছে রাজনীতি বিলাসমাত্র। বর্তমানে মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য ব্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মাথা ঘামাইবার মত অবকাশ তাহার নাই। কর্মক্লান্ত দেহ ও মন লইয়া সে রাজনীতির চর্চা করিতে পারে না।

(গ) প্রাণধারণের জন্য প্রাণান্তকর ব্যবস্থা।

রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে উদাসীনতার অপর একটি কারণ—প্রকৃত শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাবে নাগরিক রাষ্ট্রীয় সমস্যার প্রকৃতি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। এই অক্ষমতাই তাহাকে উদাসীন করিয়া তুলে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুনাগরিকতার সহায়ক নহে। ইহা স্বাধীন চিন্তার উদ্রেক করে না। মৌলিক চিন্তার অভাবে উদাসীনতার উদ্রেক হয়।

(ঘ) যথার্থ শিক্ষার অভাব।

রাষ্ট্র আজ আর নাগরিকের একমাত্র আকর্ষণ নহে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, শিল্পকলা, খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতির দিকে তাহার মন নিয়ত আকৃষ্ট হইতেছে। আপাতমধুর প্রলোভনে পড়িয়া নাগরিক আর রাজনীতির কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াইতে চাহে না।

(ঙ) অন্যান্য আকর্ষণ।

স্বার্থবুদ্ধি নাগরিককে আদর্শভ্রষ্ট করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নাগরিক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় সামগ্রিক স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে। এই স্বার্থপরতার কারণে সে বহু কুকাজে লিপ্ত হয়। লোভের বশে সে ভোট বিক্রয় করে। অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় উৎকোচ দান করে। টাকার জোরে বিত্তশালী ব্যক্তি শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল কৌশলে সমর্থকদের মধ্যে

সরকারী চাকুরী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বণ্টন করে। অসৎ সরকারী কর্মচারী অর্থের বিনিময়ে কালো বাজারের প্রশ্রয় দেয়। এইভাবে উগ্র ব্যক্তি-স্বার্থবোধ সমগ্র সমাজ-জীবনকে কলুষিত করিয়া তুলে।

(২) স্বার্থপরতা।

গণতন্ত্রের ভিত্তি রাজনৈতিক দল। সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সমর্থনেই সরকার দৃঢ় এবং স্থায়ী হয়। বিরোধীদলের সমালোচনার ভয়ই সরকারকে সংযত রাখে। জনমত গঠনে এবং প্রকাশে, রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসারে, সরকারের সহিত শাসিতের সংযোগ সাধনে, উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নে এবং ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু রাজনৈতিক দল যখন আদর্শ-ভ্রষ্ট হয় তখন তাহা গণতন্ত্রের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। নীতিভ্রষ্ট দল শাসনক্ষমতা লাভের আশায় হীন ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হয়, দুষ্কৃতকারী জানিয়াও প্রভাবশালী ব্যক্তিকে প্রার্থী মনোনয়ন করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল অন্যায়ভাবে বিরোধীপক্ষকে নির্যাতিত করে। আবার সরকারকে লোকচক্ষুতে হেয় করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা এবং নিন্দাবাদ প্রচার করাই বিরোধী দলের একমাত্র কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলি সাম্প্রদায়িকতা প্রচার এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যে লিপ্ত হয়। দলভুক্ত ব্যক্তিগণ অন্ধভাবে নেতাদের নির্দেশ পালন করে। তাহাদের আনুগত্য রাষ্ট্রের প্রতি নহে, দলের প্রতি। দলীয় স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের উপরে স্থান দেওয়ার ফলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং উন্নতি ব্যাহত হয়।

(৩) দলীয় মনোভাব।

এইভাবে দলগত মনোবৃত্তি সুনাগরিকতার পথে দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে।

উপরি-উক্ত তিনটি প্রধান প্রতিবন্ধক ছাড়া আরও যে সমস্ত বাধা সুস্থ নাগরিক জীবনকে ব্যাহত করে তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা এবং বর্ণ বৈষম্য উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য অন্তরায়।

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধকের প্রতিকার (Remedies against the Hindrances to Good citizenship):

এখন প্রশ্ন হইল কিভাবে সুনাগরিকতার পথে অন্তরায়গুলি দূর করা যায়:

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ প্রতিকারের বিভিন্ন পথের নির্দেশ দিয়াছেন। সাধারণভাবে বলিতে গেলে শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং জনগণের নৈতিক আদর্শের মানোন্নয়ন —এই দুইটি উপায়ে প্রতিবন্ধকগুলির প্রতিকার করা সম্ভব।

অন্তরায়গুলি দূরীকরণের উপায় প্রধানতঃ দুইটি: শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত এবং নীতিগত।

শাসনযন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থার কথা বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বাধ্যতামূলক ভোটদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, যেমন—গণ-উদ্যোগ, গণভোট, প্রতিনিধি প্রত্যাহার প্রভৃতি প্রবর্তন, অল্প সময়ের ব্যবধানে সাধারণ নির্বাচনের আয়োজন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের স্মবিধা দান, কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন, ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত এইসব ব্যবস্থা গৃহীত হইলে সাধারণের ব্যাপারে নাগরিকের উদ্যমহীনতা, হীন স্বার্থপরতা এবং উগ্র দলীয় মনোভাব অপসৃত হইবে।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত ব্যবস্থা।

শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলিই যথেষ্ট নহে। নাগরিকই শাসনতন্ত্র পরিচালনার অধিকারী। তাহার কর্তব্য বোধ জাগ্রত না হইলে সব ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইবে। নাগরিকের নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই অসামাজিক প্রবৃত্তিগুলি নির্মূল করা যায়। নাগরিকের মধ্যে নীতিজ্ঞান এবং কর্তব্যনিষ্ঠা জাগরিত করিতে হইলে যথার্থ শিক্ষার ব্যাপক বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিক উদাসীনতার অভিশাপ হইতে মুক্তি পাইবে। সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শ তাহার স্বার্থবুদ্ধিকে সংযত করিবে। শিক্ষাপ্রসূত রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্যদানে তাহাকে বাধা দিয়া দলগুলিকে আদর্শনিষ্ঠ করিয়া তুলিবে।

নীতিগত উপায়।

॥ সারাংশ ॥

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকের ভূমিকাই প্রধান। তাহার যোগ্যতার উপরেই শাসনযন্ত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে। স্মনাগরিকতার অপরিহার্য লক্ষণ তিনটি—বুদ্ধিমত্তা, আত্মসংযম এবং বিবেক।

স্মনাগরিকতার আদর্শ উপলব্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হইল—উদ্যমহীনতা, স্বার্থপরতা এবং দলীয় মনোবৃত্তি। এই অন্তরায়গুলির প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন—শাসন ব্যবস্থার উন্নতিবিধান এবং নাগরিকের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন।

শাসনযন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বাধ্যতামূলক ভোটদান, সংখ্যা-লঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব, দুর্নীতি দমন প্রভৃতি ব্যবস্থার উল্লেখ করা যায়।

নাগরিকদের মধ্যে নীতি এবং কর্তব্যবোধ জাগরিত করা অধিকতর মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন স্মশিক্ষার ব্যাপক আয়োজন।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Discuss the qualities of good citizenship.
স্নাগরিকের গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১১০]

2. What are the hindrances to the exercise of good citizenship? How would you remove them?
স্নাগরিকতার পথে অন্তরায়গুলি কি কি? তোমার মতে এই প্রতিবন্ধকগুলির প্রতিকারের উপায় কি? [পৃষ্ঠা ১১১-১১৪]

একাদশ অধ্যায়

নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য

(Rights and Duties of Citizenship)

অধিকার (Rights):

ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশই রাষ্ট্র ব্যবস্থার লক্ষ্য। কতকগুলি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্র ব্যক্তিকে তাহার অন্তর্নিহিত উদ্ভাবনী শক্তির অনুশীলনে সহায়তা করে। ইহাদের অভাবে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। ব্যক্তিসত্তার সমৃদ্ধি সাধনের জন্য অপরিহার্য সামাজিক সুযোগ সুবিধাগুলিই অধিকার নামে অভিহিত।

অধিকার কাহাকে বলে।

ল্যাস্কির ভাষায় অধিকার বলিতে বুঝায়—সমাজ-জীবনের সেই সব অবস্থা যাহা ব্যতীত ব্যক্তি তাহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না।

অধিকারের প্রকৃতি বিশ্লেষণ: মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি হইতেই অধিকারের উদ্ভব হয়। সমাজবহির্ভূত জীব ক্ষমতা ভোগ করে, কিন্তু অধিকারের আস্বাদ পায় না। আসলে অধিকার হইল সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত দাবী দাওয়া। সমাজের অবর্তমানে দাবীর কোন প্রশ্নই উঠে না এবং স্বীকৃতির কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

(১) সমাজভুক্ত মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসই অধিকারের ভিত্তি।

অধিকার কাহারও দান বা দাক্ষিণ্য নহে। ইহা আত্মসচেতন মানুষের দাবী—অপরের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি। এই দাবীর লক্ষ্য হইল শ্রেষ্ঠ সত্তার সন্ধান।

(২) অধিকার হইল ব্যক্তির আত্মবিকাশের দাবী।

এই সব দাবী দাওয়ার যৌক্তিকতা বিবেচনা করিয়া রাষ্ট্র আইনসঙ্গত স্বীকৃতি দান করে। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভের ফলে দাবীগুলি অধিকার বলিয়া গণ্য হয়। এই স্বীকৃতির তাৎপর্য দুইটি (ক) ইহার ফলে দাবীগুলি সুনিশ্চিত এবং সুরক্ষিত হয়, ইহারা সাধারণের সামগ্রী হইয়া উঠে; (খ) স্বীকৃতির অপর একটি অর্থ নির্বাচন। অসামাজিক দাবীগুলিকে দমন করিয়া রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্ণতাপ্রাপ্তির সহায়ক শর্তগুলিকে মান্য করে। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সমষ্টিগত কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত দাবীই হইল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় 'অধিকার'।

(৩)
রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অধিকারের অপরিহার্য লক্ষণ।

অধিকারের একটি স্থান কাল নিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। ঐতিহাসিক পরিবেশের পটভূমিকায় ইহার বিচার করিতে হইবে। চলমান জীবনে চিরন্তন অধিকার বলিয়া কিছু নাই। পুরাতন অধিকার সময়ের পরিবর্তনের ফলে অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে এবং স্বীকৃতি সাপেক্ষ নিত্যনূতন দাবীর উদ্ভব হইতেছে।

(৪)
অধিকার নিয়ত পরিবর্তনশীল।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rights):

অধিকার প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর : নৈতিক (moral) এবং আইনগত (legal)।

নৈতিক অধিকার বলিতে বুঝায় ব্যক্তির সেই সব দাবী দাওয়া যাহা মানুষের বিচার বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত। নীতিবোধই এই শ্রেণীর অধিকারের ভিত্তি। ইহা অমান্য করিলে আইনতঃ কেহ শাস্তি পায় না। বিবেকের নির্দেশে এবং জনমতের প্রভাবে নৈতিক অধিকারগুলি সংরক্ষিত হয়। সামাজিক নিন্দার ভয়ই ইহার সমর্থন, আইনের অনুশাসন নহে।

নৈতিক অধিকারের ভিত্তি ন্যায়বোধ এবং সমাজচেতনা।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বৃদ্ধবয়সে পিতামাতার সাবালক সন্তানের নিকট হইতে সেবা যত্ন পাইবার নৈতিক অধিকার আছে। অনুরূপভাবে পিতামাতার নিকট হইতে নাবালক সন্তানের শিক্ষা পাইবার অধিকারও নৈতিক অধিকার।

যে সব দাবীর পশ্চাতে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি রহিয়াছে, সেইগুলিকে আইনগত অধিকার বলা হয়। রাষ্ট্রের সমর্থনের অর্থ এই যে রাষ্ট্র এইসব অধিকার রক্ষা করিবে, যেমন সম্পত্তির অধিকার। ইহা আইনের সমর্থনপুষ্ট বলিয়া কেহ যদি তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্র তাহার প্রতিকার করিবে।

রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা সমর্থিত দাবীই আইনগত অধিকার।

আইনগত অধিকার যে শুধু রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সমর্থিত, তাহাই নহে। তাহার পশ্চাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনমতের সমর্থন থাকে, যেমন জীবনের অধিকার। ইহা আইনের দ্বারা স্বীকৃত এবং নীতিবোধের দ্বারাও সমর্থিত। আবার নৈতিক দাবীগুলি কালক্রমে আইনসঙ্গত অধিকারে পরিণত হয়। কর্ম পাইবার অধিকার বর্তমানে আমাদের দেশে নৈতিক দাবীমাত্র। আইনের সম্মান লাভ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে ইহা বৈধ অধিকার বলিয়া গণ্য হইবে।

নৈতিক এবং আইনগত অধিকারের পারস্পরিক সম্পর্ক।

পৌরবিজ্ঞানের আলোচনায় আইনগত অধিকারগুলিই নাগরিক অধিকার বলিয়া অভিহিত। নাগরিক অধিকার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—পৌর অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক অধিকার।

নাগরিক অধিকারের প্রকারভেদ।

পৌর বা সামাজিক অধিকার বলিতে সেই সব দাবীদাওয়াগুলিকে বুঝায় যেগুলি ব্যতীত মানুষের সমাজজীবন সুস্থ এবং সুন্দর হইতে পারে না। অর্থাৎ সভ্য জীবন যাপনের পক্ষে অপরিহার্য সুযোগ সুবিধাগুলিই হইল পৌর সামাজিক অধিকার। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশের জন্যই এগুলির প্রয়োজন। জীবন ধারণের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকারের পর্যায়ে পড়ে।

(১) পৌর অধিকার (Civil Rights)।

যে ক্ষমতাবলে নাগরিক রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে বলা হয় রাজনৈতিক অধিকার, যথা—ভোটদানের অধিকার, নির্বাচন প্রার্থী হইবার অধিকার, যোগ্যতানুযায়ী সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার, আবেদনের অধিকার প্রভৃতি। এই সব অধিকার নাগরিককে রাজনৈতিক ব্যাপারে আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠার সুযোগ দান করে।

(২) রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের কোনরূপ সীমারেখা টানা যায় না। এমন কতকগুলি অধিকার আছে, যাহা উভয় পর্যায়েই পড়ে, যেমন স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার। ইহা সভ্য জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য, আবার শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তারের ইহাই প্রকৃষ্ট পথ।

পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারের পারস্পরিক সম্বন্ধ।

উভয় অধিকারের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পৌর অধিকারের অবর্তমানে রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন। জীবনের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন

হইলে ভোটাধিকার অবশ্য মূল্যহীন হইয়া পড়ে। আবার রাজনৈতিক অধিকারের অবর্তমানে পৌর অধিকারের নিশ্চয়তা থাকে না। নাগরিকগণের হস্তে শাসনক্ষমতা না থাকিলে, তাহাদের সামাজিক সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।

(৩) অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Rights)।

যে অধিকারের ফলে নাগরিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহার জীবনের সদর্থ খুঁজিয়া পায় তাহাই হইল অর্থনৈতিক অধিকার। এই অধিকার বলিতে বুঝিতে হইবে কর্মসংস্থানের অধিকার, জীবিকা নির্বাহের উপযোগী পারিশ্রমিক পাইবার অধিকার, অভাব এবং অনিশ্চয়তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার অধিকার, শ্রমিকসংঘ গঠনের অধিকার ইত্যাদি।

ইহার গুরুত্ব

অর্থনৈতিক অধিকারের অভাবে রাজনৈতিক অধিকারগুলি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে। উপবাসী ব্যক্তির নিকট ভোটাধিকারের কোন আকর্ষণ নাই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এইগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সোভিয়েট সংবিধানে কর্মসংস্থানের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকারের তালিকায় অর্থনৈতিক দাবীগুলি স্থান পায় নাই। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিতে এগুলি ব্যাপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের তালিকা (List of Civil and Political Rights):

সামাজিক বা পৌর অধিকার: এই অধিকারগুলি সামাজিক এই হিসাবে যে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ইহাদেরও পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক অধিকার স্থিতিশীল নহে ধরিয়া লইলেও, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতম বিকাশের জন্য কতগুলি অধিকার সর্বত্র অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। এই অধিকারগুলিকে মৌলিক বা প্রাথমিক হিসাবে গণ্য করা হয়। অগ্রগণ্য এই সব সামাজিক অধিকারের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভিন্ন মৌলিক অধিকার

(১) **জীবন রক্ষার অধিকার** (Right to Life): ইহাই সব অধিকারের মূল বা ভিত্তি স্বরূপ। জীবনের নিরাপত্তার অভাবে অপর সমস্ত অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে। এই অধিকার এরূপ মূল্যবান যে আত্মরক্ষার্থে আততায়ীকে হত্যা করিলেও, আইনের চক্ষে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। আত্মহত্যার প্রচেষ্টা জীবনের নিরাপত্তাকে ক্ষুণ্ন করে বলিয়া, ইহা দণ্ডনীয় অপরাধ।

(২) **ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার** (Right to Personal Liberty)ঃ এই অধিকার বলে নাগরিক দেশের অভ্যন্তরে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। সরকারী কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছভাবে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে বা আটক রাখিতে পারিবে না এবং বন্দীকে বিচারার্থে আদালতে প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

(৩) **সম্পত্তির অধিকার** (Right to Property)ঃ স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি প্রত্যেক নাগরিক ভোগ করিতে পারিবে। উত্তরাধিকারও বাঞ্ছিত ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃত হয়। সম্পত্তি আত্মপ্রকাশের অন্যতম উপায়। তবে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে।

(৪) **আইনের চক্ষে সমানাধিকার** (Right to Equality before Law)ঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। পক্ষপাতশূন্য বিচারই গণতন্ত্রের প্রাণ। ধনী, নির্ধন, উচ্চ-নীচ সকলের উপরেই আইন সমভাবে প্রযুক্ত হইবে।

(৫) **চুক্তির অধিকার** (Right to Freedom of Contract): নাগরিক স্ব-ইচ্ছায় অপর নাগরিকের সহিত লিখিত বা মৌখিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে এবং এই চুক্তির শর্ত উভয় পক্ষের উপর সমভাবে প্রযুক্ত হইবে। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধ প্রমাণিত হইবে, আদালত তাহার দণ্ড বিধান করিবে। তবে চুক্তিবদ্ধ হইবার অধিকার অবাধ নহে। সমাজের পক্ষে অহিতকর চুক্তি কখনই বৈধ হইতে পারে না।

(৬) **শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার** (Right against Exploitation)ঃ মানুষ লইয়া ব্যবসার অধিকার কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই স্বীকার করে না। দাস ব্যবসায় সর্বত্র নিন্দিত। বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রম দানের বব্যস্থা আইনসিদ্ধ নহে। এমনকি মজুরী দিয়াও কাহাকেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করান অবৈধ আচরণ বলিয়া গণ্য হয়।

(৭) **ধর্মের অধিকার** (Right to Religion)ঃ নাগরিক তাহার রুচি এবং বিশ্বাস অনুযায়ী যে কোন ধর্মমত গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে পারিবে। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতি দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে। বর্তমান রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের আনুকূল্য বা বিরোধিতা করার পক্ষপাতী নহে। তবে ধর্মের নামে রাষ্ট্র-বিরোধী বা সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠিত হইলে, রাষ্ট্র তাহাতে আইনতঃ বাধা দিবে।

(৮) **মত প্রকাশের স্বাধীনতা** (Right to Freedom of Expression): গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিক তাহার অভাব অভিযোগ প্রকাশের অধিকার ভোগ করে। প্রয়োজন বোধে সে সরকারের সমালোচনাও করিতে পারে। সরকারের স্বৈরাচার রোধ করিবার জন্য এই অধিকার অপরিহার্য।

মতামত প্রকাশের অধিকার বলিতে দুইটি জিনিষ বুঝায়—**বাক্-স্বাধীনতা** এবং **মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা**। নাগরিক বক্তৃতার মাধ্যমে তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারে, অথবা পত্রের সহায়তায় তাহার অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন করিতে পারে। সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে—সরকারের সহিত সংবাদপত্রের মিলন সাধিত হইলে গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান হইবে। কিন্তু এই অধিকারও চরম নহে। অশ্লীল বা অপরের মানহানি-কর উক্তি আইনের চক্ষে অপরাধ। যে মতামতের দ্বারা হিংসাত্মক কার্যের প্ররোচনা দেওয়া হয়, অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব সৃষ্টি করা হয়, তাহাও আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ।

(৯) **মিলিত হওয়ার বা সভাসমিতি গঠন করিবার অধিকার** (Right to Freedom of Association)—মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তি নানা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। তাই সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার অবশ্য স্বীকার্য। তবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর সংঘ বা প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধনের অধিকার রাষ্ট্রের আছে। সম-মতাবলম্বী নাগরিকগণ সংঘবদ্ধ হইয়াই তাহাদের আদর্শকে কার্যকরী রূপ দান করিতে সমর্থ হয়। রাজনৈতিক দল এইরূপ একটি সংগঠন, ইহার অভাবে গণতন্ত্র অচল হইয়া পড়ে।

(১০) **অন্যান্য অধিকার**—গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক আরও বহুবিধ অধিকার ভোগ করিয়া থাকে, যথা পরিবার গঠনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার প্রভৃতি। শেষোক্ত অধিকারটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট রক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)

রাজনৈতিক অধিকারের ফলে নাগরিক সমষ্টিগত জীবনে আপন প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকার নাগরিকগণ ভোগ করিয়া থাকে।

(ক) **ভোটাধিকার** (Right to vote): ভোটদানের ক্ষমতা বর্তমান যুগে নাগরিকের সর্বপ্রধান অধিকার বলিয়া বিবেচিত হয়। এই ক্ষমতা বলে

নাগরিক শাসন কার্যে পরোক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। এই অধিকারের অভাবে নাগরিক শাসক শ্রেণীর কৃপাপাত্রে পরিণত হয় এবং তাহার দাবীদাওয়া সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা শাসক-বর্গকে গণদাবী সম্বন্ধে সচেতন করিবার একমাত্র কার্যকরী পন্থা। তাই সার্বজনীন ভোটাধিকারকে গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয়।

কয়েকটি মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার।

সার্বজনীন ভোটাধিকার (Universal Franchise) বলিতে সকলের ভোটদানের ক্ষমতা বুঝায় না। যাহারা অপ্রাপ্তবয়স্ক, কোন দেশই তাহাদের ভোটাধিকার স্বীকার করে না। তাই সার্বজনীন ভোটাধিকার বলিতে কার্যতঃ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Universal Adult Franchise) ই বুঝায়। আবার প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও বিদেশী, বিকৃত-মস্তিস্ক এবং গুরুতর অসদাচরণের অপরাধে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে কোন রাষ্ট্রের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না। সার্বজনীন ভোটাধিকারের আলোচনা প্রসঙ্গে উপরি-উক্ত স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ।

সপক্ষে যুক্তি—(১) ভোটাধিকার নাগরিকের জন্মগত অধিকার। তাহাকে এই অধিকার হইকে বঞ্চিত করার অর্থ তাহার অস্তিত্বকে উপেক্ষা করা। শাসক নির্বাচনে যাহার কোন ভূমিকা নাই, তাহার দাবী দাওয়া সহজেই অবহেলিত হয়। এই অবহেলা হইতে জনগণকে অব্যাহতি দিবার একমাত্র উপায় হইতেছে তাহাদের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া।

(২) ভোটাধিকারের অভাবে নাগরিক তাহার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রয়োগ করিতে পারে না। ইহার ফলে সমষ্টিগত জীবনের সমৃদ্ধির অন্তরায় উপস্থিত হয়।

(৩) ভোটদানের ক্ষমতার অভাবে নাগরিক রাজনৈতিক ব্যাপারে উদ্যমহীন হইয়া পড়ে। এই উদ্যমহীনতা তাহার সুনাগরিকতার আদর্শকে ব্যাহত করে।

বিপক্ষে যুক্তি—যাহারা সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিরোধী তাঁহারা বলেন ভোটাধিকার একটি পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা যাহার আছে, ভোটাধিকার শুধু তাহারই প্রাপ্য। মিল ভোটাধিকারের জন্য কয়েকটি শর্তের উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) তাঁহার মতে সার্বজনীন শিক্ষাই সার্বজনীন ভোটাধিকারের অপরিহার্য শর্ত হওয়া উচিত। অশিক্ষিত নাগরিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যথার্থ শিক্ষার অভাবে সে বুদ্ধি বিবেচনা সহকারে ভোটদানে অসমর্থ।

মিলের এই যুক্তির বিপক্ষে বলা যায় যে অশিক্ষিত নাগরিক মাত্রেই অজ্ঞ বা নির্বোধ নহে। আক্ষরিক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও বাস্তব বুদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। আকবর, শিবাজী প্রভৃতি প্রথিতযশা শাসকগণ যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেন নাই। কিন্তু শাসন দক্ষতার গুণে তাঁহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

তাহা ছাড়াও বলা যায় যে ভোটাধিকার দান শিক্ষাদানের অন্যতম উপায়। ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক রাজনীতি সম্বন্ধে সচেষ্ট হয় এবং স্বীয় চেষ্টায় রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে। ইহাও অনস্বীকার্য যে একমাত্র সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকারই সার্বজনীন শিক্ষার বিস্তারে তৎপর হন। অন্য কোন সরকারের নিকট হইতে এরূপ প্রয়োগ আশা করা যায় না।

(২) মিল কর প্রদানকে ভোটাধিকারের অন্যতম ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মিলের এইরূপ মনোভাব অগণতান্ত্রিক বলিয়া বর্তমান যুগে গণ্য হয়। দারিদ্র্যের অজুহাতে ব্যক্তিকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা অন্যায়। দরিদ্র ব্যক্তিও রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং সম্পদ বা করদানের সামর্থ্য ভোটাধিকারের বাঞ্ছনীয় ভিত্তি হইতে পারে না। আর্থিক দৈন্য যদি অযোগ্যতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে এই দৈন্য দূরীকরণে রাষ্ট্রের অগ্রণী হওয়া উচিত।

নারীর ভোটাধিকারঃ কেহ কেহ নারীগণকে ভোটাধিকার দানের ব্যাপারে বিরোধিতা করেন। তাঁহারা বলেন দৈহিক দুর্বলতা হেতু নারী পুরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাহার ভোট সে পুরুষেরই পরামর্শে ব্যবহার করিবে। অতএব তাহার ভোটাধিকার অর্থহীন। তাহাদের অপর একটি যুক্তি এই যে নারী দেশ রক্ষার ব্যাপারে অক্ষম বলিয়া শাসন কার্যে অংশ গ্রহণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাহার নাই। ইহা ছাড়াও তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে রাজনীতিতে যোগদানের ফলে নারীর স্বভাবসুলভ কোমলতা লুপ্ত হইবে এবং সাংসারিক শান্তি বিনষ্ট হইবে।

বিপক্ষে যুক্তি

মিল উপরি-উক্ত যুক্তিসমূহকে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ বলা যায় যে দুর্বল বলিয়াই ভোটাধিকারের প্রয়োজন নারীদেরই বেশী। এই অধিকার বলে তাহারা কুশাসনের কবল হইতে মুক্তি পাইবে। দ্বিতীয়তঃ পিতার পরামর্শে ভোট দিলেও পুত্রের অধিকার যদি অন্যায় বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে পুরুষের নির্দেশে পরিচালিত হওয়ার অজুহাতে নারীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা কখনই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ দেশ রক্ষার কার্যে বর্তমানে নারীগণ মোটেই পিছপা

যুক্তিগুলির অসারতা প্রমাণ।

নহে। ধাত্রীবেশে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা আহত সৈনিকের পরিচর্যা করে এবং প্রয়োজন বোধে অস্ত্রও ধারণ করে। চতুর্থতঃ তথাকথিত সাংসারিক শান্তির খাতিরে সমাজের এক বৃহৎ অংশকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা কোন মতেই কাম্য নহে।

পরিশেষে বলা যায় যে রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণের ফলে রাজনীতি ভেদনীতি পরিহার করিয়া উদার এবং কল্যাণধর্মী হইয়া উঠিবে।

(খ) **নির্বাচিত হইবার অধিকার** (Right to be elected): শুধু নির্বাচন করিবার অধিকারও নহে, নির্বাচিত হইবার অধিকারও নাগরিক ভোগ করে। গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিক নির্বাচন প্রার্থীও হইতে পারে।

(গ) **সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার** (Right to hold public offices):—যোগ্যতা অনুযায়ী সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। শুধু মাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণের ভিত্তিতে কোন নাগরিককে সরকারী চাকুরি লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা গণতন্ত্র বিরুদ্ধ।

(ঘ) **আর্জি পেশ করিবার অধিকার** (Right to Petition): এই অধিকার বলে নাগরিকগণ একক বা সমবেত ভাবে তাহাদের অভাব অভি-যোগের প্রতিকার কল্পে আইনসভা অথবা শাসন বিভাগের নিকট আবেদন করিতে পারে।

(ঙ) **অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার** (Other Political Rights): উপরি-উক্ত অধিকার ছাড়াও আরও কতকগুলি সুযোগ সুবিধা নাগরিকগণ ভোগ করিয়া থাকে। এই সব অধিকার সামাজিক এবং রাজনৈতিক উভয় পর্যায়েই পড়ে, যেমন মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সভা সমিতি গঠনের অধিকার, বিদেশে থাকাকালীন নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য পাইবার অধিকার ইত্যাদি।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of Citizenship)

কর্তব্য বলিতে কি বুঝায়

অপরের জন্য কিছু করিবার অথবা অন্যের স্বার্থে কোন কিছু হইতে বিরত থাকিবার দায়িত্বই হইল কর্তব্য। অধিকার হইল ব্যক্তির প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা। ইহার বিনিময়ে ব্যক্তির যাহা দেয়, তাহাই হইল কর্তব্য। অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে উপভোগের এবং কর্তব্যের মধ্যে ত্যাগের ভাব বর্তমান।

কর্তব্য দুই জাতীয়—নৈতিক (Moral) এবং আইনগত (Legal)।

নাগরিক যে দায়িত্ব বিবেকের নির্দেশে অথবা সামাজিক মূল্যবোধের প্রেরণায়

পালন করিয়া থাকে, তাহাই নৈতিক কর্তব্য। ইহা পালন না করিলে রাষ্ট্রের আদালত দণ্ড বিধান করে না। বৃদ্ধ অথবা অক্ষম পিতা মাতার সেবা করা সমর্থ সন্তানের নৈতিক কর্তব্য। এই কর্তব্য যদি সে পালন না করে, তাহা হইলে সে অবশ্যই সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হইবে।

যে দায়িত্বের ভিত্তি ব্যক্তির বিবেক বা সমাজ মূল্যবোধ, তাহাই নৈতিক কর্তব্য।

আর দায়িত্ব যখন আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট হয় এবং দায়িত্ব অবহেলার দরুণ শাস্তি ভোগ করিতে হয়, তখন তাহাকে বলা হয় আইনগত কর্তব্য। রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট কর প্রদান করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। এই কর্তব্য পালন না করা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ।

রাষ্ট্রীয় আইন যে দায়িত্ব পালনে ব্যক্তিকে বাধ্য করে, তাহাই আইনগত কর্তব্য।

এই দুই শ্রেণীর কর্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নহে। এক দেশে যাহা নৈতিক দায়িত্ব অন্য দেশে তাহাই আবার বাধ্যতামূলক আইনগত কর্তব্য। যেমন ভোটদান ভারতবর্ষে নৈতিক দায়িত্ব, কিন্তু বেলজিয়ামে তাহাকে আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

নৈতিক এবং আইনগত কর্তব্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নহে।

তাহা ছাড়া আইনগত কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীতিবোধের দ্বারা সমর্থিত। অপরের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ না করা—ইহা আইন এবং নীতিবিজ্ঞান উভয়ের দ্বারাই নির্দিষ্ট, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে নৈতিক এবং আইনগত কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে রাষ্ট্রীয় অনুশাসন মান্য করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্য। কিন্তু অত্যাচারী সরকারের অন্যায় আদর্শ অমান্য করা নাগরিকের ধর্ম—তাহার নৈতিক দায়িত্ব।

দুইশ্রেণীর কর্তব্যের মধ্যে বিরোধও দেখা যায়।

নাগরিকের বিভিন্ন প্রকার কর্তব্য (Different kinds of Duties of a citizen)**:**

রাষ্ট্র নাগরিক অধিকারের উৎস এবং রক্ষক। রাষ্ট্র না থাকিলে ব্যক্তির অধিকার অনিশ্চিত এবং অসংরক্ষিত হইয়া পড়িত। তাই রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি নাগরিকের দায়িত্ব অসীম, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য নিম্নরূপ—

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য

(১) **আনুগত্য** (Allegiance)**:** নাগরিকের সর্বপ্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বীকার করা। এই আনুগত্যের অর্থ রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, রাষ্ট্রীয় কার্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করা, অন্যায়ের প্রতিকার এবং

অন্যায়কারীর গ্রেপ্তারে সরকারের সহযোগিতা করা এবং সর্বোপরি দেশ রক্ষার্থে আত্মদান করিতে প্রস্তুত থাকা।

(২) **আইন মান্য করিয়া চলা** (Obedience to Law) : রাষ্ট্রের আদর্শ বা ইচ্ছা আইনের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে এবং স্বাধীনতার নূতন ক্ষেত্র রচনা করে। অতএব প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য আইনানুগ জীবন যাপন করা। তাই বলিয়া আইন মাত্রেই কাম্য বা গ্রহণযোগ্য নহে। অন্যায় আইন অমান্য করিয়াই নাগরিক তাহার কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দান করে।

(৩) **কর প্রদান** (Payment of Taxes) : শাসনযন্ত্রকে সচল অবস্থায় রাখার জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ সংগৃহীত হয় জনগণের উপর কর ধার্য করিয়া। নাগরিকগণ যদি এই কর বা রাজস্ব দানে অসম্মত হয় অথবা ইহা হইতে অন্যায় ভাবে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে, তাহা হইলে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ব্যাহত হইবে।

(৪) **সততার সহিত ভোটাধিকারের ব্যবহার** (Honest Exercise of the Franchise) : ভোটদান নাগরিকের শুধু অধিকার নহে, ইহা তাহার অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব। এই অধিকারের যথার্থ প্রয়োগের উপরেই শাসন যন্ত্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে। সুতরাং নাগরিকের কর্তব্য হইতেছে ব্যক্তিগত, দলগত অথবা সম্প্রদায়গত প্রভাব মুক্ত হইয়া সততা এবং সুবিবেচনা সহকারে এই অধিকার প্রয়োগ করা।

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলেও সর্বতোভাবে সরকারের সহযোগিতা করা নাগরিকতার ধর্ম। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, লাভের আশা না থাকিলেও নাগরিকের জুরীর কার্যে যোগদান করা এবং আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবির বিচারকের পদ গ্রহণে সম্মত হওয়া কর্তব্য।

পরিবারের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য।

নাগরিক শুধু রাষ্ট্রের সদস্য নহে। সে আবার পরিবারের সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই মাতা, পিতা এবং পরিবারের অন্যান্য আত্মীয়ের স্নেহ, মমতা এবং ত্যাগ স্বীকারের ফলেই শিশু বর্ধিত হয় এবং কালক্রমে বৃহত্তর সমাজ জীবনে প্রবেশের সামর্থ্য অর্জন করে। সামাজিক রীতিনীতি, এবং সংস্কৃতির সন্ধান পরিবারই তাহাকে দিয়া থাকে। এক কথায়, পরিবারের অকৃপণ দানের ফলেই অসহায় শিশু দেহ ও মনের সামগ্রিক বিকাশ লাভ করে। তাই পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন করা নাগরিকের পবিত্র ধর্ম। যে পরিবারের সদস্যগণ পারস্পরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং কর্তব্য পালনে তৎপর, তাহাই সুস্থ এবং

আদর্শ পরিবার। এইরূপ নিবিড় পারিবারিক বন্ধন ব্যক্তি-জীবনকে পূর্ণতা দান করে এবং সামাজিক সংহতি বিধানে সহায়তা করে।

সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য।

পরিবার ছাড়াও বৃহত্তর সমাজের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য রহিয়াছে। ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনের অসম্পূর্ণতাকে সমাজ পূর্ণ করে। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তি-সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়। ব্যক্তির বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধান করিয়া সমাজ ব্যক্তিকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা নাগরিকের কর্তব্য। সামাজিক অনুশাসনগুলি মান্য করিয়া নাগরিক সমাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি, নিজ গ্রাম বা সহরের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য ত্যাগ স্বীকারের সংকল্প, সমষ্টিগত সম্পদ সম্বন্ধে সচেতনতা, সর্ববিধ অন্যায় এবং অনাচারের বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব ইত্যাদিই হইল সমাজের প্রতি নাগরিকের ঋণ পরিশোধের উপায়। সমাজ-কল্যাণে সাধ্যমত সহায়তা করিয়া নাগরিক আত্মোন্নতির পথ প্রস্তুত করে।

অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rights and Duties) :

দায়িত্ব পালন অধিকার-ভোগের অপরিহার্য শর্ত।

পারস্পরিক স্বীকৃত দাবী দাওয়াই অধিকার নামে অভিহিত। দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়াই ব্যক্তি আপন দাবী আদায় করিতে পারে। অর্থাৎ অধিকারের মধ্যেই কর্তব্যের ধারণা নিহিত রহিয়াছে। অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক নিম্নরূপ।

(১) আমার অধিকার অন্যের উপর কর্তব্য আরোপ করে।

আমার যাহা অধিকার, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই হইল অন্যের কর্তব্য। অপর সকলে এই দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃত হইলে, আমার অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে।

(২) আমার কর্তব্য অন্যের ন্যায্য দাবীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়া।

আমারও স্মরণ রাখা উচিত যে অধিকার আমার একক সামগ্রী নহে। অপর সকলেও অনুরূপ সুযোগ সুবিধার অধিকারী। অপরের সম অধিকারের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করিয়াই আমি আমার অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করিতে পারি।

(৩) সামাজিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই অধিকার ভোগ করা আমার পবিত্র ধর্ম।

সমাজের সদস্য হিসাবে আমি অধিকার লাভ করি। তাই এই সমাজের উন্নতিকল্পে আমার দায়িত্ব রহিয়াছে। অধিকার বলিতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সুযোগ সুবিধা বুঝায়। আমার কর্তব্য হইল এই সব সুযোগ সুবিধার এরূপ সদ্ব্যবহার করা যাহার ফলে সমাজ-জীবন সমৃদ্ধ হয়।

আমার অধিকার রাষ্ট্রের উপরও কর্তব্য আরোপ করে। ব্যক্তি-অধিকারকে স্বীকার করিয়া এবং তাহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াই রাষ্ট্র ব্যক্তির আনুগত্য দাবী করিতে পারে। তাই ব্যক্তি-অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। যে স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্র ব্যক্তিত্বের দাবীকে উপেক্ষা করে তাহা নাগরিকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্য লাভ করিতে পারে না।

(৪) রাষ্ট্রের কর্তব্য আমার অধিকার রক্ষা করা।

রাষ্ট্র আমার অধিকারের রক্ষক বলিয়া আমার কর্তব্য এই রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করা এবং রাষ্ট্র-কল্যাণে তৎপর হওয়া।

(৫) রাষ্ট্র রক্ষার্থে তৎপর হওয়া আমার কর্তব্য।

॥ সারাংশ ॥

ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সুযোগ সুবিধাগুলিই অধিকার নামে অভিহিত। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক দাবী দাওয়া যখন রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় অধিকার। অধিকার সমাজ হইতে উদ্ভূত। সমাজ-জীবন সদা পরিবর্তনশীল। অধিকারও তাই স্থিতিশীল হইতে পারে না।

অধিকার দুই শ্রেণীর—নৈতিক এবং আইনগত। যে অধিকার ব্যক্তির বিবেক এবং সমাজের নীতিবোধের দ্বারা সমর্থিত, তাহা নৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য হয়। আর যে অধিকার আইনের দ্বারা স্বীকৃত এবং রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সংরক্ষিত, তাহাকে বলা হয় আইনগত অধিকার।

নাগরিক অধিকারের তিনটি রূপ : সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক।

সামাজিক অধিকার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, রাজনৈতিক অধিকার বলে নাগরিক শাসন-ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং অর্থনৈতিক অধিকার ব্যক্তিকে অভাব এবং অনিশ্চয়তার হাত হইতে অব্যাহতি দান করে।

জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তিবদ্ধ হইবার অধিকার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার, বসবাস এবং দেশের সর্বত্র বিচরণের অধিকার, ভাষা এবং সংস্কৃতির অধিকার, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার—এইগুলিই হইল উল্লেখযোগ্য সামাজিক বা পৌর অধিকার।

রাজনৈতিক অধিকারগুলির মধ্যে ভোটাধিকার হইল সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার আধুনিক গণতন্ত্রে স্বীকৃত। সার্বজনীন ভোটাধিকার না থাকিলে সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। অনেকে

ভোটাধিকারের জন্য যোগ্যতার নির্দেশ করেন। ভোটাধিকারের শর্ত হিসাবে মিল শিক্ষা, করদান প্রভৃতি যোগ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন। নারীর ভোটাধিকার সম্বন্ধেও মত বিরোধ দেখা যায়।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অধিকার হইল নির্বাচিত হইবার অধিকার, আর্জি পেশ করিবার অধিকার এবং সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার।

অধিকারের বিনিময়ে নাগরিকের যাহা করণীয় তাহাই কর্তব্য বলিয়া অভিহিত হয়। যে দায়িত্ব ব্যক্তি বিবেকের নির্দেশে অথবা সামাজিক নিন্দার ভয়ে পালন করে, তাহা নৈতিক কর্তব্য। আর রাষ্ট্রীয় আইন যে দায়িত্ব পালনে নাগরিককে বাধ্য করে, তাহাকে বলা হয় আইনগত কর্তব্য।

নাগরিক কর্তব্য বহুবিধ। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যক্তি-জীবনকে সার্থকতা দান করে বলিয়া ইহাদের প্রত্যেকের প্রতিই নাগরিকের কর্তব্য রহিয়াছে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য হইল—আনুগত্য প্রদর্শন, আইনানুমোদিত জীবন যাপন, নিয়মিত কর দান এবং সততার সহিত ভোটাধিকারের প্রয়োগ।

অধিকার এবং কর্তব্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা প্রত্যেকের কর্তব্য। রাষ্ট্রের কর্তব্য অধিকার রক্ষা করা। নাগরিকের কর্তব্য রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা। সমাজ হইতেই অধিকারের উদ্ভব হয় বলিয়া ব্যক্তির পবিত্র দায়িত্ব হইল সমাজ-কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপন অধিকার প্রয়োগ করা।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Define Rights. Distinguish between (i) Civil and Political Rights and (ii) Legal and Moral Rights.**
   অধিকারের সংজ্ঞা কি ? সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে এবং আইনগত ও নৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃষ্ঠা ১১৫-১১৭]

2. **What are the fundamental rights and duties of a citizen in a modern State ?**
   আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার এবং কর্তব্য কি কি ? [পৃষ্ঠা ১১৮-১২০ ও ১২৪-১২৫]

3. **"Rights imply duties"—Explain the significance of this statement.**
   "অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহত আছে"—এই উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
   [পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭]

দ্বাদশ অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা

(Law and Liberty)

আইনের প্রকৃতি (Nature of Law) : সংঘবদ্ধ জীবনের অপরিহার্য শর্ত হইল বিধিনিষেধ। সমাজে বাস করিতে হইলে কতগুলি সাধারণ নিময় কানুন প্রত্যেককেই পালন করিতে হয়। অর্থাৎ সকলকে একত্র বসবাসের সুযোগ দিবার জন্য প্রত্যেকের অবাধ আচরণকে সংযত করিতে হয়। এই সংযম বা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠাই হইল সামাজিক অনুশাসনের লক্ষ্য। প্রত্যেক সংঘ বা প্রতিষ্ঠান এইরূপ কতকগুলি নিয়ম বা অনুশাসনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

বিধি নিষেধ হইল সমাজ-জীবনের ভিত্তি।

'রাষ্ট্রও একটি সংঘ'। ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কতকগুলি নিয়ম প্রবর্তন করে। এই নিয়ম যে লঙ্ঘন করে তাহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই সব রাষ্ট্র-সৃষ্ট নিয়ম কানুনকেই বলা হয় আইন। সার্বভৌমের সমর্থনই আইনকে অন্যান্য সামাজিক অনুশাসন হইতে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করে। আইন সর্বজনীন। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইহা রচিত।

রাষ্ট্রপ্রণীত বিধিকে বলা হয় আইন।

বিখ্যাত ইংরাজ লেখক অষ্টিন আইনকে সার্বভৌমের নির্দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অষ্টিনের বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়া স্যার হেনরী মেইন বলেন যে আইন সার্বভৌমের দ্বারা সৃষ্ট নহে, বিবর্তনের ফলেই আইনের উদ্ভব হইয়াছে। প্রাচীন সমাজে সার্বভৌমের স্থান ছিল না। প্রথা এবং রীতি নীতিই ছিল তৎকালীন সমাজ-জীবনের ভিত্তি। আধুনিক কালেও ব্যক্তি-জীবন প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয় এই সব সামাজিক প্রথা এবং
আধুনিক কালেও ব্যক্তি-জীবন প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হয় এই সব সামাজিক প্রথা এবং
লোকাচারের দ্বারা।

আইন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা

উপরি-উক্ত দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয় সাধন করিয়া উইলসন বলেন,—"আইন হইল সমাজের প্রচলিত চিন্তা এবং অভ্যাসের সেই অংশ যাহা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হইয়া সুস্পষ্ট বিধিতে পরিণত হইয়াছে এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্ট্রশক্তির পূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।"

আইন সম্বন্ধে আধুনিক অভিমত

উইলসন প্রদত্ত সংজ্ঞায় সামাজিক প্রথা এবং লোকাচারের মূল্য এবং সার্বভৌমের সমর্থনের তাৎপর্য স্বীকৃত হইয়াছে।

বিখ্যাত আইনবিজ্ঞানী হল্যাণ্ড আইনের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে আইনের আসল প্রকৃতি সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার মতে "আইন হইল সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রযুক্ত মানুষের বাহ্যিক আচরণ সম্পর্কিত নিয়ম।" অর্থাৎ আইন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমের দ্বারা প্রযুক্ত এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা।

আইনের উৎস (Source of Law):

(১) প্রথা আইনের প্রাচীনতম উৎস। বর্তমানেও আইন প্রণয়নে প্রথার প্রভাব দেখা যায়।

প্রথা (Custom): লোকাচারই হইল আইনের আদি উৎস। প্রাচীনকালে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতেই সমাজ-জীবন পরিচালিত হইত। তখন রাষ্ট্র বা সরকার বলিয়া কিছুই ছিল না। প্রতিষ্ঠিত রীতি নীতিই তখন পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করিত। বর্তমানেও প্রথা আমাদের সমাজ জীবনের বৃহৎ অংশ জুড়িয়া আছে। আর যাহাকে আমরা এখন আইন বলিয়া গ্রহণ করি তাহা অতীতের লোকাচারেরই বিধিবদ্ধ আনুষ্ঠানিক রূপ।

(২) প্রাচীন সমাজে ধর্মীয় অনুশাসনই ছিল আইন। বর্তমানেও দেখা যায় যে ধর্মের উৎস হইতে সৃষ্ট আইনের সংখ্যা বড় কম নয়।

ধর্ম (Religion): অতীতে আইন ছিল প্রথাগত বিধান এবং প্রথাগত বিধানই ছিল ধর্মের অনুশাসন। ধর্মীয় বিধি তখন সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান করিত এবং পুরোহিত সমাজের শিরোমণি হিসাবে সম্মান বা প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। ধর্মীয় অনুশাসনগুলি কালক্রমে আইনে পরিণতি লাভ করে।

(৩) প্রাচীন কালে বিচারের রায় আইনের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল, বর্তমানেও বিচারেব রায় হইতে আইনের সৃষ্টি হয়।

বিচারকের রায় (Judicial Decisions): বিচারকেরাও অনেক সময় বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া নূতন আইনের সৃষ্টি করেন। প্রচলিত আইনকে কোন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার জন্য বিচারক তাহার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই ব্যাখ্যার ফলে অনেক সময় আইনের অর্থ পরিবর্তিত হয়। ইহা নূতন আইন প্রণয়নের সামিল। বিশেষক্ষেত্রে প্রদত্ত রায় পরবর্তীকালে অনুরূপ বিরোধের নিষ্পত্তির ব্যাপারে আইন বলিয়া গণ্য হয়।

(৪) ন্যায়বোধ হইতে আইনের সৃষ্টি

ন্যায়বোধ (Equity): ন্যায়বোধও আইনের উৎস। প্রচলিত আইন অনুসারে কোন বিরোধের ন্যায় মীমাংসা সম্ভব না হইলে, বিচারক ব্যক্তিগত বিবেক এবং মূল্যবোধের নির্দেশে রায় দান করেন।

পণ্ডিতব্যক্তিগণের ভাষ্য (Scientific Commentaries) ঃ বিখ্যাত আইন-বিদ্‌গণের ভাষ্য বা টীকা আইনের একটি উৎপত্তিস্থল। প্রচলিত প্রথা এবং আইনের উপর তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ এবং যুক্তিসিদ্ধ অভিমত অনুসারে বিচারক অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থির করেন। ইংলণ্ডের ব্লাকষ্টোন এবং ভারতের মনু প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(৫)
বিশেষজ্ঞদের রচনাও নূতন আইনের ইঙ্গিত দান করে।

আনুষ্ঠানিক আইন প্রণয়ন (Formal Legislature) ঃ আধুনিক কালে আইন সভাই প্রত্যক্ষভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া আইনসভা পুরাতন আইন বাতিল করিয়া নূতন আইন রচনা করে। সমাজের আচার ব্যবহার এবং ন্যায় অন্যায়ের ধারণা বা মূল্যবোধই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হইয়া গৃহীত বিধিতে পরিণত হয়।

(৬)
আইন সভাই আধুনিক কালে আইনের প্রধানতম উৎপত্তিস্থল

উইলসন আইনের ক্রমবিকাশের ধারা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"প্রথা আইনের প্রাচীনতম উৎস এবং সমসাময়িক উপাদান হিসাবে ধর্মও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ; আদিতে এই দুইটি উপাদান ছিল অভিন্ন। বিচারকের রায় এবং ন্যায়বোধ সুপ্রাচীন কাল হইতেই আইনের উৎপত্তিস্থল হিসাবে স্বীকৃত। কেবল আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি এবং ভাষ্যকারের রচনা উন্নততর সভ্যতার অপেক্ষায় ছিল।"

আইন ও নীতি (Law and Morality) ঃ

নির্দিষ্টতা, ব্যাপকতা এবং প্রয়োগপদ্ধতি—এই তিন দিক দিয়া আইন নীতি হইতে স্বতন্ত্র।

আইন স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট। আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করিবার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ আছে। কিন্তু নীতি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট, কোন বিষয়ে সমাজের নৈতিক অভিমত কি, তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নহে। সতীদাহ প্রথা অবৈধ ঘোষিত হইবার পূর্বে এ বিষয়ে তৎকালীন সমাজের নীতিবোধ কিরূপ ছিল তাহা নির্ভুলভাবে নিরূপণ করা শক্ত। নৈতিকতা বিচারের মাপকাঠি সকলের একরূপ নহে। একজনের বিচারে যাহা অন্যায়, অন্যের বিবেচনায় তাহা নীতিসম্মত।

(১)
আইন এবং নীতির মধ্যে প্রভেদ। নীতি অপেক্ষা আইন অধিকতর সুস্পষ্ট।

আইন ও নীতির বিষয়বস্তু পৃথক, মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রিত করাই আইনের উদ্দেশ্য। মনের চিন্তা সংযত করিবার শক্তি আইনের নাই। কিন্তু

নীতি চিন্তা এবং কর্ম উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে, অর্থাৎ নীতির পরিধি আইনের তুলনায় ব্যাপকতর। পরস্বাপহরণ অবৈধ এবং অন্যায়। কিন্তু অপহরণের অভিলাষ নীতি-বিরুদ্ধ হইলেও বে-আইনী নহে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারক অপরাধীর অভিপ্রায় অনুসারে অপরাধের গুরুত্ব নির্ধারণ করেন।

(২) নীতি আইন অপেক্ষা ব্যাপক

আইন রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সমর্থিত, বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্র আইনের প্রতি জনগণের আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করে। অপরপক্ষে নৈতিক অনুশাসনের প্রয়োগকর্তা সমাজ। নৈতিক নিয়ম যে লঙ্ঘন করে তাহাকে বিবেকের দংশন এবং সমাজের ঘৃণা সহ্য করিতে হয়।

(৩) সমর্থনের দিক দিয়াও আইন ও নীতির মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে

আইন রচিত হয় বাস্তব সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া। নিরাপত্তাই হইল রাষ্ট্রের প্রাথমিক লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নীতিবিরুদ্ধ কার্যও বাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু লাভ ক্ষতির ধারণা নীতিবোধকে প্রভাবিত করে না।

(৪) নীতি স্থান-কাল-নিরপেক্ষ, কিন্তু আইন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন সাপেক্ষ।

এই কারণে দেখা যায়, যাহা অবৈধ, তাহা সব সময় অন্যায় নহে এবং যাহাই আইন-অনুমোদিত, তাহাই নীতিসম্পন্ন নহে। রাস্তার ডানদিকে গাড়ী চালান অবৈধ আচরণ, কিন্তু ইহার সহিত নীতির কোন সম্পর্ক নাই। আবার আইন-অনুমোদিত বহুপ্রকার আমোদ প্রমোদ নিশ্চিতরূপে নীতি বিগর্হিত। আইনগত ধারণা এবং নৈতিক চেতনা মূলতঃ ভিন্ন, সব সময় ইহাদের সমন্বয় সাধন করা যায় না।

তাই আইনের চক্ষে যাহা অপরাধ, নীতির দৃষ্টিতে তাহা অন্যায় নাও হইতে পারে। আবার নীতি যাহা সমর্থন করে না, আইন তাহা অনুমোদন করিতে পারে।

আইন ও নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক।

আইন এবং নীতির মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

আইন ও নীতির উদ্দেশ্য মূলতঃ অভিন্ন।

আইন এবং নীতি উভয়েরই লক্ষ্য এমন একটি সুস্থ সামাজিক পরিবেশ রচনা করা, যেখানে মনুষ্যত্বের সুমহান সম্ভাবনা সার্থক হইতে পারে।

আইন অপেক্ষাকৃত স্থূল হাতিয়ার; বহিরাচরণ সংযত করিলেও ইহা মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে পারে না। আইনের এই ফাঁক নীতিবোধ পূরণ করে। আইনের আদেশ মনকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু নীতির আবেদন মর্মস্পর্শী। আইন এবং নীতি এই দুয়ের একত্র সমাবেশ শ্রেষ্ঠ সমাজ-জীবনের সূচনা করে।

নীতি আইনের পরিপূরক

আইন সামাজিক মূল্যবোধের দর্পণ, অর্থাৎ সমাজের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণার ভিত্তিতেই আইন রচিত হয়। সূচনাতে আইন ও নীতি ছিল অভিন্ন। বর্তমানেও মানুষের বিশ্বাস এবং ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা আইনের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে।

নৈতিক ধ্যান ধারণা আইন প্রণয়নে সমধিক প্রভাব বিস্তার করে।

আইন যখন সমাজের নীতিবোধের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয়, তখন তাহা সহজেই প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। আর আইন যখন মানুষের নীতিজ্ঞানকে আঘাত করে, তখন তাহা জনপ্রিয়তা হারায় এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনুগত্যলাভে বঞ্চিত হয়। অনেক সময় এইরূপ আইনকে বাতিল করিয়া দিতে রাষ্ট্র বাধ্য হয়।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ সমাজের নীতিবোধের উপর নির্ভর করে।

আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় আইন এবং নীতিবোধের ব্যবধান অন্তর্হিত হয়। নীতিজ্ঞান আইনের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যদানে ব্যক্তিকে প্রণোদিত করিয়া আইনের পথ সুগম করে। আইনও নীতির নির্দেশে রচিত হইয়া তাহাকে স্পষ্ট রূপ দান করে এবং তাহার বাধ্যতামূলক প্রয়োগ সম্ভব করিয়া তুলে।

আইন ও নীতি পরস্পর নির্ভরশীল।

স্বাধীনতা (Liberty): স্বাধীনতার ধারণা সাধারণভাবে নৈতিমূলক, ইহার দ্বারা বন্ধনমুক্তি বা নিয়ন্ত্রণের অভাব বুঝায়। অর্থাৎ ব্যক্তির অবাধ আচরণের অবকাশই স্বাধীনতা বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু এইরূপ স্বাধীনতা স্পষ্টতঃই অসম্ভব। সাধারণ কতগুলি নিয়মের অভাবে সমাজ-জীবন যাপন করা যায় না। যথেচ্ছ আচরণের সুযোগ সামাজিক শান্তিকে বিঘ্নিত করে এবং অরাজকতার প্রশ্রয় দেয়। অরাজক অবস্থা ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশ নহে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রসূত কতগুলি সুবিধাজনক নিয়ম যথার্থ সমাজ-জীবনের ইঙ্গিত দান করে। এই সব অনুশাসনের প্রতি আনুগত্যদানে বাধ্য করার অর্থ স্বাধীনতার বিনাশ নহে। চুরি অথবা হত্যার বিরুদ্ধে যে নিয়ম তাহা কাহারও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না বা ইহার ফলে ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয় না।

স্বাধীনতা বলিতে নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা বুঝায় না। বিধি নিষেধ সমাজ-জীবনকে অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা করে।

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ—অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিজের ইচ্ছামত আচরণ করা। সকলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাধীনতা দিবার জন্যই প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা সংযত করিতে হয়। সর্ব সাধারণের কল্যাণে ন্যায়সঙ্গত বিধিনিষেধ প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ যদি স্বেচ্ছাচারমূলক হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলিতে এইরূপ অন্যায় এবং অসঙ্গত

বাধা নিষেধের অভাবই বুঝায়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন, "বর্তমান সভ্যতায় যে সামাজিক অবস্থা ব্যক্তি-জীবনকে সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্য দান করে, তাহার উপর হইতে নিয়ন্ত্রণের অপসারণই হইল স্বাধীনতা।"

বাধা নিষেধের অনুপস্থিতিই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ পরিচয় নহে। স্বাধীনতা কথাটি অস্তিবাচক। স্বাধীনতার অর্থ আত্মসম্প্রসারণের সুযোগ, মানসিক বৃত্তিসমূহের অনুশীলনের অবকাশ। ল্যাস্কির মতে "স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় সেইরূপ পরিবেশের সমুৎসুক সংরক্ষণ যেখানে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পূর্ণতম সুযোগ লাভ করে।" এইরূপ পরিবেশ রচিত হয় কতগুলি অধিকারের স্বীকৃতির ফলে। অধিকারের অবর্তমানে ব্যক্তি রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি সৃজন সামর্থ্যের অধিকারী। এই সামর্থ্যের সার্থক প্রকাশের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা।

স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী পরিবেশের সংরক্ষণ। এই অর্থে স্বাধীনতা—অধিকার সৃষ্ট

অতএব দেখা যাইতেছে স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন একদিকে অন্যায় নিয়ন্ত্রণের অবিদ্যমানতা, অপরদিকে অপরিহার্য সুযোগ সুবিধার উপস্থিতি।

অপরিহার্য অধিকারের উপর অন্যায় বাধা নিষেধের অনুপস্থিতিই স্বাধীনতার সূচনা করে।

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে স্বাধীনতার সার্থকতা তাহার প্রকৃত প্রয়োগের উপর নির্ভর করে। স্বাধীনতার সম্যক ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিক্ষা। শিক্ষার অভাবে স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না।

স্বাধীনতার সার্থকতা প্রাপ্তিতে নহে, প্রয়োগে।

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty): আপাতঃদৃষ্টিতে আইন ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী বলিয়া মনে হয়, কেননা আইন হইল নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতার অর্থ নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী এবং নৈরাজ্যবাদীগণ আইনকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। তাঁহাদের মতে বন্ধন মাত্রেই অসঙ্গত এবং স্বাধীনতা বিরোধী।

অনেকে মনে করেন আইনের বন্ধন ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে।

এইরূপ মতবাদের সমর্থকগণ স্বাধীনতাকে চরম বা অবাধ অর্থে গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা বলিতে যথেচ্ছ আচরণের অবকাশ বুঝায় না। স্বাধীনতা একটি সামাজিক ধারণা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ইহার অপরিহার্য শর্ত। সকলকে স্বাধীনতা দিবার জন্যই প্রত্যেকের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ সাম্যের প্রয়োজনেই স্বাধীনতার সীমা নির্দেশ করিতে হয়। বিধি-নিষেধ স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

আইন বা রাষ্ট্রের অবর্তমানে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রশক্তি সমর্থিত আইনই স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা

অতএব স্বাধীনতা প্রত্যক্ষভাবে আইনের উপর নির্ভরশীল। আর আইন রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা সমর্থিত বলিয়া স্বাধীনতা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ আইন বা রাষ্ট্রশক্তিই হইল স্বাধীনতার রক্ষক।

আইন স্বাধীনতার স্রষ্টা

আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র এমন এক সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করে যাহা ব্যক্তি-জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্যায় এবং অসাম্যজনিত যে বাধা ব্যক্তিত্বকে ব্যাহত করে, রাষ্ট্রীয় আইন তাহা দূরীভূত করে মাত্র, নূতন কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে না। আইনের সাহায্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, শ্রমিকের মজুরী এবং কার্যকাল নির্দিষ্ট করিয়া, রাষ্ট্র নাগরিকের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বিকাশে সহায়তা করে।

শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যক্তি-স্বাধীনতার সূচনা করে।

সাংবিধানিক আইন নাগরিকের মৌলিক অধিকার স্বীকার করিয়া সরকারের স্বেচ্ছাচারের হাত হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

স্বাধীনতা এবং কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন

আইনের দ্বারা স্বাধীনতা সৃষ্টি এবং সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু আইন যদি প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ব্যক্তিত্বকে অযথা আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহা নিশ্চিতরূপে স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রকর্তৃত্বের মধ্যে এরূপ সমন্বয় সাধন করিতে হইবে, যাহার ফলে ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের পথ উন্মুক্ত থাকে।

স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ (Kinds of Liberty):

"স্বাধীনতা" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। মণ্টেস্কু বলেন, "স্বাধীনতার মত আর কোন শব্দ এত ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই বা মানুষের মনে এরূপ বিচিত্র ধরণের রেখাপাত করে নাই।" স্বাধীনতার প্রকৃতি উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ স্বেচ্ছাচার।

(১) **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা** (Natural Liberty): প্রাকৃতিক পরিবেশে অর্থাৎ সমাজ বা রাষ্ট্রের উদ্ভবের পূর্বে মানুষ যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত, তাহাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। রুশো এইরূপ স্বাভাবিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ স্বাধীনতার ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। আইন বা রাষ্ট্রশক্তির অবর্তমানে স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়।

(২) **সামাজিক বা পৌর স্বাধীনতা** (Civil Liberty) : সমাজ-জীবনে ব্যক্তি যে স্বাধীনতার আস্বাদ পায়, তাহাই সামাজিক বা পৌর স্বাধীনতা। রাষ্ট্র ব্যক্তির বহুবিধ অধিকার, যেমন—জীবন রক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, মত-প্রকাশের অধিকার, ইত্যাদি স্বীকার এবং সংরক্ষণ করিয়া ব্যক্তিত্বের সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়তা করে, রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে সবলের আক্রমণ হইতে দুর্বলের অধিকার রক্ষা করে। সরকারের অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার ধারণা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অন্যায় সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপসারিত করিবার জন্য বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতী।

পৌর স্বাধীনতার অর্থ ব্যক্তি সত্তার পূর্ণ বিকাশের সহায়ক সুযোগ সুবিধা লাভ।

(৩) **রাজনৈতিক স্বাধীনতা** (Political Liberty) : রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় নাগরিক হিসাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের ক্ষমতা। নির্বাচন করিবার এবং নির্বাচিত হইবার অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার অপরিহার্য লক্ষণ।

রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণের অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষণ।

(৪) **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** (Economic Liberty) : অভাব এবং অনিশ্চয়তায় ভয় হইতে মুক্তিই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত। কর্ম-সংস্থানের সুযোগ, উপযুক্ত মজুরী লাভ, বেকার অথবা অক্ষম অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সাহায্য ইত্যাদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সূচনা করে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলিতে বুঝায় দারিদ্র্যের অভিশাপ মোচন।

স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে, নাগরিক হিসাবে এবং শ্রমিক হিসাবে মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে যথাক্রমে পৌর, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে। ব্যক্তি হিসাবে সে দেহ, মন এবং সম্পত্তির স্বাধীনতা ভোগ করে, নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সক্রিয় হইবার সুযোগ পায় এবং শ্রমিক হিসাবে দারিদ্র্য এবং অনিশ্চয়তার অভিশাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

(৫) **জাতীয় স্বাধীনতা** (National Liberty) : জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ জাতির বন্ধন মুক্তি। বৈদেশিক শাসনের অবসান না ঘটিলে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। জাতীয় স্বাধীনতাই ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি। স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অলস কল্পনায় পরিণত হয়। পরাধীন দেশের মানুষ ব্যক্তি-জীবনে স্বাধীনতার আস্বাদ পায় না। তবে জাতীয় স্বাধীনতা থাকিলেই যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। হিটলারের আমলে জার্মানী স্বাধীন

জাতীয় স্বাধীনতার অভাবে অন্যান্য স্বাধীনতার প্রশ্ন অবান্তর।

ছিল, কিন্তু তখন সাধারণ জার্মান নাগরিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করিত একথা বলা যায় না।

স্বাধীনতার রক্ষা কবচ (Safeguards of Liberty) : স্বাধীনতা ব্যক্তি-জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশের প্রতিশ্রুতি বহন করে। স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচিয়া থাকা অর্থহীন। তাই এই অমূল্য সম্পদের সম্যক সংরক্ষণ সর্বদা কাম্য।

সার্বিক বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্থান নাই। একমাত্র গণতন্ত্রেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণের দ্বারা শাসক নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে। অন্য কোন উপায়ে জনগণের দাবী দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি সম্যকরূপে আকর্ষণ করা যায় না। আসন্ন নির্বাচনে পরাজয়ের আশঙ্কাই সরকারকে দায়িত্বশীল করিয়া তুলে। অতএব বলা যায় যে গণতন্ত্র ব্যতিরেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষিত হইতে পারে না।

স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় থাকিবে না। ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রবণতা অসদ্ব্যবহারের দিকে। নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় উন্মত্ত হইয়া জনগণের অধিকার উপেক্ষা করিতে পারে। ক্ষমতার এই অপপ্রয়োগ রোধ করার জন্য বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়।

স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম উপায় হিসাবে কেহ কেহ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ দাবী করেন। আইন, শাসন, এবং বিচার—এই তিনটি কার্য স্বতন্ত্র বিভাগের হস্তে অর্পণ করিলে ক্ষমতার যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করা যায়। কিন্তু এই নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভবও নহে, কাম্যও নহে।

(১) শাসন ক্ষমতার পৃথকীকরণ

প্রকৃত পক্ষে যাহা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়, তাহা হইতেছে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা। বিচারকগণের নির্ভীকতা এবং নিরপেক্ষতাই স্বাধীনতাকে নিরাপত্তা দান করিতে পারে। আইন সভা অথবা শাসনবিভাগের প্রভাব হইতে বিচার বিভাগ যদি মুক্ত না থাকে, তাহা হইলে বিচারের নামে বিচারের প্রহসনই হইয়া থাকে। কার্যকালের নিশ্চয়তা বিচারকগণের স্বাধীনতার সূচনা করে।

(২) বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা

ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে বর্তমানে বহু দেশে নাগরিকের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সংবিধানে লিখিত হওয়ার ফলে অধিকার পবিত্র এবং অলঙ্ঘনীয় বলিয়া গণ্য হয় এবং সরকার তাহাতে ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কিন্তু শাসনতন্ত্রে সন্নিবিষ্ট অধিকারের সনদ ব্যক্তি-স্বাধীনতার নিশ্চিত নিরাপত্তা

(৩) সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ।

বিধান করিতে পারে না। প্রতিটি অধিকারের শর্ত বা ব্যতিক্রম রাখা হয়। এই সব ব্যতিক্রমের অপপ্রয়োগের ফলে স্বাধীনতা বিপন্ন হইতে পারে।

আবার অনেকের মতে আইনের শাসন (Rule of Law) প্রবর্তন করিয়াই ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। তাঁহারা ইংলণ্ডের উল্লেখ করিয়া বলেন, সে দেশে স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষা কবচ হইল আইনের শাসন। আইনের শাসন বলিতে বুঝায়—আইন প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী দেশ শাসিত হইবে, কোন ব্যক্তির ইচ্ছায় নহে। আইনের দৃষ্টিতে ধনী, দরিদ্র, মালিক শ্রমিক সকলেই সমান। যে আদালতে নিতান্ত নগণ্য নাগরিকের বিচার হয়, সেই আদালতেই পরাক্রান্ত প্রধান মন্ত্রীরও বিচার হইবে।

(৪) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা

অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেন—স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralisation of Power) প্রয়োজন। সব সমস্যাই কেন্দ্রীয় সমস্যা নহে। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানের ভার অর্পণ করিলে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দায়িত্ববোধ এবং সৃজন-সামর্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়।

(৫) ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

তাঁহার মতে স্বাধীনতার অপর একটি মূল্যবান শর্ত—সততা এবং নির্ভীকতা সহকারে সংবাদ সরবরাহ করা। সমালোচনার মাধ্যমেই দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা সম্ভব। সংবাদপত্র যে দেশে সরকার অথবা সংরক্ষিত স্বার্থের প্রভাবাধীন, সে দেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কোন মতেই নিরাপদ নহে।

(৬) নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন

স্বাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষা কবচ হইতেছে চিরন্তর সতর্কতা। জনসাধারণ যদি স্বাধীনতা সম্বন্ধে সচেতন না হয়, তাহা হইলে শাসনতান্ত্রিক কোন ব্যবস্থাই তাহা রক্ষা করিতে পারে না। ল্যাস্কির ভাষায় "প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিরোধের সংগঠিত ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই নহে"। আত্মবিশ্বাস এবং সাহসিকতাই হইল স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। সম্ভাব্য অরাজকতার হুমকিই ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্বকে সংযত রাখিবার প্রকৃষ্ট পথ।

(৭) সদাজাগ্রত জনমতই স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষা কবচ।

॥ সারাংশ ॥

সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ। রাষ্ট্র সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কতগুলি নিয়মকানুন প্রবর্তন করে। রাষ্ট্রের এই অনুশাসনগুলিই আইন বলিয়া অভিহিত। আইন মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

রাষ্ট্রশক্তিই ইহার সমর্থন। আইনের অপর একটি বৈশিষ্ট্য সার্বজনীনতা। ইহা সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য।

সামাজিক প্রথা, লোকাচার এবং ধ্যান ধারণাই সার্বভৌম কর্তৃক স্বীকৃত হইয়া আইনে পরিণতি লাভ করে। প্রচলিত প্রথা, ধর্মীয় বিধি, বিচারকের রায়, বিশেষজ্ঞদের ভাষ্য এবং আনুষ্ঠানিক আইন প্রণয়ন—এইগুলিই হইতেছে আইনের উৎস।

আইন ও নীতিঃ বিষয়বস্তু, স্পষ্টতা এবং সমর্থন—এই তিনদিক দিয়া আইন নীতিবোধ হইতে স্বতন্ত্র। যাহা অবৈধ তাহা হয়ত অন্যায় নহে। আবার যাহা নীতি-বিগর্হিত, তাহা সব সময় আইন-বিরুদ্ধ নাও হইতে পারে। আইন ও নীতির মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, উভয়েরই লক্ষ্য সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। সমাজের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা বা মূল্যবোধই কালক্রমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিধিবদ্ধ হইয়া আইন হিসাবে প্রচলিত হয়।

স্বাধীনতার স্বরূপঃ স্বাধীনতা বলিতে সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণ বিহীনতা বুঝায়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ সমাজ-জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। তবে অবাঞ্ছিত বাধা নিষেধের অনুপস্থিতি অবশ্যই কাম্য।

স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ অর্থ হইতেছে ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের উপযোগী পরিবেশের সৃষ্টি এবং সংরক্ষণ। এই হিসাবে স্বাধীনতাকে অধিকারের সৃষ্টি বা সম্ভাব্য ফল বলিয়া জ্ঞান করা হয়।

স্বাধীনতার দুইটি প্রধান স্বরূপঃ জাতীয় এবং ব্যক্তিগত। জাতীয় স্বাধীনতাই ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তি। রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তি পৌর, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক—এই তিন শ্রেণীর স্বাধীনতার আস্বাদ পায়। স্বাধীনতা সম্বন্ধে অপর একটি ধারণা প্রচলিত আছে, তাহা হইল প্রাকৃতিক স্বাধীনতা। কিন্তু এই জাতীয় ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সমাজ ও রাষ্ট্রের অবর্তমানে প্রকৃত স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।

আইন ও স্বাধীনতাঃ আপাতঃ দৃষ্টিতে আইনকে স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কার্যতঃ আইনই স্বাধীনতার স্রষ্টা এবং রক্ষক। আইন স্বেচ্ছাচার রোধ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান দেয়। অন্যায় এবং অসাম্যের প্রতিকার করিয়া আইন স্বাধীনতার নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। তবে আইন যখন প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন করে অথবা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বিরোধী কোন নিয়ম প্রবর্তন করে, তখন তাহা নিশ্চিতরূপে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Define Law. What are the sources of Law ?**
   আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। আইনের উৎস কি কি ? [পৃষ্ঠা ১২৯-১৩১]

2. **"Law is generally regarded as the command of the Sovereign." Discuss**
   "আইন সার্বভৌমের আদেশ মাত্র"—আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১২৯-১৩০]

3. **Explain how Law is related to Morality.**
   আইন ও নীতির মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ১৩১-১৩৩]

4. **Explain the term Liberty. What do you mean by Civil and Political Liberty ?**
   স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝ ? পৌর এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য কি ?
   [পৃষ্ঠা ১৩৩, ১৩৬]

5. **"Civil liberty is not the absence of restraint, but an opportunity for self-realisation."**
   "পৌর স্বাধীনতার অর্থ নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা নহে; আত্মোপলব্ধির সুযোগ"—আলোচনা কর।
   [পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৪]

6. **"Civil Liberty arises from the State."**
   "পৌর স্বাধীনতার স্রষ্টা রাষ্ট্র"—ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ১৩৬]

7. **"Law is the condition of Liberty"—Amplify.**
   "আইনই স্বাধীনতার ভিত্তি"—এই উক্তিটির বিস্তৃত আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৩৪-১৩৫]

8. **What are the safeguards of Liberty ?**
   স্বাধীনতার রক্ষা কবচ কি কি ? [পৃষ্ঠা ১৩৭-১৩৮]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জনমত

(Public Opinion)

জনমতের স্বরূপ (Nature of Public Opinion): জনমত বলিতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিষ বুঝায়।

প্রথমতঃ, ইহা সর্বসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কিত মত। ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত ধ্যানধারণা জনমতের পর্যায়ে পড়ে না।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা বহুজনের সমর্থন পুষ্ট। জনমত গঠনের জন্য সকলকে একমত হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সংসারে নানাজনের নানা মত। আবার জনমতের দ্বারা শুধু সংখ্যা-গরিষ্ঠের মত বুঝায় না। সংখ্যা-গরিষ্ঠের মত যদি সংখ্যালঘু অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে ইহা জনমত বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অপরপক্ষে, সংখ্যালঘিষ্ঠের মত যদি ব্যাপক সমর্থন লাভ করে, তাহা হইলে ইহাও জনমত বলিয়া গৃহীত হয়।

(১)
জনমতের বৈশিষ্ট্য—ইহা সার্বজনীন বিষয়সংক্রান্ত।

রাজনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে জনচিত্তে অহরহ যে সব বিচিত্র এবং বিভিন্ন ধারণার উদ্ভব হয়, তাহার মধ্যে কোনটি হয়ত সময় বিশেষে সমধিক গুরুত্ব অর্জন করে। কোন বিশেষ মতের আবেদন যখন বহুজনে সাড়া দেয়, তখনই তাহা জনমত আখ্যা পায়। প্রথম পর্যায়ে প্রায়শই এই জাতীয় অভিমতের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কিন্তু পরিণামে ইহার অন্তর্নিহিত আবেদন নিশ্চিতরূপে সকলের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিশ্বাস অর্জন করে।

(২)
ইহা সর্বজনগ্রাহ্য

সার্বিক কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত মতই যথার্থ জনমতের মর্যাদা পাইবার যোগ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত যদি সংখ্যালঘুর স্বার্থের পরিপন্থী হয়, তাহা হইলে ইহাকে জনমত বলা যায় না। অথচ সামগ্রিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সমাজের সংখ্যালঘু অংশ যদি কোন ধারণা প্রচার করে, তাহা হইলে ইহাকেও জনমত হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধা নাই।

(৩)
ইহার লক্ষ্য সর্ব-সাধারণের মঙ্গল

ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা বা হুজুগের ফলে যে মত গঠিত হয়, তাহা জনমত নহে। স্থির মস্তিষ্কে বিশ্লেষণ করিলেই এইরূপ মতবাদের অসারতা ধরা পড়ে। জনমতের

ভিত্তি অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কার নহে। সমাজের সজ্ঞান সম্প্রদায়ের বিবেচনা প্রসূত, সুসৃঙ্খল চিন্তাধারাই জনমত বলিয়া অভিহিত হয়। সংখ্যা নহে, আস্থার দৃঢ়তাই সত্যকার জনমতের সূচক।

(৪) ইহা সংস্কারমুক্ত যুক্তিসিদ্ধ অভিমত

জনমতের সংজ্ঞা

প্রকৃত জনমত হইতেছে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারে প্রভাবশালী অংশের যুক্তিপূর্ণ, সচেতন এবং কল্যাণবুদ্ধি প্রসূত মত, যাহা সংখ্যালঘু অংশ পোষণ না করিলেও, স্বেচ্ছায় মানিয়া চলিতে সম্মত হয়।

জনমতের সমালোচনা

জনমত নির্ধারণের কোন নির্ভুল পদ্ধতি আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাই জনমতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, জনসাধারণের রাজনৈতিক বিষয়ে কোন সুচিন্তিত ধারণা নাই। উদাসীন বা অজ্ঞ জনতা সুশৃঙ্খল চিন্তাধারার অধিকারী নহে। অতএব জনমতের সহিত জনতার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। আসলে ইহা মুষ্টিমেয়ের অভিমত মাত্র।

জনমতের গুরুত্ব

রাজতন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্রে জনমতের কোন মূল্য নাই, কিন্তু গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব সর্বাধিক। জনমতের সমর্থনই সরকারের শক্তির একমাত্র উৎস। ইহার অভাবে কোন সরকারই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। সুস্থ জনমতই সরকারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করিতে সমর্থ।

সংগঠিত জনমত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করে এবং সরকার তদনুযায়ী তাহার কার্যসূচী স্থির করে।

গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতিটি আচরণের মধ্যে আমরা জনমতের প্রতিফলন দেখিতে পাই। সুস্থ জনমতের গঠন এবং প্রকাশের সুষ্ঠু ব্যবস্থার উপরেই গণতান্ত্রিক সফলতা নির্ভর করে।

জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম (Agencies or Organs of Public Opinion) :

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি জনমত গঠনে এবং প্রকাশে সাহায্য করে—(১) সংবাদপত্র, (২) বক্তৃতামঞ্চ, (৩) বেতার ও চলচ্চিত্র, (৪) রাজনৈতিক দল, (৫) ব্যবস্থাপক সভা এবং (৬) শিক্ষায়তন।

সংবাদপত্র (Press) : জনমত গঠনের উপায় এবং প্রকাশের বাহন হিসাবে সংবাদপত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। সংবাদপত্র জনস্বার্থ সম্পর্কিত ঘটনাবলী যেরূপ

জনসমক্ষে উপস্থাপিত করে এবং তৎসম্পর্কে সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে বিবেচনাপ্রসূত বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাহা জনগণের ধ্যান ধারণাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। সংবাদপত্র মারফৎ দেশের নানাবিধ সমস্যা বিশ্লেষিত এবং সরকার ও বিরোধীপক্ষের কার্যাবলী সমালোচিত হয়। ইহার ফলে জনসাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটি সুচিন্তিত মতামত স্থির করিতে পারে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে আবার দেশের বিভিন্ন দল, শ্রেণী ও স্বার্থের চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

(১)
জনমত গঠনে ও প্রকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা।

যথার্থ জনমত গঠনের অন্যতম প্রধান শর্ত নির্ভরযোগ্য সংবাদের সরবরাহ। বিকৃত উপাদানের ভিত্তিতে প্রকৃত জনমত গঠন করা সম্ভব নহে। নিরপেক্ষভাবে সত্যকে প্রকাশ করাই সংবাদপত্রের ধর্ম। ইহার জন্য প্রয়োজন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাযন্ত্র গ্রামাফোন শিল্পের সামিল। স্বাধীনতাই সংবাদপত্রের প্রাণ। যদি সততার সঙ্গে সংবাদপত্রকে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন প্রয়োজন সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুদ্রাযন্ত্রের মুক্তি, অন্যদিকে তেমনি তাহাকে শ্রেণী, সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত প্রভাব অতিক্রম করিতে হইবে।

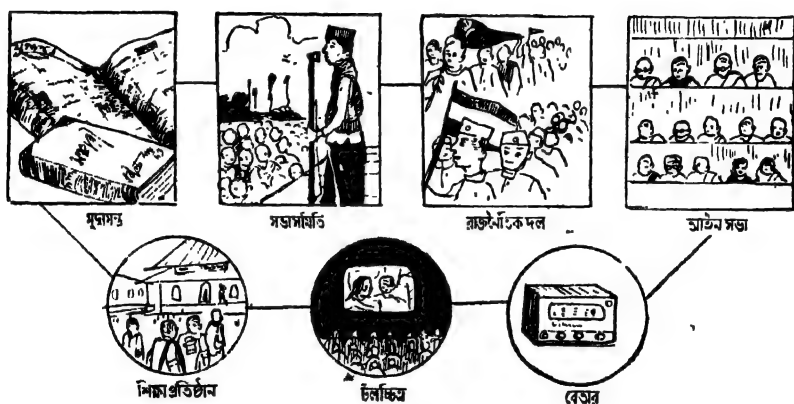
নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশ করাই সংবাদপত্রের কর্তব্য।

বক্তৃতামঞ্চ (Platform): সংবাদপত্রের প্রভাব আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অশিক্ষিত জনতার রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে বক্তৃতামঞ্চের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। প্রকাশ্য জনসভায় সরকার এবং বিরোধীপক্ষের নেতৃবৃন্দ যে ভাষণ দেন, তাহার ফলে জনসাধারণ দেশীয় সমস্যার বিভিন্ন দিক জানিতে পারে। এইভাবে সভাসমিতি জনমত গঠনে সহায়তা করে। বিভিন্ন জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে জনমতের প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায়। সভাসমিতি জনমত প্রকাশের অন্যতম বাহন।

(২)
বক্তৃতামঞ্চ জনমত গঠন ও প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম।

বেতার ও চলচ্চিত্র (Radio and Cinema): আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম অবদান বেতার। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিনব চিন্তাধারার সান্নিধ্যে অগণিত জনসাধারণকে আনয়ন করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পথ। সংবাদপত্রের আবেদন শুধুমাত্র শিক্ষিত জনগণের মধ্যে এবং সভাসমিতির প্রভাব নির্দিষ্ট স্থান ও জনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু যে অঞ্চলের মানুষ অশিক্ষিত এবং যেখানে সভাসমিতির সুযোগ নাই সেখানে বেতারই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ করিতে পারে।

(৩)
বেতার ও চলচ্চিত্রের অবদানও অনস্বীকার্য।



জনমত গঠন ও প্রকাশের মাধ্যম

বেতারের নিরপেক্ষতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে তাহাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আতিশয্য হইতে মুক্তি দিতে হইবে। চলচ্চিত্র সাম্প্রতিক কালে সমধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। ইহা চিত্তবিনোদনের অন্যতম উপায়। আমোদ প্রমোদের মাধ্যমে শিক্ষাদানের এবং জনমত গঠনের ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। সুস্থ রুচি এবং শালীনতা-বোধে উদ্বুদ্ধ চলচ্চিত্র শিল্প আমোদবিলাসীগণকেও জাতীয় প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলে।

রাজনৈতিক দল (Political Parties) : জনগণের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে সংহত এবং সংগঠিত রূপদান করে রাজনৈতিক দল। জনগণের সমর্থন লাভের আশায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাহার আদর্শ এবং কর্মসূচীর স্বপক্ষে নিয়ত প্রচারকার্য চালায়। এইভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনগণ জাতীয় সমস্যার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে এবং সে সম্বন্ধে নির্দিষ্ট মতামত গঠন করিতে পারে।

> (৪)
> **জনমতের গঠন এবং প্রকাশনায় রাজনৈতিক দলের প্রভাব সমধিক।**

ব্যবস্থাপক সভা (Legislature) : দেশের বিভিন্ন শ্রেণী, স্বার্থ ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়। তাঁহাদের মতামতকে জাতির সর্বস্তরের মানুষের অভিমত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার মাধ্যমে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভিযোগ প্রকাশিত হয়, অপরদিকে প্রতিনিধিবর্গের আলোচনা, বিতর্ক, এবং মন্তব্য সংবাদপত্র মারফৎ প্রকাশিত হইয়া জনচিত্তকে প্রভাবিত করে। আইনসভার কার্য বিবরণী হইতে জনসাধারণ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করিতে সমর্থ হয় এবং তদনুযায়ী তাহাদের সুদৃঢ় অভিমত গড়িয়া উঠে।

> (৫)
> **জনমতের সৃষ্টি এবং প্রতিফলনের উপযোগী প্রতিষ্ঠান-ব্যবস্থাপক সভা।**

শিক্ষায়তন (Educational Institution) : বিদ্যামন্দিরের পবিত্র পরিবেশে শিক্ষার্থী যে আদর্শে দীক্ষিত হয়, তাহাই উত্তরকালে তাহার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। ছাত্র অবস্থায় মানুষ দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে যে ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়, পরিণত বয়সেও তাহার প্রভাব সে অতিক্রম করিতে পারে না। দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাই পরোক্ষভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে, তাই একনায়কতন্ত্রে সরকারের অনুকূলে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিই প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

> (৬)
> **জনমত গঠনে শিক্ষায়তনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।**

॥ সারাংশ ॥

সমাজের প্রবলতর অংশের যুক্তিপূর্ণ সচেতন মতই জনমত বলিয়া গণ্য হয়। প্রকৃত অর্থে জনমত হইতেছে সার্বিক কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত সর্বজনগ্রাহ্য অভিমত। রাজতন্ত্র অথবা একনায়কতন্ত্রে জনমতের স্থান নাই। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করিয়াই তাহার কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। জনমতের গঠন ও প্রতিফলনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গণতন্ত্রের সফলতার অন্যতম শর্ত। সংবাদপত্র, বক্তৃতামঞ্চ, বেতার ও চলচ্চিত্র, রাজনৈতিক দল, ব্যবস্থাপক সভা এবং শিক্ষায়তনের মাধ্যমেই জনমত গঠিত এবং প্রকাশিত হয়।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. What is meant by Public Opinion? How does Public Opinion influence legislation in a popular government?
জনমত কাহাকে বলে? গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নে জনমতের প্রভাব কিরূপ?
[পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২]

2. "An alert and intelligent Public Opinion is the first essential of democracy". Discuss.
"সতর্ক এবং সচেতন জনমতই গণতন্ত্রের সর্বপ্রধান অবলম্বন"—আলোচনা কর।
[পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৫]

3. "Successful administration in a modern state depends largely upon the way in which public opinion is formed and expressed." Discuss.
"আধুনিক রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থার সাফল্য প্রধানতঃ জনমত গঠন ও প্রকাশের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে"—আলোচনা কর। [ঐ]

4. Describe the nature of Public Opinion. How is it formulated and expressed?
জনমতের প্রকৃতি বর্ণনা কর। কিভাবে ইহা গঠিত এবং প্রকাশিত হয়। [পৃষ্ঠা ১৪১-১৪৫]

5. What are the chief agencies that mould Public Opinion in modern times? Discuss the strength and limitations of these agencies.
আধুনিক কালে জনমত গঠনের প্রধান উপাদান কি কি? ইহাদের গুণাগুণ আলোচনা কর।
[পৃষ্ঠা ১৪২-১৪৫]

চতুর্দশ অধ্যায়

দল প্রথা

(Party System)

গণতন্ত্রের সফলতার অপরিহার্য শর্ত সুস্থ দল-প্রথা। দল-প্রথা বলিতে একাধিক রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি বুঝায়। গণতান্ত্রিক দেশের শাসনতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও পরোক্ষ সমর্থন অবশ্যই থাকে। রাজনৈতিক দল শাসনব্যবস্থার অঙ্গ নহে সত্য, কিন্তু ইহাই সরকারের প্রাণ শক্তির উৎস।

রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব।

রাজনৈতিক দল (Political Party) বলিতে আমরা এমন একটি সুসংগঠিত নাগরিক সমষ্টিকে বুঝি, যাহারা জাতীয় সমস্যার স্বরূপ এবং সমাধানের উপায় সম্বন্ধে একই ধারণার বশবর্তী এবং নিজস্ব কার্যসূচী অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করিতে ইচ্ছুক।

রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য :

এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করিলে আমরা রাজনৈতিক দলের কয়েকটি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই।

(১) নাগরিক লইয়াই ইহার প্রতিষ্ঠা

প্রথমতঃ, রাজনৈতিক অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তিদের লইয়াই রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ভিন্ন দেশবাসীগণ পররাষ্ট্রে সাময়িক ভাবে সংঘবদ্ধ হইলেও, তাহাদিগকে রাজনৈতিক দল হিসাবে গণ্য করা হয় না। তেমনি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা ছাত্রসংঘও রাজনৈতিক দলের পর্যায়ে পড়ে না।

(২) মৌলিক বিষয়ে মতৈক্য।

দ্বিতীয়তঃ, একটি সুনির্দিষ্ট কর্মনীতিতে দলভুক্ত সকলের সুদৃঢ় আস্থা থাকিবে। সদস্যগণ সব বিষয়ে যে একমত হইবে, এমন কোন কথা নাই। তবে মৌলিক নীতি সম্বন্ধে তাহারা হইবে পরস্পর সম্মত। জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যেক দলের ব্যাখ্যা পৃথক এবং নিজস্ব কার্যসূচীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তাহারা নিঃসন্দেহ।

(৩) সুষ্ঠু সংগঠন

তৃতীয়তঃ, সংগঠন হইল রাজনৈতিক দলের প্রাণ। ইহার অভাবে দল বিশৃঙ্খল জনতায় পরিণত হয়। সংগঠনের দৃঢ়তাই রাজনৈতিক দলের সাফল্যের সূচনা করে। সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দলীয় আদর্শের রূপায়ন সম্ভব।

চতুর্থতঃ, জাতীয় স্বার্থের উন্নয়ন রাজনৈতিক দলের একমাত্র লক্ষ্য। এখানেই রাজনৈতিক দলের সহিত চক্রীদল (Clique or Coterie) বা উপদলে (Faction) পার্থক্য। ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থ সিদ্ধিই চক্রীদল বা উপদলের লক্ষ্য। স্বার্থ-বুদ্ধির প্ররোচনায় তাহারা জাতীয় স্বার্থও বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু জাতি বা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকৃত রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষণ।

(৪) জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির আদর্শ।

নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় জীবন পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দলই সরকার গঠনে সচেষ্ট হয়। শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার জন্য তাহারা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিই পছন্দ করে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক দল বিশ্বাস করে যে সরকারী কর্তৃত্ব হস্তগত করিবার উপায় নিরপেক্ষ নির্বাচন, বিপ্লব নহে।

(৫) নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের প্রয়াস।

রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, আধুনিক নির্বাচক মণ্ডলীর আবির্ভাবের সমসাময়িক ঘটনা। জাতীয় কল্যাণ সাধন প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য। কিন্তু অনুসৃত পদ্ধতির তারতম্য রহিয়াছে। পৃথক কর্মপন্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। দলগত বিভিন্নতার মূল কারণ মনুষ্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। কোন ব্যক্তি একান্ত ভাবে সংরক্ষণশীল আবার কেহ হয়ত উগ্র সংস্কারপন্থী। স্বাভাবিক ভাবেই এই দুই জাতীয় লোক পৃথক দলভুক্ত হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত দলীয় বৈষম্যের প্রধান কারণ হিসাবে নির্দিষ্ট হয়, আবার দল ব্যবস্থায় পরিবেশের প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। বলা হয় ধর্মের মত রাজনৈতিক চিন্তাধারাও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। চার্চের মত রাজনৈতিক দলের সদস্যপদও তাই বংশানুক্রমিক। ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্মের প্রভাব অপস্রিয়মান, কিন্তু প্রাচ্যভূমিতে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠায় ধর্মের ভূমিকা নগণ্য নহে।

দলগত বিভিন্নতার কারণ : (১) প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য (২) স্বার্থবোধ (৩) পরিবেশ এবং (৪) ধর্ম।

রাজনৈতিক দলের কার্য (Functions of Political Parties) :

বর্তমান যুগে নির্বাচকমণ্ডলী বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন। সমস্যার জটিলতা এবং সংখ্যাধিক্য সাধারণ নাগরিককে বিব্রত করিয়া তুলে। সময়োপযোগী সমস্যা নির্বাচন এবং তাহার প্রতি জনচিত্তকে আকর্ষণ করাই হইতেছে রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক কার্য।

(১) সমস্যা নির্বাচন।

এবং সংরক্ষণশীল নামে পরিচিত হয়। কালক্রমে উদারনৈতিক দলের পতনের পর তাঁহার স্থান দখল করে শ্রমিক দল। বর্তমানে ইংলণ্ডে সংরক্ষণশীল দল ক্ষমতায় আসীন এবং শ্রমিক দল বিরোধীপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত। বিদায়ী রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার ছিলেন রিপাবলিকান দলভুক্ত এবং নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কেনেডি ডেমোক্র্যাটিক দলের সভ্য। মার্কিন কংগ্রেসের উভয়কক্ষে বর্তমানে শেষোক্ত দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে। মার্কিন শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ রাষ্ট্রপতিকে দলনিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে কল্পনা করিয়াছিলেন। জাতীয় ঐক্যের প্রধান প্রতিবন্ধক দলপ্রথা—ইহাই ছিল তাঁহাদের ধারণা। কিন্তু যে সম্ভাবনাকে তাঁহারা এড়াইতে চাহিয়াছিলেন, তাই আজ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার লক্ষণ।

যখন কোন রাষ্ট্রে দুইয়ের অধিক রাজনৈতিক দল থাকে, তখন তাহা বহু-দলীয় ব্যবস্থা বলিয়া অভিহিত হয়। বহু-দলীয় ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক সভা বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। ফ্রান্স বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ভারতবর্ষে বহু রাজনৈতিক দল থাকিলেও কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বহুদলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি (Case for Two-party system):

যখন দেশে দুইটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে, তখন একটি দল অবশ্যম্ভাবীভাবে আইন সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠনে প্রবৃত্ত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রীসভা স্বভাবতঃই দৃঢ়তার পরিচয় দেন। মন্ত্রীগণ একই রাজনৈতিক দলভুক্ত বলিয়া সকলে পূর্ণ সহযোগিতা সহকারে কাজ করেন। অবাঞ্ছিত আপোসরফার ফলে নীতিগত শৈথিল্য প্রশ্রয় পায় না। রাজনৈতিক আদর্শের অভিন্নতার ফলে যৌথ দায়িত্বের স্বরূপ অব্যাহত থাকে। আবার আইনসভায় পরিষ্কার সংগরিষ্ঠতা থাকার দরুণ মন্ত্রীসভার আকস্মিক পতনের আশঙ্কা থাকে না।

(১)
দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় স্থায়ী এবং দৃঢ় সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা সংগঠিত বিরোধিতার সূচনা করে। একটি মাত্র বিরোধী দল থাকায় তাহার নীতি ও কার্যক্রমের সঙ্গতি থাকে। আপোষের প্রয়োজনে বিরোধিতার তীব্রতা হ্রাস পায় না। সরকারও বিরোধীপক্ষের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকে।

(২)
ইহা বলিষ্ঠ বিরোধী দলের সূচনা করে।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচন কার্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া উঠে। দুইটি বিকল্প নীতির একটিকে বাছিয়া লইতে জনগণকে কোনরকম বেগ পাইতে হয় না। নির্বাচকমণ্ডলী সহজেই প্রতিদ্বন্দ্বী দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে মনোনীত করিতে পারে।

(৩)
ইহার ফলে নির্বাচন কার্য সহজ হয়।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি (Case against Two-party system):

দুইটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে আইন সভায় জনমতের সম্পূর্ণ প্রতিফলন হয় না। এমন অনেক লোক দেশে থাকিতে পারেন, যাঁহারা এই দুইটি দলের কোনটিকে সুনজরে দেখেন না। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ফলে তৃতীয় পক্ষের মতামত আইন সভায় প্রকাশ পায় না। তাহা ছাড়া, নির্বাচকমণ্ডলীর একটি অংশ, এই দুইটি দলের মনোনীত প্রার্থীদ্বয়কে পছন্দ করেন না বলিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন। এইভাবে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ফলে জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিনিধিত্বের অবকাশ পায় না।

(৪)
দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার জনমতের পর্যাপ্ত প্রতিফলন হয় না।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার ফলে মন্ত্রীসভা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যে কোন নীতিকে কার্যকরী করিতে পারে। বিরোধীপক্ষের সমালোচনা এমত পরিস্থিতিতে অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছু নয়। ইহার দ্বারা আইন সভার গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং মন্ত্রীসভা স্বৈরাচারী হইয়া উঠে।

(২)
ইহা সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেয়।

বহু-দলীয় ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি (Case for Multiple-party system):

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রতিটি যুক্তপূর্ণ মতের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। বহু-দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের এই শর্তপূরণে সহায়তা করে। জনগণের নির্বাচন দুইটি মাত্র বিকল্পনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাহারা নিজস্ব অভিরুচি অনুযায়ী প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে।

(১)
বহুদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্র সম্মত।

বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকিলে আইন সভার কোন দলই সচরাচর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতালাভ করিতে পারে না। ফলে একাধিক দলের মিলিত মন্ত্রীসভা (Coalition ministry) গঠিত হয়। ইহাতে কোন দলই যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। একাধিক দলের আপোষ আলোচনার দ্বারা সরকার পরিচালিত হয় বলিয়া শাসন ক্ষমতার অপব্যবহার হয় না।

(২)
ইহা যথেচ্ছ শাসনের প্রতিবন্ধক।

বহুদলীয় ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি (Case against Multiple-party system) :

(১) ইহার ফলে স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করা যায় না।

আইনসভায় কোন দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায়, প্রায়শই যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু একাধিক দলের এই মিলন একেবারে কৃত্রিম। আদর্শগত বিভিন্নতার কারণে তাহারা একযোগে বেশীদিন কাজ করিতে পারে না। তাই ঘন ঘন মন্ত্রীসভার পরিবর্তন ঘটে। মন্ত্রীসভার স্থায়িত্বের অভাবে শাসন ব্যাপারে নানারূপ দুর্বলতা দেখা যায়।

(২) ইহার কারণে দলগুলি আদর্শচ্যুত হয়।

বহু দল থাকার ফলে, প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই অপরের সহিত মিলিত হইয়া সরকার গঠনে প্রবৃত্ত হয়। বিপরীত মতাবলম্বী দলগুলিকেও এই কারণে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করিতে দেখা যায়। এইভাবে আপোষ মীমাংসা করিয়া শাসন ক্ষমতা দখলের মোহে রাজনৈতিক দলগুলি আদর্শ ভ্রষ্টতার পরিচয় দেয়।

(৩) বহু দল থাকায় নির্বাচনে জটিলতা দেখা দেয়।

ইহা নির্বাচন ব্যবস্থাকে অযথা জটিল করিয়া তুলে। অসংখ্য দলের বিঘোষিত বহু নীতির মধ্যে একটিকে বাছিয়া লওয়া বা বহু প্রার্থীর মধ্যে একজনকে নির্বাচন করা অপেক্ষাকৃত বিবেচনা সাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

সিদ্ধান্ত : দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাই কাম্য।

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাই গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়নের উপযোগী বলিয়া গণ্য হয়। সুস্থ দলপ্রথার সন্ধান একমাত্র ইংলণ্ডেই পাওয়া যায়। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা সরকারের নীতিনিষ্ঠ দৃঢ়তার এবং স্থায়িত্বের সূচনা করে। আবার সুগঠিত বিরোধিতার অবকাশ দিয়া ইহা সরকারের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করে। তাহা ছাড়া ইহার ফলে নির্বাচন ব্যয় হ্রাস পায় এবং নির্বাচন সমস্যাও সরল হইয়া উঠে। এই সব কারণে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে অনেকেই আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন।

। সারাংশ ।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন মতকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে। দলপ্রথা তাই গণতন্ত্রের অপরিহার্য লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায়—

(১) এমন একটি নাগরিক সমষ্টি, (২) যাহারা সুসংগঠিত, (৩) সার্বজনীন কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত, (৪) মৌলিক বিষয়ে পরস্পর সম্মত এবং (৫) নির্বাচনের

মাধ্যমে শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করিতে সচেষ্ট। সার্বিক কল্যাণের ধারণাই রাজনৈতিক দলকে উপদল হইতে পৃথক করে।

রাষ্ট্রের উন্নতি সব রাজনৈতিক দলেরই লক্ষ্য। কিন্তু কোন্ পথে বা পদ্ধতিতে সর্বাধিক মঙ্গল হইতে পারে, এ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। দলগত বিভিন্নতার মূলে রহিয়াছে মানুষের (১) প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, (২) স্বার্থবোধ, (৩) পরিবেশ এবং (৪) ধর্ম।

রাজনৈতিক দলের কার্য :

(১) সময়োপযোগী সমস্যা নির্বাচন, (২) সুচিন্তিত কার্যসূচী প্রণয়ন, (৩) স্বীয় আদর্শ প্রচার এবং জনমত গঠন, (৪) প্রার্থী মনোনয়ন এবং (৫) সরকার গঠন বা বিরোধীপক্ষের ভূমিকা গ্রহণ।

দলপ্রথার পক্ষে যুক্তি :—(১) দলপ্রথা সুশৃঙ্খল নির্বাচনের সহায়তা করে, (২) ইহার ফলে বিচ্ছিন্ন জনতা সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ লাভ করে, (৩) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থনই সরকারের স্থায়িত্বের ভিত্তি, (৪) সরকারের সহিত শাসিতের সংযোগ রক্ষার মাধ্যম হইতেছে রাজনৈতিক দল; (৫) সঙ্গত সমালোচনার দ্বারা বিরোধীদল সরকারকে সংযত করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা বজায় রাখে; (৬) দলপ্রথা জনগণের অপ্রকাশিত আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ ক্ষমতা দান করে এবং জনমত গঠনে সাহায্য করে; (৭) দলপ্রথা রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারের উপায়; (৮) শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিকল্প সরকার গঠনের সম্ভাবনা এই দলপ্রথার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

বিপক্ষে যুক্তি :—(১) দলপ্রথা জাতীয় ঐক্যের প্রধান প্রতিবন্ধক; (২) একই দলভুক্ত সভ্যদের ঐক্য অন্তঃসারশূন্য, (৩) আদর্শভ্রষ্ট দল রাষ্ট্রের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, (৪) ইহা ব্যক্তিত্বকে দলের বেদীমূলে বিসর্জন দেয়, (৫) দলপ্রথা নানা দুর্নীতির আকর, (৬) দলীয় শাসনে দক্ষতার অভাব ঘটে।

দলপ্রথা ত্রুটিবহুল, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু ইহা ব্যতীত প্রতিনিধিমূলক শাসন চলিতে পারে না। জনগণের নৈতিক মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দলপ্রথার দোষ দূর হইবে।

ইংলণ্ড দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার জন্মভূমি। ফ্রান্স বহু-দলীয় ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বহু-দলীয় ব্যবস্থা জনমতের পর্যাপ্ত প্রতিফলনের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য নহে। নির্বাচন ব্যবস্থার সারল্য, স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন, সুগঠিত বিরোধিতার অবকাশ ইত্যাদি দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই ধরা পড়ে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Define a Political Party. Distinguish between a Party and a faction.**
রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাজনৈতিক দল এবং উপদলের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। [পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৮]
2. **Describe the role of political parties in a democracy.**
গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা কি—তাহা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৪৭-১৪৯]
3. **Discuss the merits and defects of the Party system.**
দল-প্রথার সুফল এবং কুফল সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫২]
4. **What is a Political Party ? What are its functions ?**
রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে ? ইহার কাজ কি কি ? [পৃষ্ঠা ১৪৭, ১৪৮-১৪৯]
5. **Write notes on : (1) Two Party System, (2) Multiple Party system.**
টীকা লিখ : (১) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা, (২) বহুদলীয় ব্যবস্থা। [পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৫]

পঞ্চদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রকৃত্যক

(Public Services)

সরকারী কর্মচারীগণ সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রকৃত্যক নামে অভিহিত।

গণতান্ত্রিক সরকারের শীর্ষস্থানে যাহারা থাকেন, যেমন রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রীমণ্ডলী প্রভৃতি তাঁহারা সকলেই অস্থায়ী কর্মকর্তা এবং জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। তাঁহারা রাজনীতিজ্ঞ এবং শাসন ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য বহু কর্মকুশল কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়কে 'রাষ্ট্রকৃত্যক' আখ্যা দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রকৃত্যকের বৈশিষ্ট্য (Charateristics of Public Services) :

রাষ্ট্রভৃত্যগণ (১) স্থায়ী, (২) নিরপেক্ষ (৩) পেশাদার (৪) বেতনভুক এবং (৫) দক্ষ।

রাষ্ট্রকৃত্যকভুক্ত কর্মচারীরণের পদ স্থায়ী। প্রমাণিত অসদাচারণ বা অকর্মণ্যতা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে সহজে পদচ্যুত করা যায় না। তাঁহারা রাজনীতি-নিরপেক্ষ। যে কোন দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাঁহারা বিশ্বস্তভাবে আপন কর্তব্য পালন করেন। রাজনৈতিক দলের উত্থান পতনের সহিত তাঁহাদের ভাগ্য জড়িত নহে। শাসনকার্য পরিচালনা করাই তাঁহাদের বৃত্তি।

তাঁহারা নির্দিষ্ট হারে বেতন, ভাতা ইত্যাদি পাইয়া থাকেন। দক্ষতা বা পারদর্শিতাই তাঁহাদের প্রধান বৈশিষ্ট।

রাষ্ট্রকৃত্যকের ভূমিকা (Role of Public Services) ঃ

রাষ্ট্রকৃত্যক সরকারের রাজনৈতিক শাখাব পরিপূরক।

রাষ্ট্রকৃত্যক বা জনপালন কৃত্যককে "উনবিংশ শতাব্দীর অভাবনীয় রাজনৈতিক আবিষ্কার" বলিয়া অভিহিত করা হয়। বর্তমান রাষ্ট্র শুধু আয়তনেই বৃহৎ নহে, তাহার কার্যক্রমও বহুধাবিস্তৃত। এই বিপুল কর্মভার বহনের সামর্থ্য নির্বাচিত স্বল্পসংখ্যক বিভাগীয় প্রধানদের নাই। তাহা ছাড়া তাঁহারা শাসন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নহেন। অস্থায়ী পদাধিকারীর নিকট হইতে বৃত্তিগত কুশলতা আশা করা যায় না। আবার বিশেষজ্ঞসুলভ গুণাবলী অনেকক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত বলিয়া বিবেচিত হয়। তাই মন্ত্রীপরিষদের শাসনকে অনভিজ্ঞের শাসন (Government by Amateurs) নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহাদের রাজনৈতিক আদর্শ পেশাদার রাষ্ট্রভৃত্যগণের দ্বারাই বাস্তবে রূপায়িত হয়।

শাসনযন্ত্র পরিচালনা তাঁহাদের প্রাথমিক কার্য।

রাজনীতিজ্ঞ বিভাগীয় প্রধানগণ শাসন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করেন। রাষ্ট্রভৃত্যগণের কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে এই নীতিকে প্রয়োগ করা। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ বা আইনসভার অনুশাসন অনুযায়ী তাঁহারাই সমগ্র দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বিধান করেন। শাসনযন্ত্রকে তাঁহারাই চালু রাখেন।

নীতিনির্ধারণে সহায়তা করা রাষ্ট্রভৃত্যের অন্যতম কর্তব্য।

নির্বাচিত কর্মকর্তাগণ নিজস্ব বিভাগের বৃত্তিগত দিক সম্বন্ধে অবহিত নহেন। অথচ শাসননীতি তাঁহারাই স্থির করেন। পটু, পেশাদার কর্মচারীদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত পরামর্শ সেইজন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে অপরিহার্য। অন্যথায় সরকারীনীতি অবাস্তব এবং অলীক হইয়া পড়ে। বাস্তবধর্মী কার্যসূচী প্রণয়নে রাষ্ট্রভৃত্যের ভূমিকা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁরাই দৈনন্দিন শাসনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন।

পরিবর্তনশীলতা গণতান্ত্রিক শাসনের ধর্ম। নির্দিষ্ট সময় অন্তর রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্তন হয়। রাজনৈতিক শাখার এই নিয়ত পরিবর্তনের প্রভাব শাসন-কাঠামোকে স্পর্শ করে না। ফ্রান্সে ঘন ঘন মন্ত্রীসভার পতনের ফলে শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া পড়ে নাই। দৈনন্দিন শাসনের ধারাবাহিকতা রাষ্ট্রভৃত্যগণই অক্ষুণ্ণ রাখেন।

আধুনিককালে রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত সর্ববিধ কার্যই দৈনন্দিন শাসনের পর্যায়ে পড়ে না। রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালন, রেলপথ, বিমান, ডাক ও তার বিভাগ তত্ত্বাবধান, বন্যানিরোধ, বাস্তুহারা পুনর্বাসন প্রভৃতি কার্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই সুসম্পাদিত হইতে পারে।

রাষ্ট্রভৃত্যগণ বিভিন্ন গঠনমূলক কার্যও পরিচালনা করেন।

সরকার এবং জনসাধারণের পারস্পরিক যোগাযোগ রাষ্ট্রভৃত্যগণের মাধ্যমেই সাধিত হয়। সরকারের মুখপাত্র হিসাবে তাঁহারা জনগণের নিকট সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করেন। আবার জনগণের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলিয়া, তাঁহারাই জনসাধারণের বাস্তব সুবিধা অসুবিধার সংবাদ সরকারকে সরবরাহ করেন।

রাষ্ট্রকৃত্যক সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে।

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পদ্ধতি (Method of Appointment to Public Services) :

আধুনিক কালে প্রত্যেক গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই রাষ্ট্রভৃত্যগণ নিযুক্ত হন। এই পরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ নিয়োগ কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন প্রার্থীগণের যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। বিভাগীয় প্রধানদের হাতে মনোনয়নের অধিকার থাকিলে স্বজন-তোষণনীতি প্রশ্রয় লাভ করে এবং অযোগ্য ব্যক্তিও সরকারী চাকুরী পায়। ইহার ফলে রাষ্ট্র-কৃত্যকের নিরপেক্ষতা, সততা এবং কর্মকুশলতা ব্যাহত হয়। তাই মনোনয়নের পরিবর্তে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই কর্মচারী নিয়োগ পদ্ধতি সর্বত্র অনুসৃত হইতেছে। অবশ্য নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে জড়িত, বা গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয় কার্যে নিযুক্ত উচ্চ শ্রেণীর কিছু সংখ্যক কর্মচারী সব দেশেই শাসন বিভাগের দ্বারা মনোনীত হন।

রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগের নিরপেক্ষ পদ্ধতি হইতেছে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি শাসন বিভাগীয় নির্দেশ অনুসারে ইংলণ্ডে প্রথম নিয়োগ কমিশন (Civil Service Commision) গঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে এই ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিবহুল। কালক্রমে ইহার প্রভূত পরিবর্তন সাধন করা হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের অপর একটি যুগান্তকারী ঘোষণার দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারের প্রায় সর্বস্তরের কর্মচারী নিয়োগের একমাত্র পদ্ধতি বলিয়া গৃহীত হয়।

নিয়োগ কমিশনের মাধ্যমেই সর্বত্র সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন কংগ্রেস নিয়োগ কমিশন গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়। কিন্তু ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথা পরিত্যক্ত হয়। ইহার পর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের 'Pendleton Act' অনুযায়ী প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। ইহাই বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের মৌলিক আইন।

ভারতবর্ষে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের জন্য কেন্দ্রে এবং প্রত্যেক রাজ্যে রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ কমিশন গঠনের বিধান সংবিধানে লিখিত আছে। এই কমিশন নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থীগণের যোগ্যতা যাচাই করে এবং যোগ্যতমের নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারের নিকট সুপারিশ করে।

নিয়োগ কমিশনের স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন।

প্রায় সব দেশেই রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ কমিশনের সদস্যগণকে শাসন বিভাগের প্রভাব মুক্ত রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নির্ভীক এবং নিরপেক্ষ নিয়োগ কমিশনই সৎ এবং সুযোগ্য কর্মচারী নিয়োগ সম্ভব করিয়া শাসন যন্ত্রের দক্ষতা এবং সততা বিধান করিতে পারে।

রাষ্ট্রভৃত্যগণের চাকুরীর শর্তাদি সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

রাষ্ট্রভৃত্যগণের চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং সন্তোষজনক শর্তাদি তাঁহাদের দক্ষতা-বৃদ্ধির সহায়ক। তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে হইলে নিয়োগ কমিশনের মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রায় সব দেশের শাসনতন্ত্রই স্বীকার করে। তাহা ছাড়া তাঁহাদের পদোন্নতির ব্যাপারে পক্ষপাতশূন্য নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। মিল বলেন রাষ্ট্রভৃত্য-গণের পদোন্নতির ব্যাপারে মিশ্রিত নীতি গ্রহণ করা উচিত। যে সমস্ত কাজ গতানুগতিক ভাবে চলে, তাহার জন্য শুধু মাত্র অভিজ্ঞতাকেই পদোন্নতির ভিত্তি বলিয়া ধরা কর্তব্য। কিন্তু যে সকল কার্যে প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রয়োজন, সে সব ক্ষেত্রে নির্বাচন (Selection) বিধেয়।

রাষ্ট্রভৃত্যের সহিত জনগণের সম্পর্ক (Relation between the Public Servant and the Public) :

আমলাতন্ত্রে, রাষ্ট্রভৃত্য জনগণের প্রভুর আসনে সমাসীন।

আমলাতন্ত্রে রাষ্ট্রভৃত্যের যে ভূমিকা, গণতন্ত্রে তাহা নহে। আমলাতন্ত্রে যান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসরণ করাই রাষ্ট্রভৃত্যের কর্তব্য। তাহার কার্য নিয়ম মাফিক, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম নাই। হৃদয়হীন দক্ষতাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। জনগণের দাবী দাওয়া এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। এই জাতীয় শাসনে রাষ্ট্রভৃত্য

এবং জনগণের মধ্যে একটা দুরতিক্রম্য ব্যবধান গড়িয়া উঠে। আমলাতান্ত্রিক আইনও এই পার্থক্যের পোষকতা করে। রাষ্ট্রভৃত্যের বিচারার্থ পৃথক আদালত এই শ্রেণী শাসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গণতন্ত্রে রাষ্ট্রভৃত্য প্রকৃতই জনগণের সেবক।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রভৃত্য যথার্থই জনগণের সেবক। তিনি জনসাধারণের ভাগ্যনিয়ন্তা নহেন, তাহাদের প্রকৃত বন্ধু এবং পথ-প্রদর্শক। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রে জনসেবাই হইল তাহার কর্তব্য। রাষ্ট্রভৃত্যগণের সেবাপরায়ণতা, ন্যায় নিষ্ঠা এবং কর্মতৎপরতার উপরেই জনগণের কল্যাণ এবং সরকারের সুনাম নির্ভর করে।

॥ সারাংশ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে থাকেন রাজনীতিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ। তাঁহাদিগকে সাহায্য দানের জন্য যে সব স্থায়ী সরকারী কর্মচারী থাকেন তাঁহাদিগকে সামগ্রিক ভাবে "রাষ্ট্র কৃত্যক" আখ্যা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রভৃত্যগণ (১) স্থায়ী পদাধিকারী, (২) পেশাদার, (৩) বেতনভুক, (৪) রাজনীতি নিরপেক্ষ এবং (৫) বিশেষজ্ঞ।

রাষ্ট্রকৃত্যক সরকারের রাজনৈতিক শাখার পরিপূরক। (১) পেশাদার কর্মচারীগণ অনভিজ্ঞ কর্মকর্তাদিগকে নীতি-নির্ধারণ ব্যাপারে সহায়তা করেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের বাস্তবজ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে সরকারী সিদ্ধান্ত অলস কল্পনায় পরিণত হয়। (২) স্থায়ী কর্মচারীগণই অস্থায়ী কর্মকর্তাদের উত্থান পতনের মধ্যে শাসনের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। (৩) তাঁহারাই সরকারী নীতিকে প্রয়োগ করেন এবং শাসনযন্ত্রকে চালু রাখেন। (৪) সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রে দৈনন্দিন শাসন বহির্ভূত বহু কল্যাণমূলক কার্য তাঁহারা পরিচালনা করেন। (৫) তাঁহারাই সরকারের সহিত জনসাধারণের সংযোগ রক্ষা করেন।

প্রায় সর্বত্র রাজভৃত্যগণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে, নিয়োগ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নিযুক্ত হন। এই নিয়োগ কমিশনের স্বাধীনতা একান্তভাবে কাম্য। একমাত্র ইহার ফলেই নিরপেক্ষ ভাবে একমাত্র যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রভৃত্যগণের চাকুরীর শর্তাদি বহুলাংশে তাঁহাদের দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। একদিকে যেমন তাঁহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব প্রয়োজন, অপরদিকে পদোন্নতি ব্যাপারেও নির্দিষ্ট নিয়ম থাকা বাঞ্ছিত।

ষোড়শ অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

(Characteristics of the Constitution of India)

ভূমিকা ঃ যে সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা বর্তমানে পরিচালিত হইতেছে তাহা একটি গণপরিষদের দ্বারা প্রণীত। দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা বিদেশী শাসকের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট তখন ছিল ভারতীয় শাসনব্যবস্থার নিয়ামক। নির্বাচিত গণপরিষদের মাধ্যমে নিজস্ব সংবিধান রচনার যে দাবী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ১৯৪২ সালে ক্রিপস প্রস্তাবের (Cripps Proposals) দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছিল। পরে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Scheme) অনুসারে গণপরিষদ (Constituent Assembly) আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তদনুযায়ী ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে নবগঠিত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পার্লামেণ্ট-প্রণীত ভারতীয় স্বাধীনতা আইনের (Indian Independence Act) দ্বারা শাসনক্ষমতা হস্তান্তরিত এবং অখণ্ড ভারত দুইটি স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নে বিভক্ত হইল। অবিভক্ত ভারতের গণপরিষদ অতঃপর ভারত এবং পাকিস্তানের দুইটি পৃথক গণপরিষদে পরিণত হইল। ১৯৪৭ সালে ২৯শে আগষ্ট ভারতীয় গণপরিষদ ডাঃ আম্বেদকরের সভাপতিত্বে একটি খসড়া কমিটি (Darfting Committee) নিয়োগ করে এবং এই কমিটি ১৯৪৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। খসড়া সংবিধান (Draft Constitution) ব্যাপকভাবে প্রচারিত এবং আলোচিত হইয়াছিল। ১৯৪৮ সালের ৫ই নভেম্বর ইহা গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। সুদীর্ঘ সমালোচনা এবং বিতর্কের পর ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ইহা গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত এবং সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী এই সংবিধান প্রবর্তিত হয়। ২৬শে জানুয়ারী ঐতিহাসিক অর্থে প্রতিজ্ঞা-দিবস। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ঠিক ২০ বৎসর পূর্বে ভারতের প্রতিটি প্রান্তে সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত নেহেরুর সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় জনগণ একনিষ্ঠভাবে পূর্ণ স্বরাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। আজিকার প্রজাতন্ত্র দিবস সেই ঐতিহাসিক স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতি বহন করিতেছে।

শাসনতন্ত্র চালু হইবার পর প্রায় ১৪ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত দলিলের কিছু রূপ বদল করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধান নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ১৭ বার সংশোধিত হইয়াছে। আনুষ্ঠানিক সংশোধন ছাড়াও প্রথাগত বিধান, বিচারালয়ের ব্যাখ্যা ইত্যাদির মাধ্যমে মূল সংবিধানের যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ভারতের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় পাইতে হইলে উপরি-উক্ত পরিবর্তনের সন্ধান অবশ্যই করিতে হইবে।

সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of the Constitution) :

বিভিন্ন দিক দিয়া ভারতীয় সংবিধান স্বাতন্ত্র্য দাবী করে। ইহার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে বর্ণিত হইল :—

(১) ভারতীয় সংবিধান লিখিত।

ভারতীয় শাসনব্যবস্থার মূলনীতিগুলি গণপরিষদ কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে একটি প্রচ্ছন্ন মনোভাব ব্যক্ত হয়। তাহা হইতেছে, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানকে অতীত হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র করিবার অভিলাষ। লিখিত সংবিধান এই মর্মে একটি ঘোষণামাত্র।

২। ইহা বৃহত্তম সংবিধান।

পৃথিবীর লিখিত সংবিধানগুলির মধ্যে ভারতীয় সংবিধান সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। ইহা ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৯টি তপশীলে বিভক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল শাসনতন্ত্র ছিল মাত্র ৭টি অনুচ্ছেদ-সমন্বিত।

বৃহদায়তন হইবার কারণ।

একাধিক কারণে ভারতীয় সংবিধানের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ, সংবিধানের রচয়িতাগণ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের শাসন-তন্ত্রের মূল্যবান নীতিসমূহ ভারতীয় সংবিধানে সংযোজিত করিয়াছেন। ইহার ফলে সংবিধানের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় জনগণ পূর্ব হইতেই বৃহদায়তন সংবিধানের সহিত পরিচিত ছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক বিষয়সমূহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল। নূতন সংবিধানে এই পদ্ধতিই অনুসৃত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় সংবিধানে শাসনের মূলনীতি ছাড়াও বহু খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ডাঃ আম্বেদকর ইহার সপক্ষে বলেন : ' "যেখানে জন-সাধারণ শাসনতান্ত্রিক নীতিবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত, কেবলমাত্র সেখানেই মূল সংবিধান হইতে খুঁটিনাটি বিষয় বাদ দিয়া তাহা পূরণের ভার আইন সভার উপর

ছাড়িয়া দেওয়া নিরাপদ। কিন্তু গণতন্ত্র ভারতের নিজস্ব আদর্শ নহে। একান্তভাবে অগণতান্ত্রিক পরিবেশের উপর ভারতীয় গণতন্ত্র আরোপিত হইয়াছে। কাজেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে আত্মসমর্পণ না করাই যুক্তিযুক্ত।"

চতুর্থতঃ, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের সংবিধানে কেবলমাত্র কেন্দ্রের শাসন ব্যবস্থারই উল্লেখ থাকে এবং রাজ্যগুলি স্বতন্ত্র সংবিধান রচনা করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েরই শাসন ব্যবস্থার বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে। একমাত্র ব্যতিক্রম জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য।

পঞ্চমতঃ, শাসনতন্ত্রের প্রণেতৃবর্গ অপর একটি জটিলতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য লইয়া ব্রিটিশ ভারত গঠিত ছিল। শাসন পদ্ধতি এবং সভ্যতার দিক হইতে তাহারা ছিল সম্পূর্ণ অসম। কাজেই তাহাদের সকলের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বিভিন্ন শ্রেণীর অঙ্গ রাজ্যের জন্য পৃথক ধারা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এই পার্থক্যের অবসান ঘটিয়াছে। এখন সব রাজ্য সমপর্যায়ভুক্ত।

ষষ্ঠতঃ, তপশীলভুক্ত বর্ণ ও উপজাতি এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ সংবিধানে করা হইয়াছে।

সপ্তমতঃ, মৌলিক অধিকারের তালিকা ছাড়াও কতগুলি নির্দেশাত্মক নীতি সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে স্থান পাইয়াছে। ভারতের ভৌগোলিক বিস্তৃতি এবং কৃষ্টিগত বৈচিত্র্যের সহিত সঙ্গতি বিধান করিতে যাওয়ার ফলে ভারতীয় সংবিধান বিপুলায়তন হইয়া উঠিয়াছে।

(৩)
ইহাতে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে।

ভারতীয় সংবিধানে লোকায়ত্ত সার্বভৌমিকতার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে ইহা জনগণের দ্বারা সৃষ্ট এবং ইহার লক্ষ্য সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত এবং প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সরকারের দ্বারা পরিচালিত। তাহা ছাড়া এখানে বংশগত অধিকার রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অস্বীকৃত।

(৪)
যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে ভারতকে রাজ্য সমূহের সংঘ (Union of States) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ সাধারণভাবে ভারতে পরিদৃষ্ট হইলেও, ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রপ্রবণতা অনস্বীকার্য। স্বাভাবিক অবস্থায় ভারত যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে শাসিত হইলেও বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে

জরুরী ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি ইহাকে এককেন্দ্রিক রূপ দান করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণার ফলে রাজ্য সরকারগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে সত্য, কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের অধীনস্থ হইয়া পড়ে। আবার শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রপতি যে কোন রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। এই সব কারণে ভারতকে পূর্ণাঙ্গ যুক্তরাষ্ট্র না বলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের রাষ্ট্র বলাই সমীচীন।

ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি ইংলণ্ডের মত সহজ সাধ্য অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কষ্টসাধ্য নহে। ইহা আংশিকভাবে নমনীয়, আবার আংশিকভাবে অনমনীয়। কতগুলি অনুচ্ছেদ সত্যই দুষ্পরিবর্তনীয়। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের ক্ষমতার তালিকাগুলি, ইত্যাদি বিধান পরিবর্তন করিতে হইলে একদিকে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের এবং সমগ্র সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের সমর্থন প্রয়োজন, অপরদিকে রাজ্য আইনসভাসমূহের অন্ততঃ অর্ধেক অংশের সম্মতি অপরিহার্য।

(৫)
নমনীয়তা ও অনমনীয়তার সংমিশ্রণ।

অধিকাংশ অনুচ্ছেদের ব্যাপারে পার্লামেন্টের উভয় পক্ষের উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশ এবং সমগ্র সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের সম্মতিই সংশোধনের পক্ষে পর্যাপ্ত।

আবার কিছু সংখ্যক ধারা আছে, যাহা পার্লামেণ্ট সাধারণ আইনের মতই পরিবর্তন করিতে পারে। এই জাতীয় পরিবর্তন আনুষ্ঠানিক সংশোধন (Amendment) বলিয়া গণ্য হয় না।

সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে মৌলিক অধিকারের একটি বিস্তৃত তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সব অধিকারের অভিভাবক হইতেছে ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ এবং রাজ্যের মহাধর্মাধিকরণ। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এই সব অধিকার অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই অধিকারগুলি নাগরিকগণ অবাধে ভোগ করিতে পারে না। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র এই অধিকারগুলির উপর ন্যায় সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারে।

(৬)
মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি।

আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতগুলি মূলনীতি সংযোজিত হইয়াছে। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র (Social Welfare State) প্রতিষ্ঠা কল্পে এই নীতি শাসন-পরিচালনা এবং আইন প্রণয়নে অবশ্য পালনীয়। তবে রাষ্ট্র এই সব নীতি কার্যকরী করিতে অসমর্থ হইলে

(৭)
নির্দেশাত্মক নীতির উল্লেখ।

এই মর্মে আদালতে কোনরূপ অভিযোগ দায়ের করা চলিবে না। এখানেই মৌলিক অধিকারের সহিত নির্দেশাত্মক নীতির পার্থক্য।

এই সংবিধানে ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Secular State) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম (State Religion) বলিয়া কিছু নাই। রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের পক্ষপাতিত্ব বা বিরোধিতা করিবে না। নাগরিকগণ তাহাদের নিজস্ব বিশ্বাস ও রুচি অনুযায়ী যে কোন ধর্ম অনুসরণ করিতে পারে।

(৮)
ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

২১ বৎসর অথবা তদূর্ধ্ব বয়স্ক ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারতে ইতিপূর্বে দুইবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

(৯)
প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেই ভোটদানের অধিকারী।

ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। তাঁহার পদগৌরব আছে কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা নাই। পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীপরিষদই যথার্থ শাসন-ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রের অনুরূপভাবে রাজ্যগুলিতেও দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(১০)
দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশের অধিবাসীগণ একাধারে রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের নাগরিকতা ভোগ করে। কিন্তু ভারতীয়গণ একমাত্র ভারত রাষ্ট্রের নাগরিক। রাজ্যের নাগরিকতা ভারতীয় সংবিধানে স্থান পায় নাই।

(১১)
একনাগরিকতার প্রচলন

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলেও, ভারতে বিচারব্যবস্থাকে বিভক্ত করা হয় নাই। এখানে সমস্ত বিচারালয় একই সূত্রে গ্রথিত।

(১২)
বিচার ব্যবস্থার অখণ্ডতা রক্ষা

॥ সারাংশ ॥

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে ভারতীয় গণপরিষদ কর্তৃক প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান গৃহীত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী এই সংবিধান চালু করা হয়।

ভারতীয় সংবিধান নানা দিক দিয়া মৌলিকত্ব দাবী করে। (১) ইহা লিখিত এবং বিপুলায়তন, (২) সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই ইহার লক্ষ্য, (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের শাসন ব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত হইয়াছে, (৪) ইহার দ্বারা নমনীয়তা ও অনমীয়তার অপূর্ব সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে, (৫) নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে, (৬) রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিও এই সংবিধানে সংযোজিত হইয়াছে, (৭) ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার বিশেষত্ব, (৮) কেন্দ্রে এবং রাজ্যসমূহে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে (৯) সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, (১০) এক-নাগরিকতার প্রচলন এই সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, (১১) এই সংবিধান বিচার ব্যবস্থায় অখণ্ডতা অব্যাহত রাখিয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Discuss the salient features of the Constitution of India.**
   ভারতীয় সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৭]

2. **Describe the method of amending the Constitution of India.**
   ভারতীয় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৬৬ অনু: ২]

সপ্তদশ অধ্যায়

সংবিধানের প্রস্তাবনা

(Preamble to the Constitution)

সাধারণতঃ লিখিত সংবিধানের দুইটি অংশ থাকে—প্রথমটি ঘোষণামূলক (declaratory), দ্বিতীয়টি কার্যকরী (operative)। ঘোষণামূলক অংশটিকে প্রস্তাবনা বা ভূমিকা বলা হয়। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় এক মহান আদর্শের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রস্তাবনাটি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়ঃ

(১)
সংবিধানের স্রষ্টা স্বয়ং জনসাধারণ।

প্রথমতঃ প্রস্তাবনায় লোকায়ত্ত সার্বভৌমিকতার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সংবিধান জনগণের দ্বারা রচিত। গণপরিষদ ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা হিসাবে এই সংবিধান প্রণয়ন করিয়াছিল। জনসাধারণের নামেই ইহা ঘোষিত হইয়াছে।

(২)
সংবিধানের লক্ষ্য—সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা

দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাবনা অনুসারে ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইবে। সার্বভৌম কথাটির দ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুক্তি সূচিত হইতেছে। অর্থাৎ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে অথবা আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনায় ভারত অন্য কোন রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিতে বাধ্য নহে। গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন প্রস্তাবনার প্রধান বক্তব্য। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর দ্বারা দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হইবে। সাধারণতন্ত্র কথাটি এমন একটি শাসনব্যবস্থার নির্দেশ দেয় যেখানে বংশানুক্রমিক কোন নৃপতির স্থান নাই। ভারতের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি।

কমনওয়েলথ-ভুক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ।

কেহ কেহ ভারতের সার্বভৌম এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কমনওয়েলথ-ভুক্তির অর্থ ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্য স্বীকার। অতএব বংশানুক্রমিক নৃপতির প্রাধান্য স্বীকার করার ফলে একদিকে ভারতের প্রজাতান্ত্রিক স্বরূপ বিকৃত হইয়াছে, অপরদিকে তাহার সার্বভৌমিকতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

কিন্তু এইরূপ অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন। ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে পণ্ডিত নেহেরু ঘোষণা করেন যে অনতিবিলম্বে ভারত সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইবে। এই ঘোষণা অনুযায়ী স্থির করা হয় যে অতঃপর 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস্' শুধুমাত্র 'কমনওয়েলথ অব নেশনস্' নামে পরিচিত হইবে; অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রাধান্যের পরিচায়ক 'ব্রিটিশ' শব্দটি বাদ দেওয়া হইবে এবং ভারত ব্রিটিশরাজকে কমনওয়েলথের প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার আনুগত্য স্বীকার করিবে না। বাস্তবে ভারত শাসন ব্যাপারে ইংলণ্ডের রাণীর বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই। তাঁহার নেতৃত্ব বাস্তব কোন ঘটনা নহে। তাহা ছাড়া কমনওয়েলথের সদস্যপদ একান্তভাবে ইচ্ছামূলক। ভারত নিজের প্রয়োজনেই এই সম্পর্ক আজিও অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। ইংলণ্ডের সহিত ভারতের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক হঠাৎ ছিন্ন করা যুক্তিযুক্ত নহে। কমনওয়েলথে থাকার ফলে ভারতের সার্বভৌমিকতা বা প্রজাতন্ত্রসুলভ গুণের অবমাননা করা হয় নাই।

উত্তরে বলা যায় যে ইহার ফলে ভারতের সার্বভৌমিকতা বা প্রজাতান্ত্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক গণতন্ত্র সংবিধানে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করাও সংবিধানের লক্ষ্য। অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে ভারতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(৩) ইহাতে গণতন্ত্রকে ব্যাপক অর্থে ধরা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, চিন্তার স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ধর্মের স্বাধীনতা এই প্রস্তাবনার দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। এই অধিকারগুলি মৌলিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত।

(৪) ব্যক্তি-স্বাধীনতার স্বীকৃতি।

পঞ্চমতঃ, প্রস্তাবনায় বলা হইয়াছে যে সমান সুযোগ এবং মর্যাদা সকলেরই প্রাপ্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রীপুরুষ ভেদে বৈষম্যমূলক আচরণ রাষ্ট্রের পক্ষে নিন্দনীয়।

(৫) মর্যাদা এবং সুযোগের সাম্য।

পরিশেষে, এই প্রস্তাবনা ব্যক্তির সম্ভ্রম এবং জাতির অখণ্ডতার প্রতিশ্রুতি বহন করে। সংবিধানের আদর্শ হইতেছে ব্যক্তিকে মহিমান্বিত করা এবং জাতীয় ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

ব্যক্তি-মহিমা এবং জাতীয় ঐক্যের প্রতিশ্রুতি বহন।

সঠিকভাবে বলিতে গেলে, প্রস্তাবনা মূল সংবিধানের অংশ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নহে। প্রস্তাবনা সংবিধানের উৎস এবং সমর্থনের ইঙ্গিত দান করে। ইহার মাধ্যমে সংবিধানের আদর্শ, প্রকৃতি, প্রবণতা এবং বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া

প্রস্তাবনার তাৎপর্য।

যায়। প্রস্তাবনার অপর একটি উপযোগিতা এই যে, সংবিধানের কার্যকরী অংশের ভাষা যেখানে দ্ব্যর্থবোধক, সেখানে প্রস্তাবনা মূল সূত্র নির্দেশ করিয়া ব্যাখ্যার সহায়তা করিয়া থাকে। ভারতীয় সংবিধানের আবেদন যথার্থই মর্মস্পর্শী। উজ্জ্বল এবং সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সংকেত দান করিয়া এই প্রস্তাবনা গণমানসে আশা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

॥ সারাংশ ॥

প্রস্তাবনায় ভারতীয় জনগণকে সংবিধানের স্রষ্টা হিসাবে এবং ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে অভিহিত করা হইয়াছে। কমনওয়েলথে থাকার ফলে ভারত এই মূলনীতি হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। গণতন্ত্র কথাটি ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যক্তি-অধিকার, সুযোগ এবং মর্যাদার সাম্য, ব্যক্তির মহিমা এবং জাতীয় ঐক্যের কথাও প্রস্তাবনায় ঘোষিত হইয়াছে। প্রস্তাবনা সংবিধানের কার্যকরী অংশের পর্যায়ভুক্ত নহে। ইহা রাষ্ট্রশক্তির উৎস, শাসনব্যবস্থার স্বরূপ, সরকারের আদর্শ ইত্যাদির সন্ধান দেয়, সংবিধানের কোন ধারার অস্পষ্টতা বা জটিলতাজনিত সমস্যার সমাধানে আলোকপাত করে এবং ইহার দ্বারা যে মহান আদর্শ ধ্বনিত হইতেছে তাহা গণচিত্তে চেতনা এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Write a note on the Preamble to the Constitution of India and its significance.**

   ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং তাহার তাৎপর্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

   [পৃষ্ঠা ১৬৯-১৭১]

2. **The Preamble describes India as a Sovereign Democratic Republic—Discuss.**

   প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—আলোচনা কর। [ঐ]

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র

(Federalism in India)

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব (Establishment of the India Union) :

সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব হয় কতগুলি স্বাধীন, স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে। তাহারা স্বেচ্ছায় স্বীয় ক্ষমতা কিছুটা খর্ব করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে। উদাহরণ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে পৃথক পদ্ধতিতে। ইংরাজ আমলে ভারতবর্ষে একদিকে ছিল গভর্ণরশাসিত প্রদেশ (Province), অপরদিকে ছিল নৃপতি পরিচালিত দেশীয় রাজ্য (Native State)। প্রদেশ লইয়া গঠিত ব্রিটিশ ভারতের (British India) শাসন ব্যবস্থা ছিল এককেন্দ্রিক (Unitary)। প্রদেশগুলির স্বতন্ত্র ক্ষমতা স্বীকৃত হয় নাই; কেন্দ্র ছিল অপ্রতিহত এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী। যদিও ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হইয়াছিল, তথাপি কেন্দ্রের নানাবিধ হস্তক্ষেপের অধিকার থাকার ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের (Provincial Autonomy) সম্ভাবনা ছিল সাতিশয় সীমাবদ্ধ।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইল এবং ব্রিটিশ ভারতকে পাকিস্থান এবং ভারতবর্ষ এই দুইটি ডোমিনিয়নে বিভক্ত করিল। ভারতীয় এলাকাভুক্ত প্রদেশগুলি পূর্বের ন্যায় কেন্দ্রের অধীনস্থ থাকিল। ব্রিটিশ প্রভুত্বমুক্ত দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করিল। তাহাদের অধিকাংশই অনতিবিলম্বে সন্নিকটবর্তী প্রদেশগুলির সহিত সংযুক্ত হইল। এইভাবে প্রাক্তন ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য লইয়া স্বাধীন ভারতীয় ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহ (Units or, Constituent States of the Indian Union) : ১৯৫০ সালের সংবিধান অনুযায়ী ক, খ, গ এই তিন শ্রেণীয় রাজ্য (State) এবং 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত অঞ্চল (Tyerritory) লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের আবির্ভাব হইল। বিভিন্ন শ্রেণীর রাজ্য ও অঞ্চলগুলির নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

'ক' শ্রেণীর রাজ্য Part A States	'খ' শ্রেণীর রাজ্য Part B States	'গ' শ্রেণীর রাজ্য Part C States	'ঘ' শ্রেণীর অঞ্চল Part D Territories
(১) আসাম	(১) জম্মু ও কাশ্মীর	(১) আজমীর	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
(২) উড়িষ্যা	(২) মহীশূর	(২) ভূপাল	
(৩) বিহার	(৩) মধ্যভারত	(৩) বিলাসপুর	
(৪) বোম্বাই	(৪) পেপসু	(৪) কুচবিহার	
(৫) পশ্চিমবঙ্গ	(৫) রাজস্থান	(৫) কুর্গ	
(৬) পাঞ্জাব	(৬) সৌরাষ্ট্র	(৬) দিল্লী	
(৭) মধ্যপ্রদেশ	(৭) ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	(৭) হিমাচল প্রদেশ	
(৮) মাদ্রাজ	(৮) হায়দরাবাদ	(৮) কচ্ছ	
(৯) যুক্তপ্রদেশ		(৯) বিন্ধ্যপ্রদেশ	
		(১০) মণিপুর	
		(১১) ত্রিপুরা	

পরবর্তীকালে 'ক' শ্রেণীভুক্ত অন্ধ্ররাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কুচবিহার ও চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতীয় পার্লামেণ্ট যে রাজ্যপুনর্গঠন আইন প্রণয়ন করে, তাহা ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর বলবৎ করা হয়। এই আইনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে ১৪টি রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছিল। ইহার পর দ্বিভাষাভিত্তিক বোম্বাই রাজ্যকে ভাঙিয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এই দুইটি নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং ষোড়শ রাজ্য হিসাবে নাগাল্যাণ্ড স্বীকৃত হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে নিম্নলিখিত ১৬টি রাজ্য এবং ৮টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল রহিয়াছে :

রাজ্য (States)		কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল (Union Territories)
(১) অন্ধ্র	(৯) পাঞ্জাব	(১) দিল্লী
(২) আসাম	(১০) পশ্চিমবঙ্গ	(২) হিমাচল প্রদেশ
(৩) বিহার	(১১) মহীশূর	(৩) মণিপুর
(৪) উড়িষ্যা	(১২) রাজস্থান	(৪) ত্রিপুরা
(৫) মধ্যপ্রদেশ	(১৩) কেরল	(৫) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
(৬) উত্তরপ্রদেশ	(১৪) মাদ্রাজ	(৬) লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপ
(৭) মহারাষ্ট্র	(১৫) জম্মু ও কাশ্মীর	(৭) পণ্ডিচেরী
(৮) গুজরাট	(১৬) নাগাল্যাণ্ড	(৮) গোয়া, দমন, দিউ

রাজ্যপুনর্গঠন আইনের ফলে রাজ্যগুলি সমপর্যায়ভুক্ত হইয়াছে এবং ৫টি আঞ্চলিক মন্ত্রণাসভা গঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (Nature of Indian Federation):

সংবিধানে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে রাজ্যসমূহের সংঘ (Union of States) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ভারতীয় সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় এবং ইহা চরম আইন বলিয়া স্বীকৃত। দ্বিতীয়তঃ, এই সংবিধানের দ্বারা কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং শাসনতান্ত্রিক বিরোধের মীমাংসার জন্য একটি প্রধান ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের ব্যবস্থাও গৃহীত হইয়াছে।

এইসব সদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ভারত যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ভুক্ত নহে।

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশে সমস্ত অঙ্গরাজ্যগুলি সমমর্যাদাসম্পন্ন। কিন্তু মূল সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় রাজ্যগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থারও তারতম্য ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই পার্থক্য দূরীভূত হইয়াছে। বর্তমানের ১৬টি রাজ্য সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু রাজ্যসভায় (Council of States) সকল রাজ্যের সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই।

আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না এবং কেন্দ্রও কোন রাজ্যের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার রাজ্যসীমা পরিবর্তন করিতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নীতিটি প্রযুক্ত হইলেও দ্বিতীয়টি গ্রহণ করা হয় নাই।

রাজ্যগুলির আয়তন এবং নাম পরিবর্তনের অধিকার কেন্দ্রের।

কেন্দ্র ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যগুলির রদবদল করিতে পারে। সম্প্রতি ভারতীয় রাজ্যগুলি পার্লামেণ্টে প্রণীত আইনের দ্বারা পুনর্গঠিত হইয়াছে। নূতন বিন্যাসের ফলে রাজ্যসংখ্যা কমিয়া ১৫তে পরিণত হইয়াছিল। তারপর দ্বিভাষাভিত্তিক বোম্বাই রাজ্যকে ভাঙিয়া গুজরাট ও মহারাষ্ট্র নামে দুইটি নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পূর্ব-সীমান্তে নাগাল্যাণ্ড নামে আর এক নূতন রাজ্য জন্মলাভ করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে ভারতীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। বোম্বাইয়ের মত বর্তমানের অন্য কোন রাজ্যও কালক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। রাজ্যগুলির পুনর্গঠন ক্ষমতা কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত থাকায় এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অভিমত গ্রহণ বাধ্যতামূলক না হওয়ার ফলে, ভারতীয় রাজ্যগুলির অসহায়তা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, তাহার নাগরিক সংক্রান্ত বিধান। চিরাচরিত দ্বৈত নাগরিকতার ধারণা বর্জন করিয়া ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান একনাগরিকতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। ভারতের অধিবাসী ভারতরাষ্ট্রের প্রতিই আনুগত্য দান করিবে। রাজ্য এই আনুগত্যের অংশীদার নহে। এইরূপ ব্যবস্থা নিশ্চিতরূপে রাষ্ট্রীয় সংহতির সহায়ক।

সংবিধানে কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকতা স্বীকৃত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যাপারেও ভারতীয় সংবিধানের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের কর্মক্ষেত্র সংবিধানের দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত (Union List) বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের একক অধিকার পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত। যুগ্মতালিকাভুক্ত (Concurrent List) বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তবে রাজ্যবিধানমণ্ডল প্রণীত বিধি পার্লামেন্ট-সৃষ্ট আইনের বিরোধী হইলে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। রাজ্যতালিকার (State List) অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। কেন্দ্র তাহাতে সাধারণভাবে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু অবস্থা বিশেষে পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্যবিধানমণ্ডল (State Legislative) কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে, বা রাজ্যসভা (Council of States) এই মর্মে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি কার্যকরী করিবার জন্যও কেন্দ্র অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী।

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন।
(Distribution of power between the Union and the State)

ইহা ছাড়া, জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা, রাজ্যতালিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না। আবার কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষিত হইলে, পার্লামেন্ট-সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া থাকে।

রাজ্যপালগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে তিনি রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। রাজ্য-সরকারগুলি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য। এই নির্দেশ পালনে রাজ্য-সরকার অস্বীকৃত বা অসমর্থ হইলে, কেন্দ্র উক্ত রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করিতে পারে। ইহা ছাড়া

শাসন-সম্পর্কিত ব্যাপারে রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

রাজ্যপালের বিবরণী পাঠ করিয়া রাষ্ট্রপতি যদি অবগত হন যে কোন রাজ্যের শাসন কার্য সংবিধানসম্মতভাবে চলিতেছে না, তাহা হইলে তিনি শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা ঘোষণা করিয়া এই রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

আর্থিক ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলির নির্ভরশীলতা সুস্পষ্ট।

অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতীয় রাজ্যগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার ফলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বহুলাংশে ব্যাহত হয়।

বিচারবিভাগীয় অখণ্ডতা বিধান।

বিচার ব্যবস্থার সংহতি সাধন ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় বিচারালয় ও রাজ্যবিচারালয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে এইরূপ পৃথকীকরণ নীতি গ্রহণ করা হয় নাই। ভারতের সমস্ত আদালত এক অখণ্ড বিচার ব্যবস্থার অন্তর্গত।

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা আকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হইলেও, তাহার প্রকৃতি প্রধানতঃ এককেন্দ্রিক ধরণের। স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যগুলি স্বতন্ত্র শাসন ক্ষমতা ভোগ করে সত্য, কিন্তু জরুরী বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রাষ্ট্রপতি ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক রূপ দান করিতে পারেন। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে জরুরী অবস্থা নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা নহে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় ইউনিয়নের শাসনকার্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতেই পরিচালিত হয়। জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে জাতীয় সংবিধান কেন্দ্রের উপর অধিকতর ক্ষমতা ও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ভাষা, ধর্ম, আচার ব্যবহারে, স্বতন্ত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সুস্থ মিলনের মাধ্যমে বৃহত্তর এক ভারতীয় জাতির প্রতিষ্ঠা কল্পে এইরূপ প্রবল কেন্দ্রের প্রয়োজন অবশ্য স্বীকার্য। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার প্রতিবিধান কল্পে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতৃবর্গ এক কেন্দ্রপ্রধান যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

॥ সারাংশ ॥

১৯৫০ সালের সংবিধান অনুযায়ী তিনশ্রেণীর রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতীয় রাজ্যসংঘের আবির্ভাব অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত মূল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে চুক্তির ফলে হয় নাই। ব্রিটিশ আমলে

প্রদেশগুলি প্রধানতঃ কেন্দ্রের অধীনস্থ ছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করে। ১৯৫৬ সালের রাজ্যপুনর্গঠন আইন অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলির রদবদল করা হয়। পূর্বব্যবস্থা বাতিল করিয়া ১৪টি সমপর্যায়ভুক্ত রাজ্য এবং ৬টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হইল। জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া আর সব রাজ্যই রাজ্যপাল কর্তৃক শাসিত। একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধান সদর-ই-রিয়াসৎ নামে পরিচিত। সম্প্রতি বোম্বাই রাজ্যকে ভাঙিয়া দুইটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং পূর্বসীমান্তে নাগাল্যাণ্ড নামে ষোড়শ রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে স্থান পাইয়াছে।

সংবিধানে ভারতকে 'রাজ্যসংঘ' বলা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে স্থান পাইয়াছে, যেমন (১) সংবিধানের প্রাধান্য, লিপিবদ্ধতা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তা, (২) কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন, (৪) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন। ভারতীয় সংবিধানে কিছু কিছু যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী নির্দেশনও বর্তমান রহিয়াছে। মূল সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যগুলি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ছিল। ১৯৫৬ সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইনানুসারে তাহাদিগকে (জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া) সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। রাজ্যসভায় রাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তাহা ছাড়া, ভারতীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। রাজ্যগুলির রদবদল করিবার অধিকার কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত। একমাত্র ভারতীয় নাগরিকতাই সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত।

কেন্দ্রীয়, যুগ্ম এবং রাজ্য এই তিনটি তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে পারে।

শাসন সম্পর্কিত ব্যাপারেও কেন্দ্র-প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যপালের নিয়োগ-কর্তা রাষ্ট্রপতি। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

আর্থিক ব্যাপারেও রাজ্যসরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতীয় বিচারব্যবস্থাকে বিভক্ত করা হয় নাই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সংমিশ্রণ হেতু, ভারতকে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের রাষ্ট্র' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। জাতিগত ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ভারতীয় সংবিধান প্রবলতর কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Is India a federation ?**
   ভারত কি যুক্তরাষ্ট্র? [পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৬]
2. **"The Constitution of India is more Unitary than Federal"—Discuss.**
   "যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিই ভারতীয় সংবিধানের প্রবণতা দেখা যায়"—আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৬]
3. **Describe the relation between the Union and State under the Constitution of India.**
   ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ তাহা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৭৪-১৭৬]

ঊনবিংশ অধ্যায়

নাগরিকতা ও ভোটাধিকার

(Citizenship & Franchise)

ভারতীয় নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের অনুকরণে ভারতে দ্বৈতনাগরিকতার প্রবর্তন করা হয় নাই। সংবিধান অনুযায়ী একটি মাত্র নাগরিকতা ভারতে স্বীকৃত। তাহা হইতেছে ভারতীয় নাগরিকতা। ভারতীয় নাগরিকের রাজ্যের বাসিন্দা হিসাবে পৃথক কোন নাগরিকতা নাই।

ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন (Acquisition of Indian Citizenship) :

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকতা অর্জনের কোন স্থায়ী নিয়ম বিধিবদ্ধ করা হয় নাই। এ সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের অধিকার পার্লামেন্টের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে, অর্থাৎ সংবিধান চালু হইবার দিন যে-সব ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন, সংবিধানে শুধুমাত্র তাঁহাদেরই উল্লেখ আছে।

সংবিধানে তিনটি শর্তের উল্লেখ

সংবিধান অনুযায়ী, নিম্নলিখিত তিনটি শর্তের যে-কোন একটি পূরণ করিলে, যে-কোন ব্যক্তি সংবিধান প্রবর্তনের দিন ভারতীয় নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

প্রথমতঃ, ভারতীয় এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা ভারতভূমিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, অথবা যাহাদের পিতামাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে কোন একজনের জন্ম হইয়াছে ভারতভূখণ্ডে, অথবা সংবিধান চালু হইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহারা কমপক্ষে পাঁচ বছর ভারতীয় এলাকায় বসবাস করিয়াছে, তাহারাই ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

(১) ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা সম্পর্কে বিধান।

দ্বিতীয়তঃ, পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত ব্যক্তিদিগকেও বিশেষ শর্তে ভারতীয় নাগরিকতা প্রদান করা হইবে। পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিগণকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে : (১) যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে ভারতে আসিয়াছে এবং (২) যাহারা উক্ত দিবসে বা তৎপরে ভারতে আসিয়াছে।

(২) পাকিস্থান হইতে আগত ব্যক্তিদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নির্দেশ।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে তাহারাই ভারতীয় নাগরিক হিসাবে পরিগণিত হইবে, যাহারা অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অথবা যাহাদের পিতামাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে কোন একজনের জন্ম অবিভক্ত ভারতে হইয়াছিল এবং যাহারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের পর সাধারণভাবে ভারতে বসবাস করিতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিকে তখনই নাগরিক বলিয়া ধরা হইবে, যদি সংবিধান চালু হইবার পূবে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার নাম রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়া থাকে। আবেদনকারী তাহার আবেদনপত্র দাখিল করিবার পূর্বে যদি কমপক্ষে ছয় মাস কাল ভারতীয় এলাকায় বসবাস না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আবেদন না-মঞ্জুর হইবে।

অবিভক্ত ভারতের অর্থাৎ অধুনা ভারত ও পাকিস্থানের বাহিরে বাসকারী কোন ব্যক্তির জন্ম যদি অবিভক্ত ভারতে হইয়া থাকে, অথবা তাহার পিতামাতা, পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীর মধ্যে কোন একজন যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে এবং সে বর্তমানে যে দেশে বাস করিতেছে, সেই দেশে নিযুক্ত ভারতীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধির দ্বারা যদি তাহার নাম রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইয়া থাকে; তবে তাহাকেও ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৩) অবিভক্ত ভারতের বহির্ভূত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ব্যবস্থা।

১৯৫৫ সালের ভারতীয় নাগরিকতা আইন (Indian Citizenship Act of 1955)**ঃ** পূর্বেই বলা হইয়াছে যে নাগরিকতা সম্পর্কে নিয়মকানুন প্রবর্তনের

ভার সংবিধান পার্লামেন্টের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছে। সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পার্লামেন্ট ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগরিকতা সংক্রান্ত বিস্তৃত বিধান প্রণয়ন করে। এই আইন অনুসারে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি পাঁচ প্রকার।

১৯৫৫ সালের আইন অনুযায়ী নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি।

(১) জন্মসূত্র।

প্রথমতঃ, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী অথবা তাহার পরে ভারত ভূখণ্ডে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারাই ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়তঃ, ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী অথবা তৎপরে ভারতীয় কোন নাগরিকের সন্তান বিদেশে ভূমিষ্ঠ হইলেও তাহাকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া ধরা হইবে।

(৩) রেজেষ্ট্রীকৃত ভাবে।

তৃতীয়তঃ, ভারতীয় নাগরিকতা লাভ করিতে হইলে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট নির্দিষ্ট ফর্মে রেজেষ্ট্রীকরণের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং শর্ত পূরণের সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নাম নাগরিক হিসাবে রেজেষ্ট্রী করিয়া লইবেন।

(৪) দেশীয়করণ জনিত।

চতুর্থতঃ. প্রাপ্তবয়স্ক বিদেশী আইনসিদ্ধভাবে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে। তাহাকে অবশ্যই কয়েকটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে। শর্তগুলির মধ্যে স্থায়ী বসবাসের অভিপ্রায় এবং যে কোন একটি ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৫) নূতন ভূখণ্ড ভারতীয় এলাকা হওয়ার ফলে।

যদি কোন নূতন অঞ্চল ভারতীয় এলাকাধীনে আসে, তাহা হইলে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণ ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

নাগরিকতার বিলুপ্তি : ভারতীয় নাগরিকতা আইনে নাগরিকতার বিলুপ্তির কথাও বলা হইয়াছে।

(১) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ঘোষণার দ্বারা।

প্রথমতঃ, যদি কোন ব্যক্তি এককালীন ভারত এবং অন্য কোন দেশের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সে ঘোষণার দ্বারা ভারতীয় নাগরিকতা পরিহার করিতে পারে।

(২) দেশীয়করণের ফলে।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কোন ভারতীয় নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ভারতীয় নাগরিকতা বিলুপ্ত হইবে।

তৃতীয়তঃ, ভারত সরকার আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির নাগরিকতার বিলোপ সাধন করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সংবিধান অবমাননার অপরাধে অপরাধী এবং যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের সঙ্গে ব্যবসায়ে অথবা সংবাদ আদান-প্রদানে রত ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকতা হইতে বঞ্চিত হইবে।

(৩) নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার ফলে।

ভারতীয় নাগরিকতা আইনে **কমনওয়েলথ নাগরিকতারও** (Commonwealth Citizenship) উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারতীয় নাগরিক যেসব অধিকার ভোগ করে, কেন্দ্রীয় সরকার সেই সব অধিকার ভারতস্থিত কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির নাগরিকদিগকে প্রদান করিতে পারে। তবে এইরূপ ব্যবস্থা পারস্পরিক হওয়া প্রয়োজন।

কমনওয়েলথ নাগরিকতা

ভারতে ভোটাধিকার (Franchise in India) ঃ

ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভোটদানের নিমিত্ত শিক্ষা ও সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনরূপ বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হয় নাই। সংবিধানের ৩২৬নং অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক বলিতে ভারতীয় সংবিধানে ২১ বৎসর বয়স্ক বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিকে বুঝান হইয়াছে। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্ট অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডল প্রণীত বিধি অনুযায়ী কোন ভারতীয় নাগরিকের নাম, বসবাস না করার ফলে, মস্তিষ্ক-বিকৃতির কারণে এবং গুরুতর অসদাচরণের জন্য, লোকসভা এবং রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে ভোটার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।

সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি।

॥ সারাংশ ॥

একনাগরিকতা ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী কাহারা ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে, শুধু তাহাদের কথাই সংবিধানে বলা হইয়াছে। পরবর্তীকালের নাগরিকতা সংক্রান্ত বিধান প্রণয়নের ভার পার্লামেন্টের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। সংবিধানে তিনটি শর্তের উল্লেখ দেখা যায়। ইহার মধ্যে যে কোন একটি পালন করিলেই যে কোন ব্যক্তিকে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া ধরা হইবে।

১৯৫৫ সালের নাগরিকতা আইন অনুসারে ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি পাঁচটি: (১) জন্মসূত্রে, (২) রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে, (৩) রেজেষ্ট্রীকৃত ভাবে, (৪) দেশীয়করণ জনিত কারণে এবং (৫) নূতন অঞ্চলের ভারতভুক্তির ফলে।

নাগরিকতার বিলুপ্তি এবং কমনওয়েলথ নাগরিকতা সম্পর্কেও যথোপযুক্ত ধারা এই আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রাপ্তবয়স্কমাত্র সকলের ভোটদানের অধিকার সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। ২১ বৎসর অথবা তদূর্ধ্ব বয়স্ক প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. What is the existing law with regard to citizenship in India?
ভারতীয় নাগরিকতা সংক্রান্ত বর্তমান আইন সম্পর্কে যাহা জান লিখ। [পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮১]

2. Describe the different methods by which Indian Citizenship can be acquired?
ভারতীয় নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ঐ]

3. Write notes on ; (a) Citizenship in India at the commencement of the Constitution ; (b) Franchise in India.
টীকা লিখ: (ক) সংবিধান চালু হইবার সময়ে ভারতীয় নাগরিকতা, (খ) ভারতে ভোটাধিকার। [পৃষ্ঠা ১৭৯-১৮১, ১৮১]

বিংশ অধ্যায়

মৌলিক অধিকার

(Fundamental Rights)

মৌলিক অধিকারের অর্থ

গণতান্ত্রিক শাসনের লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণতম বিকাশের উপযোগী পরিবেশ রচনা করা। কতগুলি প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার সম্যক সংরক্ষণের দ্বারাই সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গঠন করা সম্ভব। এই সব অমূল্য সুযোগ বা শর্তগুলিই মৌলিক অধিকার বলিয়া অভিহিত। ইহাদের অবর্তমানে ব্যক্তির পূর্ণতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা ব্যাহত হয়।

সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকা উচিত কিনা এ সম্বন্ধে দুইটি পরস্পর বিরোধী ধারণা প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের নজীর দেখাইয়া অনেকে বলেন যে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার্থে মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মতে অধিকারের ধারণা নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাহা ছাড়া অবস্থা বিশেষে অধিকারগুলির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ করা হইয়া থাকে। অতএব মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ না থাকাই যুক্তিযুক্ত।

মৌলিক অধিকারের সংবিধান ভুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা।

কিন্তু দ্বিতীয় মতবাদ অনুসারে মৌলিক অধিকার অলিখিত থাকার অর্থ ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সরকারের শুভেচ্ছার উপর সমর্পণ করা। সাংবিধানিক স্বীকৃতির ফলে মৌলিক অধিকার সমূহ এরূপ শক্তি ও পবিত্রতা অর্জন করে যে, সরকার যথেচ্ছভাবে এইগুলি লংঘন করিতে সাহসী হয় না। আধুনিক প্রায় প্রতিটি লিখিত সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এই দিক দিয়া পরবর্তী সংবিধানসমূহকে প্রভাবিত করিয়াছে।

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights of Indian Citizens): ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের একটি বিস্তৃত তালিকা স্থান পাইয়াছে। এই অধিকারগুলিকে মান্য করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে কোন আইনের দ্বারা মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে, তাহা সংবিধান বিরোধী বলিয়া বাতিল হইয়া যাইবে।

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলিকে সাধারণতঃ সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে : (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষা-বিষয়ক অধিকার, (৬) সম্পত্তির অধিকার, (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার। নিম্নে অধিকার সমূহের বিস্তৃত আলোচনা করা হইতেছে।

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ৭টি শ্রেণীতে বিভক্ত।

নিম্নলিখিত অধিকারগুলি সাম্যের অধিকারের অন্তর্গত :—

(ক) আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ; (খ) কেবলমাত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জন্মস্থান অথবা স্ত্রী পুরুষ ভেদে বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রীয় আচরণের উপর নিষেধাজ্ঞা ; (গ) সাধারণের ব্যবহার্য স্থান, যেমন পার্ক, রেঁস্তোরা ইত্যাদিতে সকলের প্রবেশাধিকার ; (ঘ) অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং ইহাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা ; (ঙ) একমাত্র সামরিক ও শিক্ষাবিষয়ক উপাধি ছাড়া, অন্যান্য উপাধির বিলুপ্তি সাধন।

(১)
সাম্যের অধিকার
(Right to Equality)

(২) স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

বিভিন্ন পৌর বা সামাজিক অধিকার, স্বাধীনতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, যথা—(ক) মতামত প্রকাশের অধিকার, (খ) শান্তিপূর্ণ এবং নিরস্ত্রভাবে সমবেত হইবার অধিকার (গ) সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার, (ঘ) ভারতরাষ্ট্রের সর্বত্র অবাধ গমনাগমনের অধিকার, (ঙ) ভারত ভূখণ্ডের অন্তর্গত যে কোন স্থানে বসবাস করিবার অধিকার, (চ) সম্পত্তি অর্জনের, রক্ষার এবং দান বা বিক্রয়ের অধিকার, (ছ) নিজস্ব অভিরুচি অনুযায়ী যে কোন বৃত্তি অবলম্বনের অথবা অন্য কোন পেশা বা ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার অধিকার।

কোন নাগরিক যাহাতে অযথা দোষী সাব্যস্ত না হয়, তাহার জন্য সংবিধানে প্রতিকারের ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে। সংবিধানে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, প্রচলিত আইন ভঙ্গ না করিলে কেহ অপরাধী বলিয়া গণ্য হইবে না। একই অপরাধের জন্য কেহ একাধিকবার দণ্ডিত হইবে না এবং নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে কাহাকেও বাধ্য করা যাইবে না।

জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারের অর্থ।

স্বাধীনতার অধিকারের সহিত সংশ্লিষ্ট অপর একটি মূল্যবান অধিকারের উল্লেখ ভারতীয় সংবিধানে করা হইয়াছে, তাহা হইতেছে জীবনের নিরাপত্তা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার (Right to Protection of life and Personal Liberty)। এই অধিকারে বলা হইয়াছে যে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি ছাড়া কোন ব্যক্তিকে তাহার জীবন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। ইহা ছাড়া, কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইলে, যথাশীঘ্র সম্ভব তাহাকে গ্রেপ্তারের কারণ জানাইতে হইবে, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে এবং নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ ব্যতিরেকে তাহাকে ২৪ ঘণ্টার অধিককাল আটক রাখা যাইবে না।

উপরি-উক্ত অধিকার শত্রুপক্ষীয় বিদেশী (Enemy Alien) এবং নিবর্তনমূলক আটক আইনে অবরুদ্ধ ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হইবে না। সম্প্রতি ভারতীয় পার্লামেণ্ট নিবর্তনমূলক আটক আইনের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

(৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation)।

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার অনুসারে নরনারী লইয়া ব্যবসা, বেগার ও অন্যান্য রকমের বাধ্যতামূলক শ্রম অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, এবং চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে কারখানা, খনি অথবা অন্য কোন বিপদসংকুল কার্যে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে

সামাজিক শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য ও নীতি সাপেক্ষভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্ম প্রচারের অধিকার থাকিবে। কোন বিশেষ ধর্মের সংরক্ষণ বা প্রচারের জন্য কাহাকেও করদানে বাধ্য করা যাইবে না। সরকার পরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে সাধারণভাবে ধর্মমূলক শিক্ষা দেওয়া চলিবে না এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কোন শিক্ষায়তনে ধর্মীয় উপাসনা ইত্যাদিতে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক হইবে না।

(৪)
স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Freedom of Religion)।

এই অধিকারটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থে সংবিধানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকদের কোন অংশ ভারতের যে কোন অংশে বসবাস করা কালীন তাহাদের নিজস্ব ভাষা, লিপি ও কৃষ্টি রক্ষার অধিকার ভোগ করিবে। কেবলমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা ভাষার হেতু দেখাইয়া রাষ্ট্র পরিচালিত বা রাষ্ট্রীয় সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষায়তনে কাহারও প্রবেশ নিষিদ্ধ করা চলিবে না। সংখ্যালঘুদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত বলিয়া কোন শিক্ষালয় সরকারী সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইবে না।

(৫)
সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার। (Cultural and Educational Rights)

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন এবং আইনের নিদেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির সম্পত্তি দখল করিলে, তাহাকে অবশ্যই ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে। রাজ্য-আইনসভা এই মর্মে কোন আইন প্রণয়ন করিলে, রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া তাহা কার্যকরী হইবে না। জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে যে সব বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা দূর করিবার জন্য ১৯৫১ এবং ১৯৫৫ সালে ভারতীয় সংবিধানের দুইবার সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংশোধনগুলি ভারতরাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার পরিচয় দান করে।

(৬)
সম্পত্তির অধিকার। (Right to Property)

অধিকার অযথা ক্ষুন্ন হইলে, প্রতিকারের কোন উপায় যদি না থাকে, তাহা হইলে অধিকার অর্থহীন আশ্বাসবাণীতে পর্যবসিত হয়। ভারতীয় সংবিধানে অধিকার সংরক্ষণের যথোচিত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। কোন ব্যক্তির অধিকার অন্যায়ভাবে আক্রান্ত বা ব্যাহত হইলে, সে প্রধান ধর্মাধিকরণ বা মহাধর্মাধিকরণের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারিবে। মৌলিক অধিকারের অভিভাবক হিসাবে উক্ত ন্যায়ালয় হেবিয়াস কর্পাস, ম্যাণ্ডেমাস, কুয়োওয়ারেন্টো ইত্যাদি ধরণের আদেশ, নির্দেশ—বা পরোয়ানা জারী করিতে পারে। কিন্তু

(৭)
শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)।

প্রতিবিধানের অধিকার রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতার দ্বারা স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হইয়াছে। জরুরী অবস্থায় বিশেষ ঘোষণার দ্বারা রাষ্ট্রপতি অধিকার রক্ষার জন্য বিচারালয়ে আবেদনের অধিকার স্থগিত রাখিতে পারেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত অধিকারগুলি নিরঙ্কুশ বা অসীম (absolute) নহে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অধিকারগুলির উপর ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা চলে। স্বাধীনতার অধিকার নানাবিধ শর্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ, মত প্রকাশের স্বাধীনতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, পররাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, সামাজিক শৃঙ্খলা ও শ্লীলতা বা নীতিবোধের প্রয়োজনে এবং আদালতের অবমাননা, মানহানি ও অবৈধ আচরণের পোষকতা, ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাষ্ট্র মতপ্রকাশের অধিকারের উপর ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতে পারে। অবশ্য রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ন্যায়সঙ্গত কিনা, তাহা বিচারের চূড়ান্ত ক্ষমতা বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত। সম্পত্তির অধিকারও অবাধ নহে। জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা চলিবে। তেমনি সর্বসাধারণের স্বার্থে বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতার উপরও রাষ্ট্র বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারে।

অধিকারগুলি অবাধ বা শর্তশূন্য নহে।

গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে অধিকারের সীমাবদ্ধতা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করা হইলে, উক্ত আইনের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানগুলি সেখানে প্রযুক্ত হইবে না।

জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে রাষ্ট্র স্বাধীনতার অধিকার বিরোধী আইন প্রণয়ন করিতে এবং পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে। জরুরী ঘোষণার মেয়াদ শেষ হইলে অবশ্য এইরূপে আইন বাতিল হইয়া যাইবে। ইহা ছাড়া জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার স্থগিত রাখিতে পারেন। এই জাতীয় ব্যবস্থা গৃহীত হইলে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার সমাপ্তি ঘটিবে এবং ভারতীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হইবে বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে রাষ্ট্রই অধিকারের রক্ষক। কাজেই দেখিতে হইবে ব্যক্তি-অধিকার যেন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধানের পথে বাধার সৃষ্টি করিতে না পারে। রাষ্ট্র যখন বিপদাপন্ন, তখন ব্যক্তির অধিকার অব্যাহত থাকা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের স্বার্থে ব্যক্তির স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা অসমীচীন নহে।

ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপন্মুক্ত এবং নাগরিক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই সংবিধানে সাময়িকভাবে মৌলিক অধিকার মুলতুবী রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

॥ সারাংশ ॥

সংবিধানে মৌলিক মানবীয় অধিকারের উল্লেখ ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম উপায় হিসাবে বর্তমানে বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সংবিধানেও মৌলিক অধিকারের একটি তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে নাগরিক প্রধান ধর্মাধিকরণ অথবা মহাধর্মাধিকরণের নিকট আবেদন করিতে পারিবে। সরকার প্রণীত কোন আইন মৌলিক অধিকারের বিরোধী হইলে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। এই সব মৌলিক অধিকারের সম্যক সংরক্ষণের উপরই ভারতীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

নিম্নলিখিত অধিকারগুলি ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত হইয়াছে :

(১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার, (৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার, (৬) সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার এবং (৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার।

এই সব অধিকারের উপর রাষ্ট্র ন্যায়সঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারে। অবশ্য নিয়ন্ত্রণ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা, তাহার চূড়ান্ত বিবেচনার দায়িত্ব বিচারালয়ের। অধিকারগুলি অবস্থা-নিরপেক্ষ নহে। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ইহাদের প্রয়োগ বন্ধ রাখা যায়। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে আদালতের নিকট আবেদনের অধিকার স্থগিত রাখিতে পারেন।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1 What do you mean by Fundamental Rights? Enumerate the Fundamental Rights guaranteed by the Constitution of India.

মৌলিক অধিকার বলিতে কি বুঝায়? ভারতীয় সংবিধানে কি কি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে? [পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৫]

2 Give an idea of the Fundamental Rights enjoyed by the citizens of India. Are those rights absolute?

ভারতীয় নাগরিকগণ যে সব মৌলিক অধিকার ভোগ করে, তাহা বর্ণনা কর। এই অধিকারগুলি কি অবাধ? [পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৬]

3. Write a short essay on the Fundamental Rights of the Indian citizen.

ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখ। [পৃষ্ঠা ঐ]

একবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি

(Directive Principles of State Policy)

(ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ অংশে (Part IV) আয়ারল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রের অনুকরণে রাষ্ট্র-পরিচালনার নিমিত্ত কতগুলি নির্দেশাত্মক নীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই সব নীতির লক্ষ্য সুবিচার এবং সাম্যের ভিত্তিতে এক সুস্থ সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।) পুলিশী রাষ্ট্রের ধারণা বর্তমানে বর্জন করা হইয়াছে এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সর্বত্র প্রসারলাভ করিতেছে। যুগবিশ্বাসের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভারতীয় সংবিধানও রাষ্ট্রের উপর কতগুলি কল্যাণবিধায়ক দায়িত্বভার অর্পণ করিয়াছে। শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ গঠন করা ভারতীয় সংবিধানের লক্ষ্য। ভারত রাষ্ট্র শুধুমাত্র নিবারণমূলক কার্যে ব্যাপৃত থাকিবে না। তাহার কল্যাণহস্ত সমাজ-জীবনের সর্বত্র প্রসারিত হইবে। এইরূপ (সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Social Welfare State) আদর্শই নির্দেশাত্মক নীতির মাধ্যমে ঘোষিত হইয়াছে। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র এমন এক সমাজব্যবস্থার সংগঠন ও সংরক্ষণে তৎপর হইবে, যাহার ফলে জাতীয় জীবনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায়পরতা সঞ্চারিত হয়।

এই নীতিগুলির লক্ষ্য ন্যায় এবং সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

এই নীতিগুলি আইনতঃ প্রযোজ্য নহে। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে সরকারের বিরুদ্ধে এই সব নীতি অমান্যের অভিযোগ বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু এই নীতিগুলিই হইবে দেশ শাসনের ভিত্তি স্বরূপ। আইন প্রণয়নে এবং শাসন পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে প্রয়োগ করাই হইতেছে রাষ্ট্রের কর্তব্য।

নীতিসমূহকে আদালতের সাহায্যে বলবৎ করা যায় না।

সরকারী আইন বা কার্যের দ্বারা মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে নাগরিক ন্যায়ালয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করিতে পারে, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতি পালন করা না হইলে, বিচারালয়ে এই মর্মে আবেদন করা যাইবে না, এখানেই নির্দেশাত্মক নীতির সহিত মৌলিক অধিকারের পার্থক্য। মৌলিক অধিকার আইনসঙ্গত, কাজেই অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতি রাষ্ট্রের প্রতি সংবিধানের উপদেশ বা সুপারিশ ছাড়া আর কিছু নহে।

মৌলিক অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে পার্থক্য।

বিভিন্ন নির্দেশাত্মক নীতি : সংবিধানে যে সব নির্দেশাত্মক নীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

(১) পুরুষ ও নারী নির্বিশেষে সকল নাগরিক ভরণপোষণের অধিকার লাভ করিবে।

(২) দেশের ধনসম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সর্বসাধারণের স্বার্থে পরিচালিত হইবে।

(৩) স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলে সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক পাইবে।

(৪) শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তির অপচয় রোধ করা এবং আর্থিক দৈন্যবশতঃ নাগরিক যেন বয়স ও সামর্থ্যের প্রতিকূল উপজীবিকা গ্রহণে বাধ্য না হয় তাহা দেখা, রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(৫) কৈশোর ও যৌবন যাহাতে শোষণ ও অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠন করিতে হইবে।

(৭) প্রত্যেক নাগরিক কর্মের এবং শিক্ষার অধিকার পাইবে। ইহা ছাড়া বেকার, বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং অক্ষম নাগরিকের জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) রাষ্ট্র সকল শ্রেণীর শ্রমিকের কর্মসংস্থান, তাহাদের উপযুক্ত মজুরী, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করিবে।

(৯) ভারতের সর্বত্র একই রূপ দেওয়ানী বিধি প্রবর্তিত থাকিবে।

(১০) সংবিধান চালু হইবার ১০ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বালক বালিকাদের বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১১) অনগ্রসর সম্প্রদায়ের, বিশেষ করিয়া তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতিসমূহের উন্নতি বিধানের এবং তাহাদিগকে অবিচার ও শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(১২) জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(১৩) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কৃষি কার্য ও পশুপালনের ব্যবস্থা এবং গোহত্যা নিবারণ করিতে হইবে।

(১৪) ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান এবং স্মৃতিরক্ষক বস্তু সমূহের যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৫) বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিতে হইবে, এবং

(১৬) শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইবে।

· সংবিধানের মুখবন্ধে ঘোষিত আদর্শগুলি নির্দেশাত্মক নীতি সমূহের দ্বারা পুনরুচ্চারিত হইয়াছে। এই নীতিগুলির প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ। কাজেই কোন একটি নীতি শাসন ব্যবস্থায় গৃহীত বা প্রযুক্ত না হইলে, আদালতের সাহায্যে তাহাকে বলবৎ করা যায় না। তবে এই নীতিগুলিকে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য পালনীয় এই নীতিগুলিই হইতেছে সরকারের সার্থকতা বিচারের মাপকাঠি। জনপ্রিয় সরকার এইগুলিকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না, কারণ তাহার একমাত্র প্রতিদান হইবে পরবর্তী নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয়। শাসন কর্তৃপক্ষ এই সব আদর্শকে বাস্তবায়িত করার নিমিত্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং নানাবিধ কর্মপন্থা গ্রহণ করিতেছে। এই নীতিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই মৌলিক অধিকারের বিধানগুলি পরিবর্তন, এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করা হইতেছে। সুতরাং নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের উপযোগিতা উপেক্ষণীয় নহে।

নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের তাৎপর্য।

॥ সারাংশ ॥

ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতি স্থান পাইয়াছে। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রের আদর্শ নীতিগুলির মাধ্যমে ব্যক্ত হইতেছে। ভারত রাষ্ট্র এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনে উদ্যোগী হইবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাহাতে ন্যায় এবং সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তদুদ্দেশ্যে এই নীতিগুলি প্রণীত হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের মত এই নীতিগুলি আইনতঃ প্রযোজ্য নহে। সরকার এইগুলি পালন না করিলেও, বিচারালয়ের সাহায্যে এইগুলিকে বলবৎ করা যায় না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের শাসনতান্ত্রিক মূল্য সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ জাগে। তবে সংবিধানে এইগুলিকে দেশ শাসনের ভিত্তি হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং আইন প্রণয়নে ও শাসন পরিচালনায় এইগুলিকে প্রয়োগ করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক সরকার এই সব নীতি উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। জন সমর্থন হারাইবার ভয়ই সরকারকে নির্দেশাত্মক নীতর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রবণ করিয়া তুলিবে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Enumerate some of the Directive Principles of State Policy. How do they differ from Fundamental Rights?

কতকগুলি নির্দেশাত্মক নীতির উল্লেখ কর। নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কি? [পৃষ্ঠা ১৮৯, ১৮৮]

2. What is the significance of the Directive Principles of State Policy?

নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য কি? [পৃষ্ঠা ১৯০]

3. Write a note on the Directive Principles of State Policy.

নির্দেশাত্মক নীতি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [পৃষ্ঠা ১৯০ সারাংশ]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ

(Union Executive)

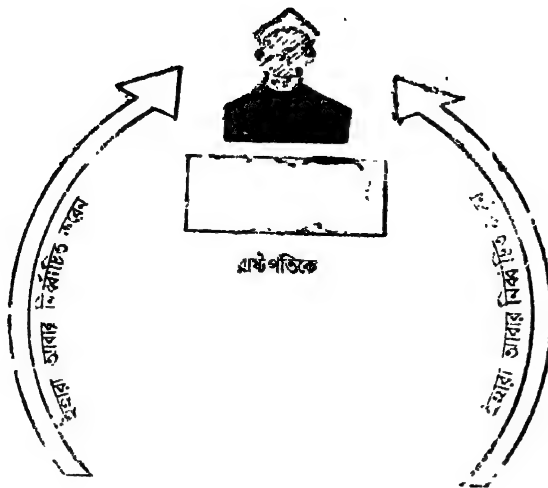
কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগ বলিতে কি বুঝায়।

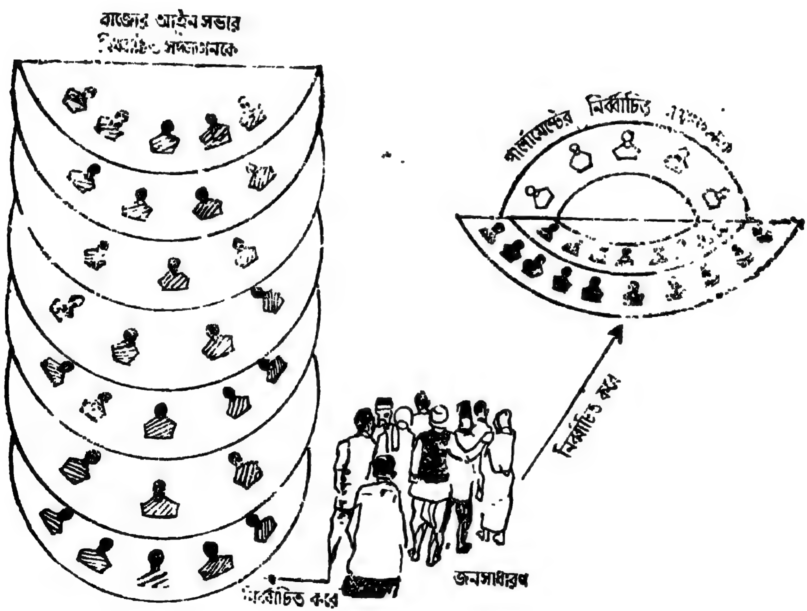
নূতন সংবিধান অনুযায়ী ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরণের শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। সমগ্র দেশ শাসনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সরকার (Union Government) এবং রাজ্য শাসনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি রাজ্য সরকার (State Government) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীপরিষদ লইয়া কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের শাসনবিভাগ গঠিত।

ভারতের রাষ্ট্রপতি (The President of India):

ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ইংলণ্ডের রাণীর অনুরূপ।

মন্ত্রীপরিষদ পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় একজন রাষ্ট্রপ্রধানের (Constitutional Head of State) প্রয়োজন অনুভূত হইয়া থাকে। সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের দেশ ইংলণ্ডে রাণীই হইলেন রাষ্ট্রপ্রধানা। প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানে একজন রাষ্ট্রপতির স্থান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নামে সমুদয় শাসন কার্য সম্পাদিত হইলেও, তিনি কার্যতঃ প্রধান শাসক নহেন। প্রকৃত শাসনক্ষমতা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীপরিষদের হস্তে ন্যস্ত।


রাষ্ট্রপতিকে


রাজ্যের আইন সভার
পার্লামেন্টের নির্বাচিত
নির্বাচিত করে
জনসাধারণ

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন (Election of President) :

ভারতীয় রাষ্ট্রপতি পদ ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের মত বংশানুক্রমিক নহে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে জনগণের অংশ গ্রহণের অবকাশ নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি (১) পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ এবং (২) রাজ্য বিধানসভা সমূহের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দকে লইয়া গঠিত এক নির্বাচন সংস্থার (Electoral College) দ্বারা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে দুইটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়: প্রথমতঃ সকল রাজ্যের প্রতিনিধিত্বের হার অভিন্ন হইবে, দ্বিতীয়তঃ সমস্ত রাজ্য বিধানসভা সমূহের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের মোট ভোট সংখ্যা পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট ভোটসংখ্যা পরস্পর সমান হইবে।

রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

ভোটসংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতি নিম্নরূপ :—

প্রথমে বিধানসভার নির্বাচিত সভ্যসংখ্যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যাকে ভাগ করিতে হইবে এবং ভাগফলকে ১০০০ দ্বারা ভাগ করিলে, যাহা ভাগফল হইবে তাহাই হইল উক্ত রাজ্যের বিধানসভার একজন নির্বাচিত সভ্যের ভোট সংখ্যা। এইভাবে বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার সমস্ত নির্বাচিত ভোটসংখ্যা যোগ করিলে, যে যোগফল পাওয়া যায় তাহাই হইতেছে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সমস্ত সদস্যের মোট ভোট সংখ্যা। এই মোট ভোট সংখ্যাকে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলেই, একজন সদস্যের ভোট সংখ্যা পাওয়া যাইবে।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোটের মাধ্যমে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক ভোটদাতাকে রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীগণের নামের একটি তালিকা সমন্বিত ভোটদানের কাগজ দেওয়া হয়। ভোটদাতা, প্রার্থীগণের নামের পাশে ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা লিখিয়া নিজস্ব পছন্দ জ্ঞাপন করিবেন। নির্বাচিত হইতে হইলে, প্রার্থীকে অবশ্যই মোট প্রদত্ত বৈধ ভোট সংখ্যার অর্ধেকের বেশী পাইতে হইবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পাইলে, কেহ রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। মোট প্রদত্ত বৈধ ভোট সংখ্যাকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত ১ যোগ করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহাই হইল নির্দিষ্ট ভোট সংখ্যা (Quota)। যে প্রার্থী ভোটদাতাগণের প্রথম পছন্দ অনুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট পাইবেন, তাঁহাকেই নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। আর কেহ নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পাইলে, যে প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম তাঁহাকে বাতিল করিয়া,

তাঁহার ভোটগুলি দ্বিতীয় পছন্দের সূত্র ধরিয়া হস্তান্তরিত করিতে হইবে। এইভাবে কোন একজন প্রার্থী নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পাওয়া পর্যন্ত ভোট হস্তান্তরিত করা হইবে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরোক্ষ পদ্ধতি অনুসৃত হইবার কারণ:

ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে পরোক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ ভারতের মত জনবহুল দেশের সমস্ত ভোট দাতার ভোট গ্রহণ ও গণনা আয়াসসাধ্য এবং ব্যয়বহুল ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় রাষ্ট্রপতি প্রকৃত শাসক নহেন। তাঁহাকে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শক্রমে চলিতে হইবে। কিন্তু জনগণের দ্বারা রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা গৃহীত হইলে, স্বাভাবিকভাবেই তিনি ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করিবেন; ইহার ফলে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা ব্যাহত হইবে।

তবে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে যথার্থ গণতান্ত্রিক নির্বাচনের সূচনা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা (Qualification for election as President)

রাষ্ট্রপতি-পদপ্রার্থীকে নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে :—

(১) তিনি ভারতীয় নাগরিক হইবেন। ভারতীয় সংবিধানে জন্মসূত্রে নাগরিক এবং বিহিত নাগরিকের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় নাই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিধান অনুযায়ী সে দেশের রাষ্ট্রপতিকে জন্মসূত্রে নাগরিক হইতে হইবে।

(২) তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই।

(৩) তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হইবার মত যোগ্যতার অধিকারী হইবেন।

(৪) নির্বাচনকালে তিনি সরকারের অধীনে কোন লাভজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

রাষ্ট্রপতি-পদের শর্ত (Conditions of President's Office) ঃ

(১) রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডলের সভ্য হইবেন না।

(২) রাষ্ট্রপতি অপর কোন লাভজনক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন না।

(৩) তিনি বিনা ভাডায় সরকারী ভবনে বাস করিবেন এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইনের দ্বারা নির্ধারিত বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করিবেন। (বর্তমানে তাঁহার মাসিক বেতন ১০,০০০ টাকা)।

(৪) রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মধ্যে তাঁহার প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাসমূহ হ্রাস করা চলিবে না।

সম্বন্ধে ঘোষণা পার্লামেন্টের সমর্থন না পাইলে, দুইমাসের অধিককাল কার্যকরী থাকিবে না।

রাষ্ট্রপতির শাসনতান্ত্রিক পদমর্যাদা (Constitutional Positon of the President): ভারতে পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর শাসনব্যবস্থায় আইন সভাব আস্থাভাজন মন্ত্রীপরিষদই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ভারতীয় সংবিধানে এই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, প্রথাগত বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ-ক্রমে চলিতে বাধ্য থাকিবেন। সংবিধানে তাঁহার উপর যে বিপুল ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা স্ব-ইচ্ছায় প্রয়োগ করিবার অধিকার তাঁহার নাই। সংবিধান অমান্য করিয়া যথেচ্ছভাবে ক্ষমতা ব্যবহারের চেষ্টা করিলে তিনি অপসারিত হইবেন। বস্তুতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত ক্ষমতা নামমাত্র।

রাষ্ট্রপতির শাসন-ক্ষমতা নাম মাত্র।

কিন্তু তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অপরিসীম। শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে তিনি মন্ত্রীপরিষদকে সংযত, সাবধান এবং অনুপ্রাণিত করিতে পারেন। একজন সুযোগ্য রাষ্ট্রপতির বিবেচনা প্রসূত মতামত কোন মন্ত্রীপরিষদই অগ্রাহ্য করিতে পারেনা। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ও জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি সমগ্র শাসন ব্যবস্থার উপর তাঁহার শুভ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির প্রভাব।

রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ক্রমে কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সমগ্র মন্ত্রী পরিষদের বিবেচনার জন্য মন্ত্রীপরিষদের সভায় প্রধান মন্ত্রী উপস্থাপিত করিবেন। প্রধানমন্ত্রীর অপর একটি কর্তব্য হইতেছে শাসন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত করা।

রাষ্ট্রপতির অধিকার।

রাষ্ট্রপতি ভারতের নাগরিক হিসাবে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি। শাসনতান্ত্রিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তিনি আদালতের নিকট জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। তাঁহার কার্যকালের মধ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন রকম ফৌজদারী মামলা রুজু করা যায় না। এমন কি তাঁহার বিপক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমা সুরু করিতে হইলে কম পক্ষে দুই মাস আগে লিখিত নোটিশ দিতে হইবে।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President of India):

সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় ইউনিয়নের একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকিবেন।

উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য গোপন ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন।

উপরাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থীকে (১) ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে; (২) তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া চাই; (৩) তিনি সরকারের অধীনে কোন রকম লাভজনক পদে নিযুক্ত থাকিবেন না।

যোগ্যতাবলী।

উপরাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারেন। আবার উপরাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অপসারণের প্রস্তাব যদি রাজ্যসভার তৎকালীন সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে গৃহীত এবং লোক সভার দ্বারা সমর্থিত হয়, তাহা হইলে উপরাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পদচ্যুত হইবেন। রাজ্যসভায় অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপনের অন্ততঃপক্ষে ১৪ দিন পূর্বে উক্ত মর্মে নোটিশ দিতে হইবে।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি।

উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ঃ

(১) উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি।

(২) রাষ্ট্রপতির মৃত্যু, পদত্যাগ অথবা অপসারণের ফলে তাঁহার আসন শূন্য হইলে, উপরাষ্ট্রপতি, নূতন রাষ্ট্রপতি দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত, রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

(৩) আবার অনুপস্থিতিতি, অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি সাময়িক-ভাবে কর্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, তিনি যোগদান না করা পর্যন্ত, তাঁহার যাবতীয় কার্য উপরাষ্ট্রপতিই নির্বাহ করিবেন।

(৪) উপরাষ্ট্রপতির নিকট স্বহস্ত লিখিত পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া রাষ্ট্রপতি কর্মভার হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

মন্ত্রীপরিষদ (Council of Ministers) ঃ

সংবিধানে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য প্রধানমন্ত্রী-সহ একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকিবে।

রাষ্ট্রপতি প্রথমে প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং পরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করিয়া থাকেন। সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীগণের স্ব স্ব পদে বহাল থাকা রাষ্ট্রপতির খুসীর উপর নির্ভর করে।

মন্ত্রীদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি।

কিন্তু কার্যতঃ মন্ত্রীপরিষদের শাসনকাল পার্লামেন্টের ইচ্ছাধীন। মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোক সভার নিকট দায়ী। লোক সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারাইলে মন্ত্রীপরিষদ পদত্যাগ করিতে বাধ্য।

মন্ত্রীদের দায়িত্ব।

মন্ত্রীগণ সকলে সমপর্যায়ভুক্ত নহেন। তাঁহারা তিনটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ক্যাবিনেট মন্ত্রী (Cabinet Minister) বলিয়া অভিহিত হন। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে তাঁহারাই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মন্ত্রী-গণকে রাষ্ট্রমন্ত্রী (Minister of State) বলা হইয়া থাকে। তাঁহারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ পরিচালনা করেন। আবার বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের সহকারী হিসাবে কিছু সংখ্যক উপমন্ত্রী (Deputy Minister) নিযুক্ত করা হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্রী।

মন্ত্রীপরিষদের কার্য ঃ

(১) সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রীদের কার্য রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করা।

(২) কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা কতকগুলি দপ্তরে বিভক্ত। এক একটি দপ্তর পরিচালনার ভার থাকে এক একজন মন্ত্রীর হস্তে।

(৩) মন্ত্রীপরিষদ শাসন সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ করে।

(৪) তাহারাই গুরুত্বপূর্ণ আইনের খসড়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিয়া থাকেন।

এইভাবে শাসন পরিচালনায়, আইন প্রণয়নে এবং আয় ব্যয় নির্ধারণে মন্ত্রী-পরিষদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা (Role of the Prime Minister) ঃ মন্ত্রীপরিষদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হইলেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর পদ সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তবে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত ইচ্ছা প্রয়োগের অধিকার সীমাবদ্ধ। লোক-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতা অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন

প্রধানমন্ত্রীই মন্ত্রীপরিষদের নিয়ামক। তাঁহারই পরামর্শ ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীগণ নিযুক্ত হন। বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে তিনিই সামঞ্জস্য বিধান করেন। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করা ছাড়াও প্রধান-মন্ত্রী স্বয়ং বৈদেশিক দপ্তরের ভার বহন করেন।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ

তিনি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি নিজে পদত্যাগ করিলে, সমগ্র মন্ত্রীপরিষদের কার্যকালের সমাপ্তি ঘটে।

প্রধানমন্ত্রীই শাসন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য রাষ্ট্রপতিকে সরবরাহ করেন।

প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ক্রমে কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত তিনি মন্ত্রীপরিষদের সভায় বিবেচনার জন্য উত্থাপন করিবেন। প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রীপরিষদের সংযোগ স্থাপিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেণ্ট

প্রধানমন্ত্রী লোক সভার নেতৃস্থানীয় সদস্য। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে লোক সভায় তথা পার্লামেণ্টে তাঁহার ভূমিকাই প্রধান। সরকারীপক্ষে তাঁহার বক্তব্যই চূড়ান্ত।

প্রধানমন্ত্রী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল

সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সংসদীয় শাখার (Parliamentary Party) প্রধান হিসাবে দলীয় সংগঠনের উপরেও তাঁহার প্রভাব সমধিক।

বাস্তবিকই রাষ্ট্রপরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অনন্যসাধারণ। তাঁহার কর্মক্ষমতা, দূরদৃষ্টি ও বিচারবুদ্ধির উপরেই শাসনের সাফল্য এবং রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বহুলাংশে নির্ভর করে। শাসনব্যবস্থায় তাঁহার যথার্থ-স্থান তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারাই নির্ণীত হয়।

রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রীপরিষদের সম্পর্ক (Relation between the President and the Council of Ministers) ঃ

রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের নিমিত্ত সংবিধানে একটি মন্ত্রীপরিষদ স্থাপনের কথা বলা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি প্রথমে প্রধানমন্ত্রীকে এবং পরে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করেন। মন্ত্রীদের নিয়োগ এবং তাহাদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনের কার্য আনুষ্ঠানিক ভাবে রাষ্ট্রপতির দ্বারা সম্পাদিত হইলেও, এই সমুদয় কার্য প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি হইলেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ণধার। তাঁহারই নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ তিনি মানিতে বাধ্য—এরূপ সুস্পষ্ট উক্তি সংবিধানে করা হয় নাই। বরং তাঁহারই মর্জির উপর মন্ত্রীদের কার্যকাল নির্ভর করে। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভারতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে। মন্ত্রীপরিষদ শাসন বিভাগীয় সমুদয় কার্যের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। এই দায়িত্বই মন্ত্রীপরিষদের প্রকৃত শাসনাধিকারের ভিত্তি। কাজেই ভারতীয় রাষ্ট্রপতি, ইংলণ্ডের রাণীর ন্যায় আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকাই গ্রহণ করিবেন।

আইনসভার আস্থাভাজন মন্ত্রী-পরিষদের মতামত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি অস্বীকৃত হইলে, তিনি সংবিধান ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হইতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীপরিষদ বাতিল করিয়া লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন সত্য, কিন্তু সাধারণ নির্বাচনে প্রাক্তন মন্ত্রীগণ যদি পুনরায় লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে লইয়াই মন্ত্রীপরিষদ গঠন করা ছাড়া রাষ্ট্রপতির গত্যন্তর থাকিবে না। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রের প্রধান মাত্র, প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী নহেন।

তবে ভারতীয় রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের হস্তস্থিত ক্রীড়নক মাত্র নহেন। ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এবং জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতির প্রভাব কোন মন্ত্রীপরিষদই অতিক্রম করিতে পারে না। ইংলণ্ডের রাণীর মত ভারতীয় রাষ্ট্রপতিও মন্ত্রীপরিষদকে পরামর্শ দিতে, সাবধান করিতে ও অনুপ্রেরণা যোগাইতে পারেন। শাসন সম্পর্কিত সংবাদ প্রধানমন্ত্রী তাঁহাকে সরবরাহ করিয়া থাকেন এবং কোন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সঠিক বলিয়া বিবেচিত না হইলে রাষ্ট্রপতি তাহা সমগ্র মন্ত্রীসভার বিবেচনাধীন করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করিতে পারেন।

সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে শাসক এবং মন্ত্রীপরিষদকে পরামর্শদাতা হিসাবে বর্ণনা করা হইলেও, বাস্তবে উভয়ের ভূমিকা পরিবর্তিত হইয়াছে। মন্ত্রীপরিষদই যথার্থ শাসক, রাষ্ট্রপতি পরামর্শদাতা মাত্র।

মন্ত্রীপরিষদ এবং পার্লামেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Council of Ministers and the Parliament) : পার্লামেণ্ট এবং মন্ত্রী-পরিষদের পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ভারতীয় সংবিধান ক্ষমতা বিভাজন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। তাই শাসন এবং আইন বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। মন্ত্রীগণ সকলেই পার্লামেণ্টের সদস্য। মন্ত্রীত্ব গ্রহণকালে কেহ যদি পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকেন, তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে অবশ্যই যে কোন একটি পরিষদের সভ্য হইতে হইবে। অন্যথায় তাঁহার মন্ত্রীত্বের অবসান ঘটিবে।

ভারতীয় মন্ত্রীপরিষদ লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। যৌথ দায়িত্বের বিধান অনুযায়ী কোন একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে সমগ্র মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করিবে। ইংলণ্ডে এই দায়িত্বশীলতার ভিত্তি প্রথাগত বিধান। কিন্তু এই নীতিই ভারতীয় সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ মন্ত্রীপরিষদই গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া লোকসভায় কর ধাযের প্রস্তাব এবং ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপনের একমাত্র অধিকার মন্ত্রীপরিষদের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

আইনতঃ পার্লামেন্টের অধীন হইলেও কার্যতঃ মন্ত্রীপরিষদই সর্বেসর্বা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অকুণ্ঠ আনুগত্যের বলে মন্ত্রীপরিষদই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

॥ সারাংশ ॥

কেন্দ্রীয় সরকরের শাসনবিভাগ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রীপরিষদ লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বছর। তিনি পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারেন। কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে তাঁহাকে বিশেষ পদ্ধতিতে অপসারিত করা যায়। তাঁহার ক্ষমতা পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা (১) শাসন সম্পর্কিত ক্ষমতা, (২) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) অর্থবিষয়ক ক্ষমতা (৪) বিচার বিষয়ক ক্ষমতা এবং (৫) জরুরী ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতির নামে শাসনকার্য পরিচালিত হইলেও, তিনি প্রকৃতপক্ষে শাসনবিভাগের প্রধান নহেন। তাঁহার পদগৌরব আছে, কিন্তু শাসন ক্ষমতা নাই। তবে শাসন পরিচালনায় তাঁহার প্রভাব অসীম।

উপরাষ্ট্রপতি ঃ ভারতের উপরাষ্ট্রপতির নিয়োগ কর্তা পার্লামেণ্ট। তিনি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতি কালে তিনি রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন করেন। কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে তিনি সাময়িক ভাবে রাষ্ট্রপতির স্থলাভিষিক্ত হন।

মন্ত্রী পরিষদ ঃ মন্ত্রী পরিষদ নিয়োগের কর্তা রাষ্ট্রপতি। এই পরিষদ লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। তাঁহার কার্যকাল রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর নিভর করে। মন্ত্রীগণ বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনা করেন, আইনের খসড়া ও আয় ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্টে উত্থাপন করেন। মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমেই সমুদয় শাসনকার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

প্রধান মন্ত্রী ঃ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে স্বীকৃত হন। অন্যান্য মন্ত্রীগণ তাঁহারই পরামর্শক্রমে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই মন্ত্রীপরিষদের পরিচালক। তিনি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন এবং রাষ্ট্রপতির সহিত মন্ত্রীপরিষদের সংযোগ রক্ষা করেন। পার্লামেণ্টে তিনিই হইলেন সরকার পক্ষের প্রধান মুখপাত্র।

মন্ত্রীপরিষদ ও রাষ্ট্রপতি : সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীদের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি এবং তাঁহারই খুশীর উপর মন্ত্রীদের শাসনাধিকার নির্ভর করে। মন্ত্রীপরিষদ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ ও সাহায্য দান করিবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এই পরামর্শ মানিতে বাধ্য—একথা সংবিধানে লিখিত নাই। তবে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার স্বরূপ বজায় রাখিতে হইলে, রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শক্রমে চলিতে হইবে।

মন্ত্রীপরিষদ ও পার্লামেণ্ট : মন্ত্রীগণ পার্লামেণ্টের কোন না কোন মন্ত্রীপরিষদের সদস্য এবং লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। পার্লামেণ্টের আস্থার উপর মন্ত্রী-পরিষদের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রীগণই পার্লামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করেন।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Describe the composition of the Union Executive in India.**
   ভারতের ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের গঠন বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২০৪-২০৫]
2. **How is the President of India elected ? How can he be removed ?**
   ভারতের রাষ্ট্রপতি কি ভাবে নির্বাচিত হন ? তাঁহাকে অপসারণ করিবার পদ্ধতি কিরূপ ?
   [পৃষ্ঠা ১৯৩-১৯৪, ১৯৫]
3. **Describe the powers and position of the President of India.**
   ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৯৫-১৯৯]
4. **Give an idea of the relation between the President and his Council of ministers.**
   ভারতীয় রাষ্ট্রপতির সহিত তাঁহার মন্ত্রীপরিষদের সম্পর্ক কিরূপ তাহা বর্ণনা কর।
   [পৃষ্ঠা ২০২-২০৩]
5. **Describe the relation between the Parliament and the Council of Ministers.**
   পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রীপরিষদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২০৩-২০৪]
6. **Describe the powers and position of the Vice-President of India.**
   ভারতের উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও পদ-মর্যাদা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [পৃষ্ঠা ২০০]
7. **Discuss the role of the Prime Minister of India.**
   ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ২০১-২০২]
8. **What do you mean by Responsible Government ? How is this responsibility enforced in India ?**
   দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা বলিতে কি বুঝ ? ভারতে এই দায়িত্ব কিভাবে কার্যকরী করা হয় ?
   [পৃষ্ঠা ৭০, পৃষ্ঠা ২০০—২০৩]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

পার্লামেণ্ট

(The Parliament)

ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতেও দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট ব্যবস্থাপক সভার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপক সভা পার্লামেণ্ট নামে পরিচিত। ইহা রাজ্যসভা ও লোকসভা—এই দুইটি পরিষদ-সমন্বিত। রাষ্ট্রপতিও পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পার্লামেণ্ট দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট।

ভারতের পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের ন্যায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে। রাজ্যগুলির অধিকার এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকায় ইহার আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

ইহা অ-সার্বভৌম আইনসভা।

রাজ্যসভা: অনধিক ২৫০ জন সদস্য লইয়া রাজ্যসভা গঠিত। ১২ জন সদস্য বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক এবং চারুকলাবিদগণের মধ্য হইতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন এবং অনধিক ২৩৮ জন সদস্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতে রাজ্যগুলির সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও আসাম যথাক্রমে ৩৪, ১৬, ৯ ও ৭ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে।

রাজ্যসভার গঠন:

বিধান সভার নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রতিনিধিবৃন্দ সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটে নির্বাচিত হন। অপরপক্ষে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধিবর্গ বিশিষ্ট নির্বাচন সংস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

রাজ্যসভার সভ্যদের যোগ্যতা

রাজ্যসভার সভ্য নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীকে অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে।

রাজ্যসভার স্থিতিকালঃ রাজ্যসভা স্থায়ী পরিষদ। রাষ্ট্রপতি ইহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। তবে প্রতি দুই বৎসর অন্তর এই সভার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহণ করেন।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করিয়া থাকেন।

লোকসভাঃ পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদ লোকসভা বলিয়া অভিহিত। রাজ্যগুলি হইতে অনধিক ৫০০ জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-সমূহ হইতে অনধিক ২০ জন সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত। বর্তমান লোকসভার সভ্যসংখ্যা ৫০৫। তন্মধ্যে রাষ্ট্রপতি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় হইতে ২ জন, আসামের উপজাতি অঞ্চল হইতে ১ জন এবং আন্দামান-নিকোবর ও লাক্ষা এবং মিনিকয়-আমীন দ্বীপপুঞ্জ হইতে ২ জন সদস্য মনোনীত করিয়াছেন। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ৬ জন প্রতিনিধি উক্ত রাজ্যের বিধানমণ্ডলের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বাকী ৪৯৪ জন সদস্য প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তপশীলভুক্ত বর্ণ এবং উপজাতি-সমূহ সংরক্ষিত আসনের অধিকারী। সংরক্ষণের ব্যবস্থা অবশ্যই সাময়িক।

লোকসভার সদস্যের যোগ্যতা। অনূ্যন ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইতে পারে।

লোকসভার কার্যকাল। লোকসভার কার্যকাল সাধারণভাবে ৫ বৎসর। তৎপূর্বেই রাষ্ট্রপতি ইহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আবার জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকিলে পার্লামেণ্ট এককালীন ইহার মেয়াদ ১ বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে।

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের নির্বাচন লোকসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ সদস্যগণের মধ্য হইতেই নির্বাচিত হন। যদিও তাঁহাদের নাম সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দ্বারাই প্রস্তাবিত হয়, তবুও নির্বাচনের পর তাঁহারা রাজনীতি বিষয়ে যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন। রাষ্ট্রপতিই পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করেন। তাঁহারই আদেশে অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে পর পর দুইটি অধিবেশনের মধ্যে ছয়মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হইবে না। সংবিধানে উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনেরও উল্লেখ আছে।

সাধারণতঃ উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের ভোটেই উভয় পরিষদের সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়। কোন সভায় সংশ্লিষ্ট পরিষদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না

থাকিলে, সে সভা বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। নির্দিষ্ট সভ্য সংখ্যা বলিতে পরিষদের সমগ্র সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক দশমাংশকে বুঝায়।

পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী : (Powers and Functions of the Parliament) :

পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও কার্য নানাবিধ :—

(১) আইন প্রণয়ন ক্ষমতা।

পার্লামেন্ট সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় ও যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তালিকা-বহির্ভূত অবশিষ্ট বিষয়েও আইন প্রণয়নের একক অধিকার পার্লামেন্টের। রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্য বিধানমণ্ডল আইন প্রণয়ন করিলেও, অবস্থা বিশেষে পার্লামেন্ট সে সম্বন্ধেও আইন রচনা করিতে পারে। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

(২) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা।

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি একটি আর্থিক বিবরণী পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া সরকারী আয় ব্যয় সংক্রান্ত কোন প্রস্তাব পার্লামেন্টে উত্থাপন করা যায় না। কর ধার্যের প্রস্তাব এবং ব্যয় বরাদ্দের দাবী পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। তবে যে সমস্ত ব্যয় ভারতের সংরক্ষিত তহবিলের উপর ধার্য করা হয় (charged on the consolidated fund of India), যেমন রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা, রাজ্যসভা ও লোকসভার সভাপতি ও সহসভাপতিগণের বেতন ও ভাতা, প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা, সরকারী ঋণের উপর প্রদত্ত সুদ ইত্যাদি, পার্লামেন্টের ভোটে পেশ করা হয় না। পার্লামেন্ট অবশ্য এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারে।

(৩) শাসনবিভাগের উপর কর্তৃত্ব (Control over the Executive)।

দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী শাসনবিভাগ আইনসভার উপর নিভরশীল। ভারতীয় সংবিধানে স্পষ্টই ঘোষণা করা হইয়াছে যে মন্ত্রীপরিষদ যৌথ ভাবে লোকসভার নিকট দায়ী। লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনের উপরেই মন্ত্রীপরিষদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পার্লামেন্টের সদস্যগণ যে কোন মন্ত্রীকে তাঁহার বিভাগীয় কার্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন, জরুরী বিষয় আলোচনার জন্য মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন এবং রাষ্ট্রপতির প্রারম্ভিক ভাষণকে কেন্দ্র করিয়া সরকার-অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রমের তীব্র সমালোচনা করিতে পারেন। মন্ত্রীগণের প্রস্তাবিত বিল নামঞ্জুর করিয়া, সম্ভাব্য

আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক বিবরণী প্রত্যাখ্যান করিয়া, মন্ত্রীপরিষদের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক বা অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পার্লামেণ্ট মন্ত্রীপরিষদের পতন ঘটাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে পার্লামেণ্ট মন্ত্রীপরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রয়াস পায়। সরকারী হিসাব পরীক্ষার জন্য নিযুক্ত কমিটি, অবৈধ এবং অবাঞ্ছিত ব্যয়-ব্যাপারে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং পার্লামেণ্টকেও অবহিত করিয়া থাকে। সরকার তাহার প্রতিশ্রুতি মত কার্য করিতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য একটি প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শাসনবিভাগের উপর অর্পিত আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করিবার জন্যও অপর একটি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নামমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রীপরিষদ যে কোন প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইতে পারে। তবে বিরোধীপক্ষের যুক্তিসহ সমালোচনা সরকারের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিয়া মন্ত্রীপরিষদের স্বেচ্ছাচার যথাসম্ভব সংযত করিয়া থাকে।

(৪)
বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা।

রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সর্বোচ্চ হিসাব নিরীক্ষক এবং প্রধান ধর্মাধিকরণ ও মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণকে পার্লামেণ্ট অভিযুক্ত এবং অপসারিত করিতে পারে।

(৫)
সংবিধান বিষয়ক ক্ষমতা।

পার্লামেণ্টের হস্তে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতাও অর্পণ করা হইয়াছে। অবশ্য বিশেষ কতগুলি ধারা সংশোধন করিতে হইলে রাজ্য বিধানমণ্ডলগুলির অন্ততঃপক্ষে অর্ধেকের সম্মতির প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য ক্ষমতা।

পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের দ্বারাই নিযুক্ত হন। পার্লামেণ্টের অপর একটি দিক দিয়া গুরুত্ব রহিয়াছে। পার্লামেণ্ট হইতেছে জাতীয় প্রতিনিধি-সভা। ইহা জনমতের প্রতিফলন ক্ষেত্র। জনগণের অভাব অভিযোগের প্রতি পার্লামেণ্টই সকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ।

রাজ্যসভা ও লোকসভার পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation between the Lok Sabha and the Rajya Sabha) :

ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত রাজ্য ও অঞ্চল সমূহের প্রতিনিধি লইয়া রাজ্যসভা গঠিত। অর্থাৎ রাজ্যসভা রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকে। অপর পক্ষে

লোকসভা ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। ইহার সভ্যগণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার মাধ্যমে রাজ্যগুলির স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং লোকসভা জনপ্রতিনিধিসভা হিসাবে জাতীয় ঐক্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে।

রাজ্যসভা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের এবং লোকসভা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব ব্যতীত অপর কোন বিল যে কোন পরিষদে উত্থাপন করা যায় এবং উভয়ের সম্মতি ব্যতীত তাহা আইনে পরিণতি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু কোন বিল লইয়া উভয় পরিষদের মধ্যে মত বিরোধ ঘটিলে, যুক্ত অধিবেশনে সংখ্যাধিক্যের ভোটে বিলটির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে। লোকসভার সদস্য সংখ্যা অধিক হওয়ার দরুণ, রাজ্যসভার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

সাধারণ আইন প্রণয়ন ব্যাপারে উভয়ের ক্ষমতা প্রায় সমান।

অর্থ সংক্রান্ত বিল বা প্রস্তাব একমাত্র লোকসভাতেই উত্থাপিত হইবে। লোকসভা কর্তৃক গৃহীত অর্থসংক্রান্ত বিল, রাজ্যসভার বিরোধিতা সত্ত্বেও আইনে পরিণত হইবে। রাজ্যসভা কেবলমাত্র ১৪ দিন বিলম্ব ঘটাইতে পারে।

অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য-সভার অধিকার নাম মাত্র।

সংবিধানে বলা হইয়াছে মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোক-সভার নিকট দায়ী। অর্থাৎ একমাত্র লোকসভার সমর্থনের অভাবেই মন্ত্রীপরিষদের পতন ঘটিবে। রাজ্যসভার সম্মতি বা অসম্মতিতে কিছুই যায় আসে না।

শাসনবিভাগ নিয়ন্ত্রণের একক অধিকার লোক সভার।

রাজ্যসভা এক দিক দিয়া স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যসভা যদি সমগ্র সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করা বিধেয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট উক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

রাজ্যসভার বিশিষ্ট ক্ষমতা।

॥ সারাংশ ॥

পার্লামেণ্ট বলিতে অবশ্যই রাষ্ট্রপতি সহ পার্লামেণ্ট বুঝাইয়া থাকে। ইহার দুইটি পরিষদ—রাজ্যসভা ও লোকসভা।

রাজ্যসভার সভ্যসংখ্যা অনধিক ২৫০। ইহার মধ্যে ১২ জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত এবং অনধিক ২৩৮ জন পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ইহা স্থায়ী পরিষদ।

ইহার এক তৃতীয়াংশ সভ্য দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। লোকসভা অনধিক ৫২০ জন সভ্য লইয়া গঠিত। সদস্যগণ সাধারণতঃ জনগণের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি অনধিক দুইজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। লোকসভার স্থিতিকাল পাঁচ বৎসর। তবে তৎপূর্বেই ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়। জরুরী অবস্থায় ইহার কার্যকাল বাড়ানও চলে।

পার্লামেণ্টের ক্ষমতা : (১) ইহা কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম-তালিকাভুক্ত বিষয়ে সাধারণভাবে এবং অবস্থাবিশেষে রাজ্যতালিকভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে। উভয় পরিষদের সমর্থনে আইন পাশ হয়। উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিলে যুক্ত অধিবেশন আহূত হয়। (২) ইহা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। (৩) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি প্রভৃতিকে ইহা অপসারিত করিতে পারে। (৪) আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। (৫) রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে ইহার অধিকার আছে। (৬) ইহা সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতারও অধিকারী। তাহা ছাড়া ইহার মাধ্যমেই জনগণের অভাব-অভিযোগ ধ্বনিত হয়।

উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক : (১) রাজ্যসভা, অঙ্গরাজ্যসমূহের স্বার্থ ও অধিকারের এবং লোকসভা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। (২) সাধারণ আইনের ব্যাপারে উভয় পরিষদের ক্ষমতাই সমান। তবে যুক্ত অধিবেশনের দ্বারা লোকসভার প্রাধান্যই সূচিত হয়। (৩) অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে লোকসভার মতামতই চূড়ান্ত। (৪) লোকসভার নিকটই মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে দায়ী। (৫) রাজ্যসভার প্রস্তাব অনুযায়ী পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Briefly describe the composition and powers of the Parliament of India.
   ভারতীয় পার্লামেণ্টের গঠন এবং ক্ষমতা সংক্ষেপে বিবৃত কর। [পৃষ্ঠা ২০৬-২০৯]
2. Discuss the relation between the two houses of the Parliament.
   পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ২০৯-২১০]
3. Discuss the nature of the control exercised by the Parliament over the Executive
   শাসনবিভাগের উপর পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।
   [পৃষ্ঠা ২০৮-২০৯]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

রাজ্য সরকার

(State Government)

বর্তমানে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত মোট রাজ্যসংখ্যা ১৫। প্রত্যেক রাজ্যে একই ধরণের দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। রাজ্য শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে রহিয়াছেন রাজ্যপাল। তাঁহাকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ নিয়োগ করা হয়। মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী। প্রত্যেকটি রাজ্যে একটি মহাধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এইভাবে রাজ্যপাল, মন্ত্রীসভা, এক বা দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট আইনসভা এবং একটি মহাধর্মাধিকরণ লইয়া রাজ্যসরকার গঠিত হয়। মহাধর্মাধিকরণ সম্বন্ধে আলোচনা ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা প্রসঙ্গে করা হইবে।

রাজ্য সরকার বলিতে কি বুঝায়।

রাজ্যপাল (Governor): প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া রাজ্যপাল থাকেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্যকাল সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন। তাঁহাকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্ততঃপক্ষে ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। সদর-ই-রিয়াসৎ নামে অভিহিত জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপ্রধান উক্ত রাজ্যের বিধানমণ্ডলের দ্বারা নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বীকৃত হইয়া থাকেন।

রাজ্যপালের নিয়োগ, যোগ্যতা ও কার্যকাল।

রাজ্যপাল পার্লামেণ্ট অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডলের সভ্য থাকিবেন না এবং অপর কোন লাভজনক কার্যে নিযুক্ত হইবেন না। তিনি বিনা ভাড়ায় সরকারী ভবনে বাস করিবেন এবং পার্লামেণ্টের দ্বারা নির্ধারিত হারে বেতন, ভাতা ইত্যাদি পাইবেন। কার্যকালের মধ্যে তাঁহার বেতন ইত্যাদি হ্রাস করা চলিবে না।

রাজ্যপাল পদের শর্ত।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of the Governor): রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সাধারণত চার ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—শাসন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং বিচার বিষয়ক ক্ষমতা।

রাজ্যের শাসনভার রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই ক্ষমতা তিনি স্বয়ং অথবা অধীনস্থ কর্মচারীদের মাধ্যমে প্রয়োগ করিবেন। তাঁহারই নামে রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হইবে। তাঁহাকে মন্ত্রণা দিবার জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকে। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁহারই পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(১) শাসনসম্বন্ধীয় ক্ষমতা।

রাজ্যের মহাব্যবহারিক (Advocate General) এবং রাজ্যের সরকারী কর্মচারী নিয়োগ কমিশনের (State Public Service Commission) সভাপতি ও সদস্যগণ রাজ্যপালের দ্বারা মনোনীত হইয়া থাকেন। মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতি নিয়োগকালে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন।

তপশীলভুক্ত উপজাতি ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ভার রাজ্যপালের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

রাজ্যপাল রাজ্য-বিধানমণ্ডলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি রাজ্য-বিধানমণ্ডলের অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন স্থগিত রাখিতে পারেন এবং প্রয়োজনবোধে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি বিধানসভায় কয়েকজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য এবং বিধানপরিষদে কিছু সংখ্যক সভ্য মনোনীত করিয়া থাকেন। তিনি যে কোন পরিষদে অথবা উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন। বিধানমণ্ডলে বাণী প্রেরণের অধিকারও তাঁহার আছে। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন বিল আইনে পরিণত হয় না। বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রেরিত বিলে তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন, অথবা নাও পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তিনি তাহা রাষ্ট্রপতি সকাশে প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থবিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল তিনি আইনসভার পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। কিন্তু ইহা আইন সভার দ্বারা দ্বিতীয়বার গৃহীত হইলে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা।

আইনসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালে তিনি জরুরী আইন (ordinance) জারী করিতে পারেন। আইনসভার পুনরধিবেশনের ছয় সপ্তাহ অন্তে উক্ত জরুরী আইন আর বলবৎ থাকিবে না।

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভে রাজ্যপাল রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক বিবরণী আইনসভায় মন্ত্রী মারফৎ উপস্থাপিত করিয়া থাকেন। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত আয়-ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাব আইনসভায় উত্থাপন করা যায় না।

(৩) অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা।

রাজ্য আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা প্রদর্শন করিতে পারেন এবং তাহার দণ্ড হ্রাস করিতে বা দণ্ডাদেশ স্থগিত রাখিতে পারেন।

(৪) বিচার বিষয়ক ক্ষমতা।

রাজ্যপালের হস্তে যে সব ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শক্রমেই পরিচালিত হইবে। রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপ্রধানের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। তবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিবেচক রাজ্যপাল সমগ্র রাজ্য শাসন ব্যবস্থাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করিতে পারেন।

রাজ্যপালপদের প্রকৃতি।

মন্ত্রীপরিষদ (Council of Ministers) ঃ সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকিবে। রাজ্যপাল প্রথমে বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত ও তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন। মন্ত্রীদের কার্যকাল তাঁহার ইচ্ছাধীন।

মন্ত্রীপরিষদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি।

সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল যে সব বিষয়ে স্ব-ইচ্ছায় কার্য করিবার অধিকারী, মন্ত্রীপরিষদ সে সব বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ দান করিবে না। অবশ্য আসাম ব্যতীত অন্য কোন রাজ্যের রাজ্যপালের স্ব-ইচ্ছায় ক্ষমতা প্রয়োগের কথা সংবিধানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই। তবে সংবিধানে বলা হইয়াছে যে কোন্ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ইচ্ছামত ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন, তাহা তিনিই স্ব ইচ্ছায় স্থির করিবেন। এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির তথা কেন্দ্রের প্রতিনিধি। রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় অচল অবস্থার উদ্ভব হইলে তিনি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শক্রমে না চলিয়া রাষ্ট্রপতিকে যথার্থ সংবাদ জ্ঞাপন করিবেন। অতএব রাজ্যপালকে রাজ্য শাসন ব্যবস্থার অলঙ্কারস্বরূপ ধরিলে ভুল হইবে।

মন্ত্রীপরিষদের সহিত রাজ্যপালের সম্পর্ক।

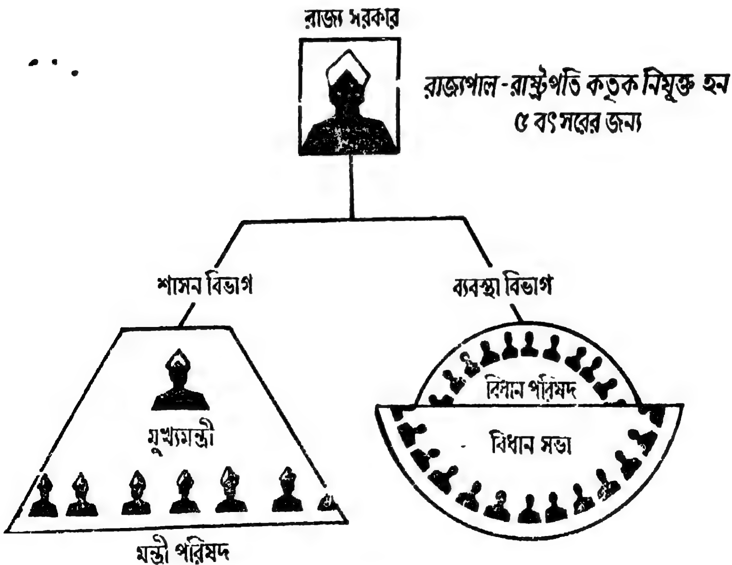
রাজ্য মন্ত্রীপরিষদের প্রধানকে মুখ্যমন্ত্রী (Chief Minister) বলা হয়। কেবল-মাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদের নেতাকে প্রধান মন্ত্রী আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা কেন্দ্রের প্রধান মন্ত্রীর অনুরূপ। তাঁহারই পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীগণ নিযুক্ত হন। তিনি মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। রাজ্যপালের সহিত মন্ত্রীপরিষদের সংযোগ তাঁহারই মাধ্যমে রক্ষা করা হয়। তিনি শাসন সংক্রান্ত সংবাদ রাজ্যপালকে সরবরাহ করেন

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা।

এবং রাজ্যপাল কর্তৃক আদিষ্ট হইলে কোন একজন মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত সমগ্র মন্ত্রীপরিষদের বিবেচনার জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী আইনসভার সরকারী দলের প্রধান মুখপাত্র। তিনি বিধানসভার নেতা হিসাবে বিবেচিত হন।

আইনসভার সহিত মন্ত্রীপরিষদের সম্পর্ক।

সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রীকে রাজ্য বিধানমণ্ডলের কোন একটি পরিষদের সভ্য হইতে হইবে। বিধানমণ্ডলের সভ্য নহেন, এমন কোন ব্যক্তি মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে, তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে যে কোন একটি পরিষদের সভ্য হইতে হইবে। অন্যথায় তাঁহাকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী। বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনের উপরেই মন্ত্রী-পরিষদের আয়ুষ্কাল নির্ভর করে। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন সত্য, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহারা বিধানসভার অধিকাংশ সভ্যের আস্থাভাজন থাকিবেন, ততক্ষণ রাজ্যপাল সহসা তাঁহাদিগকে অপসারিত করিতে পারেন না।



রাজ্য বিধানমণ্ডল (State Legislature) :

রাজ্য বিধানমণ্ডল রাজ্যপাল এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে সদর-ই-রিয়াসৎ রাজ্যপালের স্থলে বিধানমণ্ডলের অঙ্গ।

রাজ্য বিধানমণ্ডলের গঠন।

অন্ধ্র, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু ও কাশ্মীর এই ১১টি রাজ্যে বিধানমণ্ডল দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট। বাকী ৪টি রাজ্যের বিধানমণ্ডল কেবলমাত্র বিধানসভা লইয়া গঠিত। দুইটি পরিষদ থাকিলে উচ্চ কক্ষকে বিধান পরিষদ ও নিম্ন কক্ষকে বিধান সভা নামে অভিহিত করা হয়।

বিধান পরিষদ সম্পর্কে ব্যবস্থা।

কোন রাজ্যের বিধানসভা যদি উপস্থিত সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এবং সমগ্র সদস্য সংখ্যার অধিকাংশের সমর্থনে সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠনের অথবা প্রতিষ্ঠিত বিধান পরিষদের বিলুপ্তির প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

বিধান পরিষদ (Legislative Council) : বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা বিধান সভার সভ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক এবং ৪০এর কম হইতে পারিবে না। বিধান পরিষদের মোট আসন সংখ্যার (১) এক-তৃতীয়াংশ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিগণের জন্য নির্দিষ্ট; (২) অপর এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়; (৩) এক-দ্বাদশাংশ গ্রাজুয়েটগণের এবং (৪) অপর এক-দ্বাদশাংশ শিক্ষকগণের নির্বাচন সাপেক্ষ; (৫) অবশিষ্টগুলিতে রাজ্যপাল রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সমাজসেবক প্রভৃতিগণের মধ্য হইতেই সদস্য মনোনীত করিয়া থাকেন।

বিধান পরিষদের গঠন।

বিধান পরিষদের উপরি-উক্ত গঠন প্রণালী পার্লামেণ্ট ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করিতে পারে।

বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইতে হইলে, প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং অন্যূন ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে।

সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচন করেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৭৬। তন্মধ্যে ৫৪ জন বিধান সভা এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রেরিত হইয়াছেন।

গ্রাজুয়েট ও শিক্ষকগণের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছেন ১৩ জন। আর বাকী ৯ জন রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত হইয়াছেন।

বিধান পরিষদের স্থিতিকাল।

ইহা একটি অস্থায়ী পরিষদ। তবে প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সভ্য বিদায় গ্রহণ করেন।

বিধান সভা (Legislative Assembly): অন্যূন ৬০ এবং অনধিক ৫০০ জন সদস্য লইয়া বিধান সভা গঠিত হয়। সদস্যগণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তবে ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়কে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিবার জন্য রাজ্যপাল কয়েকজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিতে পারেন। তপশীলভুক্ত বর্ণ ও উপজাতিসমূহের জন্যও আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

বিধানসভার গঠন।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মোট আসনসংখ্যা ২৫৬। ইহার মধ্যে ৪টি আসনে রাজ্যপাল ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য মনোনীত করিয়াছেন; তপশীলভুক্ত বর্ণ ও উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ৪৫ এবং ১৫। বাকী ১৯২টি হইতেছে সাধারণ আসন। অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইতে পারে।

বিধানসভার স্থিতিকাল সাধারণভাবে ৫ বৎসর। তবে রাজ্যপাল তৎপূর্বেই ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। আবার জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকিলে, পার্লামেণ্ট এককালীন এক বৎসর ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারেন।

বিধানসভার কার্যকাল।

বিধান সভার কার্য পরিচালনার জন্য সভ্যদের মধ্য হইতে একজন অধ্যক্ষ (Speaker) এবং একজন উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker) নির্বাচিত হইয়া থাকেন। রাজ্যপাল বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে বা স্থগিত রাখিতে পারেন। কিন্তু সংবিধান অনুসারে পর পর দুইটি অধিবেশনের মধ্যে ছয় মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হইবে না।

বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (Powers and Functions of State Legislatures):

রাজ্য বিধানমণ্ডল যুগ্ম ও রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

(১)
আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা।

যুগ্মতালিকার অন্তর্গত বিষয়ে বিধানমণ্ডল রচিত বিধি যদি পার্লামেণ্ট-প্রণীত আইনের বিরোধী হয়, তাহা হইলে প্রথমটি বাতিল হইয়া যাইবে এবং দ্বিতীয়টি বহাল রহিবে

যে সব রাজ্যে একটি মাত্র পরিষদ (বিধান সভা) আছে, সেখানে উক্ত সভার উপস্থিত সভ্যের সংখ্যাধিক্যে বিল পাস করা হয়। কিন্তু যে সব বিধান মণ্ডল দ্বি-পরিষদ-সমন্বিত, সেখানে অর্থবিল ছাড়া অন্য সব বিল যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায় এবং উভয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পর বিলটি রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। তবে এ বিষয়ে বিধান সভার ক্ষমতাই অধিক। বিধান সভা কর্তৃক গৃহীত বিল, বিধান পরিষদে প্রেরিত হইবার পর, বিধান পরিষদ যদি তাহা প্রত্যাখ্যান করে, বা তিন মাসের অধিক কাল ফেলিয়া রাখে, তাহা হইলে বিধান সভা তাহা পুনরায় পাশ করিয়া বিধান পরিষদে প্রেরণ করিতে পারে। এইবারও বিধান পরিষদ যদি তাহা প্রত্যাখ্যান করে, অথবা বিধান সভার পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য সংশোধন সহ পাস করে, অথবা একমাস কাল ফেলিয়া রাখে, তাহা হইলে উক্ত বিল রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হইবে।

আইনপ্রণয়নে উভয় পরিষদের ভূমিকা।

প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের প্রারম্ভে সরকারী আয়-ব্যয়ের বাৎসরিক হিসাব বিধানমণ্ডলের নিকট উপস্থিত করা হয় এবং ইহার সম্মতি ব্যতীত কর ধার্য বা ব্যয় বরাদ্দ করা যায় না। তবে যে সব ব্যয় রাজ্যের সংরক্ষিত তহবিলের (Consolidated fund of the State) উপর ধার্য করা হয় (যেমন রাজ্যপালের বেতন, ভাতা, মহাধর্মাধিকরণের বিচারপতিগণের বেতন, ভাতা, ইত্যাদি) তাহার উপর বিধানমণ্ডলের ভোট গ্রহণ করা হয় না।

(২)
অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা।

অর্থসংক্রান্ত প্রস্তাব বা বিল একমাত্র বিধান সভায় উত্থাপন করা চলে। বিধান সভা কর্তৃক গৃহীত অর্থবিলে যদি বিধান পরিষদ সম্মতি জ্ঞাপন না করে, অথবা ১৪ দিনের মধ্যে যদি তাহা প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে উক্ত বিল উভয় পরিষদের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে বিধান পরিষদের ক্ষমতা নামমাত্র।

শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার বিধান সভার হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী। বিধান সভা মন্ত্রীপরিষদ প্রস্তাবিত বিল প্রত্যাখ্যান করিয়া, ব্যয় বরাদ্দের দাবী নামঞ্জুর করিয়া এবং সর্বোপরি অনাস্থা-সূচক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া মন্ত্রীপরিষদের পতন অনিবার্য করিয়া তুলিতে পারে।

(৩)
শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা।

ইহা আসলে বিধান সভারই ক্ষমতা।

সংবিধানের বিশেষ কতকগুলি ধারা—যেমন, রাষ্ট্রপতির নির্বাচনব্যবস্থা, কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও যুগ্মতালিকা ইত্যাদি সংশোধন করিতে হইলে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ রাজ্য বিধানমণ্ডলের সম্মতির প্রয়োজন হয়। আবার রাজ্য পুনর্গঠন সংক্রান্ত বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডলের অভিমত সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

অন্যান্য ক্ষমতা।

কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা (Administration of Union Territories) :

দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান-নিকোবর, লাক্ষা ও মিনিকয়-আমীন দ্বীপপুঞ্জ, গোয়া এবং পণ্ডিচেরী—এই আটটি অঞ্চল কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে। রাজ্যসমূহের অনুরূপভাবে কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলিতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় নাই। প্রত্যেক কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের জন্য রাষ্ট্রপতি একজন করিয়া শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া থাকেন। শাসনকর্তা 'Chief Commissioner' বা প্রধান ভুক্তিপতি, অথবা 'Lieutenant Governor' বা উপ-রাজ্যপাল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পার্লামেণ্ট এই সমস্ত অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করে। রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই ইহাদের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে আইনের দ্বারা কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহে পৃথক মহাধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। আঞ্চলিক সমস্যার সমাধানকল্পে হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং ত্রিপুরা এই তিনটি অঞ্চলে গণতান্ত্রিক শাসনের পূর্বাভাষ হিসাবে একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ (Territorial Council) গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পৌর সমস্যার সমাধানের জন্য দিল্লীতে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

॥ সারাংশ ॥

রাজ্যপাল, মন্ত্রীপরিষদ, বিধানমণ্ডল ও মহাধর্মাধিকরণ লইয়া রাজ্যসরকার গঠিত হয়।

রাজ্যপাল : রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাধারণতঃ পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। তিনি নিয়মতান্ত্রিক-শাসক হিসাবে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শক্রমে রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার ক্ষমতা নানাবিধ ; যেমন, শাসন সংক্রান্ত, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত, অর্থ সম্বন্ধীয় এবং বিচার বিষয়ক।

মন্ত্রীপরিষদ : প্রত্যেক রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি করিয়া মন্ত্রীপরিষদ আছে। মন্ত্রীপরিষদের নিয়োগকর্তা রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে সাহায্য ও পরামর্শ দান করাই হইল ইহার প্রধান কার্য। মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে বিধানসভার উপর নির্ভরশীল। মন্ত্রীপরিষদের আয়ুষ্কাল রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন। মন্ত্রীপরিষদই রাজ্যের প্রকৃত শাসক।

বিধানমণ্ডল : রাজ্যপাল বিধানমণ্ডলের অন্যতম অংশ। বিধানমণ্ডল একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। একটি মাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাকে বলা হয় বিধানসভা। আর দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট বিধানমণ্ডলের উচ্চ কক্ষকে বিধান পরিষদ এবং নিম্ন কক্ষকে বিধানসভা নামে অভিহিত করা হয়। ভারতের ১:টি রাজ্যের আইনসভা দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট।

বিধানপরিষদের সভ্যসংখ্যা বিধানসভার সভ্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক বা ৪০-এর কম হইবে না। সদস্যগণ বিধানসভা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, গ্রাজুয়েট, শিক্ষক প্রভৃতির দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাজ্যপাল-মনোনীত কয়েকজন সদস্যও আছেন। ইহা স্থায়ী পরিষদ।

অনধিক ৫০০ এবং অন্যূন ৬০ জন সভ্য লইয়া বিধানসভা গঠিত। সদস্যগণ প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কয়েকজন ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্য রাজ্যপালের দ্বারা মনোনীত হইয়া থাকেন। ইহার কার্যকাল সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর। তৎপূর্বেই ইহাকে ভাঙিয়া দেওয়া যায়।

বিধানমণ্ডলের ক্ষমতা :—(১) ইহা যুগ্ম ও রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে, (২) ইহা রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর বা না-মঞ্জুর করিতে পারে, (৩) ইহা শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। বিধানসভাই সমধিক প্রভাবশালী। বিধানপরিষদের ক্ষমতা নামমাত্র।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা : ভারতে মোট ছয়টি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল আছে। রাষ্ট্রপতিকর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান ভুক্তিপতি বা উপ-রাজ্যপালের দ্বারা এই অঞ্চলগুলিতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। পার্লামেণ্ট এই সব অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করে। সম্প্রতি হিমাচল প্রদেশে, মণিপুর ও ত্রিপুরায় আঞ্চলিক পরিষদ এবং দিল্লীতে একটি কর্পোরেশন স্থাপন করা হইয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Describe the Powers and Position of the Governor of a State.
   রাজ্যপালের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২১২-২১৪]

2. Describe the Powers and Functions of the Council of ministers in relation to the Governor and State Legislature.
   রাজ্যপাল এবং বিধানমণ্ডল সম্পর্কে মন্ত্রীপরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।
   [পৃষ্ঠা ২১৪-২১৫]

3. Describe the composition and function of the Legislature.
   বিধানমণ্ডলের গঠন এবং কার্যাদি বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২১৬-২১৯]

4. Write a note on the administration of Union Territories.
   কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [পৃষ্ঠা ২১৯]

5. What is the relation between the Legislative Council and the Legislative Assembly ?
   বিধান পরিষদ ও বিধান সভার মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ? [পৃষ্ঠা ২১৬-২১৯]

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্য সমূহের মধ্যে সম্পর্ক

(Relation between the Union and the State)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী ভারতেও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আইন প্রণয়নের এবং শাসন পরিচালনার ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সম্পর্ক (Legislative Relation)

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বণ্টনের উদ্দেশ্য সংবিধানে তিনটি তালিকা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(১) **ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় তালিকা** (Union List) : সমগ্র রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থ জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় তালিকায় স্থান পাইয়াছে। দেশ রক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী, বৈদেশিক ব্যাপার, যুদ্ধ ও শান্তি, রেলপথ, ডাক, তার ও টেলিফোন, বেতার, মুদ্রা-ব্যবস্থা, বীমা ইত্যাদি ৯৭টি বিষয় এই তালিকার অন্তর্গত। এই সব বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের একক অধিকার পার্লামেন্টের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

(২) **যুগ্মতালিকা** (Concurrent List) : ৪৭টি বিষয় সম্বলিত এই তালিকা কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই এলাকাধীন। ফৌজদারী দণ্ড বিধি, নিবর্তনমূলক আটক, বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, বিদ্যুৎশক্তি ইত্যাদি যুগ্মতালিকার অন্তর্গত বিষয়ে পার্লামেণ্ট এবং রাজ্য বিধানমণ্ডল উভয়েই আইন প্রণয়ন করিতে পারে। এইসব বিষয়ে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন রাজ্য আইনের উপর বলবৎ হইবে।

(৩) **রাজ্যতালিকা** (State List) : যে সমস্ত বিষয়ের সহিত রাজ্যের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য জড়িত রহিয়াছে, সেইরূপ ৬৬টি বিষয় রাজ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছে, যেমন শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ; পুলিশ, জেল ও বিচার ব্যবস্থা ; জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি ও ভূমি, সমবায় সমিতি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি। রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে সাধারণতঃ রাজ্য বিধানমণ্ডলই আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে।

(৪) **অবশিষ্ট বা অনুল্লিখিত ক্ষমতা** (Residuary Powers) : উপরি-উক্ত তিনটি তালিকা বহির্ভূত কোন নূতন বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিলে পার্লামেণ্টই তাহা সম্পাদন করিবে।

সাধারণতঃ রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট রাজ্য-তালিকার অন্তর্গত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে :

রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ।

(১) দুই বা ততোধিক রাজ্য বিধানমণ্ডলের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইলে ;

(২) আন্তর্জাতিক সন্ধি চুক্তি ইত্যাদি বলবৎ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলে ;

(৩) রাজ্যসভা সমগ্র সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে পার্লামেণ্টের রাজ্যতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা উচিত, তাহা হইলে ;

(৪) জরুরী অবস্থার ঘোষণা বলবৎ থাকা কালে ;

(৫) কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইলে।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত সম্পর্ক (Administrative Relations) :

কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কেন্দ্র নানা ভাবে রাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে।

প্রথমতঃ সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী, রাজ্যসরকারের আইন প্রণয়নাধিকার কেন্দ্রীয় আইনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে এবং শাসন ক্ষমতা এরূপভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধিকার ব্যাহত না হয়।

দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে নির্দেশ দান করিতে পারে এবং এই নির্দেশ পালনে কোন রাজ্যসরকার অস্বীকৃত বা অসমর্থ হইলে, কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ জাতীয় স্বার্থে বা সামরিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত সংযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে, এবং রাজ্যস্থিত রেলপথ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে নির্দেশ দান করিতে পারে। এই সমস্ত কার্যের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় কেন্দ্র মঞ্জুর করিবে।

চতুর্থতঃ রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করিলে যে কোন কেন্দ্রীয় বিষয়ের পরিচালনভার রাজ্যসরকারের সম্মতি ক্রমে তাহার হস্তে অথবা তাহার অধীনস্থ কর্মচারীগণের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন।

পঞ্চমতঃ দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদীর জল বা নদী উপত্যকা লইয়া সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইলে পার্লামেণ্ট উক্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

ষষ্ঠতঃ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ (Inter-State Council) গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে রাজ্য পুনর্গঠন আইনানুসারে সমগ্র ভারতীয় ইউনিয়নকে ৫টি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Council) গঠন করা হইয়াছে।

সপ্তমতঃ রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। রাজ্যশাসনের সমুদয় ক্ষমতা তাঁহার নামে পরিচালিত হইবে। রাজ্যপাল যদি এই মর্মে রাষ্ট্রপতিকে সংবাদ পাঠান যে তাঁহার শাসনাধীন রাজ্য সংবিধান সম্মতভাবে শাসিত হইতেছে না, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করিয়া উক্ত রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন।

॥ সারাংশ ॥

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য সংবিধানে তিনটি তালিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে পার্লামেণ্ট। রাজ্যতালিকার অন্তর্গত বিষয়ে রাজ্য আইনসভা আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই এলাকাধীন। অবশিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকার পার্লামেণ্টের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। সাধারণভাবে রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেণ্ট হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু অবস্থা বিশেষে পার্লামেণ্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দান করিতে পারে। আবার রাজ্য সরকারকে বাতিল করিয়া কোন রাজ্যের শাসনভার কেন্দ্র স্বহস্তে গ্রহণও করিতে পারে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Briefly describe the relation between the Union and the State under the Constitution of India.**
   ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্বন্ধ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২২২-২২৪]
2. **Describe the legislative relation between the Union and the States of India.**
   ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সম্পর্ক বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২২২-২২৩]
3. **Discuss the administrative relation between the Union and State.**
   কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক লইয়া আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ২২৩-২২৪]

ষড়বিংশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার সমূহের আয়-ব্যয়

(Sources of Revenue and Heads of Expenditure of the Union and State Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের আয়ের উৎস সুনির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। অর্থবিষয়ে উভয় সরকার পরস্পর স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ না হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের প্রকৃতি অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায় না। কেন্দ্র রাজ্যের উপর অথবা রাজ্য কেন্দ্রের উপর আর্থিক দিক দিয়া নির্ভরশীল হইয়া পড়িলে শাসন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য অবশ্যম্ভাবী ভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে।

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বতন্ত্র আয়ের উৎস থাকা বাঞ্ছনীয়।

তবে অর্থ সম্বন্ধীয় স্বাতন্ত্র্য পুরামাত্রায় বজায় রাখা সম্ভব নহে। একটি উদাহরণের সাহায্যে এই স্বাতন্ত্র্যের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করা যায়। আয়কর বর্তমান কালে সরকারী আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। ইহা রাজ্যগুলির হস্তে অর্পণ করিলে রাজ্যগুলির আয় পর্যাপ্ত হইবে। কিন্তু সমগ্র দেশে আয়কর যদি একই হারে আরোপ করিতে হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তেই ইহার নির্ধারণ ও আদায়ের ভার থাকা যুক্তিযুক্ত। আবার এই করলব্ধ অর্থ একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হইলে রাজ্যগুলির আর্থিক সঙ্গতি ক্ষুণ্ণ হইবে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক আদায়ীকৃত আয়কর হইতে লব্ধ আয়ের একটি অংশ অবশ্যই রাজ্যসরকারকে অর্পণ করিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে সমতা রক্ষা ও প্রয়োজনানুরূপ অর্থসংস্থানের জন্য স্বাতন্ত্র্যনীতিকে অবাধে প্রয়োগ করা যায় না। আয় বণ্টনের ব্যাপারে আরও একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহা হইতেছে পরিচালন সংক্রান্ত সুবিধা।

কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য নীতির অবাধ প্রয়োগ সম্ভব নহে।

ভারতে রাজস্ব বণ্টনের পদ্ধতি :

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নরূপ :

(১) কয়েকটি কর—যেমন রেলভাড়া ও মাশুলের উপর কর, অকৃষিভূমির উপ উত্তরাধিকার কর, সংবাদপত্র ক্রয়, বিক্রয় ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপ

কর, ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য ও আদায় করিবে। তবে আদায়ের খরচ বাদে যে পরিমাণ অর্থ ইহা হইতে উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা পূর্ণভাবে রাজ্যগুলি ভোগ করিবে।

(২) কতকগুলি কর ও শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করিবে, কিন্তু সে সমস্ত আদায় ও আত্মসাৎ করিবে রাজ্যসরকার, যথা ষ্ট্যাম্প কর এবং প্রসাধন সামগ্রীর উপর ধার্য আবগারী শুল্ক।

(৩) আয়কর (কৃষিজনিত আয় বাদে) ধার্য ও সংগৃহীত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে, কিন্তু আদায়ীকৃত কররাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে।

(৪) ঔষধ ও প্রসাধন দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য সামগ্রীর উপর আবগারী শুল্ক কেন্দ্রীয় সরকার নির্ধারণ ও সংগ্রহ করিবে। ইহা হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইতে পারে।

(৫) পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানীর উপর রপ্তানী শুল্ক, ধার্য ও আদায় করিবে কেন্দ্রীয় সরকার, কিন্তু এই সূত্র হইতে সংগৃহীত নীট আদায়ের অংশ বাবদ পাট উৎপাদনকারী রাজ্য, যথা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যাকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। তবে সংবিধান প্রবর্তিত হইবার ১০ বৎসর পরে উক্ত দান বন্ধ করা হইবে।

(৬) রাজ্য সরকার স্বীয় প্রয়োজনে অথবা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বৃত্তি, ব্যবসা, উপজীবিকা ও চাকুরীর উপর কর আরোপ করিতে পারে।

(৭) এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার বাণিজ্য শুল্ক, কর্পোরেশন কর ইত্যাদি এবং রাজ্যসরকার কৃষিজাত আয়ের উপর কর, ভূমি রাজস্ব, রাজ্য আবগারী কর ইত্যাদি ধার্য করিতে পারিবে।

(৮) সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে রাজ্যগুলির জন্য বাৎসরিক অর্থ সাহায্য বরাদ্দ করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের উৎস ঃ

সরকারী রাজস্ব সাধারণতঃ দুইটি উৎস হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে—

প্রথমতঃ কর ধার্য করিয়া সরকার রাজস্ব সংগ্রহ করে, ইহাকে বলা হয় কর-সাপেক্ষ রাজস্ব (Tax Revenue)। ইহাই সরকারী আয়ের প্রধান উৎস।

দ্বিতীয়তঃ সেবামূলক কাজের মূল্য বাবদ সরকার অর্থ সংগ্রহ করে এবং শিল্প পরিচালনা বা ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারাও সরকারের অর্থাগম হইয়া থাকে। এই সব সূত্রে প্রাপ্ত অর্থকে কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব (Non-Tax Revenue) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

কর-সাপেক্ষ রাজস্ব :

নিম্নলিখিত উৎস হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়া থাকে—

(১) **কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক** (Central Excise Duties) : শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। বর্তমানে এই উৎস হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বাধিক আয় হইয়া থাকে। তামাক, দিয়াশালাই, উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, চিনি, চা, কফি, কাগজ ইত্যাদি সাধারণের ব্যবহার্য সামগ্রীর উপরও আবগারী শুল্ক আরোপ করার ফলে, কেন্দ্রীয় সরকারের আয় নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তজ্জন্য দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত করভারে জর্জরিত হইতেছে।

এই শুল্ক হইতে প্রাপ্ত নীট আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ রাজ্যসরকারগুলির প্রাপ্য। ১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে এই সূত্র হইতে মোট রাজস্বের পরিমাণ ৩৫৮.৯১ কোটি টাকা, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মোট রাজস্বের শতকরা ৪৫.৫ ভাগ ধরা হইয়াছিল। ১৯৬১-৬২ সালে এই উৎস হইতে আয়ের সম্ভাব্য পরিমাণ ৪০৬.২৬ কোটি টাকা।

(২) **আয়কর** (Income Tax) : ব্যক্তিগত অকৃষি আয়ের উপর কর ধার্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার মোট রাজস্বের শতকরা ২৫ ভাগের মত পাইয়া থাকে। ১৯৬০-৬১ সালের আয়কর লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ হইল ১০৫ কোটি টাকার কাছাকাছি। দ্বিতীয় ফিনান্স কমিশন এই কর-রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগ রাজ্য-গুলিকে প্রদানের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। ১৯৬১-৬২ সালে আয়কর-লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ হইবে ১৯০ কোটি টাকার মত।

ইহা ছাড়া, কর্পোরেশন কর (Corporation Tax) হইতে ১৩৫ কোটি টাকা আদায় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

(৩) **বাণিজ্য শুল্ক** (Customs) : বাণিজ্য শুল্ক বলিতে আমদানী শুল্ক (Import Duty) ও রপ্তানী (Export Duty) উভয়কেই বুঝাইয়া থাকে। ১৯৬০-৬১ সালের বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীতে এই উৎস হইতে নীট আয় ১৬০ কোটি টাকা হইবে বলা হইয়াছিল। ১৯৬১-৬২ সালে এই শুল্ক বাবদ ১৬৪ কোটি টাকা আদায় হইবার কথা।

এই তিনটি প্রধান কর ব্যতীত ১৯৬০-৬১ সালের মৃত্যুকর (Death Duty বা Estate Duty), সম্পত্তি কর (Wealth tax), ব্যয় কর (Expenditure Tax), দান কর (Gift Tax), হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আনুমানিক আয় হইয়াছে যথাক্রমে ৩ কোটি, ৭ কোটি, ৯০ লক্ষ এবং এবং ৮০ লক্ষ টাকা।

কর-নিরপেক্ষ রাজস্ব :

উপরি-উক্ত কর-সাপেক্ষ রাজস্ব ছাড়াও অন্যান্য সূত্র হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আগম হইয়া থাকে—

(১) **রেলপথ হইতে নীট আয়** (Net Contribution from the Railways) : রেলপথ হইতে সর্বসাকুল্যে যাহা মুনাফা হয়, তাহা হইতে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন জনিত অর্থ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে তাহা জমা করা হয়। ১৯৬১-৬২ সালে রেলপথ হইতে নীট আয় ২১'২৯ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে।

(২) **ডাক ও তার** (Post and Telegraph) : কেন্দ্রীয় সরকারের কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের অন্যতম সূত্র। ইহা প্রধানতঃ সেবামূলক কার্য, বিশেষ লাভজনক নহে। ১৯৬১-৬২ সালে এই সূত্রে অনুমিত রাজস্ব ৭৭ লক্ষ টাকা হইবে।

(৩) **মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলন** (Coinage and Currency) : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলন কার্যের দ্বারাও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাগম হইয়া থাকে। ১৯৬১-৬২ সালে ইহার মাধ্যমে মোট আয় হইয়াছিল প্রায় ৬০'৬৩ কোটি টাকা।

(৪) অহিফেন উৎপাদন ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের। এই সূত্রে আয় সত্যই অগৌরবের। ভারত সরকার ইহা হইতে ৫'৬৯ কোটি টাকার মত বাৎসরিক মুনাফা অর্জন করে (১৯৬০-৬১ সালের বাজেট অনুসারে)।

এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কর্পোরেশন এবং সরকার পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে আয় হইয়া থাকে।

১৯৬০-৬১ সালের বাজেট অনুযায়ী ভারতসরকারের রাজস্ব খাতে আনুমানিক আয় ও ব্যয় হইতেছে যথাক্রমে ৯১৯'৯৮ এবং ৯৮০'৩৫ কোটি টাকা। রাজস্ব খাতে মোট ঘাটতির পরিমাণ হইল ৬০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ১৯৬১-৬২ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারত সরকারের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৬২'৯২ এবং ১০২৩'৫২ কোটি টাকা।

বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় ব্যয় :

নিম্নলিখিত খাতে কেন্দ্রীয় সকারের রাজস্ব ব্যয় করা হইয়া থাকে—

(১) রাজস্ব আদায় করিবার জন্য প্রত্যক্ষ ব্যয়ের (Direct Demands on Revenue) পরিমাণ আনুমানিক ১০৭ কোটি টাকা (১৯৬০-৬১ সালের বাজেট হিসাব অনুযায়ী)।

(২) বেসামরিক শাসন (Civil Administration) পরিচালনার জন্য বৎসরে ২৬৭ কোটি টাকার মত অর্থ প্রয়োজন হয়।

(৩) প্রতিরক্ষা (Defence) খাতে ব্যয়ের পরিমাণ সর্বাধিক। ১৯৫৯-৬০, ১৯৬০-৬১ সালে এই বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৪৩.৭০ এবং ২৭২.২৬ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা হয়, অর্থাৎ মোট ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিরক্ষার জন্য নির্ধারিত থাকে। ১৯৬১-৬২ সালে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ২৮২.৯২ কোটি টাকা।

(৪) উন্নয়নমূলক সেবাকার্যের (Development Services) জন্য ব্যয়ও সাম্প্রতিক কালে সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৮৩.৯৭ কোটি টাকা, ১৯৫৯-৬০ সালে ইহার জন্য আরও ৩০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হইয়াছিল।

১৯৬০-৬১ সালে এই সব সেবাকার্যের জন্য ২২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ভারতের বিপুল জনসংখ্যা এবং ইহার অনগ্রসরতার তুলনায় উক্ত পরিমাণ আশানুরূপ নহে।

(৫) অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের পেনসন্, রাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্য, ঋণ জনিত ব্যয় ইত্যাদি বিভিন্ন সূত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খরচ হয়।

রাজস্ব খাতে উপরি-উক্ত ব্যয় ব্যতীত মূলধন খাতে আরও বহুরকমের ব্যয় হইয়া থাকে। পরিকল্পনাকালে এই জাতীয় ব্যয়ের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে। মূলধন খাতে ব্যয় বলিতে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা, নূতন রেললাইন পত্তন বা বৈদ্যুতীকরণ, নদী উপত্যকা পরিকল্পনা প্রভৃতির দরুণ নানাবিধ ব্যয়কে বুঝায়।

রাজ্যসরকারের রাজস্ব খাতে আয়ঃ

(১) **ভূমি রাজস্ব** (Land Revenue) ঃ রাজ্যগুলির আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হইতেছে ভূমি রাজস্ব। ১৯৫৯-৬০ সালে সমস্ত রাজ্যে এই সূত্রে প্রাপ্ত রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল ১০০.৪৫ কোটি টাকা।

(২) **কৃষি আয়কর** (Agricultural Income Tax) ঃ কৃষি আয়ের উপর ধার্য কর হইতেও রাজ্যগুলির রাজস্ব সংগৃহীত হয়। ১৯৫৯-৬০ সালের হিসাব অনুযায়ী কৃষি আয়কর হইত রাজ্যগুলির মোট ৮.১১ কোটি টাকার মত রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

(৩) **সেচ কর** (Irrigation Charges) ঃ সেচ করের হার বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। ১৯৫৯-৬০ সালে বিভিন্ন রাজ্যের বাজেট অনুযায়ী সেচকর লব্ধ রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল ১২.৪৪ কোটি টাকা।

(৪) **রাজ্য আবগারী শুল্ক** (State Excise) : মাদক দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক হইতে অধিকাংশ রাজ্যের মোটা রকমের আয় হইয়া থাকে। কোন কোন রাজ্যে ইহার পরিমাণ ভূমি রাজস্বেরও অধিক। মাদক দ্রব্য বর্জনের নীতি পূর্ণভাবে গৃহীত হইলে, রাজ্যগুলির এই সূত্র হইতে আয়ের সম্ভাবনা বিনষ্ট হইবে।

(৫) **ষ্ট্যাম্পকর ও রেজিষ্ট্রেশন ফি** (Stamp Duty and Registration Fee) হইতেও রাজ্য সরকারের অর্থাগম হয়। এই উৎস হইতে ১৯৫৯-৬০ সালে রাজ্যগুলির আয় হইয়াছিল ৩৪ কোটি টাকার কাছাকাছি।

(৬) **বিক্রয় কর** (Sales Tex) : সংবিধান অনুসারে একমাত্র সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের উপর রাজ্যসরকার কর ধার্য করিতে পারে। সম্প্রতি কাপড়, চিনি ও তামাকের উপর কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং এই সব সামগ্রীর উপর বিক্রয় কর রদ্ হইয়াছে। ১৯৫৯-৬০ সালে রাজ্যগুলির মোট রাজস্বের শতকরা ১৪ ভাগ এই সূত্র হইতে সংগৃহীত হয়।

(৭) ব্যক্তিগত আয়কর ও কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের অংশ বাবদ রাজ্যগুলির প্রাপ্যের পরিমাণ ১৯৫৯-৬০ সালে ছিল যথাক্রমে ৭৭.৬৯ এবং ৭২.৭২ কোটি টাকা।

(৮) রেলভাড়া ও মাশুলের উপর ধার্য কর, অকৃষিভূমির উপর উত্তরাধিকার কর এবং সংবাদপত্র ক্রয় বিক্রয়ের উপর কর হইতে লব্ধ রাজস্বের সম্পূর্ণ অংশই (সংগ্রহের ব্যয় বাদ দিয়া) রাজ্যসরকারের তহবিলযুক্ত হয়।

(৯) এতদ্ব্যতীত প্রমোদ কর, বিদ্যুৎশুল্ক, মোটরযানের উপর কর এবং বৃত্তি, ব্যবসা ও উপজীবিকার উপর কর হইতেও রাজ্যসরকারের মোট রাজস্বের একাংশ আহৃত হয়।

করসাপেক্ষ রাজস্ব ছাড়া, রাষ্ট্রীয় পরিবহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমেও রাজ্যসরকারের কিঞ্চিৎ আয় হইয়া থাকে। আবার রাজ্যসরকারগুলিকে বিশেষ বিশেষ কার্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করে।

রাজ্যসরকারের রাজস্ব খাতে ব্যয় : রাজ্যের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং শাসনযন্ত্রকে চালু রাখিবার জন্য রাজ্যসরকারকে পুলিশ, জেলখানা, আদালত ও জনপালন কৃত্যকের ব্যবস্থা করিতে হয়। এইসব কাজে রাজ্যসরকারের মোট রাজস্বের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ খরচ হইয়া যায়। উদ্বৃত্ত অংশ ব্যয়িত হয় জাতিগঠন কার্যে। শিক্ষাবিস্তার, জনস্বাস্থ্য-রক্ষা, কৃষির উন্নতি বিধান, সেচের বন্দোবস্ত, রাস্তাঘাটের উন্নতি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সমাজ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ইত্যাদি গঠনমূলক কার্যের অন্তর্গত।

১৯৬০-৬১ সালের বাজেটে প্রস্তাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব খাতে

মোট আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮৮.১৭ এবং ৮৯.২৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ হইল ১.০৬ কোটি টাকা।

সরকারী ঋণ (Public Debt): সব সময় রাজস্ব-লব্ধ অর্থ হইতে সরকারের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ করা যায় না। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করিতে হইলেও বিপুল আয়ের প্রয়োজন। কর ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব প্রসারিত করিয়াও প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ করা যায় না। সেইজন্যই সরকার দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। আবার ইহার দ্বারা সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান না হইলেও বিদেশ হইতেও কর্জ করিতে হয়।

দেশীয় ও বৈদেশিক ঋণ

ঋণ-লব্ধ অর্থ সরকার কলকারখানার কাজে অথবা কৃষির উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করিতে পারে। ইহার দ্বারা যে অতিরিক্ত আয় হইবে, তাহা হইতে সুদ প্রদান এবং কালক্রমে ঋণও পরিশোধ করা যাইবে। এই জাতীয় ঋণকে উৎপাদনশীল (Productive) আখ্যা দেওয়া হয়। অপরপক্ষে, ঋণ গ্রহণ করিয়া সরকার যদি দুঃস্থদিগকে সাহায্য করে, তাহা হইলে উক্ত ঋণ হইতে ভবিষ্যতে কোনরূপ আয়ের সম্ভাবনা থাকে না। এইরূপ ঋণ অনুৎপাদনশীল (unproductive)।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল ঋণ।

১৯৬০ সালের মার্চ মাসের শেষে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৭৩৪.৮৯ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ হইল ৫০৭৩.৭৯ কোটি টাকা। বাকী ৬৬১.১০ কোটি টাকা হইতেছে ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ।

॥ সারাংশ ॥

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলি আর্থিক ব্যাপারে যথাসম্ভব পরস্পর স্বাধীন ও স্বতন্ত্র থাকিবে। সংবিধানের দ্বারা তাহাদের স্বতন্ত্র রাজস্বের সূত্র নির্ধারণ করা হয়। তবে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বিধান কোন ক্রমেই সম্ভব নহে।

ভারতীয় সংবিধানে উভয় সরকারের রাজস্ব বণ্টনের জন্য কতকগুলি ধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কতকগুলি কর কেন্দ্র ধার্য ও আদায় করিবে, কিন্তু রাজস্বলব্ধ অর্থ পূর্ণভাবে রাজ্যগুলিকে প্রদান করা হইবে। আবার কতকগুলি কর-রাজস্ব-লব্ধ আয় কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে। ইহা ছাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য স্বতন্ত্র-ভাবে কতিপয় কর ধার্য, আদায় ও আত্মসাৎ করিতে পারিবে।

সরকারের রাজস্ব সংগৃহীত হয় প্রধানতঃ কর হইতে। কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের

উৎস হইতেছে সেবামূলক কার্য ও সরকার পরিচালিত শিল্প ব্যবসা ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকারের কর-সাপেক্ষ রাজস্বের উল্লেখযোগ্য উৎস হইতেছে—বাণিজ্য শুল্ক, কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, আয়কর, কর্পোরেশন কর, মৃত্যুকর, সম্পত্তিকর ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকারের কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের উৎস হইল রেলপথ, মুদ্রা প্রস্তুত ও প্রচলন কার্য, ডাক ও তার এবং সরকার পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা বাণিজ্য।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজস্ব-লব্ধ অর্থ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করিয়া থাকে, যথা (১) অসামরিক শাসন পরিচালনা, (২) দেশ রক্ষা (৩) রাজস্ব আদায় জনিত প্রত্যক্ষ ব্যয়, (৪) উন্নয়ন-মূলক ব্যয় ইত্যাদি।

রাজ্যসরকারের আয়ের সূত্র হইতেছে (১) কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক, আয়কর ইত্যাদির অংশ, (২) ভূমি রাজস্ব, (৩) কৃষি-আয় কর, (৪) রাজ্য আবগারী শুল্ক, (৫) বিক্রয় কর, প্রমোদ কর ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত সরকার পরিচালিত পরিবহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং ব্যবসা বাণিজ্য হইতেও সামান্য পরিমাণে আয় হইয়া থাকে। রাজ্য-সরকারের মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশের মত খরচ হয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। বাকী অংশটুকু গঠনমূলক কার্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে।

সরকারী ঋণ ঃ সরকারী ঋণ আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় সূত্র হইতেই সংগৃহীত হয়। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার ফলে সরকারী ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে। ঋণ সংগ্রহ করিয়া সরকার যখন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলে, বা কৃষির উন্নতি সাধন করে তখন এই ঋণকে বলা হয় উৎপাদনশীল। আর ঋণ-লব্ধ অর্থ সরকার সাহায্য বাবদ দুঃস্থদিগকে দান করে, তাহা হইলে উক্ত ঋণ অনুৎপাদনশীল বলিয়া গণ্য হইবে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Distinguish between Tax Revenue and Non-Tax Revenue. What are the main tax revenues of the Government of India?

   কর-সাপেক্ষ রাজস্ব ও কর-নিরপেক্ষ রাজস্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর। ভারত সরকারের উল্লেখযোগ্য কর-সাপেক্ষ রাজস্ব কি কি? [পৃষ্ঠা ২২৬-২২৭]

2. What are the main sources of revenue and heads of expenditnre of the Union Government of India?

   ভারত সরকারের রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস এবং ব্যয়ের খাত কি কি? [পৃষ্ঠা ২২৭-২২৯]

3. Indicate the main sources of revenue and heads of expenditure of State Governments in India.

   ভারতে রাজ্য সরকারগুলির কি কি সূত্রে প্রধানতঃ রাজস্ব আদায় ও ব্যয় হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২২৯-২৩০]

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভারতের বিচার ব্যবস্থা

(Judical System of India)

সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশে দুই শ্রেণীর আদালত থাকে, যেমন রাজ্যের আদালত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। কিন্তু ভারতীয় বিচারালয়গুলি এইরূপ দুইটি সমান্তরাল শ্রেণীতে বিভক্ত নহে, তাহারা সকলে একই সূত্রে গ্রথিত। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে রহিয়াছে প্রধান ধর্মাধিকরণ। আদিম এলাকায় ইহা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে কায করে, আবার ইহাই হইতেছে ভারতের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। ভারতের সর্বনিম্ন বিচারালয় হইল ন্যায় পঞ্চায়েত।

ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

প্রধান ধর্মাধিকরণ (The Supreme Court): সংবিধান অনুযায়ী একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক সাতজন বিচারপতি লইয়া প্রধান ধর্মাধিকরণ গঠিত হইবে। সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পার্লামেণ্ট আইনের দ্বারা বিচারপতির সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। উক্ত ধর্মাধিকরণে বর্তমানে ১ জন প্রধান বিচারপতি ও দশজন সাধারণ বিচারপতি রহিয়াছেন। প্রধান ধর্মাধিকরণের প্রধান বিচারপতি, ভারতের প্রধান বিচারপতি বলিয়া অভিহিত হন।

গঠন (composition)

যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক অন্ততঃপক্ষে পাঁচবৎসরকাল মহাধর্মাধিকরণে বিচারপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন, অথবা ১০ বৎসরকাল মহাধর্মাধিকরণে ব্যবহারিকের কার্য করিয়াছেন, অথবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রখ্যাত আইনজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হন, তাঁহাদের মধ্য হইতেই রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিবেন।

বিচারপতিগণের যোগ্যতা

বিচারপতিগণ ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্ব-পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। তৎপূর্বে সহসা তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করা যায় না। তবে পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ যদি সমগ্র সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে, প্রমাণিত অসদাচরণ বা অযোগ্যতার দরুণ কোন বিচারপতির পদচ্যুতির দাবী করে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির আদেশে তাঁহাকে অপসারিত করা হইবে।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি

অবসর গ্রহণের পর বিচারপতিগণ ভারতের কোন বিচারালয়ে ব্যবহারিক হিসাবে কার্য করিতে পারিবেন না।

ক্ষমতা :

প্রধান ধর্মাধিকরণের ক্ষমতা নিম্নলিখিত চারটি-ভাগে বিভক্ত :

(১) আদিম এলাকা (Original Jurisdiction)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিরোধের মীমাংসার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় গঠন করা হয়। ভারতে প্রধান ধর্মাধিকরণ এই কার্য সম্পাদন করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্যসরকারের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক অধিকার লইয়া বিরোধ বাধিলে, প্রধান ধর্মাধিকরণ তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। উক্ত বিরোধ প্রধান ধর্মাধিকরণের আদিম এলাকাভুক্ত। আদিম এলাকা বলিতে সেই সব বিষয়কে বুঝায় যাহার উপর একমাত্র প্রধান ধর্মাধিকরণেরই বিচারে অধিকার আছে।

(২) আপীল এলাকা (Appellate Jurisdiction)

(ক) শাসনতান্ত্রিক আইন বিষয়ক মামলার আপীল

মহাধর্মাধিকরণের নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা চলে। (ক) মহাধর্মাধিকরণ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে বিচারাধীন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমার সহিত সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জড়িত রহিয়াছে, তাহা হইলে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা চলে। আবার প্রধান ধর্মাধিকরণ মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়াও আপীলের জন্য অনুমতি দান করিতে পারে।

(খ) দেওয়ানী মামলায় আপীল

দেওয়ানী মামলায় সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য বা দাবী দাওয়ার পরিমাণ যদি কমপক্ষে ২০,০০০ টাকা হইয়া থাকে, অথবা মহাধর্মাধিকরণ যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেয় যে মামলাটি প্রধান ধর্মাধিকরণের নিকট প্রেরণের যোগ্য, তাহা হইলে মহাধর্মাধিকরণ হইতে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা চলিবে।

(গ) ফৌজদারী মামলায় আপীল

কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় মহাধর্মাধিকরণ যদি নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করিয়া আসামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে অথবা নিম্ন আদালত হইতে কোন মামলা তুলিয়া আনিয়া আসামীকে প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা দিয়া থাকে, অথবা মামলাটি আপীলের যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দেয়, তাহা হইলে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল গ্রাহ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতি গুরুত্বপূর্ণ আইন বা ঘটনা সম্বন্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণের মতামত জানিতে চাহিলে, প্রধান ধর্মাধিকরণ যথোপযুক্ত শুনানীর পর, নিজস্ব অভিমত রাষ্ট্রপতিকে জ্ঞাপন করিবে।

(৩)
পরামর্শ দান সংক্রান্ত কার্য
(Advisory Functions)

(৪)
মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ক্ষমতা (Power in regard to Fundamental Rights)

প্রধান ধর্মাধিকরণ নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারের রক্ষক। কোন কারণে যদি সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হয়, তাহা হইলে আবেদনক্রমে প্রধান ধর্মাধিকরণ মৌলিক অধিকার রক্ষা কল্পে বিভিন্ন প্রকারের আদেশ বা নির্দেশ জারী করিতে পারে।

অন্যান্য ক্ষমতা ঃ

এতদ্ব্যতীত, প্রধান ধর্মাধিকরণ স্ব-ইচ্ছায় যে কোন ভারতীয় আদালত বা ট্রাইবিউন্যালের সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার অনুমতি দিতে পারে। তবে ইহা সামরিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল গ্রহণ করিতে পারে না।

নিজ কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের চাকুরীর শর্তাদি স্থির করিবার অধিকারও প্রধান ধর্মাধিকরণের আছে।

মহাধর্মাধিকরণ (High Court)ঃ প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া মহা-ধর্মাধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিটি মহাধর্মাধিকরণ একজন প্রধান বিচারপতি ও একাধিক সাধারণ বিচাপতি লইয়া গঠিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যে বিচারপতির সংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন।

রাষ্ট্রপতিই বিচারপতিগণের নিয়োগকর্তা। নিয়োগ করিবার পূর্বে তিনি ভারতের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকেন।

বিচারপতিগণের নিয়োগ

কোন মহাধর্মাধিকরণে সাধারণ বিচারপতি নিয়োগ সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি উক্ত বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির অভিমতও সংগ্রহ করেন।

যাঁহারা ভারতের নাগরিক এবং ভারতীয় এলাকায় কমপক্ষে দশ বৎসর বিচার বিভাগীয় কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, অথবা মহাধর্মাধিকরণে অন্ততঃপক্ষে দশ বৎসর ধরিয়া ব্যবহারিকের কার্য করিতেছেন, তাহাদের মধ্য হইতেই রাষ্ট্রপতি বিচারপতিগণকে নিয়োগ করিয়া থাকেন। ষাট বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁহারা কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন। তবে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অকর্মণ্যতার জন্য প্রধান ধর্মাধিকরণের বিচাপতিগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অপসারিত করা যায়।

বিচারপতিগণের যোগ্যতা ও কার্যকাল

সর্ববিধ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় মহাধর্মাধিকরণই হইল রাজ্যের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। কয়েকটি মহাধর্মাধিকরণের আবার আদিম এলাকাও আছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বড় বড় দেওয়ানী মামলার প্রথম শুনানী মহাধর্মাধিকরণেরই হইয়া থাকে। ফৌজদারী মামলায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করিলে, মহাধর্মাধিকরণেই এই দায়রা বিচার অনুষ্ঠিত হয়।

মহাধর্মাধিকরণের কার্য ও ক্ষমতা

মহাধর্মাধিকরণ নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নানাবিধ আদেশ জারী করিতে পারে।

মহাধর্মাধিকরণ নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারে। রাজ্যের নিম্নতর আদালতসমূহ মহাধর্মাধিকরণের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হয়। মহাধর্মাধিকরণ ইচ্ছা করিলে অধীনস্থ আদালত হইতে বিচারাধীন যে কোন মামলা তুলিয়া লইয়া নিজে বিচার সমাধা করিতে পারে। নিম্নতর আদালতের বিচারকগণের স্থানান্তর, পদোন্নতি প্রভৃতি ব্যাপারে রাজ্যসরকার মহাধর্মাধিকরণের অভিমত গ্রহণ করিয়া থাকে।

নিম্নতর আদালতসমূহ (Subordinate Courts): মহাধর্মাধিকরণের অধীনস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য যে সব আদালত রহিয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেওয়ানী আদালতসমূহ (Civil Courts): ন্যায়-পঞ্চায়েৎ বা ইউনিয়ন কোর্ট-ই হইল গ্রামাঞ্চলে দেওয়ানী বিচারের সর্বনিম্ন আদালত। অপেক্ষাকৃত বেশী দাবী-দাওয়া জড়িত থাকিলে মামলা মুন্সেফের আদালতে দায়ের করিতে হয়। মফঃস্বল সহরে মুন্সেফী আদালতই হইতেছে সর্বনিম্ন দেওয়ানী আদালত। মুন্সেফের রায়ের বিরুদ্ধে সাব্‌জজের আদালতে আপীল করা যায়। কোন কোন মামলার প্রথম শুনানী সাব্‌জজের আদালতেই হইয়া থাকে। সাব্‌জজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জেলা জজের আদালতে আপীলের শুনানী হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মুন্সেফের আদালত হইতেও জেলা জজের আদালতে সরাসরি আপীল করা চলে। জেলা জজ দেওয়ানী মামলায় জেলার সর্বোচ্চ বিচারক।

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় সহরে সামান্য দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিচারের জন্য ছোট আদালত (Small Causes Court) রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা বেশী দাবী-দাওয়া সংক্রান্ত মামলার বিচারের জন্য নগর আদালত (City Courts) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ফৌজদারী আদালতসমূহ (Criminal Courts) : ইউনিয়ন বেঞ্চ বা ন্যায় পঞ্চায়েত গ্রামাঞ্চলে হাল্কা ধরণের ঝগড়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সহরাঞ্চলে লঘু অপরাধের বিচার করিয়া থাকেন। অপেক্ষাকৃত গুরুতর ফৌজদারী মামলার বিচার করিবার জন্য ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত রহিয়াছে। এই সব আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে জেলা জজের নিকট আপীল করা যায়। আবার খুন, জখম ইত্যাদি গুরুতর অপরাধের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করিলে, দায়রা জজ (Sessions Judge) জুরীর সাহায্যে তাহার বিচার করেন। একই ব্যক্তি জেলা জজ ও দায়রা জজ হিসাবে কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহাকে বলা হয় জেলা ও দায়রা জজ (District and Sessions Judge)। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে ফৌজদারী মামলার বিচার করেন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ। আবার অপরাধ গুরুতর হওয়ার কারণে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করিলে, মহাধর্মাধিকরণে জুরীর সাহায্যে দায়রায় বিচার হইয়া থাকে।

॥ সারাংশ ॥

প্রধান ধর্মাধিকরণ :—রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রধান বিচারপতি ও দশ জন অন্যান্য বিচারপতি লইয়া প্রধান ধর্মাধিকরণ গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় হিসাবে ইহা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক বিরোধের মীমাংসা করে। মহাধর্মাধিকরণের বিচারের বিরুদ্ধে প্রধান ধর্মাধিকরণে আপীল করা চলে। তাহা ছাড়া প্রধান ধর্মাধিকরণ রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করে এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য নানারূপ আদেশ জারী করিয়া থাকে।

মহাধর্মাধিকরণ :—রাজ্য বিচার ব্যবস্থার শীর্ষস্থলে রহিয়াছে মহাধর্মাধিকরণ। বিচারপতিগণের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি। বিচারপতির সংখ্যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করেন। নিম্নতর আদালত হইতে এখানে আপীল করা চলে। কোন কোন মহাধর্মাধিকরণের আদিম এলাকাও আছে। মহাধর্মাধিকরণ অধীনস্থ আদালতগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে এবং মৌলিক অধিকারের রক্ষক হিসাবেও কার্য করে।

অধীনস্থ আদালত সমূহ :—মহাধর্মাধিকরণের নিম্নে বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত রহিয়াছে। দেওয়ানী মামলার সর্বনিম্ন আদালত হইতেছে ন্যায় পঞ্চায়েৎ। ইহার উপরে যথাক্রমে মুন্সেফ, সাব্‌জজ ও জেলা জজের আদালত রহিয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি সহরে ছোট আদালত ও নগর আদালত দেওয়ানী মামলার বিচার করিয়া থাকে।

ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচারের কার্য গ্রামদেশে ন্যায়-পঞ্চায়েৎ ও সহরতলীতে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটগণের দ্বারা সম্পাদিত হয়। অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের বিচারের জন্য কলিকাতা প্রভৃতি সহরে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত এবং বিভিন্ন জেলায় ১ম, ২য়, ও ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত আছে। জেলায় দায়রা বিচার করেন দায়রা জজ। অপরপক্ষে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আসামীকে দায়রায় সোপর্দ করিলে, তাহার বিচার হয় মহাধর্মাধিকরণে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Describe the composition, jurisdiction and functions of the Supreme Court of India.**

ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণের গঠন, এলাকা ও কার্যাদি বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২৩৩-২৩৫]

2. **Describe briefly the Judicial Organisation of India.**

ভারতের বিচারব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

[পৃষ্ঠা ২৩৩ (ভূমিকা) ও ২৩৭-২৩৮ (সারাংশ) দেখ]

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভারতের প্রতিরক্ষা

(Defence of India)

বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ শান্তির দূত হিসাবে সে সর্বত্র সমাদৃত, বর্তমান বিশ্ব যে দুইটি সামরিক জোটে বিভক্ত, ভারত তাহার কোনটিতে যোগদান করে নাই। কিন্তু এই নিরপেক্ষ নীতি এখন এক বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ক্ষমতায় উন্মত্ত লালচীনের নগ্ন আক্রমণের ফলে ভারতের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক সংহিত আজ বিপন্ন। পররাজ্যগ্রাসী চীনের এই অকারণ সামরিক অভিযান বিশ্বশান্তিকে বিঘ্নিত করিয়াছে, বিপন্ন করিয়াছে নবজাগ্রত এশিয়ার স্বাধীনতাকে।

পরাক্রান্ত এই প্রতিপক্ষকে যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি। পবিত্র ভারতভূমি হইতে হানাদারদের হটাইয়া সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা-বিধানের জন্য আমাদের সামারিক বাহিনীকে আধুনিক সমর-সজ্জায় সজ্জিত ও সুগঠিত করার সময় সমুপস্থিত। ভারত সরকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করিতে দৃঢ় সংকল্প। সমর-সজ্জার ব্যাপারে দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করিবার আয়োজন চলিতেছে এবং বর্তমান সঙ্কট অতিক্রম করিবার জন্য বিদেশ হইতেও অস্ত্র আমদানী করা হইতেছে। ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সম্প্রসারণও বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন।

ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সংগঠন (Organisation of the Armed Forces of Indai): ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পর ভারতের সশস্ত্রবাহিনীর উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধানের ভার পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীর উপর অর্পণ করা হইয়াছে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের মাধ্যমেই ভারতের রক্ষি-বাহিনীর কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী নূতন সংবিধান চালু হইলে, রাষ্ট্রপতি ভারতের সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বলিয়া অভিহিত হইলেন, কিন্তু নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং তিনটি বাহিনীর সদর কার্যালয় সমূহের হস্তেই ন্যস্ত থাকিল।

দ্বিতীয়তঃ, তিন বাহিনীর জন্য তিনজন অধিনায়ক পদ সৃষ্টি করা হইল। প্রত্যেকটি বাহিনীর অধ্যক্ষ সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রধান (Chief of Staff) এবং সর্বাধিনায়ক (Commander-in chief) বলিয়া অভিহিত হইলেন। কিন্তু ১৯৫৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে তাঁহাদের সর্বাধিনায়ক আখ্যা বাতিল করা হইয়াছে। এখন তাঁহারা যথাক্রমে সৈন্য, নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রধান বলিয়া পরিচিত।

সৈন্যবাহিনী (Army): সদর কার্যালয়ের অধীনে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তিনটি এলাকায় (Commands) বিভক্ত। দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিম এই তিনটি এলাকার প্রত্যেকটিকে কতকগুলি অঞ্চলে (Areas) এবং প্রতিটি অঞ্চলকে আবার কয়েকটি উপ-অঞ্চলে (Sub-areas) বিভক্ত করা হইয়াছে। এলাকা, অঞ্চল ও উপ-অঞ্চল যথাক্রমে Lieutenant General, Major General এবং Brigadier এর দ্বারা পরিচালিত।

নয়াদিল্লীতে অবস্থিত ইহার সদর কার্যালয় সৈন্যবাহিনীর প্রধানের নিয়ন্ত্রণাধীন। ছয়টি প্রধান বিভাগের মাধ্যমে সদর কার্যালয় সৈন্যবাহিনীর পরিচালনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমরাস্ত্র, পরিবহন, আবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশ দান করে এবং নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি বিভাগের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করিয়া মেজর জেনারেল নিযুক্ত থাকে।

নৌবাহিনী (Navy): স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে ভারতের নৌশক্তি নামেমাত্র ছিল। দেশ বিভাগের ফলে ইহা আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। জাতীয় সরকার নৌবাহিনীকে যথার্থই প্রাথমিক রূপ দান করিয়াছে। বর্তমানে আধুনিকতম অস্ত্র ও সাজ সরঞ্জামের দ্বারা ভারতীয় নৌবহর সজ্জিত হইয়াছে। নৌসেনার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ভারতীয়গণ বিদেশী অফিসারদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে Royal Indian Navy শুধু মাত্র Indian Navy বা ভারতীয় নৌবাহিনী নামে পরিচিত হইয়াছে।

নৌবাহিনীর সদর কার্যালয় নয়া দিল্লীতে অবস্থিত। Deputy Chief of Staff, Chief of Personnel, Chief of Material এবং Chief of Naval Aviation —এই চারজন উচ্চপদস্থ সহকারীর সহায়তায় নৌবাহিনীর প্রধান সদর কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যাদি পরিচালনা করেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত চারজন অফিসার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ তত্ত্বাবধান করেন:

(১) Flag officer (Flotilla) Indian Fleet; (২) Commodore-in-charge, Bombay; (৩) Commodore-in-charge, Cochin; এবং (৪) Naval Officer-in-charge, Visakhapatnam।

বিমানবাহিনী (Air-Force): ভারতীয় বিমানবাহিনী ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত Royal Indian Navy নামে পরিচিত ছিল। প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর ইহা শুধু মাত্র ভারতীয় বিমানবাহিনী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

সদর কার্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে বিমানবাহিনীর প্রধানকে তিনজন উচ্চপদস্থ অফিসার সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা হইলেন—(১) Deputy Chief of Air Staff (২) Officer-in-charge Personnel and Organisation এবং (৩) Officer-in-charge Technical Equipment Services।

বিমানবাহিনীর তিনটি প্রধান সংগঠন হইতেছে (১) পরিচালন শাখা (Operational Command), (২) শিক্ষণ-শাখা (Training Command) এবং (৩) সংরক্ষণ শাখা (Maintenance Command)। এই তিনটির সদর কার্যালয় যথাক্রমে পালাম, বাঙ্গালোর এবং কানপুরে অবস্থিত। তৃতীয় সংগঠনটির প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৬ সালে।

১৯৫২ সালের পার্লামেণ্ট প্রণীত সংরক্ষিত এবং সহায়ক বিমানবাহিনী আইন (Reserve and Auxiliary Air-Force Act) অনুযায়ী দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় সহায়ক বিমানবাহিনী গঠন করা হইয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় বিমান বাহিনীর সহিত একটি 'Photographic Aerial Survey Unit' সংযুক্ত হইয়াছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (Training Institutions)

সৈন্যবাহিনীর যথোপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন ভারতেই করা হইয়াছে। কিন্তু নৌ বা বিমানবাহিনী এ বিষয়ে এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।

জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (National Defence Academy): ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এই প্রতিষ্ঠানটিকে দেরাদূন হইতে পুণায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীগণকে ভর্তি করা হয়। তাহাদের ব্যয়ভার প্রধানতঃ সরকার বহন করিয়া থাকে। এখানের ত্রিবার্ষিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে পর শিক্ষার্থীগণকে সামরিক কলেজ সমূহের মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা দান করা হয়।

সামরিক অফিসারগণের জন্য শিক্ষায়তন (Defence Services Staff College): প্রতিরক্ষা কার্যে নিযুক্ত অফিসারদিগকে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার

জন্য দক্ষিণ ভারতে ওয়েলিংটন শহরে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর তিনটি বাহিনীর প্রায় এক শত অফিসার এখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানকার শিক্ষাকাল মাত্র দশ মাস।

ইহা ছাড়াও অফিসার ও নিম্ন পর্যায়ের সৈনিকের উপযুক্ত শিক্ষার জন্য আমেদনগর, আগ্রা, পাঁচমারী, ত্রিমুলঘেরি, পুণা, ফৈজাবাদ, মৌ এবং মীরাটে কতিপয় সামরিক শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

নৌ-শিক্ষা কেন্দ্র (Naval Training Centre) ঃ বোম্বাই, বিশাখাপত্তনম্, এবং কোচিনেই প্রধান নৌ-শিক্ষাকেন্দ্রগুলি অবস্থিত। এখানকার শিক্ষার মান বেশ উন্নত।

বিমানবাহিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (Air Force Schools and Colleges) ঃ বিমান চালনা শিক্ষা দিবার জন্য বেগমপেট ও যোধপুরে দুইটি শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষক সরবরাহের জন্য কয়মবাটোরে অফিসারদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য ১৯৪৮ সালে 'প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান সংস্থা' (The Defence Science Organisation) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। আবার অস্ত্রশস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ১৯৫২ সালে কিরকিতে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই শিক্ষালয়টির নাম—Institute of Armament Studies।

অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন

দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদনের দিকেও জাতীয় সরকার দৃষ্টি দিয়াছে। এই দিক দিয়া ভারত প্রায় স্বাবলম্বী হইতে চলিয়াছে। ভারতের নানা স্থানে সমরাস্ত্র উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য কার্যকলাপ।

দেশ-রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও সশস্ত্রবাহিনী নানাবিধ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় সশস্ত্রবাহিনী দুর্গতদের সাহায্যকল্পে আগাইয়া আসে। পতিত জমি পুনরুদ্ধারে, নূতন পথঘাট, পুল প্রভৃতি নির্মাণে তাহারাই অগ্রণী হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহ্বানে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী কোরিয়ায়, ইন্দোচীনে, মিশরে এবং কঙ্গোয় প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়াছে।

আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী (Territorial Army): কোন দেশের পক্ষেই সকল রকম পরিস্থিতির উপযোগী সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন রাখা সম্ভব নয়। বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করার ফলে অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য শ্রমিক এবং অর্থ উভয়েরই ঘাটতি ঘটিবে। তাই সব দেশেই জরুরী অবস্থায় নিয়মিত সৈন্যবাহিনীকে (Regular Army) সাহায্য করিবার জন্য কিছু সংখ্যক সৈন্য মজুত (reserve) রাখা হয়।

১৯৪৮ সালে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে "ভারতীয় আঞ্চলিক সেনাবাহিনী আইন" (Indian Army Territorial Act) পাস হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে ভারতীয় আঞ্চলিক বাহিনী সংগঠন করা হয়।

নিয়মিত সৈন্যবাহিনীকে আপৎকালে সহায়তা করা এবং অসামরিক শাসন কর্তৃপক্ষকে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলারক্ষার কার্যে সাহায্য করা—ইহাই হইল আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান কর্তব্য। অন্যূন ১৮ এবং অনধিক ৩৫ বৎসর বয়স্ক সুস্থ দেহ ভারতীয় মাত্রেই বাহিনীতে যোগদান করিতে পারে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই বাহিনীর সভ্যগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে ভারতকে ৮টি অঞ্চলে (Zones) বিভক্ত করা হইয়াছে। আঞ্চলিক বাহিনী অসামরিক নাগরিকগণের সামরিক শিক্ষাকেন্দ্র।

প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য দেশরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। এই প্রস্তুতির ব্যাপারে তাহাদিগকে সহায়তা করিবার জন্যই আঞ্চলিক বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর আঞ্চলিক বাহিনীর কিছু সংখ্যক সভ্যকে তিন হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য নিয়মিত সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়।

লোক সহায়ক সেনা (Lok Sahayak Sena):

সহকারী আঞ্চলিক সেনাবাহিনীকে (Auxiliary Territorial Army) ১৯৫৪ সালে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (National Volunteer Force) নামে পুনর্গঠিত করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে বর্তমানে বলা হয় লোক সহায়ক সেনা; ইহার লক্ষ্য হইল আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ লক্ষ লোককে প্রাথমিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা। ১৪ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক সুস্থদেহ ব্যক্তি মাত্রেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী এবং জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর ভূতপূর্ব সদস্যগণ এই বাহিনীতে যোগদান করিতে পারিবেন না।

জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী (National Cadet Corps): স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীগণকে প্রাথমিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ছাত্রীদের জন্য এই বাহিনীতে একটি পৃথক বিভাগ নির্দিষ্ট থাকে। অপর তুইটি বিভাগ হইতেছে উচ্চতর বিভাগ (Senior Division) এবং নিম্নতর বিভাগ (Junior Division)। এই তুইটি বিভাগের প্রত্যেকটি সৈন্য, নৌ এবং বিমান—এই তিনটি শাখা লইয়া গঠিত। এই বাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীগণ সুস্থ দেহ ও মনের অধিকারী হইয়া জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা একদিকে স্বাস্থ্য-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়, অপরদিকে তাহাদের শৃঙ্খলাবোধ বৃদ্ধি এবং নেতৃ-সুলভ গুণাবলী বিকাশ লাভ করে।

সহায়ক শিক্ষার্থী বাহিনী (Auxiliary Cadet Corps): স্কুলের যে সকল ছাত্র ছাত্রী, জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনীতে যোগদানের সুযোগ পায় না, তাহাদিগকে সামরিক শিক্ষাদনের নিমিত্ত সহায়ক শিক্ষার্থী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহার মাধ্যমে দেশের যুবসম্প্রদায় সহযোগিতা, শৃঙ্খলা ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করে।

॥ সারাংশ ॥

বর্তমানে রাষ্ট্রপতি হইলেন ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তবে কার্যতঃ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গঠন ও পরিচালন ভার পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল একজন মন্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনটি বাহিনীর সদর কার্যালয়ের সাহায্যে প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সৈন্য, নৌ এবং বিমান বাহিনীর অধিনায়কগণ সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রধান (Chief of Staff) বলিয়া অভিহিত হন। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসের পূর্বে তাঁহারা প্রত্যেকে প্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief) আখ্যা পাইতেন।

সৈন্যবাহিনী: সৈন্যবাহিনীর সদর কার্যালয় নয়াদিল্লীতে অবস্থিত। ইহা সৈন্যবাহিনীর প্রধানের পরিচালনাধীনে ছয়টি প্রধান বিভাগের মাধ্যমে সৈন্যবাহিনী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদিত করে।

নৌ-বাহিনী: জাতীয় সরকার নৌবাহিনীকে নূতন করিয়া গঠন করিয়াছেন। ইহার সম্প্রসারণ কার্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। নৌবাহিনীর প্রধান চারজন

উচ্চপদস্থ সহকারীর সহায়তায় সদর কার্যালয় নিয়ন্ত্রণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য আরও চারজন অফিসার রহিয়াছেন।

বিমানবাহিনী : বিমান বাহিনীর পরিচালন, শিক্ষা এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংগঠন তিনটির সদর কার্যালয় যথাক্রমে পালাম, বাঙ্গালোর এবং কানপুরে অবস্থিত। ১৯৫২ সালে পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন অনুসারে সহায়ক বিমানবাহিনী গঠন করা হইয়াছে।

শিক্ষাব্যবস্থা : তিনটি বাহিনীর যথোপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন ভারতেই করা হইয়াছে। সশস্ত্র বাহিনীকে শিক্ষাদানের নিমিত্ত বহুবিধ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামরিক অফিসারদের জন্য শিক্ষায়তন, সৈনিক বিদ্যালয়, নৌশিক্ষাকেন্দ্র এবং বিমান বাহিনীর কলেজ ইত্যাদিই সমধিক প্রসিদ্ধ।

প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের দিকেও জাতীয় সরকার দৃষ্টি দিয়াছে।

সশস্ত্র বাহিনীর অন্যান্য কার্য : দেশরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও ভারতের সশস্ত্র বাহিনী সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আহ্বানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জাতীয় সরকার ও জনসাধারণকে নানাপ্রকার সাহায্য করিয়া থাকে।

বেসামরিক নাগরিক এবং ছাত্রছাত্রীদিগকে সামরিক শিক্ষাদানের জন্য (১) আঞ্চলিক সেনাবাহিনী, (২) লোক সহায়ক সেনা, (৩) জাতীয় শিক্ষার্থীবাহিনী এবং (৪) সহায়ক শিক্ষার্থী বাহিনী গঠন করা হইয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Give an idea of the Defence Organisation of India.**
   ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার একটি বিবরণ দাও। [পৃষ্ঠা ২৪৪-২৪৫]

2. **Write notes on the following :**
   (a) Territorial Army (b) Lok Sahayak Sena (c) National Cadet Corps and (d) Auxiliary Cadet Corps.
   নিম্নলিখিতগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :
   (ক) আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনী (খ) লোকসহায়ক সেনা (গ) জাতীয় শিক্ষার্থী বাহিনী এবং (ঘ) সহায়ক শিক্ষার্থী বাহিনী। [পৃষ্ঠা ২৪৩-২৪৪]

উনত্রিংশ অধ্যায়

ভারতীয় রাজনৈতিক দলসমূহ

(The Indian Political Parties)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব অপরিসীম। একাধিক রাজনৈতিক দলের অবর্তমানে গণতন্ত্রের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকা সত্ত্বেও স্থায়ী সরকার গঠনের পথে বিপত্তি দেখা দেয় নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতে রাজনৈতিকদল গঠনের দিন গত হইয়াছে। আধুনিক দলগত বিভিন্নতার মূল কারণ হইতেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে নির্বাচন কমিশন মাত্র চারটি দলকে সর্বভারতীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই চারটি সর্বভারতীয় দলের আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

(১) **ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস** (The Indian National Congress) : ইহাই ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন। কংগ্রেসের ইতিহাস এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস অভিন্ন। ১৮৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে ইহার প্রথম অধিবেশন আহূত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে জাতীয়তাবাদই ছিল কংগ্রেসের মূল মন্ত্র। স্বাধীনতা লাভের পর হইতে ইহা অব্যাহতভাবে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস লোকসভা এবং উড়িষ্যা ও কেরল ব্যতীত বিভিন্ন রাজ্যবিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বর্তমানে সব রাজ্যেই কংগ্রেস দল শাসন পরিচালনা করিতেছে।

প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস মোট বৈধ ভোট সংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগের মত পাইয়াছিল এবং লোকসভার ৪৮৯টি আসনের মধ্যে ৩৬২টি দখল করিয়াছিল। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ইহা লোকসভার ৪৯৪টি আসনের মধ্যে ৩৬৫টি দখল করিতে সমর্থ হয় এবং মোট বৈধ ভোট সংখ্যার শতকরা ৪৮ ভাগের কাছাকাছি প্রাপ্ত হয়।

কংগ্রেসের আদর্শ—সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার নির্ভুল সাক্ষ্য। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া ইহা পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে এবং

যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূজারী।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস শান্তির বাণী বহন করে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা কামনা করে। কোন একটি শক্তিজোটে ভারতের যোগদান কংগ্রেসের অভিপ্রেত নহে।

(২) **ভারতীয় সাম্যবাদী দল** (The Communist Party of India): ১৯২৪ সালে ভারতীয় সাম্যবাদীদলের পত্তন হয়। বলশেভিক বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত অল্প সংখ্যক উৎসাহী ভারতীয় যুবক তখন সোভিয়েত পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় সমস্যা সমাধানের স্বপ্ন দেখিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে প্রথম হইতেই দমন করিতে বদ্ধপরিকর ছিল। কিন্তু সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইহা দ্রুত প্রসারলাভ করিতে থাকে। সাম্যবাদী দল অবৈধ ঘোষিত হওয়ায় সাম্য-বাদীগণ কংগ্রেসের অন্তরালে কার্য করিতে সুরু করে। তাহাদের কর্মপদ্ধতি প্রধানতঃ শ্রমিকসঙ্ঘ ও ছাত্র সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ সরকার সাম্যবাদী দলের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। অর্থাৎ ইহা বৈধ সংগঠনরূপে পরিগণিত হয়। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সাম্যবাদীদল মোট প্রদত্ত ভোটসংখ্যার শতকরা ৪·৪৫ ভাগ পাইয়াছিল এবং লোকসভায় ২৩টি আসন লাভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ইহা মোট বৈধ ভোট সংখ্যার শতকরা ৮·৬৩ ভাগ লাভ করিয়াছে এবং লোকসভায় ২৭ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছে। ইহা ছাড়া রাজ্য বিধানসভাসমূহেও ইহার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেরল রাজ্য সাম্যবাদীদল বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সরকার গঠন করিয়াছিল। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী উক্ত রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত না হওয়ার দরুণ রাষ্ট্রপতি তথাকার শাসনভার সাময়িকভাবে স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কেরলে পুনর্বার যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল তাহাতে সাম্যবাদীদল আর পূর্বেকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই।

সাম্যবাদীদলের লক্ষ্য ভারতে শ্রেণীহীন, শোষণহীন আদর্শসমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন, কৃষকের হস্তে জমি অর্পণ, শিল্পসমূহের জাতীয়করণ, শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন—আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সাম্যবাদীদল এই সব নীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী।

বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইহা কংগ্রেসের শক্তিজোট-নিরপেক্ষ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বিরোধী শান্তির নীতিকে সমর্থন করে।

অন্যান্য সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রতি ইহা অতিশয় উদার মনোভাব পোষণ করে। সাম্যবাদীদল ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং ভারতের কমনওয়েলথে যোগদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। সাম্প্রতিক কালে চীনের সহিত ভারতের সীমান্ত বিরোধের ব্যাপারে কংগ্রেসের সহিত সাম্যবাদীদলের মতবিরোধ সুস্পষ্ট।

(৩) **প্রজা সমাজতন্ত্রী দল** (Praja Socialist Party): ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদল ও কৃষক মজদুর প্রজা দলের মিলনের ফলে প্রথমে সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তীকালে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের আবির্ভাব হয়।

ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল ১৯৪৮ সালের পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল নামে অভিহিত ছিল। কংগ্রেসের মধ্যে একটি বামপন্থী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ১৯৩৪-৩৫ সালে ইহা গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর ইহা কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

কৃষক মজদুর প্রজাদলের নেতৃবৃন্দও কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সমর্থক এবং সদস্য ছিলেন। কিন্তু প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে তাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া নূতন দল গঠন করেন।

প্রজা সমাজতন্ত্রীদল দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ১৯টি আসন দখল করে। কেরলে ইহা কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত হইয়া কিছুকাল মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছিল।

এই দলের লক্ষ্য—এমন একটি সুস্থ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, বিরোধীদল গঠনের অধিকার স্বীকৃত হইবে, জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিবে, মূল শিল্পসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত হইবে এবং কুটিরশিল্প প্রসারলাভ করিবে। বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইহা বিবদমান দুইটি শক্তিজোটের কোনটির পক্ষভুক্ত হওয়ার বিরোধী এবং যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার পক্ষপাতী।

(৪) **ভারতীয় জনসঙ্ঘ** (Bharatiya Janasangha): সর্বভারতীয় সংগঠন হিসাবে ১৯৫১ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে ভারতীয় জনসঙ্ঘের উদ্ভব হয়। পরলোকগত ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব নেতৃত্বগুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনসঙ্ঘ সমগ্র ভারতে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তিনজন জনসঙ্ঘপ্রার্থী লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং জনসঙ্ঘের মোট প্রাপ্ত ভোটসংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষের অধিক। অর্থাৎ মোট প্রদত্ত ভোট সংখ্যার শতকরা ৩'০৫ ভাগ। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার নির্বাচক মণ্ডলীর শতকরা প্রায় পাঁচজন জনসঙ্ঘের সপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন।

জনসঙ্ঘ ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান। ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির উন্নতি এবং যথার্থ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রসার কামনা করে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন জনসঙ্ঘ কর্তৃক সমর্থিত। ইহা শান্তিপূর্ণ এবং শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পসমূহের জাতীয়করণ ইহার পরিকল্পনার অন্তর্গত। কিন্তু অন্যান্য শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রে ইহা অবাধ নীতিই পছন্দ করে। ইহা প্রতিরক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং দেশব্যাপী যুব সম্প্রদায়ের জন্য সামরিক শিক্ষার আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইহা ভারত বিভাগকে স্বীকার করে না এবং অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন সফল করার জন্য ইহা বদ্ধপরিকর। ইহার মতে ভারতের বৈদেশিক নীতি জাতীয় স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হইবে।

উপরি উক্ত চারটি সর্ব ভারতীয় দল ছাড়া আরও বহু রাজনৈতিকদল ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিপ্লবী সাম্যবাদী দল, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দল, ফরওয়ার্ড ব্লক, হিন্দু মহাসভা এবং স্বতন্ত্র দল সমধিক উল্লেখযোগ্য।

শেষোক্ত দুইটি দলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা (Akhil Bharat Hindu Mahasabha): ভারতে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রতিরোধকল্পে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে হিন্দুমহাসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। অখণ্ড হিন্দুস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ইহার প্রধান আদর্শ। ইহা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহে। জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য হিন্দুমহাসভা বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা চালু করার পক্ষপাতী।

স্বতন্ত্র দল (The Swatantra Party): দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র দল নামে অপর একটি রাজনৈতিক সংগঠন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে। শ্রীরাজাগোপালাচারী প্রমুখ প্রথিতযশা রাজনীতিবিদগণের নিয়ত প্রচারের ফলে নবগঠিত এই দলটি ভারতে সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করা বর্তমানে সম্ভব নহে।

ক্রম-অগ্রসরমান রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ইহার প্রতিষ্ঠা। ইহা প্রধানতঃ ব্যক্তি উদ্যোগের সমর্থক এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধী। কংগ্রেস কর্তৃক পরিকল্পিত সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা স্বতন্ত্রদলের মতে নিশ্চিতরূপে ক্ষতিকারক।

বহু রাজনৈতিক দল থাকার ফলে ভারতের দুইটি রাজ্যে কিছুকাল মিলিত (coalition)* সরকার প্রতিষ্ঠিত হইলেও, একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের একাধিপত্য বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যান্য দেশের মত বহুদলীয় ব্যবস্থা ভারতে সরকারের দুর্বলতা বা অস্থায়িত্বের সূচনা করে নাই। ইহার ফলে বিরোধীপক্ষই পঙ্গু হইয়া

গড়িয়াছে। ভারতে বিকল্প সরকার গঠনের উপযোগী একটি শক্তিশালী বিরোধীদলের গঠন একান্তভাবে কাম্য। কিন্তু ভারতের বর্তমান রাজনীতি সেরূপ প্রতিশ্রুতি বহন করে না।

॥ সারাংশ ॥

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতে অসংখ্য রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক কংগ্রেস, সাম্যবাদী দল, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল এবং জনসঙ্ঘ এই চারিটি দল সর্বভারতীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

কংগ্রেস : ইহাই ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন। ১৮৮৫ সালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহার ভূমিকাই ছিল প্রধান। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কংগ্রেস অব্যাহতভাবে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কেন্দ্রে এবং সব রাজ্যেই ইহা বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে গণতন্ত্র গঠন ইহার লক্ষ্য। ইহা সমাজতান্ত্রিক ধরণের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাহে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেস শান্তি ও মৈত্রীর বাণী বহন করে এবং সামরিক জোট গঠনের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে।

সাম্যবাদী দল : ইহার প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৪ সালে, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ইহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে। ১৯৪২ সালে ইহা বৈধ বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহার লক্ষ্য ভারতে শ্রেণীহীন শোষণহীন সুস্থ সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহা কংগ্রেসের ঔপনিবেশিকতাবাদবিরোধী নিরপেক্ষ নীতির সমর্থক, অন্যান্য সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলির প্রতি ইহা উদার মনোভাবসম্পন্ন। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিজোটের প্রতি প্রকাশ্য বিরোধিতা ইহার বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য।

প্রজাসমাজতন্ত্রী দল : ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দল এবং কৃষক মজদুর প্রজাদলের মিলনের ফলে ইহা উদ্ভূত হয়। এই দুইটি দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণ পূর্বে কংগ্রেসের মধ্যেই ছিলেন। ইহা এমন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে যেখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং বিরোধী দল গঠনের অধিকার অব্যাহত থাকিবে। বৈদেশিক ক্ষেত্রে ইহা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বিশ্বাসী।

জনসঙ্ঘ : প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। জনসঙ্ঘ ভারতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার

করিতে চাহে। ইহা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধনীতি পছন্দ করে এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক নীতিই সমর্থন করে।

অন্যান্য দলগুলির মধ্যে হিন্দুমহাসভা এবং স্বতন্ত্র দল সমধিক প্রসিদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই হিন্দুমহাসভার অভ্যুদয় হয়। অখণ্ড হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠানই ইহার মূলমন্ত্র।

সম্প্রতি স্বতন্ত্র দল নামে অপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাধারণভাবে ইহা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক।

॥ **আদর্শ প্রশ্নমালা** ॥

1. **Write a short essay on the Party system of India.**
   ভারতের দলপ্রথা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর।
2. **Give an idea of the main Political Parties of India.**
   ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির পরিচয় দান কর।

ত্রিংশ অধ্যায়

জেলার শাসনব্যবস্থা
(District Administration)

ভুক্তি শাসন

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রায় প্রত্যেক রাজ্যকে কয়েকটি বিভাগ বা ভুক্তিতে (Division) বিভক্ত করা হইয়াছে। বিভাগীয় শাসনকর্তাকে বলা হয় ভুক্তিপতি (Divisional Commissioner)। তাঁহার প্রধান কর্তব্য হইল রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়সমূহ পরিচালনা করা।

প্রত্যেকটি বিভাগ আবার কতগুলি জেলায় বিভক্ত। জেলার শাসনভার একজন জেলা শাসকের উপর অর্পণ করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারী কৃত্যকের সভ্যদের মধ্য হইতেই সাধারণতঃ জেলা শাসক নিযুক্ত হন। কখনও কখনও রাজ্য সরকারী কৃত্যকের প্রবীন সদস্যও জেলাশাসকের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

জেলা শাসকের কার্যাবলী ও গুরুত্ব।

জেলাশাসক শাসন পরিচালনা এবং রাজস্ব সংগ্রহ—উভয়বিধ কর্তব্যই সম্পাদন করেন। এইজন্য তাঁহাকে শাসনকর্তা এবং রাজস্ব সংগ্রাহক (Magistrate and Collector) আখ্যা দেওয়া হয়।

রাজস্ব সংগ্রাহক হিসাবে তিনি অধীনস্থ কর্মচারীগণের সহায়তায় ভূমি-রাজস্ব এবং তৎসম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। খাসমহলের তত্ত্বাবধান এবং প্রপন্নাধিকার (Court of wards) পরিচালনাও তাঁহার কর্মসূচীর অন্তর্গত। জেলার কোষাগার তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

শাসক হিসাবে তাঁহার কার্য জেলার শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখা। জেলার পুলিস-বাহিনী তাঁহার নির্দেশে পরিচালিত হয়। তাঁহারই আদেশক্রমে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়।

জেলা শাসকের অন্যতম পরিচয় বিচারক হিসাবে। নিম্ন ফৌজদারী আদালত-গুলি তিনি পরিদর্শন করেন এবং তাঁহারই এজলাসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট গণের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের শুনানী হয়। জেলাশাসকের হস্তে বিচারক্ষমতা অর্পণ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। শাসন এবং বিচার ক্ষমতা একই ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকিলে, সুবিচারের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। এই কারণে ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র রাখিবার কথা বলা হইয়াছে।

জেলখানা এবং জেলার অন্যান্য সরকারী বিভাগের কার্য পরিদর্শন করা তাঁহার অন্যতম কর্তব্য। পৌর চিকিৎসক (Civil Surgeon), বিদ্যালয় পরিদর্শক (Inspector of Schools), নির্বাহী বাস্তুকার (Executive Engineer) প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের কার্যাদির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও জেলাশাসকের। জেলায় সমাজ উন্নয়ন এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কার্যও তিনি পরিদর্শন করিয়া থাকেন। জেলা-শাসকের মাধ্যমেই জেলায় সরকারী আদেশ প্রচারিত এবং সরকারী নীতি প্রযুক্ত হয়। আবার সরকার জেলাস্থ জনসাধারণের অভাব অভিযোগের সংবাদ তাঁহারই নিকট হইতে সংগ্রহ করে। অর্থাৎ সরকার এবং জেলাবাসীর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা জেলাশাসকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে জেলা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া তিনি রাজ্যসরকারের সমীপে বিবরণী পেশ করেন। তাঁহার বিবরণী অনুসারে সংশ্লিষ্ট জেলা সম্পর্কে সরকার যথাকর্তব্য স্থির করেন।

এতদ্ব্যতীত বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে জেলা বিপন্ন হইলে, যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব তাঁহার। সরকারী সাহায্য তাঁহারই মাধ্যমে দুর্গতদের মধ্যে বিলি করা হয়।

কিছু কিছু সামাজিক কর্তব্যও তাঁহাকে পালন করিতে হয়।

বিভিন্ন সভা সমিতিতে তাঁহাকে ভাষণ দিতে হয় এবং বহু বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতির পদ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয়।

জেলাশাসকের পদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, সততা এবং কর্তব্যনিষ্ঠার উপরেই জেলাশাসনের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বাস্তবিকই জনগণের মঙ্গল এবং সরকারের জনপ্রিয়তার মূলে রহিয়াছে জেলাশাসকের কর্মতৎপরতা এবং সেবাপরায়ণতা।

মহকুমা শাসন।

প্রত্যেক জেলা একাধিক মহকুমাতে (Subdivision) বিভক্ত। মহকুমার সরকারী কার্যাদি পরিচালনা করেন মহকুমাশাসক (Sub-divisional Officers)। কয়েকজন অধীনস্থ অফিসারের সহায়তায় তিনি যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন। ফৌজদারী মামলার বিচারের অধিকারও তাঁহার উপর অর্পণ করা হইয়াছে। তাঁহাকে জেলাশাসকের প্রতিচ্ছবি বলিয়া অভিহিত করা হয়।

॥ সারাংশ ॥

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক রাজ্য কয়েকটি বিভাগে, প্রত্যেক বিভাগ কতকগুলি জেলায় এবং প্রত্যেকটি জেলা একাধিক মহকুমায় বিভক্ত।

বিভাগীয় শাসক বা ভুক্তিপতি প্রধানতঃ রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধান করেন।

জেলাশাসনের দায়িত্ব জেলাশাসকের উপর ন্যস্ত। তিনি একাধারে শাসক, রাজস্ব সংগ্রাহক এবং বিচারক। জেলাস্থ যাবতীয় সরকারী বিভাগ তাঁহারই নির্দেশে পরিচালিত হয়। সরকারের সুনাম এবং জেলার উন্নতি তাঁহারই যোগ্যতার উপর নির্ভর করে।

মহকুমা শাসকের হস্তে মহকুমার যাবতীয় সরকারী কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। তিনি বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতারও অধিকারী।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. "The District Administration in India constitutes an essential part of the Government." Show how this administration is carried on.

"ভারতের জেলাশাসন ব্যবস্থা সরকারের অপরিহার্য অংশ।" কি ভাবে এই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় তাহা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২৫১-২৫৩]

2. What is meant by the Statement that the District Officer is the pivot of Indian administration?

জেলাশাসক ভারতীয় শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র—এই উক্তিটির অর্থ কি? [পৃষ্ঠা ঐ]

3. Describe the role of a District Magistrate in our country.

আমাদের দেশে জেলাশাসকের ভূমিকা কি—তাহা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ঐ]

একত্রিংশ অধ্যায়

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থা

(Local Self-Government)

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের উপযোগিতা : (১) বর্তমানযুগে শাসনকার্য এরূপ **জটিল** এবং ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে যে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়ের পক্ষেও সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নহে। তাই স্থানীয় সমস্যাসমূহের সন্তোষজনক সমাধানের জন্য স্থানীয় প্রনিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান গঠন করা অত্যাবশ্যক। প্রত্যেকটি অঞ্চলের বিশেষ কতকগুলি সমস্যা থাকে। স্থানীয় অধিবাসীগণের পক্ষেই সে সবের প্রতিকার করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী **স্বতন্ত্র** ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না।

(২) স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্বভার কিছুটা লঘু হয় এবং তাহারা জাতির বৃহত্তর ব্যাপারে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারে।

(৩) সুদূরস্থিত কেন্দ্র বা প্রদেশের রাজধানী হইতে স্থানীয় বিষয়সমূহ পরিচালিত হইলে, স্থানীয় বাসিন্দাগণের সৃজন-সামর্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়। অপর পক্ষে, স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার তাহাদিগকে আত্মবিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

(৪) স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি নাগরিকতার শিক্ষা কেন্দ্র। এই স্থানেই নাগরিকগণ দেশ শাসনের প্রথম পাঠ আয়ত্ত করে এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেশের বৃহত্তর শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিতে পারে।

(৫) কোন স্থানের অধিবাসীগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের ব্যয় ভার যদি সেই অঞ্চলেরই প্রতিনিধি সভার হস্তে থাকে, তাহা হইলে সেই অর্থের সদ্ব্যবহার ওয়াই স্বাভাবিক। অর্থাৎ মিতব্যয়িতার দিক দিয়া বিচার করিলে স্বায়ত্ত শাসন ,ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য।

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন : ভারতের অতীত ইতিহাস উন্নততর স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার সাক্ষ্য বহন করে। অতি প্রাচীনকাল হইতে নানা ধরণের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রচলিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় পল্লীর স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলে এই সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার ইংলণ্ডের অনুকরণে ভারতে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন

করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও পাশ্চাত্য ধরণের স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি পরিবর্তিত হয় নাই। সংবিধানে অবশ্য গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহাই ভারতের একমাত্র নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গ্রাম্য ও পৌর এই দুই ভাগে বিভক্ত। পল্লী অঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা (Rural Self-Government) পরিচালিত হয় ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম-পঞ্চায়েৎ, লোকাল বোর্ড এবং জেলা বোর্ডের মাধ্যমে। আর পৌর স্বায়ত্ত শাসন (Urban Self-Government) মূলক প্রতিষ্ঠান হইল মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, সেনানিবাস এবং নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান।

ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board) : গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হইতেছে ইউনিয়ন বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে সর্বত্রই গ্রাম-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা, কিন্তু এই রূপান্তর কার্য সম্পূর্ণ না হওয়ায় কোন কোন স্থানে এখনও পর্য্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ড অব্যাহত রহিয়াছে।

কতকগুলি গ্রাম লইয়া একটি ইউনিয়ন গঠন করা হয় এবং প্রত্যেকটি ইউনিয়নের জন্য একটি করিয়া ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা আছে। অন্যূন ৬জন এবং অনধিক ৯ জন নির্বাচিত সভ্য লইয়া ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হয়। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহসভাপতি নির্বাচন করেন।

ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামগুলির শান্তিরক্ষা এবং তদুদ্দেশ্যে চৌকিদার প্রভৃতির নিয়োগ, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নির্মাণ, পানীয় জলের সরবরাহ, মহামারীর প্রতিকার, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, ছোট খাট ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা ইত্যাদি নানাবিধ কার্য ইউনিয়ন বোর্ড সম্পাদন করে। ইহা ছাড়া সরকার প্রাপ্ত ঋণ, সাহায্য ইত্যাদি ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমেই বিলি করা হয়।

ইউনিয়ন বের্ডের আয়ের প্রধান উৎস হইল চৌকিদারী কর। এতদ্ব্যতীত খোঁয়াড, ফেরীঘাট ইত্যাদি হইতেও বোর্ডের যৎসামান্য অর্থাগম হইয়া থাকে। এই অগন্য আয়ের মোট অংশ চৌকিদারগণের মাহিনা এবং কর আদায়ের ব্যয় বাবদ খরচ হইয়া যায়। উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা উপরি উক্ত কার্যাদির ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

গ্রাম-পঞ্চায়েৎ (Village Panchayets) : সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠনের কথা বলা হইয়াছে। তদনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যে আইনানুসারে পঞ্চায়েৎ রাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হইতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অধীনে ১৯৬০-৬১ সালের শেষে অন্ততঃ পক্ষে ২.৫০ লক্ষ পঞ্চায়েৎ গঠিত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছিল।

গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ গ্রাম-সভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি গ্রাম-সভার সভ্য। ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত সমুদয় কার্যের ভার পঞ্চায়েতের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

পঞ্চায়েতের বিচার সংক্রান্ত শাখা ন্যায়-পঞ্চায়েৎ বলিয়া অভিহিত হয়। গ্রাম-পঞ্চায়েতের সদস্যগণের মধ্য হইতেই ন্যায়-পঞ্চায়েৎ নির্বাচন করা হয়। ভারতীয় পিনাল কোডের অধীনে ছোট খাট অপরাধের বিচার ক্ষমতা ইহার উপর অর্পণ করা হইয়াছে। অনধিক ২০০ টাকা মূল্যের দাবী দাওয়া সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিচার এখানে হইতে পারে। ন্যায়-পঞ্চায়েতের বিচার পদ্ধতি সরল এবং ন্যূনতম সময় সাপেক্ষ। আইন ব্যবসায়ীগণ এখানে কোন পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না।

লোকাল বোর্ড (Local Board) **:** প্রত্যেক মহকুমার অন্তর্গত গ্রামগুলির জন্য একটি করিয়া লোকাল বোর্ড গঠন করা হয়। ইহার সভ্যসংখ্যা অন্যূন ছয় জন। সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন সহ সভাপতি নির্বাচন করেন। লোকাল বোর্ডের স্বতন্ত্র ক্ষমতা বা স্বতন্ত্র আয় বলিয়া কিছু নাই। ইহা জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি-স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মাত্র। জেলা বোর্ড কার্যাদি সম্পর্কে ইহাকে নির্দেশ দান করে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করে। গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনের ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানটি অনাবশ্যক বলিয়া গণ্য হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি বহু রাজ্যে লোকাল বোর্ড তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

জেলা বোর্ড (District Board) **:** গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠান হইল জেলা বোর্ড। অন্যূন নয়জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া ইহা গঠিত হয়।

জেলাবোর্ডের গঠন

জেলা বোর্ডের স্থিতি কাল চার বৎসর। সভ্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি এবং এক বা দুইজন সহ-সভাপতি নির্বাচন করেন। সভাপতিই বোর্ডের প্রধান পরিচালক। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বহু মাহিনা করা কর্মচারী থাকেন। স্থায়ী কর্মচারীগণের মধ্যে উচ্চপদস্থ হইলেন কর্মসচিব, বাস্তুকার এবং স্বাস্থ্যাধিকারিক।

জেলাবোর্ডের কার্য

জেলার রাস্তা ঘাট নির্মাণ ও মেরামত, গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য কূপ, পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার, জন স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন এবং পরিচালনা, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিকার কল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং টোল, মক্তবখানা প্রভৃতিকে সাহায্য দান, ডাক বাংলো প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ, খেয়া ও খোঁয়াড়ের বন্দোবস্ত, পশুচিকিৎসালয় স্থাপন—ইত্যাদি নানারূপ কার্য জেলা বোর্ড সম্পাদন করে।

বোর্ডের আয়ঃ জমির খাজনার উপর ধার্য রোড্সেস বা পথকর হইতেই জেলাবোর্ডের সর্বাধিক আয় হইতে থাকে। ফেরিঘাট, খোঁয়াড়, হাট-বাজার প্রভৃতি জমা বন্দোবস্ত করিয়া বোর্ডের কিছু অর্থাগম হয়। জেলা বোর্ড রাস্তা, পুল প্রভৃতির জন্য শুল্ক ধার্য করিতে পারে। ইহা ছাড়া জেলা বোর্ড সরকার হইতে অর্থ সাহায্য লাভ করে এবং প্রয়োজনবোধে রাজ্য সরকারের অনুমতি লইয়া ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে।

বোর্ডের ব্যয়ঃ এই ভাবে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত হয়। অফিস পরিচালনা, স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, শিক্ষাবিস্তার এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য যথাক্রমে মোট আয়ের শতকরা ৫, ২৫, ১৭, ১৪ এবং ৫ ভাগ খরচ হয়। উদ্বৃত্ত অংশ অন্যান্য কার্যের জন্য নির্ধারিত থাকে।

মিউনিসিপ্যালিটি (Municipality)ঃ শহরাঞ্চলের স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে বলা হয় মিউনিসিপ্যালিটি। ইহার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসরকার স্থির করিয়া দেয়। করদাতাদের ভোটে অনধিক ৩০ এবং অন্যূন ৯ জন সভ্য নির্বাচিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে কমিশনার আখ্যা দেওয়া হয়। কমিশনারগণের দ্বারাই মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁহাদের পদ অবৈতনিক। সভাপতিই এই পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা। কর্মসচিব (Secretary), স্বাস্থ্যব্যবস্থা পরিদর্শক (Sanitary Inspector), ওভারসীয়ার এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের সহায়তায় মিউনিসিপ্যালিটির কার্যাদি পরিচালিত হয়। যে-সব মিউনিসিপ্যালিটির আয় বাৎসরিক এক লক্ষ টাকার অধিক, তাহারা সরকারের অনুমতি লইরা একজন মুখ্য কার্য-নির্বাহক (Chief Executive Officer) নিয়োগ করিতে পারে। ইহা ছাড়াও, সঙ্গতিসম্পন্ন পৌর প্রতিষ্ঠানে একজন বাস্তুকার এবং একজন স্বাস্থ্যাধিকারিক নিযুক্ত থাকেন।

কার্যঃ মিউনিসিপ্যালিটি সহরের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংস্কার এবং রাস্তায় আলো দিবার ব্যবস্থা করে; পানীয় জল সরবরাহ করে এবং শহর হইতে ময়লা নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। ইহা গৃহ নির্মাণ বিষয়ে শহরবাসীগণকে নির্দেশ দেয়। শহরবাসীর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ইহা ঔষধ ও খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। হাসপাতাল, মাতৃসদন ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করে এবং মহামারী নিবারণকল্পে প্রতিষেধক টীকা, ইঞ্জেকসন প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করে। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ইহা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং গ্রন্থাগারসমূহকে সাহায্য দান করে। ইহা ছাড়া বাজার, ডাক বাংলো, শ্মশান ইত্যাদি স্থাপন ও সংরক্ষণ করা, আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করা এবং জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখাও মিউনিসিপ্যালিটির কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

মিউনিসিপ্যালিটির আয়ঃ উপরিউক্ত কার্যসমূহের ব্যয়নির্বাহের জন্য মিউনিসিপ্যালিটি নানাসূত্রে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, ইহা শহরের বাড়ী ও জমির আনুমানিক আয়ের উপর কর ধার্য করে। এতদ্ব্যতীত পানীয় জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশন, রাস্তায় আলোদান প্রভৃতি কার্যের জন্য বাড়ী ও জমির উপর কর বসায়। বৃত্তি, ব্যবসায় প্রভৃতির উপর কর আরোপ করিয়া ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার, কবিরাজ এবং দোকানদারের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করে। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, রিক্সা প্রভৃতি যানবাহনের উপরও শুল্ক ধার্য করা হয়, গৃহপালিত জন্তুর মালিকদের নিকট হইতে অনুমতিপত্র বাবদ পৌর প্রতিষ্ঠান অর্থ আদায় করে। খেয়া এবং পুল হইতেও ইহার কিছু আয় হইয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটির বাজার, ডাক-বাংলো, পশু-হত্যাশালা প্রভৃতিও আয়ের অন্যতম উৎস। রাজ্যসরকার বিশেষ বিশেষ কার্যের অন্য মিউনিসিপ্যালিটিকে অর্থ সাহায্য করে। অবশ্য প্রয়োজনীয় অর্থের ঘাটতি ঘটিলে মিউনিসিপ্যালিটি রাজ্যসরকারের অনুমতি লইয়া জনসাধারণের নিকট হইতে কর্জ করিতে পারে।

কলিকাতা কর্পোরেশন (Calcutta Corporation) **:** কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি বৃহৎ নগরের এবং চন্দননগর নামক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সহরের পৌর প্রতষ্ঠান কর্পোরেশন নামে অভিহিত হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৮৬ জন। তন্মধ্যে ৮০ জন নির্বাচিত সদস্য। নির্বাচিত সদস্যগণকে বলা হয় কাউন্সিলার। নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে কেবলমাত্র করদাতাগণ এবং প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন বা তদনুরূপ পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে তাহারা। কাউন্সিলারগণ প্রথম সভায় ৫ জন অল্ডারম্যান নির্বাচন করেন। কর্পোরেশনের কার্যকাল চার বৎসর। সংশোধিত আইন অনুযায়ী কলিকাতা মহানগরী ১০০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত হইবেন।

কলিকাতা নগরোন্নতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদাধিকার বলে কর্পোরেশনের সভ্যপদ পাইয়া থাকেন।

সভ্যগণের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত হন। মেয়র এবং তাঁহার অবর্তমানে ডেপুটি মেয়র কর্পোরেশনের সভায় সভাপতিত্ব করেন। মেয়র, ডেপুটি মেয়র, তথা সমস্ত কাউন্সিলার এবং অল্ডারম্যানের পদ অবৈতনিক। মেয়র নগরে প্রথম নাগরিক হিসাবে সম্মানিত হন।

কর্পোরেশনের সভায় যে নীতি গৃহীত হয়, তাহাকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দায়িত্ব প্রধান কর্মাধ্যক্ষের। প্রধান কর্মাধ্যক্ষকে কমিশনার আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি রাজ্যসরকার কর্তৃক রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৫ বৎসরের জন্য

নিযুক্ত হন। অন্যান্য কর্মচারীগণের নিয়োগকর্তা স্বয়ং কর্পোরেশন। মুখ্য বাস্তুকার, স্বাস্থ্যাধিকার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়োগ রাজ্যসরকারের অনুমোদন সাপেক্ষ।

জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিদর্শন করিবার জন্য ৭টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হইয়াছে। প্রত্যেক কমিটিতে ৯ হইতে ১২ জন সভ্য থাকেন। কর্মচারী নিয়োগের জন্য একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়।

নগরের রাস্তাঘাট, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ, পানীয় এবং অপরিস্রুত জল সরবরাহ, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, রাস্তায় আলো দান—ইত্যাদিই হইল কর্পোরেশনের প্রধান কার্য। ইহা ছাড়া বাজার, পশুহত্যাশালা, শ্মশান, গোরস্থান প্রভৃতি স্থাপন, হাসপাতাল, প্রসূতিসদন, পশুচিকিৎসা কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, সংক্রামক ব্যাধির প্রসার রোধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি কার্যও কর্পোরেশন সম্পাদন করিয়া থাকে। ইহা নগরের জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখে। কর্পোরেশনের অধীনে একটি এ্যাম্বুলেন্স এবং একটি দমকল বাহিনী রহিয়াছে। নগরে নূতন গৃহ নির্মাণ বা পুরাতন গৃহের সংস্কার কার্য কর্পোরেশনের অনুমোদন সাপেক্ষ। কুটির শিল্পকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে ইহার তত্ত্বাবধানে একটি বাণিজ্যিক যাদুঘর স্থাপিত হইয়াছে।

কর্পোরেশনের আয়ঃ কর্পোরেশনের এলকাভুক্ত জমি ও বাড়ীর আনুমানিক বাৎসরিক মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে কর ধার্য করিয়া, ইহার মোট আয়ের প্রধান অংশ সংগৃহীত হয়। বিশেষ বৃত্তি বা ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতেও কর বাবদ অর্থ আদায় করা হয়। মোটরগাড়ী ছাড়া অন্যান্য যানবাহনের উপর কর্পোরেশন কর ধার্য করিয়া থাকে। মোটর গাড়ীর উপর ধার্য কর রাজ্য সরকার আদায় করে এবং তাহার অংশ বাবদ কিছু অর্থ কর্পোরেশন পাইয়া থাকে। কর্পোরেশনের নিজস্ব বাজার হইতে বেশ কিছু অর্থাগম হয়। নূতন কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য কর্পোরেশন রাজ্যসরকারের অনুমতি ক্রমে ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে।

ব্যয়ঃ বিভিন্ন উৎস হইতে সংগৃহীত অর্থ কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা এবং নানাবিধ কার্য সম্পাদনের খরচ বাবদ নিঃশেষিত হইয়া যায়।

সেনানিবাস সঙ্ঘ (Cantonment Board)ঃ যে সব স্থনে সেনানিবাস আছে সেখানে প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীনে একটি করিয়া সেনানিবাস সঙ্ঘ স্থাপন করা হয়।

কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান (Calcutta Improvement Trust) কলিকাতা এবং অন্যান্য বৃহৎ নগরে উন্নয়নমূলক কার্যাদি পরিচালনার জন্য নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠানের ১০ জন সদস্যের ৪ জন রাজ্যসরকার কর্তৃক মনোনীত। কলিকাতা কর্পোরেশন এবং বিভিন্ন বণিক সমিতি যথাক্রমে ৪ জন এবং ২ জন সদস্য মনোনীত করিয়া থাকে। সভাপতিকে নিযুক্ত করে রাজ্যসরকার।

কলিকাতা নগরীর নোংরা বস্তিগুলির উচ্ছেদ করিয়া সেই স্থানে বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং নূতন স্বাস্থ্যকর অট্টালিকা, প্রশস্ত পথ, ও নগরোদ্যান নির্মাণ করাই হইল ইহার প্রধান কার্য। নিজস্ব জমি বিক্রী করিয়া ইহা অর্থ সংগ্রহ করে। বাড়ী ভাড়া বাবদও কিছু পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়। ইহা ছাড়া কলিকাতা কর্পোরেশন এই প্রতিষ্ঠানটিকে অর্থ সাহায্য করে।

কলিকাতা বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান (Calcutta Port Trust) : কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্ প্রভৃতি বৃহৎ বন্দরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি করিয়া বন্দর রক্ষক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। কলিকাতা বন্দর-রক্ষক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বণিক সভা, কলিকাতা কর্পোরেশন, হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। বন্দর রক্ষা করা ছাড়াও ইহা মাল গুদাম, জেটি প্রভৃতি নির্মাণ করে, জাহাজগুলিকে পথ দেখায় এবং নদী পারাপারের বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। বন্দরাগত জাহাজগুলির উপর শুল্ক ধার্য করিয়া এবং গুদাম ভাড়া দিয়াও ইহা অর্থ সংগ্রহ করে।

॥ সারাংশ ॥

স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধানের ভার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর অর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত।

ভারতের নিজস্ব স্থানীয় শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তৎস্থলে পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবর্তন করা হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গ্রাম-পঞ্চায়েৎ গঠনের আয়োজন করা হইতেছে।

ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা গ্রাম্য ও পৌর এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত। গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় ইউনিয়ন বোর্ড, লোকালবোর্ড, এবং জেলা-বোর্ডের মাধ্যমে। ইউনিয়ন বোর্ডগুলির স্থলে সর্বত্র গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ গঠন করা হইতেছে এবং বহুস্থানে লোকালবোর্ডের বিলোপসাধন করা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সংরক্ষণ, পানীয় জলের সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য রক্ষার আয়োজন, মহামারী নিবারণ ইত্যাদি নানাবিধ কার্য এইসব প্রতিষ্ঠান সম্পাদন করিয়া থাকে। ইউনিয়নবোর্ডের আয়ের প্রধান উৎস চৌকিদারী কর এবং রোডসেস।

পৌর স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান বলিতে প্রধানতঃ মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনকে বুঝায়। প্রত্যেকটি সহরে একটি করিয়া মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ৯ হইতে ৩০ জন সভ্য লইয়া ইহা গঠিত হয়। সহরের রাস্তাঘাট নির্মাণ, রাস্তায় আলোদানের ব্যবস্থা, পানীয় জলের সরবরাহ, ময়লা-নিষ্কাশন, হাসপাতাল স্থাপন, মহামারী প্রতিরোধের বন্দোবস্ত ইত্যাদি নানাবিধ কার্য মিউনিসিপ্যালিটি সম্পাদন করিয়া থাকে। বাড়ী ও জমির উপর কর, বৃত্তি ও পেশার উপর কর ইত্যাদি হইতে মিউনিনিপ্যালিটির আয় হইয়া থাকে।

উপরি-উক্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় নগরে যে সব প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, তাহাদিগকে বলা হয় কর্পোরেশন। কলিকাতা কর্পোরেশন ৮৬ জন সদস্য লইয়া গঠিত, তন্মধ্যে ৮০ জন কাউন্সিলার, ৫ জন অল্ডারম্যান এবং বাকী একজন হইলেন কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। সদস্যগণ একজন মেয়র এবং একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন। রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কমিশনার ইহার প্রধান কর্মকর্তা।

কর্পোরেশন বাড়ী ও জমির উপর, বৃত্তি ব্যবসায়ের উপর কর ধার্য করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বাজার প্রভৃতি হইতেও ইহার কিছু আয় হয়।

অন্যান্য পৌর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেনানিবাস সঙ্ঘ, বন্দর-রক্ষক সংস্থা এবং নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান নগরীর উন্নতি বিধানের জন্য বস্তী অঞ্চলের উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বাস্থ্যকর স্থান গড়িয়া তোলে, প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করে এবং সুদৃশ্য অট্টালিকা, উদ্যান ইত্যাদি গঠন করিয়া থাকে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Describe the system of Village Self-Government in Bengal.**
   পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২৫৪-২৫৭]
2. **Give an idea of Urban Self Government in West Bengal.**
   পশ্চিমবঙ্গের পৌর স্বায়ত্ত শাসন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [পৃষ্ঠা ২৫৭-২৬০]

3. **Describe the composition, functions and sources of revenue of District Boards.**
জেলা বোর্ডসমূহের গঠন, কার্যাদি এবং আয়ের উৎস বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২৫৬-২৫৭]

4. **Describe the composition, functions and sources of revenue of Municipalities.**
মিউনিসিপ্যালিটি সমূহের গঠন, কার্যাবলী এবং আয়ের উৎস বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২৫৭-২৫৮]

5. **Describe the composition, functions and sources of revenue of the Calcutta Corporation.**
কলিকাতা কর্পোরেশনের গঠন, কার্যাদি এবং আয়ের উৎস বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২৫৮-২৫৯]

6. **Write notes on : (a) Calcutta Improvement Trust, (b) Calcutta Port Trust.**
কলিকাতা নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান এবং কলিকাতা বন্দররক্ষক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। [পৃষ্ঠা ২৬০]

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ভারতে নাগরিক জীবনের সমস্যা
(Civic Problems of India)

ইংরাজ ভারত ছাড়িয়াছে, পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে তাহার নির্মম শোষণের স্মৃতিচিহ্ন—দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও ব্যাধি। ভারত আজ স্বাধীন, কিন্তু হৃতসর্বস্ব। ভারতের গ্রাম ও নগর—সর্বত্র নাগরিক জীবন নানাবিধ সমস্যার ভারে জর্জরিত।

পল্লী পুনর্গঠনের সমস্যা (Problem of Rural Reconstruction): ভারত গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু ভারতের গ্রাম্যজীবন অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত। গ্রাম্য জীবনের মানোন্নয়নই হইল ভারতের প্রধানতম সমস্যা। গ্রামবাসীগণ সাধারণতঃ কৃষিজীবি। কিন্তু ভারতে কৃষির ব্যবস্থা, তথা কৃষকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দারিদ্র্য কৃষিককুলের চিরন্তন অভিশাপ ; ব্যাধি তাহাদের নিত্য সহচর ; অশিক্ষা এবং কুসংস্কার তাহাদের মজ্জাগত। জীর্ণ কুটির তাহাদের আবাসস্থল।

গ্রাম্য জীবনের প্রধান সমস্যা।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects): পল্লী ভারতের দুর্দশা মোচনের জন্য সম্প্রতি যে সর্বাত্মক কর্মযজ্ঞের অয়োজন করা

হইয়াছে, তাহা সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা নামে অভিহিত। পূর্বে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামাঞ্চলের অসুবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিত। তাহাদের কার্যক্রমের মধ্যে কোনরূপ সামঞ্জস্য ছিল না। এইরূপ বিক্ষিপ্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য। বস্তুতঃ গ্রামোন্নয়ন একটি সামগ্রিক সমস্যা। সুসংবদ্ধ কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ইহার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভবপর। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা এই দিক দিয়া গ্রাম্য জীবনের সার্বিক উন্নতিবিধানের প্রথম সার্থক প্রয়াস।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার স্বরূপ।

এই পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যগুলি হইতেছে: (১) ভূমি সংস্কার, সেচ ব্যবস্থা, সমবায় কৃষি পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি; (২) কুটিরশিল্পের পুনর্গঠন; (৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন; (৪) বেকার সমস্যার সমাধান; (৫) প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার; (৬) স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন: (৭) বয়স্ক-শিক্ষা-কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন এবং (৮) স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ নির্মাণ।

লক্ষ্য

সমাজোন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে। সমগ্র পল্লী ভারতকে অদূর-ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনার অধীনে আনা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করা হইয়াছে। এক একটি পরিকল্পনা অঞ্চল (Project Area) তিন শত গ্রাম, দুই লক্ষ লোক এবং দেড় লক্ষ একর জমি লইয়া গঠিত। ইহার বিস্তৃতি আনুমানিক পাঁচ শত বর্গ মাইল। প্রত্যেক পরিকল্পনা অঞ্চল তিনটি উন্নয়ন ব্লকে বিভক্ত। প্রতিটি ব্লকে আছে ১০০ গ্রাম এবং প্রায় ৬৬ হাজার লোক। এক একটি ব্লক আবার পাঁচটি অংশে (unit) বিভক্ত। প্রতিটি অংশে আছে ১৫ হইতে ২৫টি গ্রাম। এই সব গ্রামের মানুষকে সহযোগিতা এবং স্বাবলম্বন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বিভিন্ন অংশে একজন করিয়া গ্রামসেবক নিয়োগ করা হয়। প্রত্যেক ব্লকের ভার একজন উন্নয়ন অফিসারের (B. D. O.) উপর অর্পণ করা হয়। প্রতিটি পরিকল্পনা অঞ্চল একজন কার্য-নির্বাহকের (Project Executive officer) অধীন।

সাংগঠনিক দিক

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল নীতি দুইটি—সহযোগিতা এবং স্বাবলম্বিতা। পল্লী পুনর্গঠনের প্রথম শর্ত, পল্লীবাসীগণের পারস্পরিক সহযোগিতা। এই কারণে উক্ত পরিকল্পনায় গ্রাম-পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা এবং সমবায় ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সরকারের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করিয়া পল্লীবাসীগণ নিজেদের উন্নতির জন্য উদ্যোগী হইবে। কেবলমাত্র সরকারী প্রচেষ্টায় পল্লীর প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা যায় না।

মূলনীতি

ইহার জন্য প্রয়োজন পল্লীর মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা। গ্রাম্যজীবনে তাশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে না পারিলে কোনরূপ গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা সার্থক হইতে পারে না।

জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য (National Extension Service): দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম পর্বে সমাজ উন্নয়নের পূর্ববর্তী পর্যায় ছিল জাতীয় সম্প্রসারণ। ইহাকে সমাজোন্নয়নের প্রস্তুতি ক্ষেত্ররূপে অভিহিত করা হইত। অর্থাৎ উন্নয়নমূলক প্রাথমিক কার্য সুরু হইত সম্প্রসারণ ব্লকের মাধ্যমে। তৎপরে সমাজ উন্নয়ন ব্লকের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করা হইত। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ বা স্তর-বিন্যাস অযৌক্তিক বিবেচিত হওয়ায় ১৯৫৮ সালের নূতন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহা রদ করা হইয়াছে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সমাজ উন্নয়ন বাবদ ৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছে ২০০ কোটি টাকা। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ হইবার ঠিক সাত বৎসরের মধ্যে (১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর হইতে ১৯৫৯ সালের ২রা অক্টোবর) সমগ্র পল্লী জনসংখ্যার শতকরা ৬১ ভাগের মত লোক এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে সমগ্র পল্লী ভারতকে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় আনয়ন করিবার কথা ছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে যে নূতন সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষিত হয়, তদনুযায়ী এই লক্ষ্য আরও এক বছর পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

অনগ্রসর পল্লী-ভারতের পুনর্গঠনে এই পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। ইহার রূপদান সমাপ্ত হইলে পল্লীজীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা মূল্য বিচার।

জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজোন্নন ব্লকগুলি আশানুরূপ সফলতা অর্জন করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টা পল্লীর অগ্রগতির পথ সুগম করিয়াছে। প্রাথমিক পর্যায়ে সংগঠন সংক্রান্ত যে সব ত্রুটি ছিল, তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে। গ্রামবাসীগণ এই পরিকল্পনার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। তাহারা অকৃপণভাবে অর্থ ও শ্রম দান করিয়া এই পরিকল্পনার রূপায়নে সহায়তা করিতেছে।

নগর জীবনের সমস্যা (Problems of City life): আমাদের দেশের নগরগুলিকে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী গঠন করা হয় নাই। গ্রামাঞ্চল হইতে দলে দলে মানুষ জীবিকার অন্বেষণে আসিয়া এখানে ভিড় জমাইয়াছে। শহরের

জীবনযাত্রার সহিত তাহারা পরিচিত নহে। ফলে নানাবিধ সমস্যা পৌরজীবনকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।

বাসস্থান সমস্যা

নগরাঞ্চলে জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক হওয়ায় বাসস্থান সমস্যা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। যে পরিমাণে জনসমাগম হইতেছে, নূতন বাড়ী সে হারে নির্মিত হইতেছে না। বাসোপযোগী জমির অপ্রতুলতাহেতু নূতন গৃহ নির্মাণের সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ।

বস্তী উচ্ছেদের সমস্যা

নির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাবে নগরগুলি আপন খেয়ালে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যথেচ্ছ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। তাই গগনচুম্বী অট্টালিকার পার্শ্বে গড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য অস্বাস্থ্যকর, কদর্য বস্তী। বস্তী অঞ্চলের বিষাক্ত নিঃশ্বাস সারা নগরের আবহাওয়াকে আবিল করিয়া তুলিতেছে। তাই বস্তী উচ্ছেদের সমস্যা নগরজীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। পুরাতন নগরগুলিতে এই সমস্যার সমাধান সময়সাপেক্ষ। কিন্তু নূতন যে সব শিল্প-নগরীর সম্প্রতি পত্তন হইতেছে, প্রথম হইতে সজাগ দৃষ্টি রাখিলে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী সেগুলির উন্নয়ন প্রচেষ্টা পরিচালিত হইলে, উপরি-উক্ত সমস্যা এড়ান সম্ভব হইবে। বস্তী উচ্ছেদের ব্যাপারে নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাহাদের অর্থ সামর্থ্য সীমাবদ্ধ হওয়ার দরুণ এ বিষয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। জনবহুল নগরসমূহে প্রয়োজনানুরূপ পানীয় জল সরবরাহ করা হয় না; সেখানকার স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ।

অন্যান্য সমস্যা

পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান সমস্যা অর্থের। পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান তাহাদের সাধ্যাতীত। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনীতির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। রাজনৈতিক দলাদলি এবং অসাধুতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষিত করিতেছে। এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির আশু প্রতিকার কাম্য।

অপর একটি সমস্যা সম্প্রতি নগরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করিতেছে। ইহা হইল কর্ম-সংস্থানের সমস্যা। বেকার সমস্যার সমাধান অবশ্যই সময়সাপেক্ষ।

খাদ্য, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যা (Problems of Food, Health and Housing): নগর ও গ্রাম নির্বিশেষে ভারতের নাগরিক জীবনের সম্মুখে তিনটি প্রধান সমস্যা রহিয়াছে, যথা—খাদ্য সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং বাসস্থান সমস্যা। এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইতেছে।

খাদ্য সমস্যা (Food Problem) : যে দেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবি, সে দেশে খাদ্যের ঘাটতি অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু ইহাই ভারতের বিধিলিপি। ব্রহ্মদেশ যখন ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন হইতেই এই সমস্যার সূত্রপাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই সমস্যাকে তীব্রতর করিয়া তুলে। ইহার পর দেশ বিভাগের ফলে খাদ্য সংকট ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

খাদ্য সমস্যার সূত্রপাত

ভারতের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ভারতের প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। যে হারে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন সেই হারে বাড়িতেছে না। ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতি বৎসর ভারতকে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়।

খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি।

১৯৪৭ হইতে ১৯৫২—এই পাঁচ বৎসরে মোট খাদ্য আমদানীর পরিমাণ হইলে ১ কোটি ৯০ লক্ষ টন। ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯ সালে যথাক্রমে ৩১ লক্ষ ৭৮ হাজার টন এবং ৩৮ লক্ষ ৭ হাজার টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়।

ভারতের বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া মেহেতা কমিটি আগামী কয়েক বৎসরের জন্য নিয়মিতভাবে খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

প্রতিদিন ভারতীয়গণ গড়ে যে খাদ্য গ্রহণ করে, তাহা পরিমাণ ও পুষ্টিকারিতা উভয় দিক হইতেই অপর্যাপ্ত। Dr. Aykroyd এর মতে স্বাস্থ্যরক্ষার্থে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের প্রাত্যহিক প্রয়োজন ২৪০০ হইতে ৩০০০ ক্যালোরি মূল্যের খাদ্য। কিন্তু ভারতে ইহা গড়পড়তা ১৭৫০ ক্যালোরির অধিক নহে। ইহা ছাড়া সাধারণ ভারতীয় খাদ্যে অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যপ্রাণ, প্রোটিন এবং স্নেহজাতীয় পদার্থের একান্ত অভাব।

খাদ্যে পুষ্টিকারিতার অভাব

পরিকল্পনাকালে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭, ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬২০, ৬৮৭ এবং ৭৩০ লক্ষ টন। ১৯৫৮-৫৯ সালেই পূর্ববর্তী বৎসরগুলির তুলনায় সর্বাধিক উৎপাদন হইয়াছিল। ১৯৫৯-৬০ সালের উৎপাদন তদপেক্ষা অধিক হইয়াছে। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পায় নাই। উপরন্তু খাদ্যশস্য ক্রমশঃ দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ১৯৩৯ সালের দামস্তরের সূচকসংখ্যা ১০০ ধরিলে, ইহা ১৯৫৬-৫৭ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে যথাক্রমে ৩১৩.১ এবং ৪১১.৬ হইয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে ইহা আরও বৃদ্ধি পায়। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য

খাদ্যশস্যের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা।

প্রয়োজন যে হারে বাড়িতেছে, উৎপাদন সেই হারে বাড়িতেছে না। খাদ্যসামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের মধ্যে এই সমতার অভাবই খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির প্রধানতম কারণ।

১৯৫৭ সালের জুন মাসে ভারত সরকার শ্রীঅশোক মেহেতার সভাপতিত্বে একটি খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটী (Food Grains Enquiry Committee) গঠন করেন। উক্ত কমিটীর মতে জনসংখ্যা, আর্থিক আয়, খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ এবং খাদ্য ব্যবসায়ীগণের মজুত রাখিবার ইচ্ছা ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি তদনুরূপ হয় নাই। এই অসামঞ্জস্যই খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির মূল কারণ।

খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে মেহেতা কমিটীর অভিমত ও সুপারিশ

মেহেতা কমিটী খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে একটি মূল্য স্থিরকরণ বোর্ড (Price Stabilisation Board) এবং খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণাদপ্তরের অধীনে একটি খাদ্য স্থিতিকরণ বোর্ড (Food Grains Stabilisation Board) গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। শেষোক্ত সংস্থা খাদ্যশস্য মজুত রাখিবে এবং খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে মজুত খাদ্য বাজারে বিক্রয় করিবে এবং মূল্য হ্রাস পাইলে মজুত খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। কমিটি খাদ্যশস্যের উপর সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রবর্তনের বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করিলেও দুঃস্থ এলাকাগুলির জন্য এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও কমিটি জনগণের খাদ্য-স্বভাব পরিবর্তনের এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে সরকার বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। অত্যধিক মুনাফা অর্জন এবং ফাটকাবাজী রোধ করিবার জন্য খাদ্য ব্যবসায়ীগণকে লাইসেন্স দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; খাদ্যশস্য মজুত রাখিবার এবং দুঃস্থ এলাকাগুলির দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং উচিৎ মূল্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্থানে ন্যায্য মূল্যের দোকান (Fair Price Shops) খোলা হইয়াছে। কলিকাতার ন্যায় বড় বড় শহর ও শহরতলীতে পূর্ণ রেশনিং প্রবর্তিত হইয়াছে।

খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধকল্পে সরকারী প্রয়াস

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মেহেতা কমিটী নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতী : (১) বৃহৎ সেচ-প্রতিষ্ঠানগুলির সম্যক সদ্ব্যবহার; (২) ক্ষুদ্র সেচব্যবস্থা গ্রহণ; (৩) উন্নততর বীজ ও সার সরবরাহ এবং (৪) খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিকে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির শর্ত।

বর্তমানে আমাদের দেশে ৭৪০ লক্ষ টনের মত খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। কিন্তু হিসাব অনুযায়ী দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে খাদ্যশস্যের চাহিদা হইবে আনুমানিক ৭৯০ লক্ষ টন। অথচ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই ঘাটতি পূরণের উপযোগী উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে আনুমানিক ১০২/৩ কোটি টন। উক্ত সময়ের মধ্যে চাহিদাও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। তবে আশা করা যায় তৃতীয় পরিকল্পনা অন্তে ভারত খাদ্য বিষয়ে স্বাবলম্বী হইবে।

স্বাস্থ্য সমস্যা (Health Problem) : দেহ ও মনের সুস্থ বিকাশই হইল স্বাস্থ্য। কথায় বলে স্বাস্থ্যই সম্পদ। বস্তুতঃ স্বাস্থ্যবান জনসমষ্টিই রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মূলধন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারত যথার্থই দরিদ্র রাষ্ট্র। পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, নির্মল পানীয় জল, চিকিৎসাদির সুবিধা এবং সর্বোপরি স্বাস্থ্যসম্পর্কিত জ্ঞানের অভাবে ভারতে জনস্বাস্থ্যের মান হতাশাব্যঞ্জক। ভারতীয়দের গড় আয়ুষ্কাল হইল ৩২ বৎসর। শিশুমৃত্যু এবং সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর হার এখানে সর্বাধিক।

ভারতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা

নিম্নলিখিত খতিয়ান হইতে ১৯৪৭ সালের পর ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায় :

	১৯৪৭	১৯৫৬	১৯৫৭	১৯৫৮
প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার	১৯.৭	৯.৮	১১	৮.৮
শিশু-মৃত্যু (হাজার করা)	১৪৬	১০৮	—	৯২
বিভিন্ন রোগে প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার :				
(ক) জ্বর	১০.৮	৪.৮	৪.৮	৩.৬
(খ) বসন্ত	০.১	০.০৬	০.১৬	০.৩১
(গ) প্লেগ	০.৩	০.০	০.০	০.০
(ঘ) কলেরা	০.৪	০.০৬	০.১৬	০.০৮

জনস্বাস্থ্য প্রধানতঃ রাজ্য সরকারের বিষয়, কিন্তু পরিকল্পনাকালে কতগুলি কার্যক্রম যেমন, ম্যালেরিয়া নিবারণ, পরিবার নিয়ন্ত্রণ, জল সরবরাহ, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কেন্দ্র কর্তৃক পরিকল্পিত এবং কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে স্বাস্থ্য বিষয়ক যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ প্রচলিত সেবাসমূহেরই (Existing Services) সম্প্রসারণ।

স্বাস্থ্যোন্নয়নে সরকারী প্রচেষ্টা : জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থাগুলি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, যথা—(১) বিভিন্ন রোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ, (২) পুষ্টিকর খাদ্য

সরবরাহ ও খাদ্যে ভেজাল নিবারণ; (৩) জল সরবরাহ; (৪) স্বাস্থ্যবীমা এবং (৫) হাসপাতাল প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি।

(১) রোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

১৯৫৩ সালে গৃহীত জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্ম্মসূচী ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে জাতীয় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ কর্ম্মসূচীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ১৯৬০ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ২১·৪১ কোটি লোককে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে নিরাপত্তা দান করা হইয়াছে। যক্ষ্মারোগ নিবারণকল্পে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় ব্যাপকভাবে বি. সি. জি. টীকা দিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ভারতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা ২৫ লক্ষের মত এবং প্রতি বৎসর ৫ লক্ষের মত লোক এই রোগে মারা যায়। যথোপযুক্ত চিকিৎসার জন্য যক্ষ্মা হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস ইত্যাদির সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণের বিপুল আয়োজন সুরু হইয়াছে।

(২) পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ও ভেজাল নিবারণ

পুষ্টিকারিতা সম্বন্ধে পরামর্শদান কমিটি (Nutrition Advisory Committee) সুপারিশ করিয়াছেন যে জনসংখ্যার দুর্বল অংশকে রক্ষা করিতে হইবে, এবং পুষ্টিকারিতার অভাবজনিত ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্যের যথোপযুক্ত সরবরাহ করা বর্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব নহে। ইহা সামগ্রিক উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। তবে সরকার সাময়িক ব্যবস্থা কিছু পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে, যেমন স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদিগকে দুগ্ধ প্রভৃতি সারবান খাদ্য সরবরাহ করা।

খাদ্যে ভেজাল নিবারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। ইহার দ্বারা ভেজাল খাদ্য প্রস্তুত, আমদানী ও বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হয়। কিন্তু সরকার আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারে নাই।

(৩) পানীয় জল সরবরাহ

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে শহরবাসীদের শতকরা মাত্র ২৫ জন বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা ভোগ করিত। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত জল সরবরাহের জন্য শহরাঞ্চলে ২৭৫টি এবং পল্লী অঞ্চলে ২০৬টী পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে।

(৪) স্বাস্থ্যবীমা

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রমিক ও কর্মচারীগণের জন্য স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমানে ১৪ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারী সুবিধাজনক শর্তে সুচিকিৎসার সুযোগ ভোগ করেন।

পরিকল্পনাকালে হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪৭ সালে হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর মোট সংখ্যা ছিল ৩,৮২৫। ১৯৫৭ সালের হিসাব অনুযায়ী হাসপাতাল প্রভৃতির সংখ্যা হইল ৯,৯৫৮।

(৫) হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন

দিল্লী ও নয়াদিল্লীতে প্রায় ৪ লক্ষ সরকারী কর্মচারী ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের চিকিৎসাদির জন্য সহায়ক স্বাস্থ্য সেবা পরিকল্পনা (Contributory Health Service Scheme) গ্রহণ করা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে প্রথম পরিকল্পনার অধীনে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকসমূহে ৭৪টী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ২০০০ স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হইবে। এতদ্ব্যতীত সমাজোন্নয়ন ব্লকগুলিতে আনুমানিক ১০০০ স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। গ্রামাঞ্চলে ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়েরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৬) ঔষধপত্র উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ

ঔষধপত্র উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তারের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যখাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৪০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যোন্নতি বাবদ ২৭৭ কোটি টাকা নির্ধারিত করা হইয়াছে।

বাসস্থান সমস্যা (Housing Problems): ভারতে বাসস্থানের অবস্থা অতীব শোচনীয়। বাসস্থান বলিতে আমরা বুঝি মাথা গুঁজিবার ঠাঁই। অনেকের অদৃষ্টে তাহাও জুটে না। সহরাঞ্চলে এই সমস্যা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। শহর জীবনের অন্যতম অভিশাপ বস্তী অঞ্চলের কথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে বাসস্থানের অব্যবস্থার কথা সুবিদিত। সেখানে অধিকাংশ লোকই মাটির ঘরে বাস করে, সে ঘরও আবার পর্যাপ্ত পরিসর নহে। ইহা ছাড়া পল্লীকুটিরে পানীয় জল, পায়খানা ইত্যাদির কোন ব্যবস্থাই নাই। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ ব্যাধি বিস্তারে সহায়তা করে এবং গৃহবাসীর জীবনীশক্তিকে ক্ষীণতর করিয়া তুলে।

ভারতে বাসস্থানের দুরবস্থা

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাসস্থান উন্নয়নের কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার অধীনে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শিল্পাঞ্চলে গৃহ নির্মাণের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৫১ সালে রোপন শিল্প শ্রমিক আইন অনুযায়ী রোপনশিল্পে নিযুক্ত সমুদয় শ্রমিকের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা বাধ্যতামূলক। স্বল্পআয়বিশিষ্ট জনসংখ্যার জন্য গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও সম্প্রতি প্রবর্তন করা হইয়াছে।

বাসস্থান সম্পর্কে অবলম্বিত ব্যবস্থা

প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের শতকরা ২·১ ভাগ বাসস্থানের সুব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বাসস্থান খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ১২০ কোটি টাকা, অর্থাৎ সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ২·৫ অংশ। গ্রামাঞ্চলে বাসস্থান উন্নয়নের কর্মসূচী সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

। সারাংশ।

ভারতে নাগরিক জীবন নিদারুণ দুদশাগ্রস্ত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহের মাধ্যমে এই দুদশা মোচনের প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

পল্লীপুনর্গঠন সমস্যা : দীর্ঘদিনের উপেক্ষার ফলে গ্রামগুলি বাসের অযোগ্য হইয়া পড়ে। তথায় কৃষি ও কৃষক উভয়ের অবস্থাই শোচনীয়। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ব্যাধি, জীর্ণ বাসস্থান, ভগ্ন রাস্তা-ঘাট—এইগুলিই হইল ভারতীয় গ্রামসমূহের বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে গ্রাম জীবনের সামগ্রিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা : ১৯৫২ সালে এই পরিকল্পনা প্রথম গ্রহণ করা হয়। ইহাই পল্লীপুনর্গঠনের প্রথম সার্থক প্রয়াস। পল্লীবাসীগণের মধ্যে সহযোগিতায় মনোভাব গড়িয়া তোলা এবং তাহাদিগকে স্বাবলম্বন শিক্ষা দেওয়াই হইল এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত :

(১) খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি, (২) কুটির শিল্পের প্রসার, (৩) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, (৪) বেকার সমস্যার সমাধান; (৫) প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার; (৬) স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান এবং (৭) বাসস্থানের উন্নয়ন।

১৯৬২ সালের মধ্যে সমগ্র পল্লীভারত এই পরিকল্পনার অন্তর্গত হইবে। জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজোন্নয়ন ব্লকগুলি আশানুরূপ সফলতা অর্জন করিতে না পারিলেও ইহাদের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না।

নগর জীবনের সমস্যা : আমাদের দেশের শহর ও নগরগুলি অপরিকল্পিত ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। অগণিত মানুষ কর্মসংস্থানের আশায় নগরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছে। ইহার ফলে একদিকে বাসস্থানের অভাব তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে বস্তীর কদর্যতা সমগ্র নগরজীবনের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যকে বিকৃত করিতেছে। নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে এইসব সমস্যা সমাধানের এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নগর উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান

অভাব অর্থের, অনেক ক্ষেত্রে সততারও। পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাজনীতির বাহিরে রাখাই বাঞ্ছনীয়।

গ্রাম ও নগর নির্বিশেষে ভারতের নাগরিক জীবন তিনটি সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন।

খাদ্য সমস্যা : কৃষিপ্রধান ভারত অদৃষ্টের পরিহাসে খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত। পরিকল্পনাকালে ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী আজও বন্ধ হয় নাই এবং খাদ্যশস্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। যে হারে জনসংখ্যা এবং খাদ্যের চাহিদা বাড়িতেছে, খাদ্যোৎপাদন ঠিক সেই হারে বাড়িতেছে না, খাদ্যের যোগান ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার আশা সুদূরপরাহত।

স্বাস্থ্য সমস্যা : স্বাস্থ্যসম্পদের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতের স্থান অতি নিম্নে। ভারতবাসীর গড় আয়ু ৩২ বৎসর। মৃত্যুর হার এখানে সর্বাধিক; সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপও ভয়াবহ। স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান কল্পে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

(১) বিভিন্ন রোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ; (২) পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ ও খাদ্যে ভেজাল নিবারণ; (৩) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ; (৪) স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনা; (৫) হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি; (৬) চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রসার এবং (৭) ঔষধ-পত্রাদির উৎপাদন ও তৎসম্পর্কে গবেষণা।

বাসস্থান সমস্যা : ভারতের নগরগুলিতে বাসগৃহের অভাব এবং গ্রামগুলিতে বাসস্থানের অব্যবস্থার কথা সুবিদিত। গ্রামাঞ্চলে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে বাসস্থানের সুব্যবস্থা করা হইতেছে। নগরাঞ্চলে নগরোন্নতি বিধায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই কার্যে ব্যাপৃত। তাহা ছাড়া শিল্পাঞ্চলে সরকারী সাহায্যে গৃহ নির্মাণ এবং স্বল্প আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনাও সরকার গ্রহণ করিয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **What are the principal city problems in India? Suggest suitable remedies.**

   ভারতের নগর-জীবনের প্রধান সমস্যা কি? যথোপযুক্ত প্রতিকারের নির্দেশ দাও।

   [পৃষ্ঠা ২৬৪-২৬৫ এবং ২৬৬—৯]

2. **Describe the organisation, aims and achievements of Community Development Projects in India.**

   ভারতে সমাজে উন্নয়ন পরিকল্পনার সংগঠন, উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা বর্ণনা কর।

   [পৃষ্ঠা ২৬২-২৬৪]

3. **Describe the main Civic Problems of India. What steps have been taken to solve them ?**
ভারতে নাগরিক জীবনের প্রধান সমস্যাগুলি বর্ণনা কর। সমস্যাসমূহের সমাধান কল্পে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ? [পৃষ্ঠা ২৭১-২৭২ (সারাংশ)]

4. **Give an appraisal of the measure taken by the Government in solving the problems of Health and Housing.**
স্বাস্থ্য এবং বাসস্থান সমস্যার সমাধানের জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে, সেগুলির মূল্যবিচার কর। [পৃষ্ঠা ২৬৮-২৭১]

5. **Write a short essay on the Food Problem of India.**
ভারতের খাদ্য সমস্যার উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর। [পৃষ্ঠা ২৬৬-২৬৮]

পরিশিষ্ট

শাসনতন্ত্র

(Constitution)

ব্যক্তিজীবন যেরূপ কতগুলি সরকার-সৃষ্ট নিয়মের কানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সরকার বা শাসন ব্যবস্থাও সেইরূপ কতগুলি মৌলিক নীতি ও অনুশাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই সব নীতি ও অনুশাসনকে সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান (constitution) বলিয়া অভিহিত করা হয়। সরকারের সংগঠন এবং কর্ম-পদ্ধতি, শাসক শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য—ইত্যাদি বিষয় সংবিধানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়।

শাসনতন্ত্রের অর্থ ও তাৎপর্য

শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ : (Classification of Constitution) :

শাসনতন্ত্রকে সাধারণতঃ **লিখিত** (written) এবং **অলিখিত** (unwritten) এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যে দেশের শাসন ব্যবস্থার মূলনীতিগুলি একটি নির্দিষ্ট দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে, সে দেশের শাসনতন্ত্রকে বলা হয় লিখিত, অর্থাৎ লিখিত অর্থে সংবিধান বলিতে একটি নির্দিষ্ট দলিলকে বুঝাইয়া থাকে। ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত। অপরপক্ষে, যে দেশের শাসন ব্যবস্থা কোন একটি নির্দিষ্ট দলিলের নির্দেশে পরিচালিত না হইয়া, প্রথা, রীতি নীতি ও লোকাচারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সে দেশের সংবিধানকে অলিখিত আখ্যা দেওয়া হয়। একমাত্র ইংলণ্ডের সংবিধানই অলিখিত, ভারত বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণপরিষদের দ্বারা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার মৌলিক নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করা হয় নাই।

লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্র

সংবিধানের উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। এমন কোন সংবিধান নাই, যাহাতে শাসন সম্পর্কিত সব কিছু নিয়ম লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; সম্পূর্ণভাবে অলিখিত শাসনতন্ত্রও বিরল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র মূলতঃ লিখিত হইলেও, তাহা অগণিত প্রথাগত বিধানের দ্বারা সম্প্রসারিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ক্যাবিনেটের উদ্ভব এবং রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মার্কিন সংবিধানে ক্যাবিনেট সম্বন্ধে কোন লিখিত নির্দেশ নাই। কিন্তু প্রথাভিত্তিক

এই শ্রেণীবিভাগের যাথার্থ্য বিচার।

এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে পরিগণিত হয়। আবার উক্ত সংবিধানের লিখিত ধারা অনুযায়ী পরোক্ষ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির নির্বাচিত হইবার কথা, কিন্তু দলপ্রথা প্রবর্তনের ফলে রাষ্ট্রপতি কার্যতঃ বাস্তবে প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতেই নির্বাচিত হন।

তেমনি ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রকে সাধারণভাবে অলিখিত বলিয়া অভিহিত করা হইলেও, অধিকারের সনদ, প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা ইত্যাদি কতগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

লিখিত সংবিধানের গুণাগুণ

লিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ হইল স্পষ্টতা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কর্মক্ষেত্র সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য লিখিত সংবিধান অপরিহার্য। কিন্তু লিখিত বলিয়া স্থিতিশীল এবং জাতীয় জীবনের সহিত সঙ্গতি রক্ষায় অসমর্থ।

অলিখিত সংবিধানের গুণাগুণ

অলিখিত সংবিধানের প্রধান গুণ ইহার পরিবর্তনশীলতা। তবে ইহার ত্রুটি এই যে ইহা অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট এবং অস্থায়ী।

নমনীয় ও অনমনীয় শাসনতন্ত্র :

নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্রের পার্থক্য।

লর্ড ব্রাইস, সংশোধন পদ্ধতি অনুসারে শাসনতন্ত্র-সমূহকে **নমনীয়** (Flexible) এবং **অনমনীয়** (Rigid)—এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যে শাসনতন্ত্র অতি সহজে পরিবর্তন করা চলে, অর্থাৎ যাহা সাধারণ আইনের মত ব্যবস্থাপক সভার ভোটাধিক্যে সংশোধন করা যায়, তাহাকে বলা হয় নমনীয় সংবিধান। এই জাতীয় ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক আইন এবং সাধারণ আইনের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় না। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র নমনীয়। সে দেশের পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক বিধানগুলি পরিবর্তন করিতে পারে।

অপর পক্ষে যে সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র, তাহাকে অনমনীয় আখ্যা দেওয়া হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণ-আইন এবং শাসনতান্ত্রিক আইন পৃথক পর্যায়ভুক্ত এবং সাধারণ আইন যদি শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয়, তাহা হইলে বিচারালয় তাহা বাতিল করিতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অতীব অনমনীয়। ইহার কোন ধারা পরিবর্তনের জন্য একটি বিশেষ এবং জটিল পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। কংগ্রেস অর্থাৎ কেন্দ্রীয়

আইনসভা সাধারণ আইনের ন্যায় সংবিধানের ধারা পরিবর্তন করিতে পারে না। ভারতের সংবিধানও অনমনীয়। অবশ্য ইহার সংশোধন পদ্ধতি মার্কিন সংবিধানের সংবিধানের তুলনায় সহজসাধ্য।

নমনীয় সংবিধানে সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Flexible Constitutions) :

সুবিধা : (১) নমনীয় সংবিধান জাতীয় প্রগতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ। এই সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি সরল বলিয়া অতি সহজেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা যায়।

(২) জনগণের দাবী-দাওয়া অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় বলিয়া ইহা বিপ্লবের আশঙ্কামুক্ত।

অসুবিধা : (১) কিন্তু সদা-পরিবর্তনশীল বলিয়া নমনীয় সংবিধান গণমানসে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস উদ্রেক করিতে পারে না।

(২) শাসকবর্গ আইনসভার সংখ্যাধিক্যের জোরে সংবিধানের যথেচ্ছ পরিবর্তন সাধন করিতে পারে। ইহার ফলে জনগণের অধিকার ব্যাহত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

অনমনীয় সংবিধানের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and Demerits of Rigid Constitutions) :

সুবিধা : (১) অনমনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ স্থায়িত্ব। আইন সভার সাধারণ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের সাময়িক খেয়ালে ইহা পরিবর্তিত হয় না। এই দৃঢ়তার কারণে ইহা জনগণের আস্থা অর্জন করিতে পারে।

(২) ইহা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার অন্যতম উপায় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সাফল্য বহুলাংশে ইহার উপর নির্ভরশীল।

অসুবিধা : (১) অনমনীয় সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে ইহা প্রগতির পরিপন্থী। সংশোধন অনায়াসসাধ্য নহে বলিয়া, বহু ক্ষেত্রে যথার্থ উন্নয়ন-মূলক প্রস্তাবও প্রত্যাহার করিতে হয়।

(২) আবার নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের সম্ভাবনা না থাকায়, জনগণ বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ অনমনীয় সংবিধানে বিপ্লবের আশঙ্কা নিহিত রহিয়াছে।

(৩) অনমনীয় সংবিধান বিচারালয়ের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়া গণতান্ত্রিক আদর্শকে লঙ্ঘন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেস-প্রণীত যে কোন আইনকে শাসনতন্ত্র-বিরোধী বলিয়া বাতিল করিয়া দিতে পারে। অর্থাৎ নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের সুচিন্তিত কল্যাণকর সিদ্ধান্ত মুষ্টিমেয় বিচারক বানচাল করিয়া দিতে পারেন। বিচারের নামে গণতন্ত্রের এই অবমাননা অবশ্যই আপত্তিকর।

শাসনতন্ত্র জাতীয়-জীবনের প্রতিচ্ছবি। জাতীয় জীবন নিয়ত পরিবর্তনশীল। কাজেই সংবিধান স্থিতিশীল হইতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনমনীয়। তাই বলিয়া ইহা প্রয়োজনমত পরিবর্তিত হয় নাই, একথা বলা যায় না। আনুষ্ঠানিক-ভাবে ইহা মাত্র ২২ বার সংশোধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু প্রথাগত বিধান ও আদালতের ব্যাখ্যার মাধ্যমে অষ্টাদশ শতাব্দীর মার্কিন সংবিধান বিংশ শতাব্দীর উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে।

সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির নমনীয়তা এবং অনমনীয়তা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নহে। সংশোধন পদ্ধতি সহজ ও সরল হওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষণশীল দেশে শাসনতন্ত্র সহসা পরিবর্তিত হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ইংলণ্ডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আবার সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান অনমনীয় হওয়া সত্ত্বেও তাহার অগ্রগতি অব্যাহত রহিয়াছে।

॥ সারাংশ ॥

যে সব মৌলিক নিয়মানুসারে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহাদিগকে সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। শাসনতন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী সরকার সংগঠিত এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক নিরূপিত হয়।

লিখিত ও অলিখিত এই দুইটি শ্রেণীতে শাসনতন্ত্রের বিভাগ যুক্তিসিদ্ধ নহে। লর্ড ব্রাইস্ সংশোধন পদ্ধতির ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রসমূহকে নমনীয় এবং অনমনীয় এই দুইটি শ্রেণীভুক্ত করার পক্ষপাতী। বস্তুতঃ প্রতিটি জীবন্ত সংবিধান পরিবর্তনধর্মী। শাসনতন্ত্রের অগ্রগতি অনেকাংশে জাতীয় মনোভাবের উপর নির্ভরশীল।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. What is meant by the 'Constitution' of a State? Give a brief description of the different types of constitutions, explaining the grounds on which they are classified.

'শাসনতন্ত্র' বলিতে কি বুঝ ? শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি উল্লেখ করিয়া, বিভিন্ন প্রকার শাসনতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৬]

2. Distinguish between (a) Written and Unwritten Constitution, and (b) Rigid and Flexible Constitution. Illustrate your answer.

উদাহরণসহ (১) লিখিত ও অলিখিত, এবং (খ) নমনীয় ও অনমনীয় শাসনতন্ত্রের-পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃষ্ঠা ২৭৪-২৭৫]

অর্থশাস্ত্র

প্রথম অধ্যায়

অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

(Definition and Subject-matter of Economics)

সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা ঃ

কেবলমাত্র মানুষের সংজ্ঞা পড়িয়া মানুষ সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। অনেক মানুষ চোখে দেখিলে তবেই মানুষ কি জানা যায়। অর্থশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। সংজ্ঞা হইতে ইহার বিষয়বস্তু আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব। অর্থশাস্ত্রবিদ্‌রা বহুবিধ সমস্যার আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রেও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিতে হইলে এই আলোচিত ব্যাপারগুলি জানিতে হইবে। তবুও সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। সংজ্ঞার সাহায্যেই আমরা এক শাস্ত্রকে অপর শাস্ত্র হইতে পৃথক করিতে পারি। সংজ্ঞা না জানিলে অন্য শাস্ত্রের এলাকায় অনধিকার প্রবেশের আশঙ্কা প্রবল। সেইজন্য প্রথম হইতেই কাজ চালানোর মত একটি সংজ্ঞা থাকা ভাল।

অর্থনৈতিক সমস্যা ঃ

যেখানে সমস্যা নাই, সেখানে আলোচনারও প্রয়োজন নাই। মানুষের জিজ্ঞাসার শেষ নাই, সমস্যা ও আলোচনারও শেষ নাই। একটি শাস্ত্রের পক্ষে সমস্ত সমস্যা আলোচনা করা সম্ভব নয়। একটি শাস্ত্র একটি বিশেষ সমস্যা লইয়া আলোচনা করে। **অর্থশাস্ত্রে আমরা অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা করি।** মানুষের অভাব অসীম। প্রকৃতি নানারকম উপকরণ যোগায়। শ্রমের সাহায্যে সেই উপকরণগুলি আমরা অভাব পূরণের উপযোগী করিয়া লই। প্রকৃতি মুক্তহস্তে এই উপকরণগুলি বিতরণ করে না। আমাদের শ্রমের ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়। ইহার ফলে সমস্যা দেখা দেয়। ইহাই অর্থনৈতিক সমস্যা। সীমাহীন অভাব ও প্রকৃতির কৃপণতা—উভয়ের সংমিশ্রণে অর্থনৈতিক সমস্যার উৎপত্তি হয়।

অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি ঃ

মানুষের অভাব সীমাহীন। একটি বিশেষ অভাবের পরিপূর্ণ তৃপ্তি সম্ভব। কিন্তু সাধারণভাবে অভাবের শেষ নাই। বসতে পেলে শুতে চায়—একথা সর্বৈব সত্য।

অভাব অসীম

একটি অভাবের তৃপ্তি হইতে না হইতে, আরও দশটা অভাব মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। একটি অভাবের তৃপ্তি ঘটিলে অতৃপ্ত অভাবগুলির তীব্রতা বাড়িয়া যায়। একটি অভাবের তৃপ্তি অন্য সুপ্ত অভাবকে

জাগাইয়া তুলে। বাড়ী হইলে, গাড়ীর কথা মনে হয়। বাড়ী সাজানর তাগিদ তখন বাড়িয়া যায়। অন্যান্য জীবের মত মানুষের খাওয়া, পরা ও আশ্রয়ের অভাব আছে। মানুষের অভাব এইখানে সুরু হয়। কিন্তু ইহার শেষ নাই। জৈবিক অভাবের পর দেখা দেয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সংক্রান্ত অভাব। মানুষের বেলায় জৈবিক অভাবও তাহার জন্মগত সারল্য হারাইয়া অশেষ বৈচিত্র্য ধারণ করে। খাওয়া আমাদের নিকট শুধু জীবন রক্ষার ব্যাপার নয়। ইহা একটি আনন্দদায়ক ঘটনাও বটে। খাওয়ার কত রকমারি, কত পারিপাট্য। আশ্রয় শুধু শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নয়। এখানে শিল্প, সৌন্দর্য এমন কি লোকদেখানর ব্যাপারও আছে।

অভাব মিটাইতে গেলে নানাবিধ উপকরণ দরকার। প্রকৃতি হইতে এই উপকরণগুলি আমরা পাই। শ্রমের সাহায্যে এই উপকরণগুলি আমরা অভাব-পূরণের যোগ্য করিয়া লই। প্রাকৃতিক সরঞ্জাম ও মানুষের শ্রম কোনটাই অসীম নয়। অভাব মিটাইবার উপাদানগুলি যদি অফুরন্ত হইত, তবে অর্থনৈতিক সমস্যারও উদ্ভব হইত না।

কিন্তু প্রকৃতি কৃপণা

অর্থশাস্ত্রে অভাববোধ ও তাহার পরিতৃপ্তির বিষয়ে আমরা আলোচনা করি। অভাবপূরণের ব্যাপারটি বহুদিক হইতে আলোচনা করা যায়। অর্থশাস্ত্রে অভাব-পূরণের বিষয়টিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলাচনা করা হয়। অভাবের উৎপত্তি কি করিয়া হয় সে সম্বন্ধে বলিতে পারেন জীববিদ্যাবিদ্ বা মনস্তত্ত্ববিদ্। কার্যতঃ অভাব কি করিয়া তৃপ্ত হয় সে সম্বন্ধে আলোক সম্পাত করিতে পারেন রসায়নবিদ্, ভূ-তত্ত্ববিদ্, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি। এই ধরণের আলোচনা অর্থশাস্ত্রের এলাকার বাহিরে। অপ্রাচুর্য হেতু অভাবপূরণের ব্যাপারে যে সমস্যা দেখা দেয় আমরা শুধু তাহাই আলোচনা করি। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইবে। বাতাস আমাদের নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ। ইহা ব্যতীত আমাদের বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব। জীবদেহে ইহা দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয় তাহা বলিতে পারেন রসায়নবিদ্ ও জীববিদ্যাবিদ্। এই অভাবের তৃপ্তির জন্য সাধারণতঃ অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় না। বাতাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। একজন একটু জোরে নিঃশ্বাস লইলে আরেকজনের ভাগে কম পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই। কিংবা ইহার ফলে তাহার নিজের অন্য অভাব তৃপ্তির কোনও বিঘ্ন ঘটিবে না। কিন্তু জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বায়ু সরবরাহ একটি রীতিমত সমস্যার ব্যাপার। ইহার জন্য এখন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরের

অভাব পূরণের সম্পূর্ণ ব্যাপারটি নয়, শুধু অপ্রাচুর্যের দিকটি আমরা আলোচনা করি।

দরকার হইবে। কিন্তু শুধু যে কারিগরী সমস্যা দেখা দিবে তাহা নয়। বায়ু সরবরাহ করিতে পাখা, নল ইত্যাদি উপাদান ও সময় ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে। এই উপাদানগুলি ও সময়—উভয়ের যোগান অপ্রচুর। এই অপ্রাচুর্যের ফলে যে সমস্যা দেখা দেয় তাহাই অর্থনৈতিক সমস্যা।

অভাবপূরণের সরঞ্জামের অপ্রাচুর্যই হইল অর্থনৈতিক সমস্যার গোড়ার কথা। অপ্রাচুর্য কথাটি আমরা একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করি। সাধারণ ভাষায় রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ামকে কিংবা "পথের দাবীর" পাণ্ডুলিপিকে আমরা অপ্রচুর বলি। কিন্তু ধান, চাল বা গমকে আমরা অপ্রচুর বলি না। অপ্রচুর ও দুষ্প্রাপ্য একই অর্থে আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে অফুরন্ত না হইলেই তাহাকে অপ্রচুর বলা হয়। অপ্রাচুর্য একটি আপেক্ষিক ধারণা। অভাব ও অভাবপূরণের সামগ্রী এই দুইয়ের পরিমাণগত সম্বন্ধ হইতে অপ্রাচুর্যের সৃষ্টি। কোন দ্রব্য হয়ত সারা দুনিয়ায় মোটে একটিই আছে। তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু ইহার জন্য যদি কেহ অভাববোধ না করে, তবে ইহাকে অপ্রচুর বলা হইবে না। কেবলমাত্র দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপিই যে অপ্রচুর তাহা নহে, সামান্য 'বর্ণপরিচয়ও' আমাদের পরিভাষায় অপ্রচুর। 'বর্ণপরিচয়' অধিক সংখ্যায় মুদ্রণ করা যায় সত্য, কিন্তু তাহা করিতে গেলে অধিক পরিমাণে কালি, কাগজ ও নানাবিধ শ্রম খরচ করিতে হইবে। এই উপাদানগুলি আমাদের পরিভাষায় নিশ্চয় অপ্রচুর। যে কোনও দ্রব্যের মৌলিক উপাদান হইল নানাবিধ প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক শ্রম ও সময়। এগুলি নিঃসংশয়ে অপ্রচুর।

অপ্রচুর মানে দুষ্প্রাপ্য নয়। অফুরন্ত না হইলেই অপ্রচুর বলা হয়।

দ্রব্যের অপর বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিকল্প প্রয়োগের সম্ভাবনা। একই দ্রব্য অনেক অভাবের যে কোনও একটি মিটাইতে পারে। অপ্রাচুর্য হেতু সমস্ত অভাব একই সঙ্গে মিটাইতে পারে না। দুধ আমরা গরম পানীয় হিসাবে ব্যবহার করিতে পারি, আবার দই, ক্ষীর বা ঘোল করিয়াও খাইতে পারি। কিন্তু যে দুধ দিয়া দই করিব তাহা দিয়া আর ক্ষীর করা চলিবে না। দুধ যদি অফুরন্ত হইত, তবে দুধ, দই, ক্ষীর সমস্তই আমরা যথেষ্ট পাইতে পারিতাম। কিন্তু দুধ অপ্রচুর। সুতরাং সমস্যা দেখা দেয়, দই করিব না ক্ষীর করিব, ঘোল বেশী করিব না ক্ষীর বেশী করিব, কোন্‌টি এখন করিব—কোন্‌টি পরে করিব, কে কতটা পাইবে (আমার অভাব মিটাইবে না অপরের অভাব মিটাইবে)। দ্রব্য-সংগঠক মৌলিক উপাদানগুলির বিকল্প প্রয়োগের সম্ভাবনা অনেক বেশী। ইহারা অপ্রচুরও

অপ্রাচুর্য ও বিকল্প প্রয়োগের সম্ভাবনা মিলিয়া নির্বাচন সমস্যার সৃষ্টি করে।

(বাস্তবিক ইহারা অপ্রচুর বলিয়াই দ্রব্যসম্ভারও অপ্রচুর)। এই উপাদানগুলি একটি অভাব মিটাইবার কাজে লাগান মাত্রেই অন্য অভাব মিটাইবার আশা ছাড়িতে হইবে। সুতরাং আমাদের সামনে সমস্যা দেখা দেয়, এই উপাদানগুলি দিয়া কোন্ কোন্ দ্রব্য তৈয়ার করা হইবে, কতখানি করিয়া হইবে, কি করিয়া তৈয়ার করা হইবে, কে কতখানি করিয়া পাইবে ইত্যাদি। অর্থনৈতিক সমস্যা মানেই হইল নির্বাচনের সমস্যা। সীমাবদ্ধ অথচ বিকল্প প্রয়োগের সম্ভাবনাযুক্ত উপাদান দিয়া অসীম অভাবের তৃপ্তি করিতে গেলে যে নির্বাচন সমস্যা দেখা দেয় অর্থশাস্ত্রে আমরা তাহাই আলোচনা করি।

অর্থশাস্ত্রের ব্যাপক সংজ্ঞা : অনেক অর্থশাস্ত্রবিদ্ নির্বাচন সমস্যা আর অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে কোন তফাৎ করেন না। তাঁহাদের মতে যেখানেই নির্বাচনের কথা উঠে, সেইখানেই অর্থনৈতিক সমস্যা আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিলে অর্থশাস্ত্রের এলাকা অত্যন্ত ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের সমস্ত কাজেই নির্বাচন সমস্যা কোন না কোন ভাবে জড়িত আছে। আমি পশ্চিম দিকে না যাইয়া পূর্বদিকে গেলাম। জ্ঞাতসারে হোক আর অজ্ঞাতসারে হোক আমি পূর্বদিক নির্বাচন করিয়া বসিয়াছি। তাহা হইলে মানুষের যাবতীয় কাজ অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হইতে পারে।

অর্থশাস্ত্রের এই অতিব্যাপক সংজ্ঞা অনেকে গ্রহণ করেন না। ইহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তর্ক করা চলে। যাঁহারা এই সংজ্ঞার পক্ষপাতী তাঁহারাও কিন্তু কার্যতঃ যাবতীয় নির্বাচনমূলক কাজের আলোচনা করেন না। বাজারের মাধ্যমে যে নির্বাচনমূলক কাজগুলি ঘটে, আমরা সাধারণতঃ সেইগুলিই আলোচনা করি।

বিনিময়ের মধ্য দিয়া যে নির্বাচন সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে তাহাই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু।

এই কাজগুলি নিয়মিতভাবে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং বিনিময়ে পরিণতি লাভ করে। নিয়মিতভাবে ঘটে বলিয়া এগুলি শৃঙ্খলার সঙ্গে আলোচনা করা যায়। যে কাজ মাপা যায় না, সে কাজের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ চলে না। বাজারের মারফৎ যে বিনিময় হয় তাহা অর্থের মাধ্যমে হয়। সুতরাং তাহার পরিমাপ সহজেই করা যায়। ফলে শৃঙ্খলাবদ্ধ আলোচনাও সহজেই করা যায়। অর্থ বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম। বিজাতীয় কাজের তুলনা ও পরিমাপের জন্য সাধারণ মাপকাঠি চাই। অর্থ হইল এই সাধারণ মাপকাঠি। সেইজন্য যে নির্বাচনমূলক কাজগুলি অর্থের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে সেইগুলিই আমরা অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করি। ব্যাপক অর্থে অপ্রাচুর্য ও নির্বাচন হইল অর্থনৈতিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত সংজ্ঞা এত ব্যাপক নয়—এখানে অপ্রাচুর্য, নির্বাচন ও বিনিময় এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপরই জোর দেওয়া হয়।

অর্থশাস্ত্র কোন্ অর্থে সমাজবিজ্ঞান:

স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রায় বিনিময়ের স্থান নাই। অভাবপূরণের জন্য যখন একে অপরের মুখাপেক্ষী হয়, তখনই বিনিময়ের প্রশ্ন উঠে। একা একা বিনিময় হয় না। বিনিময় হওয়া মানেই সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লওয়া। সে দিক দিয়া অর্থশাস্ত্রকে সামাজিক বিজ্ঞান বলিতে হয়। অর্থশাস্ত্র সমাজবদ্ধ মানুষের অভাবপূরণের সমস্যা আলোচনা করে। সমাজের বাহিরে যে মানুষ একাকী বাস করে তাহার যে অর্থনৈতিক সমস্যা নাই তাহা নহে। রবিনসন ক্রুশো একাকী নির্জন দ্বীপে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার অভাবও নিশ্চয় অসীম ছিল এবং অন্য উপাদানের পরিমাণ যাহাই হউক, সময় অন্ততঃ অফুরন্ত ছিল না। একই সময়ে বাগান করা ও মাছ ধরা সম্ভব ছিল না। সুতরাং নির্বাচনের সমস্যা ছিল। এমন কি বিনিময়ও অঙ্কুর অবস্থায় ছিল। মাছ না ধরিয়া বাগান করাকে বাগানের সঙ্গে মাছের বিনিময় হিসাবে বর্ণনা করা যায়। রবিনসন ক্রুশোর অর্থনৈতিক সমস্যা হয়ত ছিল। কিন্তু এই সমস্যার আলোচনায় অপরের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। আমরা সমাজে বাস করি। সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনা আমাদের নিকট অধিকতর ফলপ্রসূ।

আমরা সমাজের দৃষ্টি কোণ হইতে অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনা করি। ব্যবসায়ী তার নিজস্ব লাভ লইয়া ব্যস্ত। তার ব্যবসার সঙ্গে অন্য ব্যবসা কি ভাবে জড়িত, সমগ্র অর্থ ব্যবস্থায় তার ব্যবসার স্থান কোথায়, তার লাভের সঙ্গে শ্রমিকের মজুরী বা কর্ম সংস্থানের সম্বন্ধ—এই জাতীয় প্রশ্ন লইয়া সে ভাবে না। অর্থশাস্ত্রে কিন্তু এই জাতীয় প্রশ্নের গুরুত্ব সমধিক। অর্থশাস্ত্রবিদ্ আর ব্যবসায়ী বা হিসাবপরীক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। অর্থশাস্ত্রবিদ্ সামাজিক লাভ-লোকসানের খতিয়ান করেন। ব্যবসায়ী বা হিসাবপরীক্ষক বিশেষ একটি কারবারের লাভ লোকসান হিসাব করেন।

অর্থশাস্ত্রবিদ্ ও ব্যবসায়ী বা হিসাব-পরীক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়

সীমাহীন অভাব অপ্রচুর উপাদানের সাহায্যে মিটাইতে গেলে দেখা দেয় নির্বাচন সমস্যা। এই নির্বাচন সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে বাজার ও বিনিময়ের মাধ্যমে। ইহারই নাম অর্থনৈতিক সমস্যা। সমাজবদ্ধ মানুষের এই অর্থনৈতিক সমস্যাই **অর্থশাস্ত্র** (Economics) আলোচনা করে।

অর্থব্যবস্থা ও তাহার কার্যাবলি (Economic system and its functions)

আমাদের অভাব বহুমুখী। এই অভাব পূরণ করিতে বহুবিধ সামগ্রীর প্রয়োজন। আমাদের কেহই এই সমস্ত দ্রব্য স্বয়ং তৈয়ার করি না। আমরা

প্রত্যেকে অর্থ উপার্জ্জন করিতে ব্যস্ত। পকেটে অর্থ থাকিলে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইবার কোন কারণ নাই। অভাবপূরণ করিতে যে সমস্ত সামগ্রী লাগে সেগুলি পাওয়া যাইবে না—একথা কোন সময় আমাদের মনে হয় না। আমরা জানি অর্থ থাকিলে অর্থের বিনিময়ে এই সমস্ত সামগ্রী বাজার হইতে ক্রয় করা যাইবে। যদি আমাদের একজনের কাজের সঙ্গে অপরের কাজের কোনও সম্বন্ধ না থাকিত, তবে এ রকমটি হইতে পারিত না। অভাব ও অভাব পূরণের জন্য দ্রব্যের উৎপাদন—এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানই হইল অর্থব্যবস্থার কাজ।

দ্রব্য দিয়া অভাবপূরণ হয়। অভাব অনন্ত। দ্রব্য সংগঠক মৌলিক উপাদান-গুলি অপ্রচুর। সমস্ত অভাব একই সঙ্গে যথেচ্ছ মিটাইবার উপায় নাই। সুতরাং সমস্যা দেখা দেয় কোন্ কোন্ দ্রব্য তৈয়ার হইবে ; কি পরিমাণে তৈয়ার হইবে।

দ্রব্য তৈয়ার হয় বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে। একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ উপাদানগুলির অনুপাত পরিবর্তনীয়। একটি উপাদান বাড়াইয়া, আরেকটি উপাদান কমান যায়। উপাদানগুলির অনুপাত পরিবর্তন করিয়া উপাদানের খরচ বাঁচান যায় কিনা দেখিতে হইবে। উপাদানগুলি অপ্রচুর। একদিকে খরচ বাঁচিলে, অন্য দ্রব্য বেশী উৎপাদন করা চলিবে। সুতরাং দ্রব্য কি প্রণালীতে উৎপাদন করা হইবে, সেই সমস্যার সমাধান চাই।

অপ্রাচুর্য নিবন্ধন বণ্টনের সমস্যাও দেখা দেয়। কে কতটা পাইল তাহার উপর নির্ভর করিবে সে অভাব কতটা পূরণ করিতে পারিবে। একজন বেশী পাইলে, আরেকজন কম পাইবে। প্রত্যেকে নিজের নিজের অংশ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। বণ্টনের সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক জীবনের সংঘর্ষ ঘটে। ধর্ম্মঘট, হরতাল, সভা, শোভাযাত্রা, বাজারের দর কষাকষি—এ সমস্তই এই সংঘর্ষের বহিঃপ্রকাশ।

আবার শুধু বর্তমানের কথা ভাবিলেই চলিবে না, ভবিষ্যতের কথাও ভাবা দরকার। উপাদান অপ্রচুর। বর্তমানের অভাব যত বেশী করিয়া মিটান হইবে, ভবিষ্যতের অভাব মিটাইবার ক্ষমতা তত কমিবে। ভবিষ্যতের ব্যবস্থা ভাল করিয়া করিতে গেলে বর্তমান ভোগ কমাইতে হইবে। অপ্রচুর উপাদানগুলির কতখানি বর্ত্তমান ভোগের জন্য ব্যবহার করা হইবে আর কতটা ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করা হইবে—ইহাও অন্যতম সমস্যা। আর্থিক অবস্থার উন্নতি আমরা চাই। উন্নয়ন কি হারে হইবে তাহা স্থির করা দরকার।

অপ্রাচুর্যের ফলে এই সব সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যাগুলি সার্বজনীন ও সমাজ ব্যবস্থা নিরপেক্ষ। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ও ধনতান্ত্রিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—

উভয় দেশেই অপ্রাচুর্যের সমস্যা বর্তমান। এই সমস্যার সমাধান দেশ ও কালভেদে নানা ভাবে করার চেষ্টা হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন অর্থ-ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে এই সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করে।

এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আমরা প্রথার উপর নির্ভর করিতে পারি, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে ভাবে এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, আমরা হুবহু তাহার নকল করিয়া যাইব। এই ধরণের অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তনের কোন স্থান নাই। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সাহায্যেও আমরা সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারি। রাষ্ট্রই এক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে, কিরূপে তৈয়ার হইবে, কিরূপে ইহার বণ্টন হইবে, ভবিষ্যৎ উন্নয়নের হার কি হইবে সমস্ত কিছু ঠিক করিয়া দিবে। আবার বাজারের মারফৎও এই প্রশ্নগুলির সমাধান করা যাইতে পারে। এখানে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এককভাবে ঠিক করিয়া দেয় না কি কি দ্রব্য হইবে ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ এখানে নাই। তাই বলিয়া কোন সংগঠন নাই বলা চলে না।

প্রথা, পরিকল্পনা ও বাজার

কোন দেশে কোন কালে অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ও পুরাপুরি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ছিল না। শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার ব্যবস্থা ও বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা—এগুলি আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটায়। এই সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বরাবর উপস্থিত আছে। মাদকদ্রব্য যে কেহ প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে পারে না। আজকাল উৎপাদককে বহু প্রকার লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র লইতে হয়। সরকার এই অনুমতিপত্র মারফৎ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং অনেক ক্ষেত্রে চালু থাকে। এখানে নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। অনেক শিল্প রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপাদন, বণ্টন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমস্ত ব্যাপারেই সরকারী নিয়ন্ত্রণ পরিস্ফুট। পরিকল্পনা এক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এই দেশেও অর্থ ও বাজার নূতন করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। ভোগকারীর ব্যক্তিগত নির্বাচনের অধিকার কিছু পরিমাণে স্বীকার করা হইয়াছে। আবার প্রথার দাসত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। মানুষ অভ্যাসের দাস। সংস্কার রক্ষণশীল—মরিয়াও মরে না। কার্যতঃ যে কোনও অর্থব্যবস্থাই মিশ্র অর্থব্যবস্থা—প্রথা, বাজার ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সকলের প্রভাবই বর্তমান। যে অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রাধান্য দেখা যায় তাহাকে **পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা** বলা যায়, যেমন—সোভিয়েট রাশিয়ায়। যেখানে ভোগকারীর প্রাধান্য স্বীকৃত—তাহাকে **অ-পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা**

বলা যায়—যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। যেখানে নিয়ন্ত্রণ ও বাজার উভয়ের দাবী প্রায় সমানভাবে স্বীকার করা হয় তাহাকে **মিশ্র অর্থব্যবস্থা** বলা যায়—যেমন ভারতে।

॥ আদর্শ প্রশ্ন ॥

1. Economics studies the role played by money in human affairs.—Discuss.

'অর্থকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের যে কার্য্যাবলি তাহাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়'। এ সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

সঙ্কেত ঃ—আপাতদৃষ্টিতে অর্থই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু মনে হয়। আমরা প্রত্যেকেই জীবনের অধিকাংশ সময় অর্থ অর্জন করিতে নতুবা অর্থ ব্যয় করিতে ব্যস্ত।

(১) অর্থ সাক্ষাৎভাবে আমাদের অভাব মিটাইতে পারে না। তবুও অর্থ আমরা চাই, কেননা আমরা জানি অর্থের বিনিময়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমরা ক্রয় করিতে পারিব। বিনিময়ের দরকার না থাকিলে অর্থেরও দরকার নাই। অর্থ ব্যতীত বিনিময়ের পরিধি বাড়িতে পারে না। তামাক উৎপাদনকারীর সহিত ধান উৎপাদনকারীর বিনিময় অর্থের অভাবে নাও হইতে পারে। ধান উৎপাদনকারী যদি ধূমপান না করে, তবে সে ধানের পরিবর্তে তামাক লইতে স্বীকার করিবে না। অর্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে এই অসুবিধা থাকে না। তামাক উৎপাদনকারী তামাক বিক্রয় করিয়া অর্থ পায়। এই অর্থের সাহায্যে সে ধান কেনে। ধান উৎপাদনকারী অর্থের বিনিময়ে ধান বিক্রয় করে। কেন না সে জানে অর্থের বিনিময়ে সে তার দরকারী দ্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে। অর্থ হইল সাধারণের গ্রহণযোগ্য বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে বিনিময় ও বাজারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

(২) চাহিবামাত্রই যদি অর্থ পাওয়া যাইত, তবে আর অর্থের কদর থাকিত না। ধান উৎপাদনকারী তখন ধানের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। সাধারণের গ্রহণযোগ্যতা হারাইয়া ফেলিলে অর্থ আর অর্থ থাকিবে না। অপ্রাচুর্য্য না থাকিলে অর্থের 'অর্থত্ব' নষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থের সহিত যে দ্রব্যাদির বিনিময় হয়, সেইসব দ্রব্যেরও অপ্রাচুর্য থাকা দরকার। যে দ্রব্য অপ্রচুর নয় অর্থাৎ যে দ্রব্য অফুরন্ত—যেমন বাতাস—তাহার বিনিময়ে কেহ অর্থ দিতে রাজী হইবে না। বাতাস চাহিলেই পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা পাইবার জন্য অর্থব্যয় করার দরকার নাই। অপ্রাচুর্যের ফলে ব্যয়সংক্ষেপের সমস্যা দেখা দেয়। অর্থ দিয়া অনেক কিছু ক্রয় করা যায়। কিন্তু সব একসাথে ক্রয় করা যায় না। সুতরাং বুঝিয়া শুনিয়া খরচ করার কথা উঠে। অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা করা মানেই অপ্রাচুর্যঘটিত সমস্যার আলোচনা করা। ব্যক্তির জীবনের মত সমাজের জীবনেও অপ্রাচুর্যের সমস্যা আছে।

(৩) অর্থের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ব্যাপক গ্রহণ-যোগ্যতা। অর্থের সাহায্যে বাজারের যে কোনও জিনিষ কেনা যায়। কিনিতে হইলে অবশ্য জিনিষের বাজার দাম দিতে হইবে। কাহারও হাতে অঢেল অর্থ নাই। ফলে নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয়। ১০ টাকা লইয়া বাজারে গেলে বাজারের যে কোনও জিনিষ ১০ টাকার পরিমাণে কেনা যায়। বাজারে মাছ, মাংস, দই ইত্যাদি বহু দ্রব্য আছে। সুতরাং আমার সামনে নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয়—কোন্‌টি কিনিব, কোন্‌টি কিনিব না, কোন্‌টি কতখানি কিনিব ইত্যাদি।

তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, অর্থের আলোচনা করা মানে আসলে বিনিময়, অপ্রাচুর্য্য ও নির্ব্বাচন সমস্যার আলোচনা করা।

2. Economics deals with man in the ordinary business of life.—Discuss.

'মানুষ সাধারণতঃ যে কাজগুলি লইয়া ব্যস্ত থাকে অর্থশাস্ত্রে সে কাজগুলির আলোচনা হয়।' উপরের বিবৃতিটি ব্যাখ্যা কর।

সঙ্কেত ঃ—জীবিকা অর্জ্জনের ধান্ধায় দিনের অনেকটা সময় কাটিয়া যায়। বাকী সময়ের খানিকটা আবার অর্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতে কাটে। দিনের অধিকাংশ সময় আমরা অর্থ অর্জন বা অর্থ ব্যয় করিতে ব্যাপৃত থাকি।......

3. What is an Economic System? What are its functions?

অর্থ-ব্যবস্থা কি? ইহার কাজ কি? [পৃষ্ঠা ৫-৮ দ্রষ্টব্য]

দ্বিতীয় অধ্যায়

মৌলিক পদ ও ধারণা

(Fundamental terms and Concepts)

অন্যান্য শাস্ত্রের মত অর্থশাস্ত্রেও কতকগুলি মৌলিক পদ ও ধারণার ব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ এইগুলিই হইল অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের হাতিয়ার। সাধারণ ভাষাতেও এই পদগুলির ব্যবহার হয়। অর্থশাস্ত্রে এই পদগুলিকে একটু বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইহাদের অর্থ পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন হওয়া দরকার। নতুবা অহেতুক মতবিরোধের আশঙ্কা থাকিবে।

মৌলিক ধারণা পরিষ্কার না হইলে নিরর্থক মতভেদ ঘটিবে

অভাব (Wants) ঃ অর্থশাস্ত্রে আমরা অভাবপূরণের একটা বিশেষ দিক আলোচনা করি ; সুতরাং অভাব বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা জানা দরকার। অভাব (wants) এবং প্রয়োজন (needs) এক কথা নয়। অভাব ব্যক্তির অনুভূতির উপর নির্ভর করে। প্রয়োজন কিন্তু ব্যক্তির অনুভূতি নিরপেক্ষ। কোন্ ব্যাপারে কি প্রয়োজন তাহা বলিতে পারেন সেই ব্যাপারে অভিজ্ঞতা যাঁহার আছে একমাত্র তিনি (expert)। কিন্তু যে কোনও ব্যাপারে আমার অভাব কি বলিবার মালিক একমাত্র আমি। রোগীর প্রয়োজন দুধসাগু কি দুধবার্লি তাহা স্থির করিবেন চিকিৎসক। কিন্তু রোগী যদি

অভাব, প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা

দুধবার্লি না চায়, তবে ইহা তাহার অভাব বলিয়া গণ্য হইবে না। আবার সাধারণ-ভাবে আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই অভাব আছে বলা যায় না। কোন কিছু না থাকায় সন্তোষ লাভ হইতেছে না—সন্তোষ লাভের জন্য তাহা পাইবার প্রয়াস করিতে হইবে—এইরূপ অনুভূতিকেই অভাব বলে।

দ্রব্য (Goods): অভাবের যে সংজ্ঞা আমরা দিয়াছি তাহা হইতে দ্রব্যের কথা আসে। যাহা কিছু আমাদের অভাব মিটায় বলিয়া আমরা মনে করি তাহাকেই দ্রব্য বলে।

১। বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা

দ্রব্য বস্তুগত (material) হইতে পারে, যেমন ঘরবাড়ী, খেতখামার ইত্যাদি। আবার অ-বস্তুগত (non-material) দ্রব্যও আছে, যেমন শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য, শ্রমিকের কর্ম্মকৌশল ইত্যাদি। শিক্ষক শিক্ষাদান করেন, গায়ক গান করেন—এই ধরণের কাজকে অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় সেবা (services) বলে। বস্তুগত দ্রব্য হইতেও শেষ বিশ্লেষণে আমরা সেবাই পাই।

২। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ

বস্তুগত দ্রব্য সমস্তই বাহ্যিক (external)। অ-বস্তুগত দ্রব্যের মধ্যে ব্যবসার সুনাম (goodwill) বাহ্যিক। অন্যান্য অ-বস্তুগত দ্রব্য আভ্যন্তরীণ (internal)।

৩। হস্তান্তরযোগ্য ও অ-হস্তান্তর যোগ্য

অনেক দ্রব্যের মালিকানা হস্তান্তর করা যায় (transferable)। আবার অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের মালিকানা হস্তান্তর করা যায় না (non-transferable)। বাহ্যিক দ্রব্য হস্তান্তর-যোগ্য। আভ্যন্তরীণ দ্রব্য অ-হস্তান্তরযোগ্য।

৪। একবার ব্যবহার্য বহুবার ব্যবহার্য দ্রব্য

কোন দ্রব্য একবার মাত্র (single-use) অভাবপূরণ করিতে পারে—যেমন খাদ্য-দ্রব্য। একবার খাইলেই ফুরাইয়া যায়। খাদ্য হিসাবে আর অস্তিত্ব থাকে না। আবার অনেক দ্রব্য বহুবার ব্যবহারেও (durable use) অভাব পূরণের ক্ষমতা হারায় না, যেমন—পোষাক-পরিচ্ছদ। বহুবার ব্যবহার্য্য দ্রব্যের চরম নমুনা হইল—জমি; অনেক পুরুষ ধরিয়া ইহা অভাব মিটাইতে পারে। স্থায়ী (durable) দ্রব্য হইলেই যে তাহা বহুবার ব্যবহার হইবে তাহা নহে। কয়লা স্থায়ী দ্রব্য—বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহা অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু যে কয়লা একবার জ্বালান হয়, তাহা একেবারেই নিঃশেষ হইয়া যায়—কয়লা হিসাবে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না।

পোষাক-পরিচ্ছদ সরাসরি আমাদের অভাব মিটায়। কিন্তু এগুলি তৈয়ার করিতে হইলে থানকাপড়, সুতা, দর্জ্জির শ্রম ইত্যাদি দরকার। আবার থানকাপড়

তৈয়ার করিতে গেলে তুলা, যন্ত্রপাতি ও নানা রকমের শ্রমের দরকার। আমাদের পোষাকের অভাব মিটাইতে গেলে তুলা, থানকাপড়, শ্রম সবই দরকার। ইহাদের মধ্যে কোনও দ্রব্য সরাসরি আমাদের অভাব মিটায়, যেমন—পোষাক। আবার কোনও দ্রব্য আমাদের অভাব পরোক্ষভাবে মিটায়, যেমন—কাপড় ও তুলা। শেষোক্ত দুইটির মধ্যে আবার তুলা অধিকতর পরোক্ষভাবে অভাব পূরণ করে। শেষ ভোগকারীর সহিত দ্রব্যের নৈকট্যের ভিত্তিতে দ্রব্যসম্ভারের শ্রেণীবিন্যাস করা যাইতে পারে। যে দ্রব্য শেষ ভোগকারীর সবচেয়ে নিকটে আছে অর্থাৎ তাহার অভাব সরাসরি মিটায় তাহাকে **প্রত্যক্ষ দ্রব্য** বা **ভোগ্যদ্রব্য** (direct goods or consumer goods) বলা হয়। দ্রব্যসম্ভার ধাপে ধাপে সাজান আছে এইরূপ কল্পনা আমরা করিতে পারি। প্রত্যক্ষ দ্রব্য বাদে অন্যান্য দ্রব্য কোনটা একধাপ, কোনটা দুইধাপ, কোনটা আরও বেশী ধাপ দূরে। এই জাতীয় দ্রব্যকে **পরোক্ষ** বা **মূলধন দ্রব্য** বলে (indirect or capital goods)। এক পর্যায় হইতে দ্রব্যকে তাহার পরবর্তী পর্যায়ে আনিতে হইবে। তবে শেষ পর্য্যন্ত সরাসরি অভাব মিটাইতে পারিবে। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থায় সমস্ত পর্য্যায়েই দ্রব্য থাকা দরকার। দ্রব্যকে এক পর্যায় হইতে তাহার পরবর্তী পর্য্যায়ে পরিণত করার মত কুশলতা ও শ্রম থাকা দরকার। নতুবা অভাব ভালভাবে মিটিবে না।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্রব্য

অভাবের সঙ্গে পরিমাণগত সম্বন্ধের ভিত্তিতে দ্রব্যকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। চাহিদার তুলনায় যে দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়—এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে একজন যথেচ্ছ পাওয়ার ফলে অপরের পাইবার কোনও বাধা জন্মায় না—ফলে ইহার জন্য কেহ মূল্য দিতে রাজী হয় না—এই জাতীয় দ্রব্যকে **অবাধ লভ্য** (free) **দ্রব্য** বলে। আলো, হাওয়া, নদীর জল ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে। আর যে সকল দ্রব্য চাহিদার তুলনায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না—একজন বেশী পাইলে অপরের ভাগে কম পড়ে অথবা তাহারই অংশে অন্য জিনিষ কম পড়ে—সুতরাং যার জন্য লোকে মূল্য দিতে স্বীকৃত হয়—এই জাতীয় দ্রব্যকে **অর্থনৈতিক দ্রব্য** বলে। কোনও দ্রব্য অবাধলভ্য বা অর্থনৈতিক—কোন্ পদবাচ্য হইবে ইহা তাহার দ্রব্যের অন্তর্নিহিত গুণের উপর নির্ভর করে না। একই দ্রব্য ক্ষেত্রবিশেষে অবাধলভ্য আবার অন্য ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মাছ আমাদের নিকট অর্থনৈতিক দ্রব্য। কিন্তু নিরামিষাশীর দেশে ইহা অবাধলভ্য দ্রব্য। অবাধলভ্য

৬। অবাধলভ্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্য

দ্রব্য লইয়া অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় না। অর্থনৈতিক দ্রব্যের ভোগ, উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন সমস্তই সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্ত সমস্যাই আমাদের আলোচ্য বস্তু।

উপযোগ (Utility): অভাব দূর করিবার ক্ষমতাকে উপযোগ বলে। উপযোগ সম্পন্ন দ্রব্য যে উপকারীও (useful) হইবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। অভাব দূর করিতে পারিলেই হইল। অভাব ভাল কি মন্দ তাহা যেমন আমাদের বিচার্য নহে, সেইরূপ দ্রব্যটি আমাদের কোনও প্রয়োজন সাধন করে কিনা তাহা আমাদের দেখিবার দরকার নাই। আমি যে অভাববোধ করি, যাহা তৃপ্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হই, তাহা অপরের এবং যোগ্যতর ব্যক্তির বিবেচনায় অনিষ্টকর বিবেচিত হইতে পারে—যেমন মাদকদ্রব্যাদি। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি আমি উহার জন্য অভাববোধ করি, তবে অর্থশাস্ত্রের পরিভাষায় আমার নিকট উহার উপযোগ আছে স্বীকার করিতে হইবে। উপযোগ সম্বন্ধে যখন আমরা আলোচনা করি নীতির ব্যাপারে আমরা কোন রায় দেই না। নীতিগত প্রশ্নের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু নীতির ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত। কিন্তু অভাববোধের ব্যাপারে ব্যক্তিই শেষ কথা বলার মালিক। সেইজন্যই উপযোগকে নীতি নিরপেক্ষ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। নৈতিক সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য অন্য শাস্ত্র আছে। ইহা অর্থশাস্ত্রের এলাকার বাহিরে। শুধু তাই নয়। কোন দ্রব্য কিনিয়া অনেক সময় মনে করি আমি ঠকিয়া গিয়াছি। অর্থাৎ যে অভাব মিটিবে বলিয়া মনে করিয়াছিলাম অথবা অভাব যে পরিমাণে মিটিবে মনে করিয়াছিলাম কার্যতঃ তাহা হয় নাই। এক্ষেত্রে দ্রব্যটি পাইবার পূর্বে অভাববোধ যতটা দূর হইবে মনে করিয়াছিলাম দ্রব্যটির উপযোগ তাহাই ধরিতে হইবে।

নীতি নিরপেক্ষ

প্রত্যাশিত অভাবপূরণ

দ্রব্যের কোন পদার্থগত বা রাসায়নিক অন্তঃর্নিহিত গুণের জোরেই দ্রব্য আমাদের অভাবের তৃপ্তি ঘটাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু অন্তর্নিহিত গুণ থাকিলেই উপযোগের সৃষ্টি হয় না। যদি তাহা হইত তবে একটি দ্রব্যের একজনের নিকট উপযোগ আছে আর অপরজনের নিকট উপযোগ নাই এমনটি হইতে পারিত না। ধূমপায়ীর নিকট তামাকের উপযোগ আছে। কিন্তু যে ধূমপান করে না তাহার নিকট তামাকের উপযোগ নাই। অর্থাৎ উপযোগ একটি আপেক্ষিক (relative) ধারণা। দ্রব্য এবং তাহার ব্যবহারকারীর মধ্যে যদি এরূপ সম্বন্ধ থাকে যাহার ফলে ব্যবহারকারী মনে করে দ্রব্যটি তাহার কোনও অভাব মিটাইবে—তাহা

হইলে উক্ত ব্যবহারকারীর নিকট দ্রব্যটির উপযোগ আছে স্বীকার করিতে হইবে। উপযোগসম্পন্ন হইলে তাহাকে দ্রব্য বলে।

উপযোগের উৎস ও প্রকারভেদ (Sources and kinds of utility)

(১) স্বাভাবিক উপযোগ—আমাদের অনেক অভাব প্রকৃতি সরাসরিভাবে মিটায়। সূর্যের আলোক ও উত্তাপ, পাহাড় পর্বতের সৌন্দর্য অস্তগামী সূর্যের মাধুরী—এখানে প্রকৃতি যাহা যে অবস্থায় দান করিতেছে, তাহার উপর মানুষের আর কিছু করিবার নাই। আমরা সোজাসুজি আমাদের অভাব মিটাইতে পারি।

প্রাকৃতিক উৎস

(২) সেবাগত উপযোগ—অনেক ক্ষেত্রে মানুষের কাজ দ্রব্যের আকার ধারণ না করিয়াও সেই কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাবপূরণ করে। অভিনেতার অভিনয়, শিক্ষকের শিক্ষাদান ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে।

মানবিক উৎস

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখি শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষ ও প্রকৃতি মিলিয়া উপযোগের সৃষ্টি করে। প্রকৃতি তার দান যে রূপে, যে স্থানে, যে সময়ে দেয়—আমাদের অভাবপূরণের পক্ষে সেই রূপ, স্থান বা সময় উপযুক্ত থাকে না মানুষ তার শ্রমের দ্বারা সেই রূপ, স্থান বা সময়ের পরিবর্তন ঘটাইয়া অধিকতর উপযোগের সৃষ্টি করে।

(৩) রূপগত উপযোগ—আমাদের আসবাবপত্রের সখ আছে। আসবাব তৈয়ার হয় কাঠ হইতে। প্রকৃতি কাঠ যে অবস্থায় দেয়, সেই কাঠের অনেক রকম রূপান্তর ঘটাইয়া তাহা হইতে আসবাব তৈয়ার করা হয়।

(৪) স্থানগত উপযোগ—খনি অঞ্চলে কয়লার অপ্রাচুর্য কলিকাতা হইতে অনেক কম। উনানের আগুন সেখানে অনেকেই সব সময় জ্বালাইয়া রাখে। খনি অঞ্চল হইতে কলিকাতায় চালান দিলে নিশ্চয় উপযোগ বৃদ্ধি পায়। সেখানে রাস্তাঘাটে কয়লা নষ্ট হয়। এখানে রেলের পোড়া কয়লা কুড়াইয়া অনেক লোক জীবিকা অর্জন করে।

(৫) সময়গত উপযোগ—আম গ্রীষ্মকালের ফল। শীতকালে আম পাওয়া যায় না। শীতকালে অপ্রাচুর্য হেতু ইহার উপযোগ বাড়িয়া যায়। সুতরাং গ্রীষ্মকালের আম যদি সংরক্ষণ করিয়া শীতকালে যোগান দেওয়া সম্ভব হয়, তবে উপযোগ অনেকটা বাড়িয়া যাইবে। দ্রব্য যখন প্রচর পরিমাণে পাওয়া যায়, তখন তার গুরুত্ব

কম থাকে। একটু নষ্ট হইলেও কেহ খেয়াল করে না। কিন্তু যখন দ্রব্যের যোগান কম থাকে, তখন সেই একটুখানির গুরুত্বই বড় হইয়া দেখা দেয়। সেই একটুখানিরই অভাবপূরণের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। আড়তদারেরা ধান চাল যখন উঠে তখন মজুত করে এবং পরে তাহা বাজারে ছাড়ে। এইভাবে সময়ের পরিবর্তন করিয়া তাহারা অধিকতর উপযোগের সৃষ্টি করে।

ধন বা সম্পদ (Wealth)—অর্থশাস্ত্রে ধন কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। **অর্থশাস্ত্রকে ধনবিজ্ঞানও** বলা হয়। সুতরাং ধন বলিতে কি বুঝায় তাহা জানা দরকার। বস্তুগত দ্রব্য যাহা মানুষের মালিকানায় আছে বা আসিতে পারে তাহারই নাম ধন।

একটু আগেই আমরা বলিয়াছি, যাহা কিছু উপযোগ সম্পন্ন তাহাই দ্রব্য। ধন দ্রব্যের একটি বিশেষ বিভাগ। সুতরাং ধন হইতে গেলে উপযোগ থাকা চাই। এখানে আবার বলিয়া রাখা ভাল উপযোগ আর উপকারিতা এক নয়। ধন আখ্যা পাইতে হইলে উপযোগ থাকিতে হইবে। তাই বলিয়া উপকারিতা থাকিতেই হইবে তাহার কোন মানে নাই।

১। উপযোগ

উপযোগ থাকিলেই অর্থাৎ দ্রব্য হইলেই তাহা ধন হইবে একথা ঠিক নয়। অবস্তুগত দ্রব্যকে আমরা ধন বলিব না। রেসের ঘোড়ার গতিবেগ—ইহার উপযোগ আছে। আবার ইহা অপ্রচুরও বটে। তবুও ইহাকে ধন বলিব না। কারণ ইহা বস্তুগত নয়। রেসের ঘোড়াটি নিশ্চয়ই সম্পদ। কিন্তু উহার গতিবেগ, সৌন্দর্য ইত্যাদি গুণকে যদি আলাদা করিয়া সম্পদ হিবাবে গণ্য করিতে হয়—তবে একই জিনিষ বহুবার গণনা করা হইবে। ইহাতে গোলমাল বাড়িবে মাত্র। সম্পদ ও উপযোগের মধ্যে ভেদরেখা মুছিয়া যাইবে। স্বাস্থ্যই সম্পদ—এই জাতীয় কথা আমরা অনেক সময় বলি। স্বাস্থ্য এবং এই ধরণের আরও গুণ—ইহাদের উপযোগ আছে। কিন্তু বস্তুগত নহে বলিয়া আমরা ইহাদিগকে সম্পদ আখ্যা দিতে পারি না।

২। বস্তুগত

বস্তুগত দ্রব্য হইলেই ধন হইবে না। দ্রব্যটি যদি মানুষের মালিকানায় থাকে বা আসিতে পারে তবেই ধনের পর্যায়ে পড়িবে। বাতাসের উপযোগ আছে। ইহা বস্তুগতও বটে। কিন্তু ইহা এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে কেহ ইহার মালিকানা পাইবার জন্য ব্যস্ত নয়। যে যত চায় পাইতে পারে। অপ্রাচুর্য না থাকিলে মালিকানার প্রশ্ন উঠে না। আবার, সূর্য, চন্দ্র, ভারত মহাসাগর—ইহাদের প্রকৃতিই এইরূপ যে ইহাদের উপর মালিকানা বর্তাইবার প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং

৩। মালিকানা, হস্তান্তর-যোগ্যতা ও অপ্রাচুর্য্য

এগুলি ধনের পর্যায়ে পড়ে না। মালিকানা অবশ্য ব্যক্তিগত হইবে এমন কথা নাই। ব্যক্তি, যৌথ কারবার, অংশীদারী কারবার, মিউনিসিপ্যালিটি, রাষ্ট্র—যে কেহ মালিক হইতে পারে।

ধনকে বস্তুগত দ্রব্য বা অপ্রচুর হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য বলার অসুবিধা

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি মালিকানার প্রশ্ন কেবলমাত্র হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেই উঠিতে পারে। হস্তান্তরযোগ্য দ্রব্য বিক্রয়যোগ্যও বটে। আমরা আরও দেখিয়াছি, কেবলমাত্র বাহ্যিক দ্রব্যই হস্তান্তরিত হইতে পারে। আবার বস্তুগত দ্রব্য হইলে তাহা বাহ্যিকও হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে বস্তুগত ও মালিকানা এই দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে। তবুও ধনকে বস্তুগত দ্রব্য বলা যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে বস্তুগত অবাধলভ্য দ্রব্যকে ধন বলিতে হইবে। আবার ধনকে শুধু অপ্রচুর হস্তান্তর-যোগ্য দ্রব্যও বলা চলে না। সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ের সুনামকে ধন বলিতে হয়। কারণ ইহা অপ্রচুর এবং বাহ্যিক—সুতরাং বিক্রয়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য। ইহার উপযোগও আছে। কিন্তু অ-বস্তুগত বলিয়া ইহা ধন বলিয়া গণ্য হইবে না। কোন কিছু ধন কিনা তাহা জানিতে হইলে তিনটি প্রশ্ন করিতে হইবে। (১) ইহার উপযোগ আছে কি? (২) ইহা বস্তুগত কিনা? (৩) ইহার কোনও মালিক আছে কি? এই তিনটি প্রশ্নেরই যদি ইতিবাচক উত্তর হয়, তবে ইহাকে ধন বলা হইবে।

সেবা কি সম্পদ?

শিক্ষকের শিক্ষাদান, গায়কের গান—এই জাতীয় কাজকে আমরা সেবা আখ্যা দিয়াছি। ইহাদের উৎপাদন ও ভোগ যুগপৎ হয়। বস্তুগত রূপ লইবার অবকাশ এখানে নাই। সুতরাং অভাবপূরণ করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইহাদিগকে ধনের পর্যায়ে ফেলা চলিবে না।

মানুষ সম্পদ কিনা

আমরা বলিয়াছি মানুষের মালিকানা বর্তাইতে পারে না এই জাতীয় দ্রব্যকে আমরা সম্পদ বলিব না। প্রশ্ন উঠিতে পারে মানুষ স্বয়ং সম্পদ কি না। ক্রীতদাসের বেলায় কোনও গোলযোগ নাই। ক্রীতদাসের উপযোগ আছে। সে বস্তুগত, তাহার প্রভুই তাহার মালিক। সুতরাং ক্রীতদাস সম্পদ। স্বাধীন মানুষ হইতে সেবা উৎপন্ন হয়—সুতরাং তাহার উপযোগ আছে। সে বস্তুগত ও অপ্রচুরও বটে। কিন্তু বর্তমানকালে তাহার মালিকানার কথা উঠে না। প্রত্যেক মানুষকে নিজেই নিজের মালিক বলিয়া ধরিয়া লইলে মানুষকেও সম্পদ পর্যায়ভুক্ত করার পক্ষে সুপারিশ করা চলে। কিন্তু আমরা সম্পদের যে সংজ্ঞা দিয়াছি সেই হিসাবে মানুষকে সম্পদ বলা যায় না।

তাহা হইলেও সম্পদ হইতে সৃষ্ট উপযোগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের তৈয়ারী উপযোগও আমরা বরাবরই আলোচনা করিব।

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ—যে সম্পদের মালিক ব্যক্তি তাহাকে আমরা **ব্যক্তিগত সম্পদ** বলিব, যেমন—ঘরবাড়ী, খেতখামার ইত্যাদি। রাস্তাঘাট, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা—এই জাতীয় সম্পদের ক্ষেত্রে ব্যক্তির মালিক হইবার কথা উঠে না। যাদুঘর, পার্ক, রেলপথ—এই জাতীয় সম্পদের মালিক বিভিন্ন পর্যায়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। এই জাতীয় সম্পদ—যাহার মালিক কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তাহাকে **সমষ্টিগত সম্পদ** বলা হয়। রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমষ্টিগত সম্পদের পরিমাণও বাড়িতেছে।

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদ

ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত যাবতীয় সম্পদকে **জাতীয় সম্পদ** বলা হয়। জাতীয় সম্পদ হিসাব করার সময় কিছু সাবধানতা প্রয়োজন। অনেক জিনিষ ব্যক্তির তরফ হইতে সম্পদ হইলেও জাতীয় সম্পদ নহে—যেমন যৌথ কারবারের শেয়ার এবং সরকারী বা বেসরকারী ঋণপত্র। ধরা যাক কোন যৌথ কারবারের মূলধন ২০,০০০৲—আমার ইহাতে ১০৲-র শেয়ার আছে। এই শেয়ারের উপযোগ আছে—ইহা বস্তুগত—ইহার মালিক আমি, ইহা বিক্রয়যোগ্যও বটে, কেন না ইহার উপযোগ, অপ্রাচুর্য ও হস্তান্তরযোগ্যতা আছে। সুতরাং আমার দিক হইতে আমি ইহাকে সম্পদ মনে করিতে পারি। কিন্তু জাতির দিক হইতে ইহা সম্পদ নয়। জাতীয় সম্পদ হিসাব-নিকাস করিবার সময় আমাকে ও যৌথ কারবার উভয়কেই ধরা হইবে। আমার হিসাবে শেয়ারটি কোম্পানীর নিকট আমার পাওনা। কিন্তু কোম্পানীর হিসাবপত্রে ইহা আমার নিকট কোম্পানীর দেনা। এই শেয়ার দেনা বা পাওনা কিছুর মধ্যেই পড়িবে না। আমার নিকট শেয়ারটি যদি ধনাত্মক সম্পদ হয়, কোম্পানীর নিকট ইহা ঋণাত্মক সম্পদ। কিন্তু সম্পদ ঋণাত্মক হইতে পারে না। আসল ব্যাপার হইল সম্পদ ও অধিকারপত্রের মধ্যে পার্থক্য করিতে হইবে। সম্পদ হইতে আয় হয় আর অধিকারপত্র মারফৎ সেই আয়ের বণ্টন হয়। শেয়ার অধিকারপত্র মাত্র। যৌথ কারবারের যন্ত্রপাতি, মালপত্র ইত্যাদি হইল সম্পদ। এই সম্পদ হইতে যে আয় হইবে—আমার শেয়ার মারফৎ আমি সেই আয়ের $\frac{১০০}{২০০০০}$ ভাগ পাইবার অধিকারী, এবং যৌথ কারবারের সম্পদেরও $\frac{১০০}{২০০০০}$ অংশের মালিক আমি। সরকারী বা বেসরকারী ঋণপত্র সম্বন্ধেও একই যুক্তি প্রযোজ্য।

শেয়ার সম্পদ নয়, সম্পত্তির অধিকারপত্র মাত্র

টাকাকড়ির ক্ষেত্রেও আমরা একই কথা বলিতে পারি। ব্যক্তির দিক হইতে ইহাকে সম্পদ বলা হয়। বাস্তবিকপক্ষে জাতীয় আয়ের উপর কে কতটা কর্তৃত্ব খাটাইবে টাকাকড়ি তাহাই মাত্র নির্দ্ধারণ করে। যাহার নিকট যত বেশী টাকা থাকিবে জাতীয় আয়ের তত মোটা অংশ সে নিজের কবলে পাইতে পারে। আয় ও সম্পদ আমরা টাকার মাধ্যমেই প্রকাশ করি। কিন্তু তাই বলিয়া টাকাকড়ি সম্পদ নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া সরকার রাতারাতি অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিত।

টাকাকড়ি সম্পদের প্রতীক মাত্র

সম্পদ আমাদের অভাব মিটায়। জাতীয় সম্পদের যে অংশের উপর বিদেশীদের মালিকানা বর্ত্তমান, তাহা হইতে আয় হইলেও সেই আয়ের মালিক আমরা নহি—উহা আমাদের অভাব পূরণের কাজে আসিবে না। সুতরাং জাতীয় সম্পদের হিসাবনিকাশ করিবার সময় ঐ অংশ বাদ দিতে হইবে। আবার ভিন্ন দেশের জাতীয় সম্পদের যে অংশের উপর আমাদের মালিকানা আছে, তাহা আমাদের দেশের বাহিরে অবস্থিত হইলেও আমাদের অভাব পূরণ করিতে পারে। সুতরাং জাতীয় সম্পদ হিসাব করিবার সময় এইদিকে নজর দিতে হইবে।

বৈদেশিক লেনদেন

আয় : সম্পদ পর্য্যায়ভুক্ত দ্রব্যাদি হইতে মানুষের কাম্য ঘটনার উৎপত্তি হয়। ইহাকে সম্পদ হইতে উদ্ভূত সেবা বা উপকার (benefit) বলা যায়। যে কোনও দ্রব্য হইতে তাহার যথাযোগ্য সেবা পাওয়া যায়। নতুবা তাহার উপযোগ থাকিত না। তাহাকে দ্রব্যও বলা চলিত না। রৌদ্র-বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া আমরা কামনা করি। বাসগৃহ এই আকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি ঘটায়। বাসগৃহ আশ্রয়—এই সেবা আমাদের দেয়। শুধু সম্পদ হইতেই সেবার সৃষ্টি হয়, তাহা নয়। স্বাধীন মানুষও সেবার উৎস হইতে পারে। অভিনেতা অভিনয় করিয়া আমাদের আনন্দ দেয়—উকিল মক্কেলের পক্ষ সমর্থন করে—এ ক্ষেত্রে অভিনেতা ও উকিলই হইল সেবার উৎস। সম্পদ বা স্বাধীন মানুষ হইতে যে সেবা পাওয়া যায় তাহাকেই আয় বলে।

ব্যয় (Cost) : সম্পদ হইতে শুধু কাম্য ঘটনার উদ্ভব হয় না। সম্পদ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জনকও বটে। বাসগৃহ হইতে আমরা আশ্রয় পাই। কিন্তু ইহার জন্য মালিককে মেরামতের খরচ বহন করিতে হয়, কর দিতে হয়, শেষ পর্য্যন্ত ইহা অকেজো হইয়া পড়ে। ক্রীতদাস হইতে নানাবিধ সেবা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা পাইতে গেলে তাহার খাওয়া-পরার ও থাকিবার

ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বাধীন শ্রমিক হইতে সেবা পাওয়া যায় কিন্তু বিনিময়ে তাহাকে বেতন দিতে হইবে। সেবার আনুষঙ্গিক এই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলিকে ব্যয় বলা হয়।

নীট আয় (Net Income) ঃ সম্পদমাত্রের আয় ও ব্যয় আছে। আকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলির সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলিও আসিয়া যায়। বিনাশুল্কে ভোগ করিবার উপায় নাই। শেষ পর্যন্ত ব্যয় হইতে আয় সাধারণতঃ বেশী হয়। যদি না হয়, সে ধরণের দ্রব্যের মালিকানার জন্য কেহ ব্যগ্র হইবে না। তাহা শেষ পর্য্যন্ত সম্পদ থাকিবে না। মালবাহী লরী সম্পদ। মাল পৌঁছাইয়া দেওয়া—এই সেবা ইহা হইতে আমরা পাই। মাল টানার বাবদ যে ভাড়া পাওয়া যায়—লরী সেই কাম্য ঘটনার উৎস। এই সেবা হইল ইহার আয়। পেট্রল, মোবিল, গ্যারেজ, ড্রাইভার, মেরামত ইত্যাদি খাতে খরচ হইল ইহার ব্যয়। ব্যয় হইতে আয় সাধারণতঃ বেশী থাকে। নতুবা কেহ ব্যয় বহন করিতে রাজী হইত না। যত দিন যাইবে ব্যয় তত বাড়িতে থাকিবে। প্রতি লিটারে কম মাইল যাইবে, গতিবেগ কমিবে, ঘন ঘন মেরামত দরকার হইবে। শেষে যখন আয় হইতে ব্যয় বেশী হইতে থাকিবে তখন ইহা আর ব্যবহার করা হইবে না। ইহার স্থান তখন হইবে বাজে জিনিষের গাদায়। ইহাকে আর সম্পদ বলিয়া গণ্য করা হইবে না। আয় এবং ব্যয়ের পার্থক্যকে নীট আয় বলে। লরী হইতে ভাড়া বাবদ বৎসরে ধরা যাক ২৪,০০০৲ পাওয়া যায় এবং ইহার জন্য বৎসরে ব্যয় হয় ১৫,০০০৲। বাৎসরিক মোট আয় এ ক্ষেত্রে ২৪,০০০৲ এবং বাৎসরিক নীট আয় হইল ২৪,০০০ – ১৫,০০০ অথবা ৯,০০০৲। উপযোগ হইল নীট আয় বা ব্যয় হইতে অধিক আয় প্রজনন করিবার ক্ষমতা।

উপযোগের নতুন সংজ্ঞা

সম্পদ ও আয় (Wealth & Income) : সম্পদ হইল আয়ের উৎস। দ্রব্য হইতে আয় হয় বলিয়াই দ্রব্য সম্পদ আখ্যা পায়। পরিমাপ করিতে গেলে এই দুইয়ের পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে। যে কোনও নির্দিষ্ট মুহূর্তে (point of time) আমরা সম্পদের হিসাব করি। কিন্তু আয়ের বেলায় একটা সময় ব্যাপিয়া (period of time) যাবতীয় সেবার হিসাব আমরা লই। ২৪শে জুন দুপুর ১২টায় একটি আম বাগানের আয় কত, এরূপ উক্তির কোন মানে হয় না। এক বৎসর জুড়িয়া যে আমের ফসল পাই তাহাই হইল আমবাগানটির বাৎসরিক মোট আয়। সম্পদ হইল ভাণ্ডার (fund)

সম্পদ হইল একটি ভাণ্ডার, এক বিশেষ মুহূর্ত্তের ছবি। আয় হইল একটি প্রবাহ—কি হারে প্রবাহ হইতেছে তাহা বুঝাইতে সময়ের উল্লেখ দরকার

জাতীয় ধারণা। আর আয় হইল এক প্রবাহ (flow)। সম্পদ হইল একটি মুহূর্তের ছবি। আয় হইল একটি চলচ্চিত্র, এখানে গতিবেগের কথা উঠে। টালা ট্যাঙ্কে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে এত লিটার জল আছে এরকম উক্তি আমরা করিতে পারি। কিন্তু এই চৌবাচ্চা কি হারে জলশূন্য হইতেছে তাহা বুঝাইতে হইলে 'প্রতি মিনিটে বা প্রতি ঘণ্টায় এত লিটার' এইরূপ বলিতে হইবে। সেইরূপ এই মুহূর্তে আমার ৩,০০০৲ আছে, এ কথা আমি বলিতে পারি। কিন্তু আমার আয় কত প্রশ্ন করা হইলে শুধু ৩০০৲ বলিলে কোনও মানে করা যায় না। প্রতি মাসে ৩০০৲, আর প্রতি দিন ৩০০৲ এক কথা নয়। কতটা সময়ের মধ্যে ৩০০৲ পাই তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

আর্থিক ও প্রকৃত আয় (Money Income & Real Income) : সেবা বস্তুগত রূপ ধারণ করিবার অবকাশ পায় না। সেজন্য সম্পদের মধ্যে ইহাকে আমরা ধরি না। কিন্তু আয়ের মধ্যে সেবা ধরিতে হইবে। শুধু তাই নয়—বস্তুগত দ্রব্য হইতে আমরা যে সেবা পাই তাহা অবস্তুগত। কিন্তু এই সেবাই হইল আমাদের প্রকৃত আয়। কি সম্পদ কি আয় উভয়কেই আমরা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত। সম্পদ ও সেবা বহুবিধ। বিভিন্ন দ্রব্যকে একত্র করিয়া কিছু বলিতে হইলে ইহাদের প্রত্যেককে সাধারণ কিছুর মাধ্যমে প্রকাশ করা দরকার। এই সাধারণ কিছুই হইল অর্থ। কোনও ব্যক্তির সম্পদের হিসাব দিতে গেলে তাহার মালিকানায় যত বস্তুগত দ্রব্য আছে তাহার ফিরিস্তি দিতে হইবে—যথা, ১টি বাড়ী, ৫টি খাট, একটি সিন্দুক ইত্যাদি। ইহাতে মোট সম্পদ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা জন্মায় না। বিভিন্ন এককের মধ্যে সমষ্টি হারাইয়া যায়। দুইজন ব্যক্তির সম্পদের তুলনা করিতে গেলেও একই অসুবিধা দেখা দেয়। অর্থের মাধ্যমে যদি সম্পদের হিসাব করা হয়, তবে এই জাতীয় অসুবিধা দেখা দিবে না। কিন্তু এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে অর্থ প্রকৃত আয় নয়। একটা বিশেষ সময় জুড়িয়া সম্পদ ও স্বাধীন মানুষ হইতে যে সেবা আমরা পাই তাহাই হইল আমাদের প্রকৃত আয়। অনেক সময় আমাদের আর্থিক আয় বাড়িয়া যায়। কিন্তু দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় বর্দ্ধিত অর্থের বিনিময়ে হয়ত আগের চেয়ে কম দ্রব্য ক্রয় করিতে পারি। এ ক্ষেত্রে আর্থিক আয় বাড়িলেও, প্রকৃত আয় কমিয়াছে। আরও তলাইয়া দেখিতে গেলে, সম্পদ ও সেবা হইতে যে সন্তোষ লাভ করি তাহাই আমাদের প্রকৃত আয়। কিন্তু সন্তোষ মাপ করিবার কোনও যন্ত্র আবিষ্কার হয় নাই। দ্রব্য মাপিবার একক

আয় অর্থের আকারে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত আয় আর্থিক আয় হইতে স্বতন্ত্র

আছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন একক। নানা জাতীয় দ্রব্যের সম্বন্ধে সাধারণ কোনও বক্তব্য পেশ করিতে হইলে গেলে তাহাদিগকে অর্থের মাধ্যমে এক জাতীয় করা ছাড়া উপায় নাই। অর্থের মাধ্যমে আমরা নানাবিধ সম্পদ, বিভিন্ন প্রকারের আয় ও হরেক রকমের সম্পত্তির অধিকারকে একজাতীয় করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য পেশ করিতে পারি।

হস্তান্তর ও বিনিময় (Transfer & Exchange) : কোন ভদ্রলোক তাঁহার বসত-বাটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দিলেন। বাড়ীর মালিকানা উক্ত ভদ্রলোকের নিকট হইতে মিশনের নিকট হস্তান্তরিত হইল। কিন্তু ভদ্রলোক ইহার পরিবর্তে কোন কিছু বুঝিয়া পাইলেন না। এই ধরণের এক-তরফা হস্তান্তরকে দান বলে। কিন্তু মিশন যদি বাড়ীটির পরিবর্তে ২০,০০০৲ ভদ্রলোককে দেন, তবে আর ইহা দান থাকিবে না। ইহা হইবে বিনিময়। বিনিময়ে দুই তরফেই হস্তান্তর হয়। বাড়ীর মালিকানা ভদ্রলোকের নিকট হইতে মিশনের নিকট হস্তান্তরিত হইল। ইহার পরিবর্তে ২০,০০০৲ এর মালিকানা মিশনের নিকট হইতে ভদ্রলোকের নিকট হস্তান্তরিত হইল।

দো-তরফা হস্তান্তরের নাম বিনিময়

সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ বিনিময় (Direct & Indirect Exchange) : দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের সাক্ষাৎ বিনিময় আজকাল খুব কমই হয়। কোন বালক অপর বালকের লাটিমের সহিত তাহার ডাকটিকিট বিনিময় করিল। এখানে অর্থের কোনও প্রয়োজন হইল না। অথচ দু-তরফেই মালিকানা হস্তান্তর হইল। আজকাল অর্থের মারফৎ অধিকাংশ বিনিময় হয়। আমার চাল আছে। পরিবর্তে আমার চিনির দরকার। আমার চাল বিক্রয় করিয়া অর্থ পাইব। সেই অর্থ দিয়া আবার চিনি ক্রয় করিব। দ্রব্য—অর্থ—দ্রব্য এইভাবে বিনিময়ের কাজ হয়। চালের সহিত চিনির বিনিময় দরকার। সাক্ষাৎভাবে না হইয়া সেই বিনিময় পরোক্ষভাবে অর্থের মাধ্যমে হইল। বিনিময়ের ফলে অভাব পূরণের ক্ষমতা বাড়ে। নতুবা বিনিময় স্বেচ্ছায় কেহ করিত না। অপ্রচুর দ্রব্যেরই বিনিময় সম্ভব। এক হাতে তালি বাজে না—বিনিময়ে দুইপক্ষের আগ্রহ দরকার। আমি হয়ত বাতাসের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে চাই। কিন্তু এরূপ বিনিময়ে অন্য পক্ষের আগ্রহ থাকিতে পারে না। সে জানে বাতাস অফুরন্ত, চাহিবামাত্র পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার পরিবর্তে সে অন্য দ্রব্যের মালিকানা হস্তান্তর করিতে আগ্রহশীল হইবে না।

দ্রব্য—অর্থ—দ্রব্য

দাম ও মূল্য (Price & Value) : বিনিময় হইতে দাম ও মূল্যের সৃষ্টি হয়। একটি জিনিষের পরিবর্তে অপর জিনিষ যতটুকু পাওয়া যায় তাহাই হইল প্রথম

জিনিষটির মূল্য দ্বিতীয় জিনিষটির মাধ্যমে—অথবা দ্বিতীয় জিনিষটির মূল্য প্রথম জিনিষটির মাধ্যমে। ৫ ডজন ডিমের পরিবর্তে ১২ সের চিনি পাওয়া যায়। তাহা হইলে ৫ ডজন ডিমের মূল্য ১২ সের চিনি। আবার ১২ সের চিনির মূল্য ৫ ডজন ডিম।

অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত মূল্যের নাম দাম

একটি দ্রব্যের এক এককের পরিবর্তে যতটা অর্থ পাওয়া যায় তাহাই হইল দ্রব্যটির অর্থমূল্য বা দাম। ১০টি কলম ৫০৲ দিয়া কেনা হইল। একটি কলমের জন্য তাহা হইলে ৫৲ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং বলিতে পারি কলমের দাম ৫৲।

বাজারে যদি ১০টি দ্রব্য থাকে তবে তাহাদের যে কোন একটির মূল্য ৯ প্রকারে প্রকাশ করা যায়। অর্থ যদি এই ৯টির অন্যতম হয়, তবে এই ৯টি মূল্যের অন্যতম হইবে অর্থমূল্য। এই অর্থমূল্যই হইল দাম। দাম সব সময় একক হিসাবে প্রকাশ করা হয়। ১০টি কলমের দাম ৫০৲ বলা হয় না। ১০টি কলমের মূল্য ৫০৲—১টি কলমের দাম ৫৲।

আমরা আগেই বলিয়াছি, আজকাল সমস্ত দ্রব্যেরই অর্থের সহিত বিনিময় হয়। ফলে এই সব দ্রব্যের অর্থমূল্য বা দাম আমরা জানি। সেক্ষেত্রে দ্রব্যগুলির মধ্যে মূল্যের সম্বন্ধ সহজেই নির্ণয় করা যাইতে পারে। ১টি কলমের দাম ৫৲ আর ১টি পেন্সিলের দাম ২০ ন.প.। ইহা হইতে সহজেই বলা যায়, ১টি কলমের দাম হইবে ২০টি পেন্সিল।

সমস্ত মূল্য একসঙ্গে বাড়িতে বা কমিতে পারে না। ক-এর খ-মূল্য বাড়া মানেই খ-এর ক-মূল্য কমা। সমস্ত দাম কিন্তু একই সঙ্গে বাড়িতে বা কমিতে পারে। ক এবং খ উভয়ের দাম বা অর্থমূল্য একসঙ্গে বাড়িতে বা কমিতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থের মূল্য কমিবে বা বাড়িবে। ক, খ এবং অর্থ—তিনটি দ্রব্যের হিসাব লইতে হইবে। সমস্ত মূল্য একসঙ্গে বাড়ে বা কমে নাই।

বিনিময় মূল্য ও ব্যবহার মূল্য (Value-in-exchange & Value-in-use) :

অনেক সময় বিনিময় মূল্যের সঙ্গে ব্যবহার মূল্যের তফাৎ করা হয়। দ্রব্যের মোট উপযোগের নামই ব্যবহার মূল্য। ব্যবহার মূল্য না থাকিলে বিনিময় মূল্য থাকিতে পারে না। যাহার উপযোগ নাই, তাহার সহিত কেহ কিছু বিনিময় করিবে না। তাই বলিয়া ব্যবহার মূল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়মূল্যও যে বাড়িবে এমন কোন কথা নাই। বিনিময়মূল্য থাকিতে গেলে শুধু ব্যবহারমূল্য থাকিলেই চলিবে না। দ্রব্যটিকে অপ্রচুর ও হস্তান্তরযোগ্য হইতে হইবে। সোনার চেয়ে জলের মোট উপযোগ অর্থাৎ

ব্যবহার মূল্য মোট উপযোগের উপর নির্ভর করে। বিনিময় মূল্য থাকিতে হইলে ব্যবহার মূল্য থাকিলেই চলিবে না—অপ্রাচুর্য ও হস্তান্তরযোগ্যতাও দরকার।

ব্যবহারমূল্য অনেক বেশী। তবুও সোনার বিনিময়মূল্য আছে—জলের নাই। কারণ জল প্রচুর পাওয়া যায়। সুতরাং ইহার বিনিময়ে কেহ কিছু দিতে রাজী হয় না। সোনা অপ্রচুর ও হস্তান্তরযোগ্য। সেইজন্য ইহার বিনিময়ে কিছু না পাইলে সোনার মালিকানা কেহ হস্তান্তর করিতে চাহিবে না। পরে আমরা দেখিব ব্যবহারমূল্য নির্ভর করে মোট উপযোগের উপর। আর বিনিময়মূল্য নির্ভর করে প্রান্তিক উপযোগের উপর।

উৎপাদন (Production) : সাধারণ ভাষায় বস্তুগত দ্রব্য যাহারা তৈয়ার করে তাহাদিগকে উৎপাদক বলি। ছুতারমিস্ত্রি চেয়ার তৈয়ার করে। চেয়ার কাঠ হইতে তৈয়ার হয়। এই কাঠ প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু প্রকৃতি যে অবস্থায় ইহা দেয়—অর্থাৎ জঙ্গলের কাঠ জঙ্গলে পড়িয়া থাকিলে—আমাদের আর চেয়ারে বসা হইবে না। কাঠুরে কাঠ কাটিবে—গাড়োয়ান ষ্টেশনে আনিবে—রেলগাড়ী বা জলপথে কলিকাতায় আসিবে—করাতকলে চেরাই হইয়া তক্তা হইবে—এই তক্তা কাঠের উপর সূত্রধর তাহার শ্রম নিয়োগ করিবে—তবে চেয়ার হইবে। প্রকৃতিদত্ত বস্তুনিচয় খুব কম ক্ষেত্রেই সরাসরিভাবে আমাদের অভাব মোচন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জঙ্গলের কাঠের মত—প্রাকৃতিক সম্পদকে বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের শ্রমের সাহায্যে রূপান্তরিত করিয়া আমাদের অভাবপূরণের ব্যাপারে উত্তরোত্তর উপযোগী করিয়া তুলিতে হয়। স্থূল পদার্থ আমরা সৃষ্টি বা বিনাশ কোনটাই করিতে পারি না; আমরা শুধু ইহার রূপান্তর ঘটাইতে পারি। এই যে ধাপে ধাপে শ্রমের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর ঘটাইয়া তাহাকে ধীরে ধীরে অভাবপূরণের উপযোগী করা ও শেষ পর্যন্ত ভোগ্য দ্রব্যে পরিণত করা—ইহারই নাম উৎপাদন। প্রত্যেক ধাপে যাহারা শ্রমদান করিয়াছে—তাহাদের সকলকেই উৎপাদনশীল বলিতে হইবে। কাহাকেও বাদ দিলে চলিবে না। একজনের কাজ যেখানে শেষ হইতেছে পরের ধাপের কাজ সেখান হইতে সুরু হইতেছে। কাঠুরে কাঠ কাটিলে তবে গাড়োয়ান তাহা বহিয়া লইয়া যাইবে। উৎপাদন মানে পদার্থের উৎপাদন নহে, ইহা আমাদের সাধ্যের বাইরে; উৎপাদন মানে হইল অধিকতর উপযোগের উৎপাদন।

উৎপাদনের অর্থ পদার্থের সৃষ্টি নয়—উৎপাদন মানে অধিকতর উপযোগের সৃষ্টি

ভোগ (Consumption) : স্থূল পদার্থ সৃষ্টি যেমন আমরা করিতে পারি না, পদার্থের বিনাশও তেমনি আমাদের সাধ্যের বাহিরে। উৎপাদন মানে অধিকতর উপযোগের সৃষ্টি। এই উপযোগের বিনাশই হইল ভোগ। ছুতার কাঠকে চেয়ারে রূপান্তরিত করিয়া অধিকতর উপযোগের সৃষ্টি করিল। চেয়ারে বসিয়া আরাম

পাইবার জন্য আমরা ইহা ক্রয় করিলাম। ব্যবহার করিতে করিতে এক সময় চেয়ারটি অকেজো হইয়া যাইবে। চেয়ার হিসাবে আর ইহার সার্থকতা থাকিবে না। অভাব মোচনের ক্ষমতা ধীরে ধীরে কমিতে কমিতে একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। অভাব পূরণের ক্ষমতা ফুরাইয়া যাওয়ার নামই হইল ভোগ। একবার ব্যবহার্য দ্রব্যের বেলায় ভোগ ক্রমশঃ হইবার সুযোগ নাই। একবার ব্যবহারেই উপযোগ ফুরাইয়া যায়। সেবার ক্ষেত্রেও উৎপাদনের সঙ্গে ভোগ হইয়া যায়। বহুবার ব্যবহার্য দ্রব্যের বেলায় ভোগ অনেক দিন ধরিয়া চলিতে পারে।

অভাব পূরণের ক্ষমতার অর্থাৎ উপযোগের বিনাশই ভোগ

ভোগ ও উৎপাদন : ভোগের নিমিত্তই মানুষ উৎপাদন করে। নানা ভাবে আমরা অর্থ উপার্জন করি। এই অর্থ আমরা ভোগ্য দ্রব্যের উপরও খরচ করিতে পারি। আবার ইহার সাহায্যে আমরা পরোক্ষ দ্রব্যও ক্রয় করিতে পারি। ভোগ্য দ্রব্য ও পরোক্ষ দ্রব্যও একরকম নয়, হরেক রকম। ইহাদের একটি না কিনিয়া অপরটি কিনিতে পারি। এই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদকেরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া নিজের নিজের দ্রব্য বিক্রয় করিতে সচেষ্ট। খবরের কাগজ, রেডিও, ইস্তাহার, সেলসম্যান এবং আরও অনেক বিচিত্র উপায়ে প্রত্যেক উৎপাদক চেষ্টা করে যাহাতে অন্য উৎপাদকের দ্রব্য না কিনিয়া তাহার উৎপাদিত দ্রব্য আমরা কিনি। এই নিরন্তর প্রতিযোগিতায় কে জয়লাভ করিবে তাহা স্থির করিবার মালিক আমরা —ব্যয়কারীরা। যে দ্রব্য আমরা ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক হই, সেই দ্রব্যের উৎপাদকের লোকসান হইবে। টিকিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে অন্য দ্রব্য তৈয়ার করিতে হইবে—যাহার জন্য আমরা লাভজনক দাম দিতে রাজী আছি। নতুবা তাহাকে দেউলিয়া হইতে হইবে। এইভাবে ভোগের সঙ্গে উৎপাদনের সামঞ্জস্য সাধিত হয়।

॥ আদর্শ প্রশ্ন ॥

1. **"Economics is the science of wealth."—Discuss.**

অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হইল ধন সম্বন্ধে আলোচনা।—এ সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

সঙ্কেত—সম্পদ বলিতে বিক্রয়যোগ্য বস্তুগত দ্রব্যকে বুঝায়। বিক্রয়যোগ্য হইতে গেলে হস্তান্তরযোগ্য ও অপ্রচুর হওয়া দরকার। সম্পদের কথা আলোচনা করা মানেই অপ্রাচুর্য ও বিনিময়ের আলোচনা করা। সম্পদ অর্জন করিতে গেলেই নির্বাচন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

সম্পদ শব্দের অর্থ ঠিকমত জানিলে এই সংজ্ঞা সম্বন্ধে আপত্তি করিবার হেতু নাই। কার্লাইল প্রমুখ লেখক অর্থশাস্ত্রে সম্পদ কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। সম্পদ এবং ঐশ্বর্যকে তাঁহারা এক

মনে করিতেন। আমাদের পরিভাষায় কিন্তু গরীব লোকেরও সম্পদ আছে। সম্পদের পরিমাণ কম—কিন্তু কম হইলেও সম্পদ নাই বলা যায় না। সম্পদের আলোচনা করা মানে শুধু ধনীদিগের কাজের আলোচনা নয়।

তাঁহারা ইহাও মনে করিতেন যে অর্থশাস্ত্রের ধনেরই আলোচনা হয়—মানুষের কোনও স্থান এখানে নাই। এ ধারণাও ভুল। মানুষের অভাব পূরণ করে দ্রব্য। এই দ্রব্যের একটা অংশের নাম সম্পদ। উপযোগ না থাকিলে অর্থাৎ অভাব মিটাইবার ক্ষমতা না থাকিলে সম্পদ আখ্যা পাওয়া যায় না। সম্পদের আলোচনা করিতে যাইয়া বস্তুতঃ আমরা মানুষের আলোচনাই করি। মানুষের সব কাজের আলোচনা আমরা করি না। সম্পদ ঘটিত অর্থাৎ অপ্রাচুর্য ঘটিত কাজগুলিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

2. How would you define wealth? Illustrate your answer with examples.
সম্পদ কাহাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও। [পৃঃ ১৪-১৭]

3. Are the following wealth? Give reasons for your answers.
(a) The Grand Trunk Road (b) A factory building (c) A bank deposit (d) A football ticket (e) A broken nib (f) Fish in the ocean (g) A B.A. diploma.

নিম্নলিখিতগুলি সম্পদ কিনা? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।
(ক) গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (খ) কারখানা গৃহ (গ) ব্যাঙ্কে রক্ষিত আমানত (ঘ) ফুটবল খেলার টিকিট (ঙ) ভাঙ্গা নিব (চ) সমুদ্রে অবস্থিত মাছ (ছ) বি. এ. ডিপ্লোমা।

4. What is utility? What are the different kinds of utility?
উপযোগ কি এবং কত রকমের হইতে পারে বর্ণনা কর। [পৃঃ ১২-১৪]

5. What is Income? Distinguish between (a) Money Income and Real Income, and (b) Gross Income and Net Income.
আয় বলিতে কি বুঝ? (ক) আর্থিক আয় ও প্রকৃত আয় এবং (খ) মোট আয় ও নীট আয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? [পৃঃ ১৭-১৮ এবং ১৯-২০]

6. Distinguish between (a) Value-in-use and value-in-exchange; and (b) Value and Price.
(ক) ব্যবহার মূল্য ও বিনিময়ের মূল্য এবং (খ) মূল্য ও দামের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [পৃঃ ২০-২২]

7. Write notes on (a) Production (b) Consumption (c) Indirect Goods.
টীকা লিখ—(ক) উৎপাদন (খ) ভোগ এবং (গ) পরোক্ষ দ্রব্য।
[পৃঃ (a) ২২, (b) ২২-২৩, (c) ১০-১১]

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আয়

(National Income)

অভাবের শেষ নাই। অভাবপূরণ করিবার ব্যাপারে ব্যক্তি কতটা সাফল্য লাভ করিবে, তাহা নির্ভর করে তাহার আয়ের উপর। জাতির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। যে জাতির আয় যত বেশী, সেই জাতিকে আমরা তত সমৃদ্ধ মনে করি। জাতীয় আয় জাতির আর্থিক অবস্থার কিছুটা ইঙ্গিত দেয়। জাতীয় আয় ক্ষুদ্র হইলে জাতির দারিদ্র দূর করা সম্ভব নয়। এই উপলব্ধি হইতেই অনুন্নত দেশগুলিতে সরকার পরিকল্পনার মারফৎ জাতীয় আয় বাড়াইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয় আয় কি করিয়া বাড়িতে পারে তাহা না জানিলে পরিকল্পনা কল্পনার রাজ্যেই থাকিয়া যাইবে। জাতীয় আয় কাহাকে বলে ও ইহা কি করিয়া মাপা যায়—ইহা না জানিলে জাতীয় আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি কি করিয়া হয় বুঝা যায় না। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ ছাড়া এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না।

জাতীয় আয় জাতির আর্থিক অবস্থার নির্দেশ দেয়। ইহা পরিকল্পনার অপরিহার্য অঙ্গ

জাতীয় আয় বাড়িলেই যে আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইল, এ রকম সিদ্ধান্ত সব সময় করা চলে না। জনসংখ্যা বাড়ার ফলে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে। এক্ষেত্রে মোট জাতীয় আয় বাড়িয়াছে বলিয়া উল্লসিত হইবার কারণ নাই। দেখিতে হইবে জনসংখ্যা যে হারে বাড়িয়াছে, জাতীয় আয় সেই হারে তাহার চেয়ে কম হারে অথবা তাহার চেয়ে বেশী হারে বাড়িয়াছে। যদি উভয়েই সমান হারে বাড়িয়া থাকে তবে বলিতে হইবে দেশের আর্থিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। জাতীয় আয় যদি কম হারে বাড়িয়া থাকে, তবে আর্থিক অবস্থার অবনতিই হইয়াছে বলিতে হয়। এক বৎসরের মোট আয় সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে গড়ে এক জনের অংশে যতটা আয় হইবে, তাহাকে মাথাপিছু জাতীয় আয় বলে। মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়িলে তবেই দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলা যায়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১৭.৫ ভাগ। আপাতদৃষ্টিতে আয় বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক মনে হয়। কিন্তু আয়

মোট জাতীয় আয় দেশের আর্থিক অবস্থার বা উন্নতির যথার্থ ইঙ্গিত দেয় না। মাথাপিছু আয় হইতে প্রকৃত অবস্থার নির্দেশ পাওয়া যায়

বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও শতকরা ৮'৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়ে মোটে ১০'৫ ভাগ। আবার ভারতবর্ষের মোট জাতীয় আয় ডেনমার্কের মোট জাতীয় আয় হইতে বেশী হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আমাদের জনসংখ্যা ডেনমার্কের জনসংখ্যা হইতে প্রায় ৫০ গুণ বেশী। অথচ আমাদের মোট আয় ডেনমার্কের মোট আয় অপেক্ষা মোটে ৩ গুণ বেশী। ফলে আমাদের মাথাপিছু আয় ডেনমার্কের মাথাপিছু আয়ের চেয়ে অনেক কম। মাথাপিছু আয়ই আর্থিক উন্নতি যাচাই করিবার সত্যকার চাবিকাঠি।

জাতীয় আয় টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। টাকার অঙ্কে জাতীয় আয় বাড়িলে জাতির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে বলা চলে না। কারণ টাকার নিজের মূল্যের পরিবর্তন হইতে পারে। কোন নির্দিষ্ট বৎসর ধরা যাক জাতীয় আয় ৯০০ কোটি টাকা। পরবর্তী বৎসর জিনিষপত্রের দাম গড়ে দ্বিগুণ হইয়া গিয়াছে। এই বৎসর উৎপন্ন দ্রব্যাদির অর্থমূল্য যোগ করিয়া দেখা গেল জাতীয় আয় ১,৮০০ কোটি টাকা। ইহা হইতে জাতির আর্থিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে বলা চলে না। কারণ এখন টাকার ক্রয়মূল্য আগের বৎসরের তুলনায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ আগের বৎসর ৯০০ কোটি টাকায় যে পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত, এখন ১,৮০০ কোটি টাকাতেও তাহাই পাওয়া যায়। সুতরাং জাতীয় আয় বাড়ে নাই বা কমে নাই। দেশের আর্থিক উন্নতি হইয়াছে কি না বুঝিতে হইলে জানা দরকার জাতীয় আয় কেন বাড়িল। টাকার মূল্যহ্রাসই যদি একমাত্র কারণ হয়, তবে প্রকৃত আয় বাড়ে নাই। মাথাপিছু আয়ও টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। সেখানেও এই সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। মূল্যস্তরের সূচকসংখ্যার সাহায্যে টাকার অঙ্কে প্রকাশিত জাতীয় আয়কে প্রকৃত আয়ে পরিবর্তিত করিতে হইবে। আর্থিক উন্নতি যাচাই করিতে হইলে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়ের সন্ধান করিতে হইবে।

প্রকৃত আয় ও আর্থিক আয়
মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়

আবার অতিরিক্ত শ্রমের ফলে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে। যুদ্ধের সময় লোক অধিক সময় শ্রম করিতে বাধ্য হয়; অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করিতে হইতে পারে; নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাধীনতা হারাইতে পারে। ইহার ফলে জাতীয় আয় বাড়িলেও আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইয়াছে জোর করিয়া বলা চলে না।

মোট কথা জাতীয় আয়ের অঙ্ক বাড়াই শেষ কথা নয়। জাতীয় আয় কি করিয়া কোন্ অবস্থায় বাড়িল সেই বিশ্লেষণের তাৎপর্য অনেক বেশী। জাতীয় আয়ের অঙ্কটা আমরা কি করিয়া পাইলাম অর্থাৎ জাতীয় আয় কি করিয়া মাপা হয়—তাহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই বিশ্লেষণ হইতে আমরা সঞ্চয়, বিনিয়োগ,

ব্যয়ের সমতা রাখিতে হইলে ক্ষয়ক্ষতির ১৲ ব্যয় হইতে বাদ দেওয়া প্রয়োজন। যন্ত্রশিল্পে ৯৲র যন্ত্র প্রস্তুত হইল। ফলে ৯৲ আয় বণ্টন হইবে, কিন্তু এই ৯৲র মধ্যে ১৲ ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিয়া বাকী ৮৲ নীট মূলধন বৃদ্ধি ধরা হইবে, হিসাব এইরূপ দাঁড়াইবে—

জাতীয় ব্যয়	টাকা	জাতীয় আয়	টাকা
ব্যক্তিগত ভোগবাবদ খরচ	৮	সুদ, খাজনা, লাভ ও মজুরী	
মোট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ৯		(ক) কাঁচামাল উৎপাদনে	১
বাদ ক্ষয়ক্ষতি ১		(খ) থান „	৩
নীট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ	৮	(গ) জামা „	৩
		(ঘ) মূলধনদ্রব্য „	৯
	১৬		১৬

(৫) বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে বিক্রয়কারী সরকারকে পরোক্ষ কর দেয়। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা আয় হিসাবে বণ্টন হয়। পূর্বেকার দৃষ্টান্তে জামার দাম ৮৲ ধরা হইয়াছে। মনে করি ইহা হইতে সরকারকে ১৲ বিক্রয়কর দিতে হয়। তাহা হইলে বাকী ৭৲ আয় হিসাবে বাঁটোয়ারা হইবে। আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে হইলে আয়ের সহিত পরোক্ষ কর যোগ দিতে হইবে—ইহাকে বাজারমূল্যে জাতীয় আয় বলে। অথবা ব্যয় হইতে পরোক্ষ কর বাদ দিতে হইবে—ইহাকে উপাদান ব্যয়ের হিসাবে জাতীয় ব্যয় বলে। নীচে একটি কাল্পনিক হিসাব দেওয়া হইল।

জাতীয় ব্যয়	কোটি টাকা	জাতীয় আয়	কোটি টাকা
ভোগের দরুণ বেসরকারী খরচ—	৩০০	মজুরী	২০০
ভোগের দরুণ সরকারী খরচ—	২০০	সুদ	৫০
মোট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ—১০০		খাজনা	১৫০
বাদ ক্ষয়ক্ষতি — ৪০		লাভ	৫০
নীট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ	৬০		
		উপাদান খরচের ভিত্তিতে নীট জাতীয় আয়— (Net National Income at factor cost.)	৪৫০
		পরোক্ষ কর	১১০
বাজার মূল্যের হিসাবে নীট জাতীয় ব্যয়—	৫৬০	বাজার মূল্যের হিসাবে নীট জাতীয় আয়	৫৬০

(৬) পরিবারের লোকজন পরস্পরের জন্য অনেক কাজ করিয়া থাকে। এই কাজগুলি আর্থিক লেনদেনের মধ্যে পড়ে না, সুতরাং মজুরীর হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। প্রাচ্য দেশগুলিতে এই ধরণের কাজের পরিমাণ নগণ্য নয়। দুই দেশের জাতীয় আয় তুলনা করার সময় এই কথা স্মরণ করা দরকার। আমাদের দেশে বাড়ীর গৃহিণীরা বাড়ীর কাজ ছাড়িয়া সবাই বাহিরের অফিসে, কারখানায় বা স্কুলে কাজ করা সুরু করিল। তখন অন্য কাহাকেও দিয়া বাড়ীর কাজ করাইতে হইবে, তাহাদিগকে এর জন্য মজুরী দিতে হইবে। জাতীয় আয় হিসাবে অনেক বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু কার্যতঃ আয় বাড়ে নাই। কেননা উৎপাদন যাহা ছিল তাহাই আছে। জাতীয় আয়ের হিসাবে নীট সুদ ও খাজনা ধরা হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয় (International Transactions and National Income): এতক্ষণ আমরা আন্তর্জাতিক লেনদেন বাদ দিয়া জাতীয় আয়ের আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান যুগে কোন দেশ বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করে না। এক দেশ অপর দেশ হইতে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে এবং অপর দেশকে নিজ দেশজাত দ্রব্য ও সেবা বিক্রয় করে। দ্রব্যের চাহিদা হইতে উপাদানের চাহিদার উদ্ভব হয়। উপাদানের চাহিদা যে যে সূত্রে হইতে পারে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ছকের বামপাশে। আর এই উপাদানগুলির আয় ডানপাশে লেখা হইয়াছে। কিন্তু আমরা যে শুধু দেশে উৎপন্ন দ্রব্যই চাহিদা করি তাহা নয়, বিভিন্ন খাতে বিদেশজাত দ্রব্যও আমরা চাহিদা করি। বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্য ও সেবার উপর আমরা যে ব্যয় করি তাহার ফলে বিদেশস্থিত উপাদানগুলির চাহিদা ও আয় সৃষ্টি হয়। এই ব্যয় হইতে দেশস্থ উপাদানের কোনও আয় হয় না। সুতরাং মোট ব্যয় হইতে বিদেশ হইতে আমদানী দ্রব্য ও সেবার উপর খরচ বাদ দিতে হইবে। আবার বিদেশীরা যখন আমাদের দেশে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে, তখন তাহাদের এই ব্যয়ের ফলে আমাদের উপাদানগুলিই চাহিদা ও আয় হয়। সুতরাং বিদেশীরা আমাদের রপ্তানীর উপর যে ব্যয় করে তাহা মোট ব্যয়ের সহিত যোগ দিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের দেশের লোকের মালিকানায় যে উপাদানগুলি আছে তাহাদের সহযোগিতায় উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবার উপর মোট ব্যয়ই হইল জাতীয় আয়। পূর্বের ছকটি সংশোধিত করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে।

জাতীয় ব্যয়	কোটি টাকা	জাতীয় আয়	কোটি টাকা
ভোগের দরুণ বে-সরকারী খরচ	৩০০	মজুরী	১৯২
ভোগের দরুণ সরকারী খরচ	২০০	সুদ	৪৮
নীট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ	৬০	খাজনা	১৪৪
		লাভ	৪৬
	——		——
বাজার মূল্যে নীট আভ্যন্তরীণ ব্যয়	৫৬০	উপাদান খরচের ভিত্তিতে	
বাদ নীট আমদানী	−৬০	নীট জাতীয় আয়	৪৩০
যোগ নীট রপ্তানী	+৪০	পরোক্ষ কর	১১০
	——		——
বাজার মূল্যে নীট জাতীয় ব্যয়	৫৪০	বাজার মূল্যের হিসাবে নীট জাতীয় আয়	৫৪০

মোট জাতীয় উৎপাদন, নীট জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় (Gross National Product or G. N. P., Net National Product or N. N. P. and National Income)**:** বৎসরের উৎপাদন কার্য আমরা শূন্য হাতে সুরু করি না। আমরা একটি সম্পদের ভাণ্ডার হাতে লইয়াই কাজ সুরু করি। ইহার ভিতর স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধন দুইই থাকে। অর্দ্ধ সমাপ্ত ও সমাপ্ত সব রকম দ্রব্যই থাকিতে পারে। সেবার প্রশ্ন উঠে না। কারণ সেবা উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। এই সম্পদের ভাণ্ডার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়—ফলে ইহার ক্ষয় হয়। এমন কি স্থায়ী মূলধনও অক্ষয় নয়। বন্দর, পোতাশ্রয়, সড়ক—ইহাদেরও ক্ষয় হয়। বর্তমান বৎসরের উৎপাদন হইতে এই ক্ষয় পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা আগামী বৎসর ক্ষুদ্রতম সম্পদের তহবিল লইয়া উৎপাদনের কাজে নামিতে হইবে। বৎসরের সুরুতে সম্পদের যে ভাণ্ডার ছিল তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৎরের মধ্যে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাহাই নীট জাতীয় আয়। ব্যবহার জনিত ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলে তবে নীট আয় পাওয়া যাইবে। কাঠ চেরাই করিবার জন্য করাত ব্যবহার করা হয়। ইহা স্থায়ী মূলধন। উৎপাদনের কাজে ইহা বহুবার ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ইহা চিরদিন ব্যবহার করা যাইবে না। ধরা যাক ইহার আয়ু ১০ বৎসর; অর্থাৎ প্রতি বৎসর গড়ে ইহার ১/১০ ক্ষয় হইতেছে। ইহার দাম ধরা যাক ৩০০৲। ইহা হইতে যে আয় হইবে তাহা হইতে ৩০০৲ × ১/১০ = ৩০৲ ক্ষয়ক্ষতি তহবিলে জমা দিতে হইবে।

ইহার বাজার মূল্যের পরিবর্তন না হইলে ১০ বৎসরে এই তহবিলে ৩০০৲ জমিবে। করাতটি তখন অকেজো হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে উৎপাদন ব্যাহত হইবে না। ক্ষয়ক্ষতির তহবিলে যে ৩০০৲ জমিয়াছে তাহা দিয়া নূতন করাত ক্রয় করা যাইবে। নীট আয় বাহির করিতে হইলে করাত হইতে মোট আয় বৎসরে যাহা হইবে তাহা হইতে বাৎসরিক ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিতে হইবে। ব্যবহার জনিত ক্ষয়ক্ষতি বাদে মূলধনের আকস্মিক ক্ষয়ও হইতে পারে। কারখানা আগুনে পুড়িয়া যাইতে পারে। রাস্তাঘাট বন্যায় বা ভূমিকম্পে বিনষ্ট হইতে পারে। অর্থাৎ **মোট জাতীয় উৎপাদন —ক্ষয়ক্ষতি=নীট জাতীয় উৎপাদন। আবার নীট জাতীয় উৎপাদন— পরোক্ষ কর=উপাদান খরচের হিসাবে নীট জাতীয় আয়।**

ক্ষয়ক্ষতির হিসাব মূলধন কতদিন টিকিবে তাহার উপর নির্ভর করে। কিন্তু মূলধন অকেজো না হওয়া পযন্ত ইহার আয় সঠিক বলা সম্ভব নয়। অনুমানের উপর নিভর করিয়া আয়ু নির্দ্ধারণ করিতে হয়। ক্ষয়ের হারও ইহার ফলে অনুমানের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। করাতের দৃষ্টান্তে আমরা আয়ু ১০ বৎসর ধরিয়া ক্ষয়ক্ষতির হার $\frac{১}{১০}$ হিসাবে ধরি। কার্যতঃ যদি করাতটি ১৫ বৎসর চলে, তবে ক্ষয়ক্ষতি হিসাবে যতটা বাদ দেওয়া উচিত ছিল (৩০০ × $\frac{১}{১৫}$ = ২০৲) আমরা বাদ দিয়াছি তাহার চেয়ে বেশী। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের অঙ্ক কম করিয়া দেখান হইয়াছে। আবার করাতটির সত্যকার আয়ু যদি ৫ বৎসর হয়, তবে ক্ষয়ের জন্য বাদ দেওয়া দরকার ছিল ৩০০৲ × $\frac{১}{৫}$ = ৬০৲। কিন্তু আমরা বাদ দিয়াছি মোটে ৩০৲। জাতীয় আয়ের অঙ্ক বেশী করিয়া দেখান হইয়া গিয়াছে। যদি কার্যতঃ ১০ বৎসরই চলে, সেক্ষেত্রেও প্রতি বৎসর $\frac{১}{১০}$ ক্ষয় হইবে বলা যায় না। ক্ষয়ের হার সঠিক নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। সেইজন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের ধারণাটির ব্যবহার আজকাল প্রায়ই করা হয়।

জাতীয় আয়ের বণ্টন (Distribution of National Income)—জাতির আর্থিক উন্নতির সূচক হিসাবে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। মোট আয় সকলের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিলে একজনের অংশে গড়ে যতটা আয় হয় তাহাকেই মাথাপিছু জাতীয় আয় বলে। কার্যতঃ মোট আয় সমান-ভাবে বণ্টিত হয় না। আয় বণ্টন যত অসম হইবে, তত বেশী লোকের আয় মাথাপিছু আয় অপেক্ষা কম হইবে। ১,০০০৲ মোট আয় ১০ জনের মধ্যে ভাগ করিলে, মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ১০০ । কিন্তু যদি এই ১০ জনের ২ জনের আয় ৩০০৲ করিয়া হয়, তবে বাকী ৮ জনের মোট আয় হয় ৪০০৲। অর্থাৎ এই ৮ জনের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ৫০৲। ইহাদের মধ্যে যদি অসমভাবে বণ্টন হয় তবে,

কয়েকজনের আয় ৫০৲র কম হইবে। জাতীয় আয়ের মোটা অংশ যদি মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হইয়া পড়ে, তবে মাথাপিছু জাতীয় আয় অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিপূর্ণ পরিচয় দিতে পারে না। অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রকৃত হদিশ পাইতে হইলে মোট জাতীয় আয় কিভাবে বাঁটোয়ারা হয় তাহা অবশ্য জানিতে হইবে।

ভারতের জাতীয় আয়—জাতীয় আয় হিসাব করিবার অসুবিধাগুলি ভারতে অত্যন্ত প্রবল। জাতীয় আয় জাতীয় উৎপন্ন অথবা উপাদানগত আয়ের সমষ্টি—যে কোনভাবে হিসাব করা যায়। যে ভাবেই হিসাব করা হোক সংখ্যাতথ্যের প্রয়োজন আছে। এই তথ্য পাওয়া যায় ভোগকারী ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে। আমাদের দেশে ভোগকারী হিসাব রাখে না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও অনেক ক্ষেত্রে হিসাব রাখা প্রয়োজন মনে করে না। উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্যের বেশ কিছু অংশ নিজে ভোগ করে। কিছুটা অংশ আবার সাক্ষাৎ বিনিময়ও হয়। এই দুই অংশের কোন অংশ বাজারে আসে না। উৎপাদক হিসাবও রাখে না। সুতরাং কতটা উৎপন্ন হইল এবং তাহার অর্থমূল্য কত সঠিক জানার উপায় নাই। আমাদের দেশের জাতীয় আয়ের হিসাবে সেইজন্য অনুমানের উপর অত্যন্ত বেশী নিভর করিতে হয়। ভুলচুকের সম্ভাবনা যথেষ্ট। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার জাতীয় আয় কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে। ইহাদের মতে প্রথম পরিকল্পনার পূর্ব্বে আমাদের জাতীয় আয়ের হিসাব এইরূপ হয়—

	১৯৪৮-৪৯ এর দাম হিসাবে	চলতি দাম হিসাবে
১৯৪৮-৪৯	২৪৬.৯	২৪৬.৯
১৯৪৯-৫০	২৪৮.৬	২৫৩.৯
১৯৫০-৫১	২৪৬.৩	২৬৫.২

এই তথ্যপঞ্জী হইতে দেখা যায় মাথাপিছু আর্থিক আয় এই তিন বৎসরে ক্রমান্বয়ে বাড়িয়াছে। কিন্তু টাকার মূল্যও এই তিন বৎসরে কমিয়াছে। মূল্যস্তর বৃদ্ধির জন্য সংশোধন করিয়া লইলে দেখা যায় মাথাপিছু প্রকৃত আয় এই তিন বৎসরে বাড়ে নাই—বরং সামান্য কমিয়াছে। আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। আর্থিক আয় সংশোধিত না করিলে সম্পূর্ণ ভুল ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে।

এই সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ও বৃটেনের মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ৯০০০ টাকা ও ৪০০০ টাকার বেশী ছিল। এমন কি মিশরের আয় ৭০০ টাকার অধিক ছিল। আমাদের আর্থিক দারিদ্র্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এই অসহনীয় দারিদ্রব্য দূর করার জন্য সরকার পরিকল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, যাহাতে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

সমাজতন্ত্রবাদে সরকার সমস্ত সম্পদের একচ্ছত্র মালিক। পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ অপরিহার্য্য নয়। তবে সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার উপর হস্তক্ষেপ করা চলিতে পারে। পরিকল্পনায় সরকারী ও বে-সরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়।

১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৫-৫৬ পর্য্যন্ত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময় ১৯৫৫-৫৬ হইতে ১৯৬০-৬১। পরিকল্পনার আমলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও প্রকৃতি কিভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা নীচের ছক হইতে বুঝা যাইবে।

১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৫৭-৫৮ পর্য্যন্ত জাতীয় আয়ের হিসাব

হিসাব—কোটি টাকায় প্রচলিত মূল্যস্তর অনুযায়ী

জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উৎস	১৯৫১-৫২	১৯৫৫ ৫৬	শতকরা বৃদ্ধি	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
১। কৃষি, মৎস্যচাষ ও অনুরূপ কার্য	৪,৯৯০	৪,২২০		৫,৬৯০	৫,৬৯০
২। খনি, বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্র শিল্প	১,৭৩০	১,৮৭০		১,৯৭০	১,৯৭০
৩। বাণিজ্য ও পরিবহন	১,৭৯০	১,৮৫০		১,৯১০	১,৯১০
৪। অন্যান্য সেবামূলক কার্য	১,৫০০	১,৭১০		১ ৮১০	১,৭৯০
৫। বিদেশ হইতে অর্জিত নীট আয়	—২০	—		+১০	—
৬। নীট জাতীয় উৎপাদন উপাদান ব্যয় হিসাবে	৯,৯৯০	৯,৬৫০		১১,৪১০	১১,৩৬০
৭। মাথাপিছু আয় প্রচলিত মূল্যস্তর হিসাবে	২৭৪ ৫	২৫২·০		২৯৪·৩	২৮৯·১
৮। মাথাপিছু আয় ১৯৪৮-৪৯ মূল্যস্তর হিসাবে	২৫০·২	২৭২·১	৮·৭%	২৮৪·০	২৭·৫৬

মাথাপিছু আয়—

১৯৫৮-৫৯—২৯৩৬ } ১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তর হিসাবে
১৯৫৯-৬০—২৯১৩ }

উপরি-উক্ত ছক হইতে দেখা যায় কৃষি হইতে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫% পাওয়া যায়। ইহার বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ বিস্তার এখনও করা সম্ভব হয় নাই। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই হারে শিল্পে বিস্তার ঘটিয়াছে। অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। শিল্পোন্নয়ন এখনও পরিস্ফুট নয়।

ভারতীয় জাতীয় আয়ের বণ্টন—এ সম্বন্ধে তথ্যের একান্ত অভাব। তবে লক্ষ্য করা দরকার কৃষিতে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫০% উৎপন্ন হয়, অথচ মোট শ্রমিক সংখ্যার প্রায় ৭৩% কৃষিতে নিযুক্ত। বাণিজ্য ও পরিবহনে জাতীয় আয়ের প্রায় ১৮% উৎপন্ন হয়, অথচ মোট জনসংখ্যার মোট ৮% এই ধরণের কাজে নিযুক্ত। পরিকল্পনার আমলে জাতীয় আয় সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে একটা বড় অংশে কঠোর দারিদ্র্য বিরাজমান। যাহারা কোনক্রমে প্রাণধারণ করিয়া আছে তাহাদের দারিদ্র্যের অবস্থান ঘটানই আর্থিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এজন্য মোট আয় বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে বণ্টন ব্যবস্থাতেও অধিকতর সাম্য আনা দরকার।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

১। **What is National Income? What are the different ways of measuring National Income?**
জাতীয় আয় বলিতে কি বুঝায়? জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২। **What are the principal sources of Indian National Income?**
ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান প্রধান উৎস কি?

৩। **Write notes on—(a) Per capita income, and (b) Real and money N..tional income.**
টীকা রচনা কর—(ক) মাথাপিছু আয় (খ) আর্থিক ও প্রকৃত জাতীয় আয়।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় আয়ের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে

(Factors determining the size of National Income)

জাতীয় আয়ের বণ্টন ব্যবস্থার গুরুত্ব আমরা আলোচনা করিয়াছি। জাতীয় আয় যদি একেবারে সমান করিয়াও ভাগ করা যায়, তবুও মোট জাতীয় আয় সামান্য হইলে মাথাপিছু আয়ও সামান্যই হইবে। মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে মোট জাতীয় আয় বাড়ানো দরকার। তাহা কোন্ কোন্ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে জানা দরকার। জাতীয় আয়ের উৎস জাতীয় উৎপাদন। উৎপাদন অর্থ উপযোগ সৃষ্টি। প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ নানাভাবে তাহার অভাব পূরণের উপযোগী করিয়া তুলে। এই প্রচেষ্টায় সে কতদূর অগ্রসর হইবে তাহা নির্ভর করে মূলতঃ দুইটি জিনিষের উপর—(১) প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, আর (২) এই সম্পদকে মানুষের কাজে লাগাইবার ক্ষমতা।

(১) **প্রাকৃতিক সম্পদ**—দ্রব্যের সাহায্যে আমরা অভাব পূরণ করি। কিন্তু দ্রব্যের মৌলিক উপাদানগুলি মানুষ প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহার জন্য প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হয়। বনজঙ্গল, জমি, জীবজন্তু, নদীনালা, জলবায়ু, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, খনিজ সম্পদ—এ সকলই প্রকৃতির দান। কোন দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আবার কোন দেশ গরীব। আরবের মরুভূমিতে চাষ করা অসম্ভব। পলিমাটির দেশে অল্প আয়াসেই ফসল ফলে। ইরাক ইরাণে খনিজ তৈল প্রচুর পাওয়া যায়। খনিজ তৈলের জন্য ভারতকে বহুলাংশে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যত বেশী, সে দেশে উৎপাদনের সম্ভাবনা তত অধিক। জাপানের কথা আলোচনা করিলে প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব সহজেই বুঝা যায়। মাথাপিছু আয়ের দিক হইতে জাপানকে উন্নত বলা চলে না। আবার অনুন্নত দেশের পর্যায়েও জাপানকে ফেলা হয় না। ইহার কারণ জাপান প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ বঞ্চিত। কিন্তু যতটুকু সম্পদ আছে তাহার চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার জাপান করিয়াছে। এই সীমাবদ্ধ সম্পদ হইতে যতটা আয় আদায় করা যায় জাপান তাহা করিয়াছে। মাথাপিছু আয় যে আরও বাড়ান যায় নাই তাহার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের স্বল্পতাই দায়ী।

প্রকৃতি তার ঐশ্বর্য দেশগুলির মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে নাই। রাশিয়া বা আমেরিকার মত ভাগ্যবান দেশ আর তৃতীয়টি নাই। এই দুই দেশে প্রধান প্রধান

প্রাকৃতিক সম্পদ প্রায় সমস্তই পাওয়া যায়। ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের এত বৈচিত্র্য নাই। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ যতটুকু আছে তাহাও অবহেলার নয়। আমাদের দেশে কয়লা, লৌহ, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইট যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। অন্যান্য খনিজদ্রব্যও কিছু কিছু পাওয়া যায়। নদীনালা এখানে প্রচুর। অরণ্য সম্পদ কিছু কিছু আছে। মোট প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে উৎফুল্ল না হইলেও নিরাশ হইবার কারণ নাই। মাথাপিছু হিসাব করিলে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে ভারতকে মোটেই সমৃদ্ধ বলা যায় না। আশার কথা এই যে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথ আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈদেশিক শাসনকালে এদিকে নজর দেওয়া হয় নাই। এখন জাতীয় সরকারের আমলে এ ব্যাপারে পরিকল্পিত প্রয়াস হইতেছে। এই প্রয়াস ইতিমধ্যেই কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্রে খনিজ তৈল মিলিয়াছে। আসামে খনিজ তৈলের সন্ধান চলিতেছে। রাজস্থানের মরুভূমিতে জলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

(২) কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেই আয় বেশী হয় না। চারশত বৎসর পূর্বে আমেরিকার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য এখনকার মতই ছিল। তখন সেখানে রেড ইণ্ডিয়ানরা থাকিত। তাহারা ঐই প্রভূত সম্পদ কাজে লাগাইতে পারে নাই। আর সেই আমেরিকা এখন তুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশ। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য যে রকম সেই রকমই আছে। কিন্তু লোক ও সমাজ বদলাইয়াছে। তার ফলেই এই পরিবর্তন।

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইতে গেলে চাই জন সম্পদ। মাথা গুণতিতে লোক বাড়িলেই যে জন সম্পদ বাড়ে তাহা নয়। সুস্থ, সবল ও উদ্যমশীল হইলে তবেই প্রকৃতিকে জয় করা যায়। কাজ করিবার ক্ষমতা ও আগ্রহ দরকার। কাজের কৌশল আয়ত্ত করা দরকার। ভারত লোকসংখ্যার দিক হইতে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কিন্তু পুষ্টির অভাবে আমরা দুর্বল। কর্মকৌশলের জন্য দরকার কারিগরি শিক্ষার। সেই কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। সাধারণ শিক্ষা পর্যন্ত ভারতে এখনও সার্বজনীন প্রসার লাভ করে নাই। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা এখনও গ্রহণ করা হয় নাই। কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য কতকগুলি কারিগরি কলেজ (Technical Institutes) ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। এদেশ হইতে বিদেশে শিক্ষানবিশ পাঠান হইতেছে।

(খ) শ্রমিকের দক্ষতা বা প্রকৃতিকে কার্যকরীভাবে কাজে লাগাইবার ক্ষমতা মূলধনের উপর নির্ভর করে। বৃটেন ও আমেরিকায় একই জাতির লোক বাস করে। অথচ একজন বৃটিশ শ্রমিক অপেক্ষা একজন আমেরিকান শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি

বেশী। ইহার অন্যতম কারণ আমেরিকায় শ্রমিকের মাথাপিছু মূলধনের পরিমাণ অনেক বেশী। একজন শ্রমিক শুধু হাতে যতটা উৎপাদন করিতে পারে, যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, জাহাজ বন্দর, রেলগাড়ী এই সমস্ত হইল মূলধন। যে দেশে মূলধনের পরিমাণ যত বেশী, সে দেশের উৎপাদিকাশক্তিও সেই পরিমাণে বেশী হইবে। মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বাড়ান যায়। আবার মূলধনের গুণগত উন্নতি হইলেও উৎপাদন বাড়ে। মূলধন বৃদ্ধি মানে শুধু একই ধরণের যন্ত্রের সংখ্যা বাড়া নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মূলধন বৃদ্ধি উন্নত ধরণের যন্ত্র হিসাবে দেখা দেয়। মূলধন মানুষের সৃষ্ট উপাদান। ইহার জন্য সঞ্চয় প্রয়োজন। শুধু সঞ্চয় হইলে চলিবে না, তাহা বিনিয়োগ করিয়া বাস্তব মূলধন সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন। আমাদের দেশ মূলধনের ব্যাপারে অত্যন্ত গরীব। আমাদের আয় এত সামান্য যে ইহা হইতে সঞ্চয় করা অত্যন্ত কঠিন। আবার যাহা সঞ্চয় হয় তাহাও সব সময় উৎপাদনের কাজে লাগান হয় না। উৎপাদনের কাজে লাগাইতে গেলে লোকসানের ঝুঁকি লইতে হয়। এই ঝুঁকি লইতে আমাদের দেশের লোক নারাজ। সরকার স্বল্পসঞ্চয় পরিকল্পনার (Small Savings Scheme) মাধ্যমে সঞ্চয়ের উৎসাহ দিতেছেন। যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার জন্য সুবিধা দিতেছেন। দেশে নানাপ্রকার যন্ত্র তৈয়ারীর চেষ্টা হইতেছে। আমদের আয় অত্যন্ত কম। সুতরাং স্বেচ্ছায় আমরা সামান্যই সঞ্চয় করিব। সেজন্য সরকার নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। আমাদের ঝুঁকি লইবার অনিচ্ছা ও অক্ষমতার জন্য অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে ও মালিকানায় মূলধন নির্মাণের বন্দোবস্ত হইয়াছে। বিদেশ হইতে সরকারী ও বে-সরকারী সূত্রে ধার লওয়া হইয়াছে।

(গ) শ্রমিক চুক্তি হিসাবে মজুরীর বিনিময়ে কাজ করে। মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ জড় পদার্থ। ইহাদের একত্রিত করিয়া উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করে সংগঠক। সংগঠন নৈপুণ্যের উপর ইহাদের যথোপযুক্ত ব্যবহার নির্ভর করে। আমাদের দেশে বে-সরকারী সংগঠকেরা শিল্পের চেয়ে বাণিজ্যে অধিকতর আগ্রহশীল। মূল শিল্প ও ভারী শিল্পের ব্যাপারে ইহাদের উৎসাহ খুবই কম। এই সব শিল্পে লাভ হয় অনেকদিন বাদে ও সুরুতেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তি এত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নয়। লগ্নী করিবার সামর্থ্যও তাহার কম। সেইজন্য সরকার অগ্রসর হইয়া এই সব ক্ষেত্রে সংগঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে আমাদের দেশে সংগঠনের কাজ কিছু সরকারী এবং কিছুটা বে-সরকারী তত্ত্বাবধানে হয়। উৎপাদনের সাফল্য অনেকাংশে ইহাদের উপর নির্ভর করে।

(ঘ) সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রসংগঠন, আইন ব্যবস্থা এবং সামাজিক রীতিনীতিও উৎপাদনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অন্যান্য উপাদানগুলির মত এগুলি ধরাছোঁয়া না গেলেও ইহাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

উৎপাদনের উপাদান (Factors of production): প্রকৃতির দান নানাবিধ। আদিম অবস্থায় এগুলি কদাচিৎ মানুষের অভাব সরাসরি মিটাইতে পারে। মানুষ শ্রমের সাহায্যে এগুলিকে তাহার অভাব পূরণ করিবার ব্যাপারে উত্তরোত্তর উপযোগী করিয়া লয়। উৎপাদনের মোট উপাদান দুইটি—(১)—প্রকৃতির দান ও (২) মানুষের শ্রম।

জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ: অর্থশাস্ত্রে প্রকৃতির দান সব কিছুকেই জমি বলা হয়। সাধারণ ভাষায় জমি বলিতে শুধু ভূত্বক্‌কে বুঝায়। অর্থশাস্ত্রে 'জমি' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। ভূ পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে এবং ভূপৃষ্ঠের উর্ধদেশে যাহা কিছু আছে সমস্তই জমির অন্তর্গত। যাবতীয় খনিজ সম্পদ, জলবায়ু, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত, অরণ্য সম্পদ, নদীনালা, বন্য জীবজন্তু—এই সবকিছুকেই জমি বলে।

শ্রম: শ্রম ব্যতীত উৎপাদন চলিতে পারে না। উৎপাদনের উদ্দেশ্য মানুষের অভাবপূরণ। আবার মানুষ নিজে উৎপাদনের অন্যতম উপাদান। শ্রম বলিতে শুধু দৈহিক শ্রমকেই বুঝায় না। মানসিক শ্রম যাহারা করে তাহাদিগকেও শ্রমিক বলা হয়।

মানুষ শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদকে সোজাসুজি ভোগ্যদ্রব্যে পরিণত করার চেষ্টা করিতে পারে, ইহাকে **প্রত্যক্ষ উপাদান** বলে। আবার প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষ **পরোক্ষ বা মূলধন দ্রব্যেও** পরিণত করিতে পারে। মূলধন দ্রব্য মানুষের অভাব সরাসরি মিটাইবে পারে না। এই মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত করার জন্য যে পরিমাণ শ্রম ও প্রকৃতির সম্পদ খরচ হইল, তাহার সাহায্যে কিছুটা ভোগ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা যাইত। মূলধনদ্রব্য তৈয়ার করিতে গেলে তখনকার মত ঐ পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্যের আশা ছাড়িতে হইবে। মানুষ জানে মূলধন দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদন করিলে ভবিষ্যতে উৎপাদন অনেকটা বাড়িয়া যাইবে। বর্তমান ভোগ হইতে বিরত হইবার কষ্ট সুদে আসলে পূরণ হইবে। সেইজন্যই মানুষ পরোক্ষ উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়। বন্য মানুষের তীর ধনুক ও বর্শাও মূলধন দ্রব্য। বর্তমান যুগের মূলধন দ্রব্য আরও জটিল। রকমারি অনেক বেশী। মূলধন জমির মত প্রকৃতির দান নয়। মূলধন মানুষের সৃষ্টি। সেইজন্য ইহাকে মৌলিক উপাদান বলা যায় না। ইহার সৃষ্টিকাল অতীতে। অতীতে মানুষের শ্রম প্রাকৃতিক সম্পদ খাটাইয়া মূলধন উৎপন্ন করিয়াছে। বর্তমানের মানুষকে ইহা উৎপাদনে সহায়তা করিতেছে। মূলধন হইল অতীত,

বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগসূত্র। ইহার মাধ্যমে আমরা পূর্বপুরুষের সাহায্য অনুভব করি। আমরা যে মূলধন রাখিয়া যাইব তাহা আবার উত্তরপুরুষকে সাহায্য করিবে। বর্তমান যুগে শ্রম এবং প্রাকৃতিক সম্পদের মত মূলধনও উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য। ইহাকে উৎপাদনের **তৃতীয় উপাদান** বলিতে হয়।

(৪) মূলধন ব্যবহার করিবার ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ও তাহার ভোগ্যদ্রব্যে পরিণতি এই দুইয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দেখা দেয়। ভবিষ্যতের কথা মনে রাখিয়া বর্তমানের উৎপাদন করিতে হয়। ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত। আজ উৎপাদন সুরু করিলে ছয়মাস বাদে হয়ত ভোগ্যদ্রব্য সমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া যাইবে। ছয়মাস বাদে উৎপন্ন দ্রব্য ৫৲ দরে বিক্রয় করা যাইবে মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন দর ৫৲ থাকিবে এ রকম নিশ্চয়তা নাই। বাজারদাম ৪৲ও হইতে পারে। সেক্ষেত্রে আমার লোকসান হইবে। বর্তমান যুগের অপর বৈশিষ্ট্য হইল আমরা কেহই স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন করি না। আমার যে সমস্ত দ্রব্য প্রয়োজন, আমি সেগুলি স্বয়ং উৎপাদন করিবার চেষ্টা করি না। আমার দক্ষতা যে কাজে অধিক আমি সেই কাজে ব্যাপৃত থাকি। বাজারে আমার উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাই তাহা দিয়া আমার বাঞ্ছিত সামগ্রী সংগ্রহ করি। আমরা বাজারে অর্থাৎ অন্যের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য উৎপাদন করি। এই বাজার আবার ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার পশম ভারতে আসে। সাতসমুদ্র পারের দেশ ভারতের চাহিদা অষ্ট্রেলিয়ার লোকের পক্ষে সঠিক জানা সম্ভব নয়। তাহারা অনুমান করিতে পারে, কিন্তু অনুমান নিশ্চিত নয়। অনুমান ভুল হইলে লোকসান হইতে পারে। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা ঝুঁকিবহুল। ঝুঁকি দুইভাবে হয় (১) আমরা ভবিষ্যতের জন্য উৎপাদন করি এবং (২) আমরা বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করি। এই ঝুঁকি কেহ বহন করিতে স্বীকার না করিলে বর্তমান কালের উৎপাদন অচল হইয়া পড়িবে।

সংগঠকের কাজ এই ঝুঁকি বহন করা। সেইজন্য সংগঠককে উৎপাদনের **চতুর্থ উপাদান** বলা হয়।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

১। **What are the main factors that determine National Incom ?**
জাতীয় আয়ের প্রধান উপাদান কি কি ? [পৃষ্ঠা ৩৮-৪০]

২। **What do do you mean by factors of production ?**
উৎপাদনের উপাদান বলিতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ৪১-৪২]

পঞ্চম অধ্যায়

জমি বা প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য

(Land or National Resources)

অর্থশাস্ত্রে জমি বলিতে শুধু ভূত্বককে বুঝায় না। প্রকৃতির দান সব কিছুকেই জমি বলা হয়। নদীনালা, পাহাড় পর্বত, আলো-বাতাস, খনিজ ও বনজ সম্পদ—এ সবই জমি।

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের গুরুত্ব (Importance of National Resources): জাতির অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের প্রভাব অগ্রাহ্য করা যায় না। জলবায়ুর উপর শ্রমের দক্ষতা নির্ভর করে। খাদ্য ও পরিচ্ছদের প্রকৃতি জলবায়ুর দ্বারাই নির্ধারিত হয়। কোন্ কোন্ শস্য চাষ করা সম্ভব তাহা জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও মৃত্তিকার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করিয়াছে, এই চেষ্টায় সে কিছুটা সফলও হইয়াছে। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা হইয়াছে। নদীতে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। মানুষ আজ বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া যাতায়াত করিতেছে। জলবায়ুর কুঠোরতা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সংযত করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতিকে পূরাপূরি বশে আনা যায় নাই। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য যে দেশে অপ্রতুল, আর্থিক উন্নয়ন সেখানে কঠিন ব্যাপার। প্রকৃতি যেখানে অকৃপণ, মানুষ সেখানে অল্প আয়াসেই আর্থিক উন্নতি করিতে পারে। ভারতে পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় সাহায্যে আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা চলিতেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্যের উপর পরিকল্পনার সাফল্য বেশ কিছুটা কিছুটা নির্ভর করিতেছে।

ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য (India's Natural Resources): ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান বাণিজ্যের দিক দিয়া বিশেষ সুবিধাজনক। পূর্ব গোলার্ধের কেন্দ্রস্থলে ভরতের অবস্থান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির মধ্যে জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে যেভাবেই যাতায়াত হোক, ভারতের উপর দিয়া যাইতে হইবে। প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্য দেশগুলি হইতে ভারত প্রায় সমান দূরে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পক্ষে ভারত সেজন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা লাভ করিয়া থাকে। ভারতের উপকূল রেখা প্রায় ৩,৫০০ মাইল দীর্ঘ। কিন্তু এ উপকূলরেখা সরল। সুতরাং স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা খুব কম। নদীতে জাহাজ ভিডাইতে হইলে বহুব্যয়ে বন্দর নির্মাণ করিতে হয়।

(১)
ভৌগোলিক অবস্থান

ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা হিসাবে ভারতকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল (২) সিন্ধুগাঙ্গেয় নদীগঠিত সমভূমি এবং (৩) দক্ষিণাংশের মালভূমি। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে কিছু কিছু চাষও হয়। বেশীর ভাগ চা এই অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়। হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। উত্তরাপথের নদীগুলি হিমালয়ের তুষার গলা জলে পুষ্ট। সেজন্য সারা বৎসর নৌ-চলাচল হইতে পারে। হিমালয় ভারতের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তরের হিমশীতল বায়ুপ্রবাহ হিমালয় পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করিতে পারে না। মৌসুমী বায়ু হিমালয়ের গায়ে ধাক্কা খাইয়া বৃষ্টিপাত ঘটায়। সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমি নদীর পলিমাটি দ্বারা গঠিত। সেজন্য অতি উর্বর। এখানে নানারকম খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। অতি অল্প আয়াসে এখানে বহুবিধ শস্য জন্মে। এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতেও কিছু কিছু খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। এই মালভূমির উত্তর পশ্চিমাংশের উচ্চতর ভূভাগ লাভাজাতীয় কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চল তুলাচাষের পক্ষে উপযোগী।

(২)
প্রাকৃতিক বিভাগ

ভারতকে মৌসুমী বায়ুর দেশ বলা হয়। এই মৌসুমী বায়ুপ্রবাহই ভারতে বৃষ্টিপাতের কারণ। ইহার প্রভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু বিভিন্ন প্রকার। পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে বৃষ্টিপাত প্রচুর। সমুদ্র হইতে দূরে বলিয়া দক্ষিণ পাঞ্জাব ও রাজস্থানে বৃষ্টিপাত একেবারে কম ও জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। প্রধানতঃ গ্রীষ্মের মৌসুমী বায়ু প্রভাবে যে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে তাহা দ্বারাই এই দেশে কৃষিকার্য হয়। কিন্তু দেশের সর্বত্র সমান বৃষ্টিপাত হয় না। তাহা ছাড়া অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিও হয়। কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা এখনও প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। অনিশ্চিত মৌসুমী বায়ুর উপর কৃষকের ভাগ্য নির্ভর করে। কৃষকের আয় কমিলে তাহার ক্রয় ক্ষমতা কমিবে। শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার খারাপ হইবে। সরকারের রাজস্ব কম হইবে।

(৩)
জলবায়ু—অনিশ্চিত মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ।

উষ্ণমণ্ডলীয় মৌসুমী অঞ্চলে সমস্ত জমির এক তৃতীয়াংশ বন হওয়া প্রয়োজন। ভারতে ২ লক্ষ ৮১ হাজার বর্গমাইল জুড়িয়া বন আছে। মোট স্থলভূমির শতকরা ২২ ভাগ বন। বনাঞ্চলের শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ নামেই বন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু কাষ্ঠ ব্যবহার পরিমাণ ৫৮ ঘনফুট—ভারতে ১·৪ ঘনফুট। অরণ্য হইতে আমরা কাষ্ঠ, ওষধি ও নানা বনজাত দ্রব্য পাই; বিস্তৃত অরণ্য থাকিলে

(৪)
অরণ্যসম্পদ অপ্রচুর

আবহাওয়া শীতল থাকে ও বৃষ্টিপাতে সহায়তা হয়। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও উর্বরতা সংরক্ষণের ব্যাপারে বনভূমির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও পরিবর্ধনের জন্য আমরা বর্তমানে কিছুটা সচেষ্ট হইয়াছি।

(৫)
মৃত্তিকার প্রকৃতি শুষ্ক

ভারতের সর্বত্র মৃত্তিকার উর্বরতা একরকম নয়। সিন্ধুগাঙ্গেয় সমভূমির মৃত্তিকা অতিশয় উর্বর। দক্ষিণাংশের গৈরিক মৃত্তিকা এত উর্বর নয়। আবার রাজস্থান বা দক্ষিণ পাঞ্জাবের মরুভূমি অঞ্চল একেবারেই শুষ্ক ও অনুর্বর। মোটামুটি ভারতের মৃত্তিকা শুষ্ক। জলসেচের ব্যবস্থা না হইলে আর্থিক উন্নতি সম্ভব নয়।

(৬)
খনিজ দ্রব্য মোটামুটি পাওয়া যায়।

ভারতের আর্থিক উন্নতির জন্য শিল্পোন্নয়ন অপরিহার্য। খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য থাকিলে, শিল্পোন্নয়ন অনেক সহজ হয়। ভারতের খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। আমাদের খনিজ সম্পদ নগণ্য নয়। কিন্তু ইহা লইয়া বাড়াবাড়ি করিবার মতও কিছু নাই। ভারতের খনিজ সম্পদের যথাযথ হিসাব এখনও হয় নাই। নূতন খনিজ সম্পদ আবিষ্কারের সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এখন পর্যন্ত যে হিসাব পাওয়া যায় তাহাতে অতিরিক্ত আনন্দের কিছু নাই। লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, ম্যাগনেসাইট, মোনাজাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ভারতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রায় ২,১০০ কোটি টন লৌহের সরকারী হিসাব পাওয়া যায়। অন্যত্র অতিরিক্ত লৌহ থাকার সম্ভাবনা আছে। ভারতের লৌহ আকর গুণের দিক দিয়াও উন্নত। কয়লা এবং লৌহ কাছাকাছি পাওয়া যায়। ইহাতে লৌহ উৎপাদন কম খরচে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতে সঞ্চিত লৌহ আকরের পরিমাণ বেশী। কিন্তু আমাদের বার্ষিক লৌহ উৎপাদন ১৯৫৮ সালে ছিল মাত্র ৫৭ লক্ষ টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক উৎপাদন ইহার প্রায় ৫০ গুণ বেশী। ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। সঞ্চিত ম্যাঙ্গানিজ আকরের পরিমাণ ১১ কোটি টনের কিছু বেশী। ১৯৫৮ সালে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষ টন। আমাদের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজন ছিল ৬০ হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ। শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। অভ্র উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রথম। অভ্র বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রেডিও ও এরোপ্লেন এবং রবারশিল্পে ব্যবহৃত হয়। বক্সাইট, চুণাপাথর, ফসফেট, লবণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভারত প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু এ্যাসবেষ্টোস, তামা, সোনা, সিসা, নিকেল, পটাস, টিন, দস্তা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ভারতে খুবই সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোনটি মোটেই পাওয়া যায় না।

শিল্পে উন্নতি লাভ করিতে হইলে সস্তা চালকশক্তির (power) প্রয়োজন। চালকশক্তির তিনটি উৎস—খনিজ তৈল, কয়লা ও জলবিদ্যুৎ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে আমাদের খনিজ তৈল প্রয়োজন হইত বার্ষিক ৭০ লক্ষ টন। ইহার মধ্যে ৬৬ লক্ষ টনই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইত। পূর্বে আসাম হইতে সুরু করিয়া পশ্চিমে বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া তেলের অন্বেষণ চলিতেছে। এখন পর্যন্ত কয়লাই চালকশক্তির প্রধান উৎস। কয়লার ব্যাপারে আমাদের আশঙ্কিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। ১০০০ ফুট নীচে পর্যন্ত কয়লা হিসাব ধরিলে ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৬০০০ কোটি টন। উৎকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ অনেক কম। ১৯৩৭ সালে ভারতীয় কয়লা কমিটির হিসাবে ভাল কয়লা ১২২ বৎসর পরে নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ছাই বেশী ও আর্দ্র—এজন্য আমাদের কয়লা গুণের দিক দিয়া নিকৃষ্ট। কয়লা দেশের সর্বত্র পাওয়া যায় না। মোট কয়লার শতকরা প্রায় ৯৮ ভাগ ধানবাদ ও রাণীগঞ্জ অঞ্চলে পাওয়া যায়। মাদ্রাজ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে এই কয়লা রেলপথে লইয়া যাইতে হয়। তাহাতে খরচ পড়ে বেশী। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কয়লার যথাযথ ব্যবহার হওয়া দরকার। অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ করিতে হইবে। জলবিদ্যুতের ব্যাপারে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ। কয়লা যেখানে পাওয়া যায় না, জলবিদ্যুৎ প্রস্তুত করিবার সুযোগ সেখানে আছে। আমরা প্রায় ৩৫০ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারি। কার্যতঃ উৎপাদন হয় ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট। ভাকরা-নাংগল, হীরাকুঁদ, চম্বল রিহান্দ, দামোদর প্রভৃতি বহুমুখী পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(৭)
চালকশক্তি

জমির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Land) : উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

জমির যোগান নির্দিষ্ট (Supply of Land is fixed) : জমি প্রকৃতির দান। মানব শত চেষ্টাতেও জমির যোগান বাড়াইতে পারে না। মানুষের সংস্পর্শে আসার পর জমির আদিম অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। প্রকৃতির দান ও মানুষের প্রয়াস এক হইয়া গিয়াছে। কার্যতঃ কতখানি প্রকৃতির দান আর কতখানি মানুষের সৃষ্টি বলা অসম্ভব। যুক্তির দিক দিয়া কিন্তু এই দুই অংশ আলাদা করিয়া দেখার প্রয়োজন আছে। সার প্রয়োগ করিয়া আবাদী জমির উর্বরতা বাড়ান যায়। আবার অযত্নের ফলে উর্বরতা হ্রাস পায়। এই অংশ মানুষের সৃষ্টি, সুতরাং

(১)
খাজনা বাড়লেও জমির যোগান বাড়ে না।

পরিবর্তনীয়। প্রাকৃতিক অবস্থান এবং স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ও তাপের বার্ষিক পরিমাপের উপরও উর্বরতা নির্ভর করে। এই অংশ প্রকৃতির দান—সুতরাং অ-পরিবর্তনীয়। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে জমির হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু এই কমা বাড়ার উপর মানুষের হাত নাই। সুদের হার বাড়িলে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িবে। ফলে মূলধন বাড়িতে পারে। খাজনা যতই বাড়ুক মানুষ জমির পরিমাণ বাড়াইতে পারে না।

জমির উৎপাদন ব্যয় নাই (Land has no cost of production)—জমি উৎপাদন করিতে কোন খরচ লাগে না। জমি এমনই পড়িয়া আছে। আমরা ব্যবহার না করিলেও জমি পড়িয়াই থাকিবে। উৎপাদনের কাজে না লাগাইয়া জমি অন্যভাবে ব্যবহার করিবার উপায় নাই। শ্রমের যোগান অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে শ্রমিকের বাল্যাবস্থায় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মজুরী না দিলে কেহ শ্রম করিবার কষ্ট স্বীকার করিবে না। শ্রম না করিয়া অবসর ভোগ করিবে। সুদ না দিলে কেহ বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত করিয়া সঞ্চয় করিবে না। মূলধনের যোগান হ্রাস পাইবে। সরকার যদি কর বসাইয়া খাজনায় মোটা অংশ কাড়িয়া লয়, তবুও জমির মালিক জমির যোগান কমাইতে পারে না। জমির অন্য বিকল্প ব্যবহার নাই। জমি হইতে যে খাজনা পাওয়া যাইবে তাহার সবটাই নীট লাভ।

(২)
খাজনা কমিলেও জমির যোগান কমে না।

জমি স্থানান্তর করা যায় না (Land is immobile)—কোন জিনিষের স্থানীয় যোগান বাড়াইবার দুইটি পথ আছে। জিনিষটির স্থানীয় উৎপাদন বাড়ান চলে অথবা উৎপাদন না বাড়াইয়া অন্যস্থান হইতে জিনিষটি আমদানী করিয়া যোগান বাড়ান যায়। জমির যোগান নির্দিষ্ট। সুতরাং প্রথম রাস্তা বন্ধ। জমি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করাও যায় না। যোগান বাড়াইবার দ্বিতীয় রাস্তাও খোলা নাই। এলাকা যতই ছোট হোক, জমির মালিকগোষ্ঠী একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী। জমির চাহিদা বাড়িলে, দাম সেজন্য অনেকখানি বাড়িয়া যায়। দুর্গাপুরে নূতন কারখানা হইল। লোক সমাগম বাড়িল। জমির চাহিদা বৃদ্ধি পাইল। জমির দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে জমি চালান করিয়া দুর্গাপুরে জমির যোগান বাড়ান যায় না। তার ফলে জমি অগ্নিমূল্য হইয়া পড়িয়াছে।

(৩)
জমির মালিক একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী।

জমির বিভিন্ন জাতীয় (Land is heterogenous)—জমির গুণগত তারতম্য আছে। পলিগঠিত জমির উর্বরতা লোভনীয়। রাজস্থানের উর্বর মৃত্তিকায় কঠোর পরিশ্রমেও সামান্য ফসল হয়। কোন খনির কয়লা প্রথম শ্রেণীর। কোন খনির কয়লার গ্রাহক পাওয়া কঠিন। অবস্থানের দিক দিয়াও জমির পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অন্য উপাদানের ক্ষেত্রেও অবশ্য গুণগত তারতম্য বর্তমান। সব শ্রমিক সমান দক্ষ নয়। কোন সংগঠক প্রচুর লাভ করে। আবার এমন সংগঠকও আছে যে কোন প্রকারে ব্যবসায় টিকিয়া আছে।

(৪)
জমির উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য দেখা যায়।

জমির বেলায় ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধি প্রযোজ্য (Land obeys the Law of Diminishing Returns)—অনেক অর্থশাস্ত্রবিদের মতে জমিতে অধিক পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদনের চেষ্টা করিলে ক্রমহ্রাসমান বিধির সম্মুখীন হইতে হইবে। অর্থশাস্ত্রে এই বিধির প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক। শিল্পে এই বিধি অচল এমন কথা বলা যায় না। আবার কৃষিতেও এই বিধির প্রয়োগ স্থগিত রাখা যায় না এমন নয়। নীচে এই বিধির বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

(৫)
ক্রমহ্রাসমান বিধি কোথায় প্রযোজ্য।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি (Law of Diminishing Returns)—এই বিধির মূলে রহিয়াছে কৃষকের অভিজ্ঞতা। কৃষক দেখিয়াছে শ্রম ও মূলধন যে হারে বাড়ান হয়, উৎপাদন সেই হারে বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। আমাদের সাধারণ জ্ঞান একই কথা বলে। শ্রম বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন যদি সেই হারে বৃদ্ধি পাইত, তবে জনসংখ্যা বাড়ার জন্য আতঙ্কিত হইবার কারণ থাকিত না। একটি ফুটবল খেলার মাঠেই সমগ্র দেশের খাদ্য উৎপাদন করা যাইত। অর্থশাস্ত্রের বিধি হিসাবে এই অভিজ্ঞতাকে ইংরেজ অর্থশাস্ত্রবিদ মার্শাল এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—একই জমিতে ক্রমান্বয়ে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিলে, শ্রম ও মূলধন যে হারে বাড়ান হইবে **সাধারণতঃ** মোট উৎপাদন সেই হারে না বাড়িয়া তাহার চেয়ে কম হারে বাড়িবে—**যদি ইতিমধ্যে কৃষিপ্রণালীর কোন উন্নতি না ঘটিয়া থাকে।**

মার্শালের বর্ণনা

উদাহরণ সাহায্যে এই বিধির ব্যাখ্যা অনেক সহজ হয়। একটি কাল্পনিক উদাহরণ পরপৃষ্ঠায় ছকের আকারে দেওয়া হইল।

স্থির উপাদান জমি	পরিবর্তনীয় উপাদান শ্রমিক (খাবিভাক মূলধন সহ)	মন হিসাবে মোট উৎপাদন	মন হিসাবে প্রান্তিক উৎপাদন বা একজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করার ফলে মোট উৎপাদন যতটা বাড়ে	মন হিসাবে গড় উৎপাদন শ্রমিক পিছু
৪ বিঘা	১	৩	৩	৩ ('৩৩)
"	২	১২	৯	৬ ('১৭)
"	৩	২৭	১৫	৯ ('১১)
"	৪	৪০	১৩	১০ ('১০)
"	৫	৪৫	৫	৯ ('১১)
"	৬	৪৮	৩	৮ ('১৩)
"	৭	৪৯	১	৭ ('১৪)
"	৮	৪৮	—১	৬ ('১৭)

বিভিন্ন উৎপাদনের সহযোগিতা না হইলে উৎপাদন সম্ভব হয় না। কৃষির ক্ষেত্রেও জমি ছাড়া শ্রম ও মূলধনের প্রয়োজনীয়তা আছে। যে দেশে জমি প্রচুর পাওয়া যায়, সেখানে লোকে বেশী জমি চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিতে পারে। উৎকৃষ্ট জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। অতএব চাষ বাড়াইতে হইলে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জমি চাষ না করিয়া উপায় থাকিবে না। উৎকৃষ্ট জমিতে শ্রমও মূলধন নিয়োগ করিয়া যতটা উৎপাদন হয়, নিকৃষ্ট জমিতে সেই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে উৎপাদন হইবে কম। শ্রম ও মূলধন বাড়াইলে মোট উৎপাদন বাড়িবে। কিন্তু মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে। জমির পরিমাণ বাড়াইয়া চাষ করাকে ব্যাপক কৃষি পদ্ধতি (extensive cultivation) বলে। ব্যাপক চাষে ক্রমহ্রাসমান বিধির প্রয়োগ হইবে এ কথা সহজেই বুঝা যায়। অধিকাংশ দেশেই শস্য উৎপাদন বাড়াইবার এই সহজ রাস্তা খোলা নাই। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমস্ত জমি চাষে আসিয়া গিয়াছে। শস্য উৎপাদন বাড়াইবার একমাত্র পথ একই জমিতে অধিকতর শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা। ইহাকে আত্যন্তিক (intensive) চাষ বলে। আমাদের উদাহরণে আমরা জমির পরিমাণ বরাবর ৪ বিঘা ধরিয়াছি। জমি এক্ষেত্রে স্থির উপাদান। একই জমিতে শ্রম ও মূলধন ক্রমাগত নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন কিভাবে বাড়ে তাহাই আমাদের ছকে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ব্যাপক ও আত্যন্তিক চাষ

শ্রম ও মূলধন বাড়াইয়া চলিলে মোট উৎপাদন কমে না। মোট উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমে। পরিবর্তনীয় উপাদান এক একক বাড়াইলে মোট উৎপাদন যতটা বাড়ে তাহাকে **প্রান্তিক উৎপাদন বলে**। প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িয়া চলিলে মোট উৎপাদনও বাড়তি হারে বৃদ্ধি পাইবে। প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইলে, মোট উৎপাদনও কমতি হারে বাড়িবে। শ্রমিকসংখ্যা বাড়াইলে, মোট উৎপাদন বাড়িবে, কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন কমিবে। শ্রমিক সংখ্যা যথেষ্ট বাড়াইলে, মোট উৎপাদন শেষ পর্যন্ত কমিতেও পারে। আমাদের ছকে দেখা যায় শ্রমিক সংখ্যা ৭ হইতে বাড়াইয়া ৮ করিলে মোট উৎপাদন ৪৯ হইতে কমিয়া ৪৮ হইয়াছে। প্রান্তিক উৎপাদন এখানে ঋণাত্মক (negative)। কার্যতঃ কেহ এতদুর অগ্রসর হইবে না। জমি প্রকৃতির দান। ইহার জন্য কোন ব্যয়ের প্রয়োজন নাই। শ্রম ও মূলধন বাড়াইলে ব্যয়ও বাড়িবে। মোট উৎপাদন বাড়িবার সম্ভাবনা না থাকিলে, কেহ কষ্ট করিয়া অধিক শ্রম ও মূলধন যোগাইবে না।

মোট উৎপাদন বাড়ে কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন কমে।

আমাদের উদাহরণে শ্রমিক সংখ্যা ৩ হইতে বাড়িবার পর হইতে প্রান্তিক উৎপাদন কমা সুরু করিয়াছে। প্রান্তিক উৎপাদন ১৫ হইতে কমিয়া ১৩ হইল। এখনও কিন্তু ক্রমহ্রাসমান বিধির ক্রিয়া সুরু হয় নাই। এই পর্যায়েও গড় উৎপাদন ৯ হইতে বাড়িয়া ১০ হইয়াছে। মাথা পিছু প্রকৃত আয় বাড়িয়াছে। শ্রমিক সংখ্যা ৪ হইতে ৫ করিলে, শুধু যে প্রান্তিক উৎপাদন কমে, তাহা নয়। গড উৎপাদনও ১০ হইতে কমিয়া ৯ হয়। এইখান হইতেই ক্রমহ্রাসমান বিধি সুরু হইল। ইহার পর শ্রমিক সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, গড় উৎপাদনও সঙ্গে সঙ্গে কমিতেছে। পরিবর্তনীয় উপাদান ১ হইতে ২ অর্থাৎ শতকরা ১০০ ভাগ বাড়াইলে, মোট উৎপাদন ৩ হইতে ১২ অর্থাৎ শতকরা ৩০০ ভাগ বাড়ে। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান বিধি সুরু হয় নাই। এই রকম শ্রমিক সংখ্যা ৩ হইতে ৪ করিলে অর্থাৎ শতকরা ৩৩⅓ ভাগ বাড়াইলে মোট উৎপাদন ২৭ হইতে ৪০ হয় অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বাড়ে। এখনও ক্রমহ্রাসমান বিধি সুরু হয় নাই। শ্রমিক সংখ্যা ৪ হইতে বাড়াইয়া ৫ করিলে কিন্তু এই বিধির প্রয়োগ হইল। পরিবর্তনীয় উপাদান এক্ষেত্রে বাড়নে হইল শতকরা ২৫ ভাগ। অথচ মোট উৎপাদন ৪০ হইতে ৪৫ হইল অর্থাৎ শতকরা ১২½ ভাগ বাড়িল। শ্রম ও মূলধন যে হারে বাড়ান হইল মোট উৎপাদন তাহার চেয়ে কম হারে বাড়িল। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধির প্রয়োগও সুরু হইল।

প্রান্তিক উৎপাদন কমিলেই এই বিধির প্রয়োগ সুরু হয় না। প্রান্তিক উপাদান কমিবার ফলে যখন গড় উৎপাদন কমিবে তখনই ক্রমহ্রাসমান বিধি কার্যকর হইয়াছে ধরিতে হইবে।

শ্রমিক সংখ্যা বাড়াইলে প্রথম হইতেই যে গড় উৎপাদন কমিবে তাহা বলা হয় নাই। আমাদের উদাহরণে শ্রমিকসংখ্যা ১ হইতে বাড়িতে বাড়িতে ৪ হইল। এই পর্যায়ে শ্রম ও মূলধন যে হারে বাড়ান হইতেছে, মোট উৎপাদন তাহার চেয়ে বেশী হারে বাড়িতেছে। গড উৎপাদনও বাড়িতেছে। শ্রমিকসংখ্যা বাড়াইয়া ৪এর বেশী করিলে তবেই ক্রম-হ্রাসমান বিধি কাজ করিতেছে। কোন স্থির উপাদানকে যথাযথ কাজে লাগাইতে হইলে তাহার সহিত নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিবর্তনীয় উপাদান দরকার। কতটা পরিবর্তনীয় উপাদান লাগাইলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাইবে অর্থাৎ সর্বাধিক গড উৎপাদন পাওয়া যাইবে তাহা আগে হইতে সঠিক বলা যায় না। স্থির ও পরিবর্তনীয় উপাদান যে অনুপাতে সংযুক্ত করিলে গড় উৎপাদন সর্বাধিক হয়, তাহাকে **কাম্যতম** (optimum) **অনুপাত** বলা লয়। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিয়া এই অনুপাত ঠিক করিতে হয়। আমাদের উদাহরণে দেখা যায় ৪ বিঘা জমিকে ভালভাবে চাষ করিতে ৪ জন শ্রমিকের দরকার। জমিতে আগাছা বেশী এবং জমি সমতল নয়। সেজন্য ১ জনের পক্ষে জমি ঠিক করিয়া চাষ করা সম্ভব নয়। আবার ৫ জনের অধিক শ্রমিক দরকার হইতেছে না। তাহা হইলেও গড় উৎপাদন কমিয়া যাইতেছে। ধরা যাক জমি অফুরন্ত, জনসংখ্যা ৪। এই ৪ জন মিলিয়া ৪ বিঘা জমি চাষ করিলে মোট উৎপাদন হইবে ৪০ মণ। জমি চাহিলেই পাওয়া যায়। সেজন্য কেহ এককভাবে ৪ বিঘা চাষ করিবে না। তাহা হইলে মোট উৎপাদন হইবে মোটে ১২ মণ। স্থির উপাদান অর্থাৎ জমির তুলনায় পরিবর্তনীয় উপাদান অর্থাৎ শ্রমিকের সংখ্যা অল্প হইলে, শ্রমিকসংখ্যা বাড়াইয়া কাম্যতম অনুপাতে আসিতে হইবে। এখন উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে না বাড়িয়া ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িবে। ইহার পরও যদি শ্রমিকসংখ্যা বাড়ান হয় তবেই ক্রম-হ্রাসমান বিধির প্রয়োগ সুরু হইবে; মার্শালের 'সাধারণতঃ' কথাটি ব্যবহার করিবার তাৎপর্য এইভাবে বুঝিতে হইবে।

কাম্যতম অনুপাত বজায় রাখার জন্য পরিবর্তনীয় উপাদান বাড়ান দরকার হইলে এই বিধি তখনকার মত খাটিবে না। ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিলে এই অনুপাত ঠিক থাকিবে না। তখন এই বিধি প্রযোজ্য হইবে।

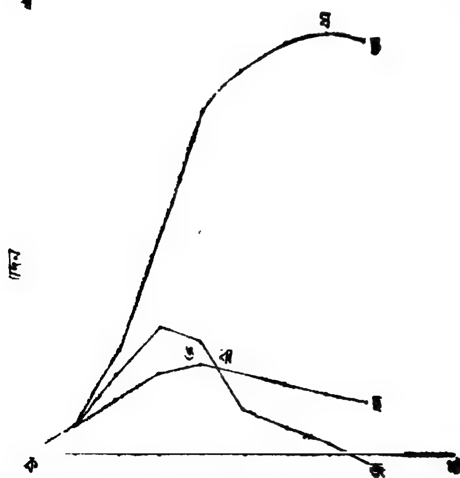
কাম্যতম অনুপাত চিরকাল একই থাকে না। আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন হয়। তাহার ফলে কাম্যতম অনুপাতেরও পরিবর্তন ঘটে। যে কোন নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট একটি উৎপাদন পদ্ধতি ও তদনুযায়ী নির্দিষ্ট কাম্যতম অনুপাত থাকিবে। সেই অনুপাত ছাড়াইয়া গেলে এই বিধির সম্মুখীন হইতে হইবে। আমাদের উদাহরণে শ্রমিকসংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে ৪ করা হইয়াছে।

ধরা যাক ইতিমধ্যে উৎপাদন পদ্ধতির গুরুতর পরিবর্তন ঘটিল। ফলে শ্রমিকসংখ্যা ৫ করায় মোট উৎপাদন বাড়িয়া ৪৫ এর পরিবর্তে ৬০ হইল। পরিবর্তনীয় উৎপাদন বাড়িল শতকরা ২৫ ভাগ—মোট উৎপাদন বাড়িল শতকরা ৩৩⅓ ভাগ। অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান বিধি এখনও সুরু হয় নাই। এখন ধরা যাক কাম্যতম অনুপাত হইল ৪ বিঘা জমির সঙ্গে ৭ জন শ্রমিক। শ্রমিকসংখ্যা বাড়িয়া চলিলে আবার এই অনুপাত ছাড়াইয়া যাইবে এবং ক্রমহ্রাসমান বিধিও পুনরায় দেখা দিবে। কৃষিপদ্ধতির উন্নতি এই বিধির প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারে—তাই বলিয়া এই বিধিকে একেবারে নাকচ করিতে পারে না।

কৃষিপ্রণালীর উন্নতি হইলে এই বিধি সাময়িকভাবে বিলম্বিত হয় মাত্র।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিকে ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের বিধিও বলা যায়। জমি প্রকৃতির দান। ইহার কোন উৎপাদন খরচ নাই। শ্রম ও মূলধন সৃষ্টি করিতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। *গড় উৎপাদন যেখানে সব চেয়ে বেশী, পরিবর্তনীয়* উপাদান সেখানে সবচেয়ে বেশী কার্যকর। মণ প্রতি পরিবর্তনীয় উপাদান ব্যয় সেখানে সবচেয়ে কম। আমাদের উদাহরণে মণ প্রতি পরিবর্তনীয় উপাদান ব্যয় শেষ স্তম্ভে বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হইয়াছে। যখন কাম্যতম অনুপাত বজায় থাকে, তখনকার অবস্থা হইল ৪ জন শ্রমিক (মূলধনসহ) ৪ বিঘা জমি চাষ করিয়া ৪০ মণ উৎপাদন করে। প্রতি শ্রমিক (মূলধনসহ) গড়ে উৎপাদন করে ১০ মণ। অর্থাৎ ১ মণ উৎপাদন করার জন্য $\frac{1}{10}$ বা ·১০ শ্রমিক (মূলধনসহ) প্রয়োজন। অন্য যে-কোন পর্যায়ে গড় উৎপাদন ব্যয় ইহার চেয়ে বেশী।

ক্রমবর্ধমান ব্যয়বিধি হিসাবে এই নিয়মের ব্যাখ্যা।



নিম্নের রেখাচিত্রটি ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধিকে বুঝিতে সাহায্য করিবে—

কখ ও কগ পরস্পরের উপর লম্ব। ক হইতে কখ রেখার উপর দিয়া পরিবর্তনশীল উপাদান অর্থাৎ শ্রমিক সংখ্যা (মূলধনসহ) মাপা হইতেছে। ক হইতে কগ রেখার উপর দিয়া উৎপাদন মাপা হইতেছে। কগ রেখার

উপর প্রতি অর্ধ-ইঞ্চিতে ১ জন শ্রমিক বুঝাইতেছে। কগ রেখার উপর প্রতি ইঞ্চিতে ১০ মণ বুঝাইতেছে। কচ মোট উৎপাদন-রেখা। ঘ বিন্দুর পর হইতে মোট উৎপাদন রেখা আর উর্ধে না উঠিয়া কখ রেখার নিকটবর্তী হইতেছে। এখানে ৭ জন শ্রমিক নিয়োগ করা হইয়াছে। আরও শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন কমিবে। কজ প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। কছ গড় উৎপাদন রেখা। আমাদের ছক হিসাবে ঙ বিন্দুর পর হইতে অর্থাৎ ৪ জনের বেশী শ্রমিক নিয়োগ করিলে ক্রমহ্রাসমান বিধির প্রয়োগ সুরু হয়। আমাদের রেখাচিত্রে দেখা যায় ৪ হইতে ৫এর মধ্যে অর্থাৎ ঙ বিন্দু পার হইয়া তবে ক্রমহ্রাসমান বিধি সুরু হইতেছে। ইহার কারণ রেখাচিত্রে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে শ্রম যেরকম খুশী বাড়ান কমান যায়। শ্রমের অসীম বিভাজ্যতা ধরিয়া লইলে, গড উৎপাদন রেখা ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা যেখানে ছেদ করিবে অর্থাৎ ঝ বিন্দুর পর হইতে গড উৎপাদন কমিয়া আসিবে এবং ক্রমহ্রাসমান বিধি সুরু হইবে। কেননা প্রান্তিক উৎপাদন যতক্ষণ গড উৎপাদন হইতে বেশী থাকিবে ততক্ষণ গড উৎপাদন বাড়িবে। ঝ বিন্দুর ডাইনে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা গড উৎপাদন রেখার নীচে থাকিয়া যাইতেছে—গড উৎপাদন কমিতেছে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধির খনি, মৎস্যচাষ ও গৃহনির্মাণে প্রয়োগ (Application of the Law of Diminishing Returns to Mines, Fisheries and Building Land) ঃ ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধির প্রয়োগ কৃষিকার্যে সীমাবদ্ধ নয়। খনিজ দ্রব্য আহরণের ক্ষেত্রেও ইহার প্রয়োগ হয়। খনির মধ্যে গুণের তারতম্য আছে। যে সব খনির উৎপাদিকা শক্তি বেশী, তাহাদের সংখ্যা অগুণতি নয়। নিকৃষ্ট খনিতে কাজ করিলে, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া ক্রমশঃ কম উৎপাদন হইবে। উৎপাদন খরচ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিবে। উৎকৃষ্ট খনিতেও ক্রমাগত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে এই বিধির সম্মুখীন হইতে হইবে। খনিজ দ্রব্য আহরণের জন্য ক্রমশঃ নীচে নামিতে হইবে। আলো ও হাওয়ার জন্য খরচ বাড়িবে। মাল বেশীদূর টানিতে হইবে—পরিবহন খরচও বাড়িবে। উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিবে ও খরচ বাড়িবে।

খনিজ উৎপাদনে প্রয়োগ

মাছ ধরিবার ব্যাপারেও এই নীতির প্রয়োগ সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। নদীতে মাছের যোগান অফুরন্ত নয়। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে ক্রমশঃ বেশীদূর যাইতে হইবে। নৌকা ও জাল বেশী রাস্তা বহন করিতে হইবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খেপের সংখ্যা কমিয়া আসিবে। ফলে উৎপাদন কম হারে বাড়িবে। সমুদ্রে মাছ ধরার ব্যাপারে এই বিধি প্রযোজ্য

মাছধরার ব্যাপারে প্রয়োগ

নাও হইতে পারে। এখানে মাছের পরিমাণ কার্যতঃ অফুরন্ত ধরা যায়। সুতরাং বেশীদূর যাইবার প্রশ্ন উঠে না। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার নাও কমিতে পারে।

গৃহ নির্মাণের ব্যাপারেও এই বিধি প্রযোজ্য। বাসস্থান বাড়াইতে হইলে নূতন নূতন গৃহনির্মাণ করিতে হইবে (ব্যাপক পদ্ধতি) অথবা গৃহকে ক্রমশঃ উঁচুর দিকে বাড়াইতে হইবে, তিনতলার স্থলে চারতলা করিতে হইবে (আত্যন্তিক পদ্ধতি)। নূতন নূতন গৃহনির্মাণ করিতে হইলে সহরের কেন্দ্রস্থল হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে হইবে। ভাড়া কমিবে, আবার 'তলা' বাড়াইয়া চলিলেও শেষ পর্যন্ত আয় কমিবে। একতলার চেয়ে দোতলার ভাড়া বেশী, তাই বলিয়া দোতলার চেয়ে পাঁচতলার ভাড়া বেশী নয়।

শিল্পে ক্রমহ্রাসমান উৎপন্ন বিধি প্রযোজ্য কি? (Does the Law of Diminishing Returns apply to Manufactures ?) ঃ জমির ব্যাপারে এই বিধির প্রয়োগ অনিবার্য, কিন্তু শিল্পে ইহার প্রয়োগ নাও হইতে পারে,—এই রকম ধারণা প্রচলিত আছে। এই ধারণার মূলে কতটা সত্য আছে যাচাই করিতে হইবে।

কাম্যতম অনুপাত বজায় না থাকিলে এই বিধির প্রয়োগ হয়। উৎপাদন করিতে বিভিন্ন উপকরণের একত্র সমাবেশ প্রয়োজন। এই উপকরণগুলির মধ্যে কোন একটির পরিমাণ যদি অ-পরিবর্তনীয় হয়, তবে কাম্যতম অনুপাত বজায় রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উৎপাদনের উপাদান বাড়াইতে হইবে। এই উপাদানগুলির কতকগুলি বাড়ান যাইতেছে—অথচ একটি বিশেষ উপাদান বাড়ান যাইতেছে না। এই অবস্থায় কাম্যতম অনুপাত বজায় থাকিবে না। ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সমস্ত উপাদানের পরিমাণ বাড়ান সম্ভব।

জমির দীর্ঘমেয়াদী যোগানও নির্দিষ্ট। সেজন্য জমির ব্যাপারে এই বিধির বিশেষ প্রয়োগ হয়।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে শ্রম ও মূলধন বাড়ান যায় বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে জমির যোগান বাড়ান যায় না। জনসংখ্যা যদি অনবরত বাড়িয়া চলে, মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমিয়া যাইবে। আমাদের উদাহরণে মাথাপিছু ১ বিঘা জমি কাম্যতম অনুপাত ধরা হইয়াছিল। জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিলে মাথাপিছু আর ১ বিঘা জমি দেওয়া চলিবে না। কারণ জমির পরিমাণ দীর্ঘ মেয়াদেও বাড়ান যায় না। সমগ্র সমাজের দিক হইতে বিবেচনা করিলে স্বীকার করিতেই হইবে জমির ব্যাপারে এই বিধির বিশেষ প্রয়োগ হয়।

বিশেষ ব্যবসা সংগঠনের তরফ হইতেও এই বিধির আলোচনা করা যায়। যে কোন ব্যবসা সংগঠনে উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদানের একত্র উপস্থিতি প্রয়োজন। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে উপাদান বাড়াইতে হইবে। দীর্ঘ সময় পাইলে সমস্ত

উপাদান যথেচ্ছ বাড়ান যায়। কিন্তু স্বল্প সময়ে কোন কোন উপাদান বাড়ান সম্ভব হয় না। হয়ত বিদেশ হইতে আমদানি হয় এই রকম যন্ত্রপাতি দরকার। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে অতিরিক্ত যন্ত্রের প্রয়োজন। যন্ত্র আমদানি করিতে সময় লাগিবে। ততদিন একই যন্ত্রের সঙ্গে অধিক শ্রম ও কাঁচামাল নিয়োগ করিয়া উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। কারখানার ঘরবাড়ীও খুব শীঘ্র বাড়ান যায় না। পাশের জমির মালিক হয়ত জমির দাম খুব বেশী দাবী করিতেছে। মিউনিসিপ্যাল সংস্থার হয়ত বাড়ীর নক্সা অনুমোদন করিতে দেরী হইতেছে। প্রয়োজনীয় গৃহনির্মাণের সরঞ্জাম হয়ত বাজারে নাই। যতদিন গৃহনির্মাণ না হইবে, ততদিন ঘরবাড়ীকে স্থির উপাদান হিসাবে ধরিতে হইবে। স্বল্প সময়ে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে কাম্যতম অনুপাত বজায় রাখা কঠিন। ফলে ক্রম-হ্রাসমান বিধির প্রয়োগ হইবে। কৃষিতে জমির গুরুত্ব অধিক। এই বিধির প্রয়োগও সেজন্য আশু অনিবার্য। শিল্পে ইহার প্রয়োগ বিলম্বে হইতে পারে। কেননা এখানে জমির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম। শিল্প ইহার প্রয়োগ হইতে একেবারে রেহাই পাইতে পারে না। কেননা জমির গুরুত্ব কম হইলেও জমির সাহায্য ছাড়া শিল্প চলিতে পারে না।

শিল্পে প্রয়োগ

আমরা দেখিয়াছি উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ঘটিলে এই বিধির প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিতে পারে। শিল্পে উন্নতির সম্ভাবনা বেশী। সেজন্য শিল্পের ক্ষেত্রে হয়ত এই বিধির প্রয়োগ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিতে পারে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহারা অত্যন্ত আশাবাদী তাহাদের নিকট এই মুলতুবী কাল অত্যন্ত দীর্ঘ। শিল্পে কার্যতঃ এই বিধির প্রয়োগ হইবে না ইহাই তাহাদের ধারণা।

শিল্পে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত থাকিতে পারে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধি ও ভারত (The Law of Diminishing Returns and India): ভারতের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ক্রমবর্ধমান জনতার খাদ্য যোগান রীতিমত সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। মাথাপিছু জমির পরিমাণ কমিয়া চলিয়াছে। কাম্যতম অনুপাত আমরা অনেকদিন অতিক্রম করিয়া গিয়াছি। গড় উৎপাদন কমিয়া চলিয়াছে। খাদ্যের ব্যাপারে নিদারুণ ঘাটতি দেখা দিয়াছে। কৃষি পদ্ধতির উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে আমাদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইবে। ভারতে কৃষি পশ্চাৎপদ কেন? কি করিয়া ইহার উন্নতি করা যায় তাহা আলোচনা করা দরকার। জমির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করার সময় আমরা দেখিয়াছি জমির

এই বিধির প্রয়োগ স্থগিত রাখিতে হইলে কৃষি পদ্ধতির উন্নতি অর্থাৎ জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে হইবে

উৎপাদিকা-শক্তি কতকটা প্রকৃতির উপর এবং বাকীটা মানুষের উপর নির্ভর করে। মানুষের উপর যে অংশটি নির্ভর করে, তাহা বাড়ানো মানুষের উপরই নির্ভর করে। কৃষি পদ্ধতির উন্নতি মানেই উৎপাদিকা-শক্তির এই পরিবর্তনীয় অংশের বৃদ্ধি। উৎপাদিকাশক্তি না বাড়াইতে পারিলে ক্রমহ্রাসমান বিধির হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই।

ভারতে জমির উৎপাদিকা-শক্তি যে কোন দেশের তুলনায় কম। নীচের ছক হইতে আমাদের শোচনীয় অবস্থা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। ভারতে শতকরা ৭০ ভাগ জনসংখ্যা কৃষির উপর নির্ভর করে। শিল্পায়ন মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে কৃষির উপর চাপ বিশেষ কমিবার আশা নাই। সুতরাং আমেরিকার অনুকরণে অতিকায় যন্ত্রপাতির সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ খামার চাষ ভারতে চলিবে না। ভারতে জনপ্রতি উৎপাদন অপেক্ষা একর প্রতি উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টাই আগে করিতে হইবে। উন্নত আত্যন্তিক চাষের দিকে নজর দিতে হইবে। সামান্য যন্ত্রপাতি ও জনবল ব্যবহার করিয়া এই উন্নতি সাধন করিতে হইবে।

ধান		গম		তুলা	
ভারত	৯৬১ পাউণ্ড	ভারত	৫৮৬ পা.	ভারত	৮০ পা.
পাকিস্তান	১,২৬১ „	পাকিস্তান	৮৬৩ „	পাকিস্তান	১৮৪ „
ব্রহ্ম	১,২৪০ „	মা. যুক্তরাষ্ট্র	৯৪৯ „	মা. যুক্তরাষ্ট্র	২৭৪ „
মিশর	৩,৩৩৩ „	অষ্ট্রেলিয়া	৯৭৯ „	রাশিয়া	২৮৫ „
জাপান	৩,৫৩৩ „	ইন্দোনেশিয়া	১,০৫০	মিশর	৪২৮ „
		ব্রিটেন	২,৪৩৬ „		

১৯৪৯-৫০ সালের হিসাব উপরে দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর ভারতে কিছু উন্নতি হইয়াছে। ধান, গম, তুলার একর প্রতি উৎপাদন বাড়িয়া যথাক্রমে ১,১০০ পা, ৭১৩ পা, ও ৯২ পা, হইয়াছে (১৯৫৪-৫৫)।

আমাদের দেশে অনেক সময় একটি মাত্র ফসল উৎপাদন করা হয়। একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার জন্য দরকার হইলে সেচের ব্যবস্থা করিতে হইবে। চীনাবাদাম জাতীয় ফসল মাটির তলায় হয়। এই ধরণের ফসল জমিতে সারের কাজ করে। জমির উর্বরতা বাড়ে।

বিরামহীন চাষের ফলে উর্বরতা ক্ষয় হইতেছে। অথচ সার প্রয়োগ করিয়া উর্বরতা বাড়াইবার চেষ্টা মোটেই নাই। মৃত্তিকার উপরিভাগ জলের স্রোতে ভাসিয়া যায়। সঙ্গে উর্বরতাও কমিয়া যায়। জল জমিয়া ও লোনা ধরিয়া এবং বালুকা চাপা পড়িয়া জমি ক্রমশঃ খারাপ হইয়া চলিয়াছে। জলের স্রোতবেগ কমাইবার জন্য ক্ষেতের দুইধারে বাঁধ দেওয়া, বনভূমি প্রসার করা এবং গোমহিষাদির নির্বিচারে

চরিয়া বেড়ান সংকুচিত করা দরকার। প্রথম পরিকল্পনায় এই বাবদ প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ভারতের জমিতে ফসফেট, নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থের অভাব আছে। গোময় জ্বালান হিসাবে ব্যবহার না করিয়া সার হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। শাক সবজি ও অন্যান্য যে সব আবর্জনা নষ্ট করা হয় তাহা পচাইয়া সার তৈয়ার করা যায়। মানুষের মলমূত্রও এই কাজে লাগান যায়। তৈলবীজ রপ্তানি কমাইয়া দেশে তেল উৎপাদন করিতে হইবে। তাহা হইলে খইল দেশেই থাকিয়া যাইবে। এই খইল অতি উত্তম সার। কৃত্রিম সার প্রস্তুত করিয়া নাইট্রোজেন ও সুপার ফসফেটের অভাব মিটাইতে হইবে। ১৯৫১ সালে সিন্ধ্রিতে কৃত্রিম সার তৈয়ারীর কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এখানে ৪ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ার হয়। উৎপাদন আরও বাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহা বাদে নাংগল, নোভলী এবং রৌরকেল্লায়ও কৃত্রিম সার উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে ৬ লক্ষ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করা হয়। ইহার মধ্যে ২ লক্ষ টন বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়।

সার

ভারতে কৃষিতে খুব সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কৃষি কমিশনের মতে যন্ত্রপাতি ভারতীয় কৃষকের পক্ষে মোটামুটি উপযোগী। ইস্পাতের লাংগল, ইক্ষু মাড়াইবার কল, ছোট ছোট পাম্প ইত্যাদি ছোটখাট যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ আছে। যন্ত্রপাতি রকমারি করিলে কৃষকের সুবিধার চেয়ে অসুবিধা হইবে বেশী। অল্প কয়েকরকম যন্ত্রপাতি চালু করা দরকার। কৃষক যাহাতে এইগুলি ব্যবহার করে সেদিকে নজর দিতে হইবে।

যন্ত্রপাতি

উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার করিলে এমনিতেই উৎপাদন শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ভারতে কৃষক পেটের জ্বালায় অনেক সময় বীজ খাইয়া ফেলে। বীজ রাখিবার অব্যবস্থার জন্য বীজের অবনতি হয়। উৎকৃষ্ট ধরণের বীজের উপকারিতা সম্বন্ধে চাষী বেশ ওয়াকিবহাল। আসলে এই ধরণের বীজের পরিমাণ নিতান্ত অপ্রচুর এবং বিলি করিবার ব্যবস্থা নিতান্ত অসন্তোষজনক। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩,০০০ বীজ তৈয়ারীর খামার প্রস্তুত করিবার কথা।

উন্নত ধরণের বীজ

কীটের আক্রমণে ও পঙ্গপালের উপদ্রবেও অনেক লোকসান হয়। এরূপ বীজ ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে পোকা না ধরে। বিদেশ হইতে পোকাধরা চারাগাছ আমদানি বন্ধ করিতে হইবে। ডি. ডি টি. জাতীয় কীটবিনাশক ব্যবহার করিতে হইবে। সস্তাদরে বিক্রী করিতে হইলে, এগুলি দেশে উৎপাদন করিতে হইবে।

কীট ও পঙ্গপাল

গোমহিষ ভারতীয় কৃষকের সবচেয়ে বড় মূলধন। বলদ দিয়া চাষ হয়। গরু-মোহিষ হইতে দুধ, মাখন ও ঘী পাওয়া যায়। গোময় হইতে জ্বালানী ও সার হয়।

গোমহিষাদি

ভারতের জন সংখ্যার মত গোমহিষাদির সংখ্যাও অত্যধিক। আবাদী জমির একর পিছু ভারতে ইহাদের সংখ্যা ৯৮, মিশরে ২৫। অথচ আমাদের দেশে চারণভূমির একান্ত অভাব। পুষ্টির অভাবে গোমহিষাদি কঙ্কালসার। মড়ক নিবারণ করিয়া ও খাদ্য উৎপাদন বাড়াইয়া ইহাদের উন্নতি করিতে হইবে।

সেচব্যবস্থার দ্বারা জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়ান যায়। ভারতের মৃত্তিকা শুষ্ক। জলের জন্য মৌসুমীবায়ুর উপর নির্ভর করিতে হয়। মৌসুমীবায়ুর কোন নিশ্চয়তা নাই। কখন সুরু হইবে, কখন শেষ হইবে কেহ বলিতে পারে না। জলসেচের

সেচব্যবস্থা

ব্যবস্থা না করিলে কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা নাই। ১৯৫৫-৫৬ সালের হিসাবে ভারতের মোট আবাদী জমির শতকরা প্রায় ১৮ ভাগে সেচের ব্যবস্থা আছে। পুকুর, পাতকুয়া, নলকূপ ও খাল দিয়া সেচ হইতে পারে। নদী উপত্যকার বহুমুখী পরিকল্পনাগুলিতে একসঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ ও বন্যানিরোধের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বড় বড় সেচ পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মাঝারি ও ছোটখাট পরিকল্পনার দিকে বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে। ছোটখাট সেচ পরিকল্পনার ব্যয় কম—অথচ ইহার ফল পাইতে বেশী দেরী হয় না। প্রথম পরিকল্পনায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর নূতন জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ২ কোটি ১০ লক্ষ একর নূতন জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিতে নিযুক্ত। জনসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু বাড়তি জনসংখ্যার সংস্থান করিবার মত শিল্পোন্নতি এখনও হয় নাই। ফলে মাথাপিছু চাষের জমি ক্রমেই ক্ষুদ্র হইতেছে। আবার একই কৃষকের জমি ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন থাকায়, খণ্ডীকরণের সমস্যা আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। বৃহদায়তন কৃষি ব্যবস্থার সুযোগ পাইতে হইলে এই খণ্ড খণ্ড জমি একত্র করিতে হইবে। সরকার জমির মালিকানা নিজের হাতে লইয়া বৃহদায়তন কৃষিব্যবস্থা চালু

সমবায় চাষ

করিতে পারেন। কিন্তু কৃষকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি করিয়া সুফল পাইবার আশা কম। বরং সমবায় প্রথার সাহায্যে কৃষকের ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় রাখিয়া বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ লইবার চেষ্টা করা দরকার। উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি হইলে কৃষিতে নিযুক্ত

কিছু লোক উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িবে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের প্রসার করিয়া ইহাদের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কৃষকের সাগ্রহ সহযোগিতা না থাকিলে, উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি কাগজে কলমেই থাকিয়া যাইবে। কার্যতঃ কোন উন্নতি হইবে না। জমি কৃষকের—জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়িলে কৃষকের নিজের আয় বাড়িবে। কৃষক যদি তাহা মনে না করে, তবে উহার উৎসাহ থাকিবে না। এই উদ্দেশ্যে জমিদারী প্রথার বিলোপ করা হইয়াছে। জমিদারের পরিবর্তে সরকারকে খাজনা দিলেই ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ লইল না। ন্যায্য খাজনা নির্ধারণ করিতে হইবে। কৃষক সহজে জমি হইতে উৎখাত না হয় তাহা দেখিতে হইবে। কোন চিরস্থায়ী উন্নতি করিবার পর উৎখাত হইলে তাহার জন্য উচিত ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত কৃষককে জমির মালিক হইবার সুযোগ দিতে হইবে।

ভূমি সংস্কার

বীজ, সার বা বলদ কিনিতে, জমির স্থায়ী উন্নতি করিতে বা ফসল গুদামে রাখিয়া সুবিধামত বিক্রয় করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। ভারতীয় চাষী দরিদ্র। এই অর্থে নিজে যোগান দিবার ক্ষমতা তাহার নাই। মহাজনের নিকট হইতে চড়া সুদে ঋণ না করিয়া উপায় নাই। ১৯৫৫ সালের হিসাবে ভারতীয় চাষী বৎসরে ৭৫০ কোটি টাকা ধার করে। এই ঋণের মোটা অংশ অনুৎপাদনশীল কাজে—যেমন বিবাহ শ্রাদ্ধ বা মামলা-মোকদ্দমায়—খরচ করা হয়। সমগ্র ঋণ চাষের কাজে লাগান হইলে সমস্যা এত গুরুতর হইত না। অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকিলে চাষের কাজ ব্যাহত হইবে। সরকার ও সমবায় সমিতির সহায়তায় এই ব্যবস্থা হইতে পারে। কৃষিঋণ যোগাইবার কাজে রিজার্ভ ব্যাংকও বর্তমানে মনোযোগ দিয়াছে।

সমবায়, সরকার ও রিজার্ভ ব্যাংক মারফত অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা।

অনেক সময় কৃষক মহাজনের নিকট হইতে দাদন লয়। ফসল উঠিবার আগেই পূর্বনির্ধারিত মূল্যে বিক্রী হইয়া থাকে। এই নির্ধারিত মূল্য বাজারদাম অপেক্ষা বেশ কম। গ্রামের হাটে ব্যাপারীরা ফসল ক্রয় করিয়া থাকে। নগদ অর্থের প্রয়োজনে যাতায়াতের অসুবিধা, এবং সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে বিক্রয় করিবার অক্ষমতার জন্য কৃষক ফসল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্তী হাটে বা গ্রামে ব্যাপারীর নিকট ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। কৃষক সেজন্য সুবিধাজনক দাম আদায় করিতে পারে না। রাস্তাঘাটের সংস্কার ও গুদামঘর নির্মাণ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় সমবায় গঠন করিতে হইবে। ইহার পরও যদি কৃষক সন্তোষজনক দামে বিক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তবে সরকারকে ন্যায্য ফসল কিনিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বিক্রয় ব্যবস্থার সংস্কার

মাথাপিছু কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ভারতে ০'৮৪ একর—জাপানে ০'৩১ একর। অথচ জাপানে খাদ্যাভাব এত প্রকট নয়। উপরি-উক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করিলে ভারতে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি নিশ্চই বাড়িবে। কৃষকের ও দেশের নিশ্চিত উন্নতি ঘটিবে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **What is meant by Land in Economics? What are its characteristics as a factor of production?**

   অর্থশাস্ত্রে জমি বলিতে কি বুঝায়? উৎপাদনের উপাদান হিসাবে জমির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
   [পৃষ্ঠা ৪৩, ৪৬–৪৮]

2. **Explain the Law of Diminishing Returns. Does the Law apply to (a) mines, (b) fisheries and (c) manufacture?**

   ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নবিধির ব্যাখ্যা কর। এই বিধির প্রয়োগ (ক) খনিজ শিল্পে (খ) মাছ ধরায় ও (গ) শিল্পে হয় কি না কারণ দেখাইয়া বুঝাও। **[পৃষ্ঠা ৪৮-৫৫]**

3. **How can you increase the productivity of Land? Illustrate your answer with reference to India.**

   জমির উৎপাদিকাশক্তি কি করিয়া বাড়ানো যায়? ভারতের উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া লেখ।
   [পৃষ্ঠা ৫৫-৫৮]

4. **Explain the causes of low agricultural yield in India. What measures may be adopted for the improvement of agricultural productivity?**

   ভারতে কৃষিতে উপাদনের হার কম কেন? উৎপাদনের হার বাড়াইবার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার? **[পৃষ্ঠা ৫৫-৫৯]**

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রম

(Labour)

যাহারা দৈহিক শ্রম করে তাহাদিগকেই আমরা সাধারণ ভাষায় শ্রমিক বলি। অর্থশাস্ত্রে কিন্তু মানসিক শ্রম যাহারা করে তাহাদিগকেও শ্রমিক বলা হয়। মুটে মজুর যেমন শ্রমিক, শিক্ষক ও কেরাণীও ঠিক তেমনিই শ্রমিক। উৎপাদনের কাজে কিছুমাত্র সহায়তা যাহারা করে তাহারা সকলেই শ্রমিক। প্রকৃতির দান যেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, সেখানেও বিনা পরিশ্রমে অভাবপূরণ হয় না। প্রকৃতি যেখানে কৃপণ, সেখানে অভাবপূরণ করিতে হইলে কঠোর পরিশ্রম দরকার। শ্রম ব্যতীত শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ দিয়া অভাব মিটে না। তবে প্রাকৃতিক সম্পদের মত

শ্রমের যোগান অ-পরিবর্তনীয় নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে বা অধিকতর দক্ষতা অর্জনের ফলে শ্রমের যোগান বাড়িতে পারে। জাতীয় আয় বাড়ানর অন্যতম উপায় হইল শ্রমের যোগান বাড়ান। সুতরাং শ্রমের যোগান কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করে আলোচনা করা দরকার।

শ্রমের যোগান

(Supply of Labour)

(১) **জনসংখ্যা** (Population) : জনসংখ্যা বাড়িলে সাধারণতঃ শ্রমিকসংখ্যাও বাড়ে। চীনদেশের শ্রমিকসংখ্যা স্বভাবতই বৃটেনের শ্রমিকসংখ্যা হইতে অনেক বেশী। বয়স হিসাবে জনসংখ্যার বিন্যাস, স্ত্রী পুরুষের অনুপাত এই সব ব্যাপারের উপরও শ্রমিকসংখ্যা নির্ভর করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ১৫ হইতে ৬৯ পর্যন্ত যাহাদের বয়স তাহাদিগকে কর্মক্ষম ধরা যায়। শিশু ও অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি কর্মক্ষম নয়। ইহাদিগকে শ্রমিকের হিসাব হইতে বাদ দিতে হইবে। দুইটি দেশের জনসংখ্যা সমান। একটি দেশে ১৫—৬০ বয়স্ক ব্যক্তিরা জনসংখ্যার ৫০%—অন্য দেশটিতে এই বয়সের লোকেরা জনসংখ্যার ৪০%। এক্ষেত্রে প্রথমদেশের শ্রমিকসংখ্যা দ্বিতীয় দেশের শ্রমিক সংখ্যা হইতে বেশী হইবে। অনেক দেশে স্ত্রীলোকদের বাহিরে কাজ করার রেওয়াজ নাই। এইসব দেশে যদি স্ত্রীলোকের অনুপাত বাড়ে, তবে জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকসংখ্যা কমিবে।

জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা বেশী হইলে জনসংখ্যা বাড়িবে। মৃত্যুহার বেশী হইলে জনসংখ্যা কমিবে। ইহাকে জনসংখ্যার স্বাভাবিক হ্রাসবৃদ্ধি বলে। আবার দেশ হইতে বিদেশে লোক গেলে অথবা বিদেশ হইতে দেশে লোক আসিলেও জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়। আজকাল সমস্ত দেশেই আইন করিয়া বিদেশীদের স্থায়ীভাবে আগমন প্রায় নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানান্তর গমনের ফলে জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আর হয় না। জন্মহার ও মৃত্যুহারের উপরই জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে।

(২) **কাজের সময়** (Working hours) : শ্রমের যোগান কেবলমাত্র শ্রমিকের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। শ্রমিক দৈনিক বা সাপ্তাহিক কত ঘণ্টা খাটে তাহার উপরও শ্রমের যোগান নির্ভর করে। সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার পরিবর্তে যদি ৪০ ঘণ্টা খাটিবার নিয়ম চালু হয়, শ্রমের যোগান তাহা হইলে কমিবে। বেতনসহ ছুটি ও অন্যান্য ছুটি যত বেশী দেওয়া হইবে শ্রমের যোগান তত কমিবে।

(৩) **শ্রমিকের দক্ষতা** (Efficiency of Labour) ঃ অনেক সময় দেখা যায় দিন ১০ ঘণ্টা খাটিয়া শ্রমিক যতটা উৎপাদন করে, দিন ১২ ঘণ্টা খাটিলে উৎপাদন তাহার চেয়ে কম। অর্থাৎ অত্যধিক খাটুনির ফলে দক্ষতা হ্রাস পায়। কাজের সময় কমাইলে যদি দক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ে, তবে সময় কমিলেও শ্রমের যোগান বাড়িতে পারে। দক্ষতাবৃদ্ধির ফলে যোগান বাড়িলে মাথাপিছু আয় বাড়িবেই। জনসংখ্যাবৃদ্ধির ভলে যদি যোগান বাড়ে, তবে মোট আয় বাড়িলেও মাথাপিছু আয় না বাড়িয়া কমিতেও পারে। শ্রমিকের দক্ষতাবৃদ্ধি অর্থ নৈতিক উন্নতির নির্ভুল মাপকাঠি। এই দক্ষতা কোন্ কোন্ উপাদানের দ্বারা নির্ধারিত হয় জানা দরকার।

শ্রমিকের দক্ষতা

(Efficiency of Labour)

(১) **প্রাকৃতিক কারণ ঃ** জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও জলবায়ু—জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দরুণ দক্ষতা কমবেশী হয় একথা স্বীকার করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের দক্ষতা অবিদিত। এখানে কিছু কিছু জাপানী ও চীনাও বাস করে। ইংরেজ আমেবিকান-দের চেয়ে জাপানী আমেরিকানদের দক্ষতা কোন অংশে কম নয়। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে যে কোন জাতির শ্রমিক দক্ষতা অর্জন করিতে পারে। দক্ষতার উপর জলবায়ুর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তি আসে। শীতের দেশে অনেকক্ষণ একটানা পরিশ্রম করা চলে। মানুষ তাহার উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে জলবায়ুর বিরুদ্ধ প্রভাব অনেকটা খণ্ডন করিতে পারে। ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতার অভাবের জন্য প্রাকৃতিক কারণকে দায়ী করা চলে না।

(২) **আয় ও জীবনযাত্রার স্তর** (Income and level of living) ঃ শ্রমিকের আয়ের উপর তার জীবনযাত্রার স্তর নির্ভর করে। জীবনযাত্রার স্তর বলিতে আমরা বুঝি—কি রকম ও কতটা খাদ্য খায়, বস্ত্র কতটা ব্যবহার করে, বাসস্থান কিরূপ, আমোদ প্রমোজের ব্যবস্থা কিরূপ ইত্যাদি। উপযুক্ত খাদ্য না মিলিলে, স্বল্পপরিসর কক্ষে অনেক পরিবারকে বাস করিতে হইলে, অসুস্থ অবস্থায় ঔষধ না জুটিলে, সামান্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা না থাকিলে, শ্রমিকের দক্ষতা কম হইতে বাধ্য। অবশ্য আয় ক্রমাগত বাড়িলে, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতাও ক্রমাগতই বাড়িবে না। অন্নবস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি ব্যাপারে একটা নিম্নতম মান থাকে। আয় যদি নিম্নতম মানে পৌঁছাইবার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে আয় বাড়াইলে দক্ষতা বাড়িবে। তার পরও আয় বৃদ্ধি হইলে দক্ষতা আর নাও বাড়িতে পারে। ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতার অভাব আমাদের জাতীয় আয়ের ক্ষুদ্রতার অন্যতম কারণ। আবার ইহাও সত্য যে আয়

যৎসামান্য বলিয়া ভারতীয় শ্রমিক দক্ষতা অটুট রাখার নিম্নতম মানে পৌঁছাইতে পারে না। ভারতীয় শ্রমিক যথেষ্ট খাদ্য পায় না। রোগে চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। বস্তীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করিতে হয়। শিক্ষার অভাবে ভারতীয় শ্রমিক তাহার সামান্য আয়ের একটা অংশ জুয়া খেলিয়া ও নেশা করিয়া নষ্ট করে। স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। উচ্চাকাঙ্খা নির্বাসিত হয়। দক্ষতা এ অবস্থায় কম হইতে বাধ্য।

(৩) **কার্যের সর্তাবলী** (Working condition): শ্রমিককে অনেকক্ষণ কাজের জায়গায়—যেমন কারখানায় কাটাইতে হয়। কি ধরণের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়, শ্রমিক মালিকের সম্বন্ধ কিরূপ—ইহার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। আমাদের দেশে শ্রমিককে যে অবস্থায় কাজ করিতে হয় তাহা মোটেই দক্ষতাবৃদ্ধির অনুকূল নয়। ভারতে বেশীর ভাগ কারখানায় বিশুদ্ধ হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা নাই। অত্যন্ত অপরিষ্কার অবস্থায় কাজ করিতে হয়। বিশ্রামের সময় ভালভাবে কাটাইবার বন্দোবস্ত নাই। এই অবস্থায় কাজ করিলে সহজেই ক্লান্তিবোধ হয়। স্বাস্থ্যে ঘুণ ধরে। কাজের আগ্রহ চলিয়া যায়।

(৪) **অন্যান্য উৎপাদনের দক্ষতা** (Efficiency of co-operating factors): শ্রম উৎপাদনের অন্যতম উপাদান। শ্রমের সহিত মূলধন ও সংগঠনও দরকার। ভারতে উপযুক্ত সংগঠকের একান্ত অভাব। সংগঠকের ত্রুটির জন্যও শ্রমিকের উৎপাদিকাশক্তি হ্রাস পায়। ভারতে মূলধন অপ্রচুর। যন্ত্রপাতির পরিমাণ কম। যে যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয় তাহাও মেরামতের অভাবে অনেক সময় জরাজীর্ণ হইয়া থাকে। ইহার ফলে শ্রমিকের দক্ষতা হ্রাস পায়।

(৫) বিভিন্ন জটিল যন্ত্র ও শ্রম বিভাগ বর্তমানকালের উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি। এই ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থার নৈপুণ্য অর্জন করিতে হইলে শিক্ষার দরকার। সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বাণিজ্যিক শিক্ষা সমস্তই দরকার। ভারতে শিক্ষার মান যে রকম নীচু, শিক্ষার বিস্তারও সেই রকম নিরাশাব্যঞ্জক। স্বাধীনতার পর একযুগ চলিয়া গেল। এখনও প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা সম্ভব হয় নাই। এখনও স্থানাভাবে কারিগরি শিক্ষায়তনের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম।

(৬) উচ্চাকাঙ্খা না থাকিলে কেহ দক্ষতা অর্জন করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে চায় না। দক্ষতা অর্জন করিয়া যদি আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিবার আশা না থাকে, তবে কেহ দক্ষ হইবার চেষ্টা করিবে না। সেইজন্য ক্রীতদাসের শ্রমের উৎপাদিকাশক্তি কম। ক্রীতদাসকে তাহার উৎপাদনের কিয়দংশ সঞ্চয় করিয়া তাহার স্বাধীনতা ক্রয়

করিবার সুযোগ দেওয়া হইলে, সে প্রাণপণে যথাসাধ্য ভাল করিয়া কাজ করার চেষ্টা করে। ভারতে অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষতার সঙ্গে উন্নতির কোনও সম্বন্ধ নাই। নানারকম দুর্নীতি এখানে প্রথাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। শ্রমিকের সুবিধার জন্য, তাহার কার্যের পরিবেশ উন্নত করার জন্য ১৯৫৮ সালে একটি আইন পাশ করা হইয়াছে। এই আইনে হাওয়া চলাচল, কারখানা পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি ব্যাপারে বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই বিধিনিষেধগুলি কার্যকরী করা দরকার। ১৯৪৬ সালের কারখানা আইনে কাজের সময় কমাইয়া সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করা হইয়াছে। বর্তমানে কাজের সময় আর কমাইবার উপায় নাই, তাহাতে উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। এই আইনেই বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থাও হইয়াছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের তত্ত্বধানে চিকিৎসা বিষয়ে বীমার ব্যবস্থা হইয়াছে। বাসস্থানের ব্যাপারে বস্তী উন্নয়ন জরুরী প্রয়োজন। বড় বড় সহরে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের তত্ত্বাবধানে শ্রমিকদের জন্য সস্তাভাড়ায় বাড়ী কিছু কিছু তৈয়ার হইয়াছে, কোন কোন প্রদেশে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বে-আইনী নেশার কারবার ও জুয়ার আড্ডাগুলিও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। শ্রমিক মালিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য শ্রমবিরোধের আশু ও ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক সংঘগুলিরও অনেক সাংগঠনিক ত্রুটি আছে। শ্রমিকদের ও জাতির স্বার্থে এই দিকেও নজর দিতে হইবে। ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

জনসংখ্যা তত্ত্ব
(Population Theory)

আমরা দেখিয়াছি শ্রমের যোগানের সহিত জনসংখ্যা বাড়া কমার নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে। জনসংখ্যা বাড়া কমার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। আবার জনসংখ্যা বাড়াকমার জন্য আর্থিক কারণও অংশতঃ দায়ী। জনসংখ্যা যখন অতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়, তখন অর্থনৈতিক জীবনের উপর ইহার প্রভাব সহজেই বুঝা যায়। যখন জনসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে, তখনও পরিবর্তন কেন হইতেছে না জানা দরকার। জনসংখ্যা বাড়িলে যোগান বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আয়ের অংশীদারও বাড়ে। জাতীয় আয়ের দিক হইতে কোন্ জনসংখ্যা কাম্যতম তাহা আলোচনা হওয়া দরকার।













খাদ্য ও জনসংখ্যা—ম্যালথাসতত্ত্ব

জনসংখ্যা সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত করেন ম্যালথাস নামে একজন ইংরেজ ধর্মযাজক ও অর্থশাস্ত্রবিদ্। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ম্যালথাস জনসংখ্যা সম্বন্ধে তাহার তত্ত্ব প্রচার করেন। তিনি বলেন জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ে। ২৫-৩০ বৎসরের মধ্যে ইহা দ্বিগুণ হয়। গণিতের ভাষায় বলা চলে জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (Geometrical progression) অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮—এইভাবে বাড়ে। খাদ্য উৎপাদন বাড়ে অনেক ধীরগতিতে। গণিতের ভাষায় বলা চলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ে পাটিগণিতিক প্রগতিতে (Arithmetical progression) অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪—এইভাবে। জনসংখ্যা বাড়ার ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে সত্য। কিন্তু জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট। সেজন্য ক্রমহ্রাসমান বিধির ক্রিয়া সুরু হয়। মোট খাদ্য উৎপাদন বাড়ে, কিন্তু মাথাপিছু খাদ্যের উৎপাদন কমে। ম্যালথাসের মূল বক্তব্য হইল, খাদ্য উৎপাদন যে হারে বাড়ে জনসংখ্যা বাড়ে তাহা অপেক্ষা দ্রুত-গতিতে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্য মিলিবে না। ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি গণিতের ভাষার সাহায্য লইয়াছেন। জ্যামিতি বা পাটিগণিতিক প্রগতি কড়ায় গণ্ডায় প্রযোজ্য না হইলেও ম্যালথাসের মূল বক্তব্য তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।

খাদ্যের ঘাটতির ফলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিবে। মৃত্যুহার বাড়িবে। যতক্ষণ জনসংখ্যা ও খাদ্য-উৎপাদন এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য ফিরিয়া না আসে, ততক্ষণ দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি চলিতে থাকিবে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্যের যোগান ছাড়াইয়া যাইবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহ আবার দেখা দিবে, মৃত্যুহার বাড়িবে, জনসংখ্যা কমিবে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধবিগ্রহকে ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের প্রাকৃতিক উপায় (positive checks) আখ্যা দিয়াছেন।

প্রাকৃতিক উপায় কার্যকরী হইলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এইভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও দূরদৃষ্টি আছে। মানুষ যদি স্বেচ্ছায় জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করে তবে জনসংখ্যা ও খাদ্য-উৎপাদনের সামঞ্জস্য ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ থাকিবে না। প্রাকৃতিক উপায়ের অমোঘ কিন্তু নৃশংস প্রয়োগ হইতেও আমরা অব্যাহতি পাইব। বিলম্বে বিবাহ, সংযম ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ করিয়া আমরা জন্মহার হ্রাস করিতে পারি। ম্যালথাস ইহাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রতিরোধমূলক উপায় নামকরণ করিয়াছেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ভর করে জন্মহার মৃত্যুহারের উপর। জন্মহার না কমাইলে মৃত্যুহার বাড়িয়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবে। বুদ্ধিমান জীব হিসাবে

আমাদের পূর্ব হইতেই সাবধান হওয়া ভাল। জন্মহার স্বেচ্ছায় হ্রাস করাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মৃত্যুহার বাড়িবার প্রয়োজন হইবে না। ইহাই হইল সংক্ষেপে ম্যালথাসের বক্তব্য।

ম্যালথুসীয় তত্ত্বের সমালোচনা

ম্যালথাসের এই তত্ত্বের নানাপ্রকার বিরূপ সমালোচনা হইয়াছে। (ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনা করিয়াছেন খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে। খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া বাড়ে না।) ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সেইজন্য তাঁহার আশঙ্কা ছিল। প্রকৃতপক্ষে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পট-ভূমিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির আলোচনা করা উচিত ছিল। (জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি মোট উৎপাদন বৃদ্ধিকে ছাড়াইয়া যায়, তবেই আশঙ্কার কারণ থাকে। এই প্রসঙ্গে গ্রেট বৃটেনের উল্লেখ করা হয়। গত চাল্লিশতাব্দীতে গ্রেট বৃটেনের জনসংখ্যা প্রায় ৬ গুণ বাড়িয়াছে। খাদ্য উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়ে নাই। তবুও গ্রেট বৃটেনের আর্থিক দুরবস্থা দেখা দেয় নাই। এমন কি মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ কমে নাই। শিল্পায়ন এই সময়ে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। শিল্পজ পণ্যের বিনিময়ে বিদেশ হইতে কৃষিজ দ্রব্য আমদানী করা সম্ভব হইয়াছে। ফলে খাদ্যের ব্যাপারে ঘাটতি দেখা দেয় নাই।) এ সমস্তই সত্য। এক দেশের পক্ষে ইহা সম্ভব। কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে যুগপৎ এই সম্ভাবনা নাই। এখন পর্যন্ত চন্দ্রলোক হইতে আমদানির কোন আশা দেখা যাইতেছে না।

ম্যালথাস ও কৃষির বৈজ্ঞানিক উন্নতি

এইখানে বলা হয় (খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধেও ম্যালথাস বর্ণিত পাটীগাণিতিক প্রগতি প্রযোজ্য নয়। ম্যালথাসের পরে কৃষি পদ্ধতির চমকপ্রদ উন্নতি ঘটিয়াছে। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি ম্যালথাসের তত্ত্বের প্রধান খুঁটি।) কৃষি পদ্ধতির উন্নতি ঘটিলে ক্রমহ্রাসমান বিধি বিলম্বিত হইবে। ম্যালথাসের আশঙ্কাও দূরে সরিয়া যাইবে। কিন্তু উন্নতি ও আবিষ্কার কোন আইন অনুসারে ঘটে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। একবার হইয়াছে, সুতরাং আবার হইবে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয় নাই। তাই বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা অমূলক বলা যায় না।

জন্মহার লইয়াও ম্যালথাসকে সমালোচনা করা হয়। জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে বাড়ে না। কিন্তু কেন বাড়ে না তাহা দেখা দরকার। ইউরোপে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জনসংখ্যার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। জন্মহার খুব বেশী

সুরু করে। জন্মহার কিন্তু বিশেষ কমে না, জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে। ইতিহাসের এই পর্যায়ে ম্যালথাস তাহার তত্ত্ব প্রচার করেন। তারপর মৃত্যুহার খুব ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। জন্মহার দ্রুত কমা সুরু করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমিতে থাকে, এমন কি কোন কোন দেশে জনসংখ্যা হ্রাসের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইহা ম্যালথাসের পরবর্তী আধুনিক যুগের ঘটনা। ভবিষ্যতের ছবি ম্যালথাসের চোখে ছিল বিভীষিকাময়। বাস্তবের সঙ্গে এই ছবির মিল নাই। ম্যালথাসের যুক্তি কিন্তু অটুট রহিয়া গিয়াছে। মৃত্যুহার বাড়িয়া বা জন্মহার কমিয়া ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। জন্মহার কমাইয়া ভারসাম্য রক্ষা করিলে কষ্ট হইবে কম। জন্মহার কমা বাড়া কিসের উপর নির্ভর করে তাহা ম্যালথাস নির্ভুলভাবে বুঝিতে পারেন নাই। এইখানেই তাহার গলদ। কিন্তু জন্মহার কোন পরিবর্তিত হয় তাহা আজও আমরা পুবাপুরি বুঝিতে রারি নাই। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ব্যাপারের উপর ইহা নিভর করে না। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ফ্যাসান, স্ত্রী-স্বাধীনতা—ইহাদের উপরও জন্মহারের পরিবর্তন নির্ভর করে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও জন্মহার কমিতে কমিতে আবার একটু বাড়িয়াছে। জীবনযাত্রার মান যত বাড়িবে, জন্মহার তত আপনা আপনি কমিবে, তাহা সত্য নয়। এই সব দেশে আজকাল সন্তানবিশিষ্ট পরিবার বিরল। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অবিবাহিত ও একসন্তানবিশিষ্ট পরিবার আগেকার মত দেখা যায় না। জন্মহারের কেন পরিবর্তন হয় তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজও হয় নাই।

ম্যালথাস ও জন্ম-মৃত্যু-হার

পাশ্চাত্য দেশে ম্যালথাসের ভূত দেখিয়া আজ কেহ ভয় পায় না। কিন্তু এশিয়ার জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে উন্নতি ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থার ফলে মৃত্যুহার হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু জন্মহার কমে নাই। আমাদের মত অর্ধোন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চিন্তিত হইবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে।

ম্যালথুসীয় আশঙ্কা

জনসংখ্যা ও জাতীয় আয়—কাম্যতম জনসংখ্যা (Optimum Population): জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যও আছে। খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িতে পারে না ভাবিয়া ম্যালথাস সন্ত্রস্ত হইয়া ছিলেন। বর্তমান অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার আলোচনা করেন। যে কোনও দেশে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আছে। ইহাকে পুরাপুরি কাজে লাগাইতে হইলে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার প্রয়োজন। এই নির্দিষ্ট জনসংখ্যা থাকিলে জাতীয়

কাম্যতম জনসংখ্যা তত্ত্ব

আয় বৃদ্ধির হার ও মাথাপিছু জাতীয় আয় সর্বোচ্চ হয়। জনসংখ্যা ইহার চেয়ে বেশী হইলে মাথাপিছু আয় কমিবে। এক্ষেত্রে জনাধিক্য (over population) ঘটিয়াছে বলিতে হইবে। আবার জনসংখ্যা যদি পূর্বনির্দিষ্ট জনসংখ্যার চেয়ে কম হয়, তাহা হইলেও মাথাপিছু আয় কমিবে। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বাড়িলে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য আরও ভাল করিয়া কাজে লাগান যাইবে। ফলে মাথাপিছু আয় বাড়িবে। এরূপ অবস্থায় দেশকে জনবিরল (under-populated) বলিতে হইবে। যে জনসংখ্যা থাকিলে মাথাপিছু জাতীয় আয় সর্বোচ্চ হয় তাহাকে কাম্যতম (optimum) জনসংখ্যা বলা যায়। এই তত্ত্ব ক্রমহ্রাসমান বিধির একটি বিশেষ প্রয়োগ মাত্র। সেখানে আমরা দেখিয়াছিলাম, স্থির ও পরিবর্তনশীল উপাদানের মধ্যে একটি কাম্যতম অনুপাত আছে। সর্বোচ্চ গড় উৎপাদন হইতে গেলে এই কাম্যতম অনুপাত বজায় রাখা দরকার। এখানেও গোটা দেশের পটভূমিকায় সেই একই কথা বলা হইতেছে।

জনাধিক্য ও জনবিরলতা

কাম্যতম জনসংখ্যা তত্ত্বের বিরুদ্ধেও সমালোচনা হইয়াছে। ইহা একটি ধারণা মাত্র। ইহা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কাম্যতম অনুপাত সব সময় একই থাকে না। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে কাম্যতম অনুপাতেরও পরিবর্তন হয়। ফলে ক্রমহ্রাসমান বিধির প্রয়োগ ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত হইতে পারে। সেইরূপ মূলধন ও আবিষ্কার ইত্যাদির ফলে কাম্যতম জনসংখ্যারও পরিবর্তন হয়। নূতন সম্পদ আবিষ্কৃত হইলে এবং সেই সম্পদ কাজে লাগাইতে নূতন লোকের দরকার হইলে কাম্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। আবার যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মূলধন নষ্ট হইলে, কাম্য জনসংখ্যাও হ্রাস পাইবে।

কাম্যতম জনসংখ্যা-তত্ত্ব নির্ভুল নয়

কাম্য জনসংখ্যার ধারণা কার্যতঃ প্রয়োগ করা অসম্ভব। সেদিক দিয়া ইহার সার্থকতা নাই। এই আলোচনা আর্থিক অবস্থার নির্দেশ হিসাবে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহাই হইল এই তত্ত্বের বাস্তব মূল্য। ম্যালথাসের তত্ত্ব বা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব—কোন ক্ষেত্রেই বণ্টন ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। বণ্টন ব্যবস্থার গুরুত্ব সব সময় মনে রাখিয়া আলোচনা করিতে হইবে।

কাম্য জনসংখ্যা-তত্ত্বের বাস্তব মূল্য

ভারতে জনসংখ্যা সমস্যা (Population Problem in India) : জনসংখ্যার দিক হইতে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৪১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩১ কোটি ২৮ লক্ষ—১৯৫১ সালে ৩৫ কোটি ৬৯ লক্ষ—১৯৫৮ সালে আনুমানিক ৩৮ কোটি। ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ এই দশ বৎসরে

জনসংখ্যা বাড়িয়াছে ৪ কোটি ৪১ লক্ষ। অর্থাৎ বাৎসরিক প্রায় ৪৪ লক্ষ হিসাবে—প্রতি বৎসরে শতকরা ১·২৫। ১৯৫১ সালের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির আনুমানিক হার বাড়িয়া বৎসরে ১·৮০ শতাংশ দাঁড়াইয়াছে।

জনসংখ্যা কি হারে বাড়িবে তাহা নির্ভর করে প্রধানতঃ জন্মহার ও মৃত্যুহারের উপর। ভারতে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব বেশী। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী হিসাবে ১৯৪১-১৯৫১ এই দশকে জন্মহার ও মৃত্যুহার যথাক্রমে হাজারকরা ৪০ ও ২৭। পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তথাপি জন্মহার খুব শীঘ্র কমিবে মনে হয় না। পরিবার-নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হইলেও, তাহার ফল এক পুরুষে অনুভব করা যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে মৃত্যুহার কমিয়াছে এবং আরও কমিবে। জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধান বাড়িয়া যাইবে। জনসংখ্যাও দ্রুত বাড়িয়া চলিবে। এই অবস্থা আর্থিক উন্নতির মোটেই সহায়ক নয়।

মৃত্যুহার কমিতেছে, ফলে জনসংখ্যা বাড়িতেছে

ম্যালথাসের আশঙ্কা ভারতের ক্ষেত্রে অবাস্তব নয়। ম্যালথাসের হিসাবে খাদ্য ঘাটতি ও তজ্জনিত দুর্ভিক্ষ ও মহামারী হইল জনাধিক্যের পরিচয়। খাদ্যের ব্যাপারে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। ১৯৩৮ সালে ডাঃ রাধা-কমল মুখোপাধ্যায় হিসাব করিয়া দেখান যে স্বাভাবিক উৎপাদনের বৎসরেও মাত্র শতকরা ৮৮ জনের খাদ্য দেশের মধ্যে উৎপন্ন হয়। প্রথম পরিকল্পনার সময় পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫০ সালে ৩০ লক্ষ টন ঘাটতি হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ১৯৫১ সালে ৪৭ লক্ষ টন শস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। প্রথম পরিকল্পনার আমলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৭৮ লক্ষ টন বাড়িবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। কার্যতঃ বাড়ে আরও বেশী। তবুও ১৯৫৩ সালে ২০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিতে হয়। আমাদের খাদ্য পুষ্টিকর দিক দিয়াও নিকৃষ্ট। জনপ্রতি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ৩০০০ ক্যালরি প্রয়োজন। আমাদের মাথাপিছু হিসাব ১৫০০ ক্যালরি। পাশ্চাত্য দেশে কৃষির উৎপাদিকা শক্তি অনেক বেশী। সেখানেও পুষ্টিকর খাদ্য যোগান দিতে মাথাপিছু ২ একর জমি দরকার হয়। আমাদের দেশে মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমি ১·৫০ একর—মাথাপিছু কর্ষিত জমির পরিমাণ ০·৯ একর।

ম্যালথাস তত্ত্বের ক্ষেত্র—ভারত

উৎপাদনের ঘাটতি

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব

দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে নূতন ব্যাপার নয়। অনেকে বলেন দুর্ভিক্ষ খাদ্যের অভাব হইতে হয় না। ক্রয়ক্ষমতার অভাব ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটির ফলেই দুর্ভিক্ষ

হয়। দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও, জন্মহার ও মৃত্যুহার যে অত্যন্ত বেশী সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। জনসংখ্যা বৎসরে ৩০ লক্ষ করিয়া বাড়িতেছে। কৃষিপদ্ধতির উন্নতি অবশ্য সম্ভব। কিন্তু এই উন্নতি রাতারাতি হইতে পারে না। কৃষি উন্নয়ন দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। এই সময়ে জনসংখ্যা আবার বাড়িয়া চলিবে। পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে জনস্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক ব্যবস্থার ফলে মৃত্যুহার কমিবে। জন্মহার কমিতে অনেক দেরী, জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বাড়িতেও পারে। ভারতবর্ষে জনাধিক্য আছে স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

জন্মহার ও মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশী, এবং কৃষি-উন্নয়ন দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ

কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্ব অবশ্য বলে জাতীয় আয়ের পটভূমিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির আলোচনা করিতে হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার এমন কিছু বেশী নয়। মাথাপিছু আয় অতি সামান্যই বাড়িয়াছে। মাথাপিছু আয় বাড়িয়াছে—সুতরাং জনাধিক্য নাই বলা চলে। জন সংখ্যা কম হইলেও জাতীয় আয় কমিত কিনা তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদের দেশে অর্ধ বেকার ও ছদ্ম-বেকারের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অনেকেই অনন্যোপায় হইয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে, উৎপাদন বজায় রাখিবার জন্য ইহাদের প্রয়োজন নাই। কাম্য জনসংখ্যার হিসাবেও ভারতে জনাধিক্য অস্বীকার করা কঠিন। জনাধিক্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন সম্ভাবনা অস্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। কৃষি ও শিল্পের কলাকৌশলের উন্নয়ন অবশ্যই করিতে হইবে। বেকার সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। জাতীয় আয়ের অসম বণ্টন রহিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবার নিয়ন্ত্রণ মারফৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণ করিতে হইবে। তাহা হইলে শুধু কাগজ কলমের হিসাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইবে না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এই আয় বৃদ্ধির সুফল ভোগ করিতে পারিব, জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে। পরিকল্পনা গণমানসে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিবে। পরিকল্পনা সফল হইবার প্রধান একটি অন্তরায় দূর হইবে।

জাতীয় আয় ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি

বেকার সমস্যা (Unemployment): উৎপাদনের উপাদানগুলির পরিমাণ জাতীয় আয়ের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্দেশ করে। উপাদানগুলির সমস্তটা পুরামাত্রায় কাজে লাগাইতে হইবে। কিছু উপাদান যদি সম্পূর্ণ বা আংশিক নিষ্ক্রিয় থাকে, তবে জাতীয় আয় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছাইতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় শ্রম ও অন্যান্য উপাদান বেকার অবস্থায় পড়িয়া আছে। লোক কাজ খুঁজিয়া

উৎপাদনের সমস্ত উপাদানকে কাজে লাগান হয় না

কাজ পায় না। জমি অনাবাদী থাকে, কারখানা নিস্তব্ধ হইয়া আছে। এই উপাদান-গুলিকে সক্রিয় করিতে পারিলে, জাতীয় আয় বাড়িবে।

মানুষ উৎপাদনের অন্যতম উপাদান। উৎপাদনের লক্ষ্য হইল আবার মানুষের সন্তোষবিধান। সেইজন্য শ্রমের বেকারত্ব আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করিব। এই বেকারত্ব জাতীয় আয় বৃদ্ধির অন্তরায়। মূলধন বাড়াইয়া জাতীয় আয় বাড়ান সময় সাপেক্ষ। উপাদানের পরিমাণ হয়ত শীঘ্র বাড়ান যাইতেছে না। সেখানেও বেকারত্ব দূর করিয়া জাতীয় আয় বাড়ান যায়। সুস্থ সবল জীবন যাপন করিতে হইলে, শুধু খাওয়া-পরার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। খাওয়া পরা দান হিসাবে পাইলে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। খাওয়া পরা স্বয়ং অর্জন করিবার সুযোগ থাকা দরকার। আমাদের দেশে যাহারা উদ্বাস্তু হইয়া আসিয়াছে, তাহারা অনেকে খয়রাতী সাহায্য পায়। দীর্ঘদিন এইভাবে থাকার ফলে ইহাদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। কাজের আগ্রহ চলিয়া যাইতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহারা বিস্ফোরক দ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। সমাজবিরোধী শক্তির হাতে অসহায় ক্রীড়নক লইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমাজের একটা বৃহৎ অংশ বেশীদিন এই অবস্থায় থাকিলে, সামাজিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য।

বেকারত্ব দূর করিয়া সহজেই জাতীয় আয় বাড়ান যায়

বেকারের শ্রেণীবিভাগ (Types of Unemployment): বেকারত্ব কমাইয়া জাতীয় আয় বাড়ান যায়। ইচ্ছাকৃত-বেকারত্ব দূর করিবার উপায় নাই। কিছু সংখ্যক লোক স্বেচ্ছায় বেকার জীবন যাপন করে। ইহারা জীবিকা অর্জন করিবার ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে চায় না, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। কাজ না করিতে করিতে শেষে কাজ পাইলেও কাজ করার ইচ্ছা থাকে না। অনেক দেশে বেকার ভাতা চালু আছে। নাবালক সন্তানের সংখ্যা ধরিয়া ভাতার পরিমাণ হিসাব করা হয়। যে ব্যক্তির সন্তানসংখ্যা অধিক, সে কাজ করিলে যত পাইতে পারে, কাজ না করিলে বেকারভাতা হিসাবে হয়ত পায় ইহার চেয়ে বেশী। এরূপ অবস্থায় কোন কোন লোক স্বেচ্ছায় বেকারত্ব বরণ করে। এরকম লোকের সংখ্যা বেশী নয়। যাহাদের অবস্থা এই রকম তাহারাও সকলেই বেকারত্ব বাছিয়া লয় না, কারণ টাকার অঙ্কে লাভ হইলেও, ইহাতে আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের দেশে গৃহিণীরা ঘরের কাজ ফেলিয়া অফিস আদালতে চাকরী করিতে চান না। ইহাদের বেকার বলা যায় না, কেননা ইহারা কাজ পাইলেও কাজ করিতে

বেকারত্বের ধরণ

স্বেচ্ছায় যাহারা বেকার থাকে তাহাদের বিষয় আলোচ্য নয়

ইচ্ছুক নন। তাছাড়া গৃহস্থালীর কাজও উৎপাদনশীল শ্রমের পর্যায়ে পড়ে। স্বেচ্ছায় যাহারা বেকার থাকে, তাহাদের সংখ্যা নগণ্য। ইহাদের লইয়া সমস্যা দেখা দেয় না।

প্রয়োজন থাকিলেও যে কাজ পায় না সেই-ই বেকার

ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাহারা বেকার থাকিতে বাধ্য হয় তাহাদের লইয়া সমস্যা দেখা দেয়। বাজারে যে মজুরীর হার বর্তমান, সেই হারেই ইহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক কিন্তু কাজ খুঁজিয়া পায় না। বেকারত্ব বলিতে আমরা এই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বই বুঝি। এই বেকারত্ব কেন হয় তানা জানা দরকার।

চাহিদার পরিবর্তনই বেকারত্বের প্রধান কারণ

চাকরির বাজারে শ্রমের যোগান ও চাহিদার অসামঞ্জস্যের ফলেই বেকারত্ব দেখা দেয়। শ্রমের যোগানের আকস্মিক কিংবা খামখেয়ালী পরিবর্তন হয় না। বেকারত্বের কারণ খুঁজিতে গেলে শ্রমের চাহিদা কেন পরিবর্তিত হয় জানিতে হইবে। বেকারত্বের সমাধানের পথ দুইটি। চাহিদা পরিবর্তনের আকস্মিকতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া বেকারত্ব কিছু পরিমাণ দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। চাহিদা অনুসারে যোগানের পরিবর্তন যদি বিলম্বিত না হয় তবেই বেকার সমস্যার তীব্রতা হ্রাস পাইবে।

(১) **মরসুমী বেকারত্ব** (Seasonal Unemployment) ঃ উৎপন্ন সামগ্রী বৎসরের সকল ঋতুতে সমানভাবে বিক্রয় হয় না। ফ্যাসান, পালাপার্বণ, আবহাওয়া অনেক কারণে বিক্রয় ঋতুভেদে কমবেশী হয়। ফলে শ্রমের চাহিদাও কমে বা বাড়ে। শারদীয়া পূজার সময় পোষাক-পরিচ্ছদ সর্বাধিক বিক্রয় হয়। গ্রীষ্মাবকাশে বা

চাহিদার মরসুমী পরিবর্তন

পূজার সময় দার্জিলিং, পুরী প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে যাত্রী সমাগম প্রচুর হয়, হোটেল বাজার সরগরম থাকে, অন্যসময় ঝিমাইয়া পড়ে। বর্ষাকালে গৃহনির্মাণে ভাঁটা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ-মিস্ত্রীর চাহিদাও কমিয়া যায়। এই সময় আবার ছাতার বিক্রয় বাড়ে। ঋতুর প্রভাব অল্পবিস্তর সমস্ত শিল্পেই আছে। বিক্রয় যখন খুব বাড়িয়া যায়, শ্রমের চাহিদাও বাড়িয়া যায়। অধিক বেতন, ওভারটাইম ইত্যাদি দেওয়া হয়। শ্রমিকেরা আসিয়া ভিড় করে। বিক্রয় যখন কমিয়া যায়, ইহাদের অনেকে বেকার হইয়া পড়ে।

চাহিদা যখন কমিয়া যায় তখন অতিরিক্ত (Supplementary) উপজীবিকার সংস্থান করা যাইতে পারে। ধান কাটার পর কৃষকের আর বিশেষ কাজ থাকে না। এই সময়টা তার বাসস্থানের কাছাকাছি কোন কুটির শিল্প জাতীয় কাজের ব্যবস্থা

করা যাইতে পারে। তাহা হইলে আর তাহাকে বেকার হইয়া থাকিতে হইবে না।

অতিরিক্ত উপজীবিকার ব্যবস্থার দ্বারা এই বেকারত্ব দুর করা যায়

চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের সংখ্যা না বাড়িতে দিলে পরে বেকার ভয় থাকিবে না। বাড়তি লোক নিয়োগ না করিয়া কাজের সময় বাড়াইয়া চাহিদা পূরণ করা যাইতে পারে। একই কারবারে ছাতা ও ছড়ি প্রস্তুত করা যাইতে পারে—ছাতার ঋতুতে ছাতা—অন্য সময় ছড়ি। এইভাবেও সারা বৎসর ধরিয়া কাজের সংস্থান করা যায়।

(২) **সংঘাতজনিত বেকারত্ব** (Frictional Unemployment): অনেক সময় চাহিদার সাময়িক পরিবর্তন হয়। হঠাৎ কমে—আবার বাড়ে। এই বাড়া-কমা নির্দিষ্ট মরসুম-মাফিক হয় না। কোন সময় অনেক জাহাজ একসঙ্গে পৌঁছায়। মালবোঝাই ও মালখালাসের জন্য তখন ডকশ্রমিকের চাহিদা বাড়িয়া যায়।

চাহিদার আকস্মিক পরিবর্তন

আবার কোন সময় জাহাজঘাট ফাঁকা থাকে। তখন এই শ্রমিকদের কাজ জুটে না। কাঁচা মাল সময়মত নাও পাওয়া যাইতে পারে; দুর্ঘটনার ফলে যন্ত্রপাতি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; সংগঠনে অব্যবস্থা থাকিতে পারে। এই সব কারণেও শ্রমিককে সাময়িকভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। গ্যাস প্ল্যাণ্ট ফাটিয়া গেলে, মেরামত না হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিতে হইবে। কয়লা ঠিক সময়ে না আসিলে, শ্রমিকসংখ্যা কমাইতে হইবে। অনেক সময় একটা কাজ শেষ না করিয়া আরেকটা কাজ অনুসন্ধান করিতে সময় লাগে। নূতন কাজ যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত বেকারী চলিবে।

শ্রমিকের গতিশীলতা বাড়াইয়া এই ধরণের বেকারত্ব কিছুটা কমান যায়। শ্রমিক যাহাতে সহজে একস্থান হইতে অন্যস্থানে বা এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে যাইতে পারে

শ্রমিকের গতিশীলতা বাড়াইলে এই বেকারত্ব দুর হইতে পারে

তাহার জন্য অর্থসাহায্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক জায়গায় শ্রমিক কাজ খুঁজিয়া পায় না—একই সময়ে অন্যত্র মালিক শ্রমিক খুঁজিয়া পায় না। সরকারী নিয়োগসংস্থার মারফৎ খবরাখবরের ব্যবস্থা হইলে এই ধরণের বেকারত্ব হ্রাস পাইবে।

(৩) **মন্দাজনিত বেকারত্ব** (Cyclical Unemployment): একটি শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে। অপর একটি শিল্প বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। এই ভাঙ্গাগড়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। ইহার ফলে যে বেকারত্ব দেখা দেয় তাহাকে আমরা মন্দাজনিত বেকারত্ব বলি না। এক এক সময় সমস্ত শিল্পেই তেজীভাব দেখা দেয়।

তখন শ্রমিকের চাহিদা বাড়ে। আবার এক এক সময় সমস্ত শিল্পেই মন্দার ভাব দেখা দেয়। তখন শ্রমিকের চাহিদা কমে। বহু লোক বেকার হয়। আবার বাজার তেজী হয়। তারপর আবার মন্দা দেখা দেয়। নিয়মিত-ভাবে তেজী ও মন্দার অবস্থা পর পর দেখা দেয়। মন্দার সময় চারিদিকে লোক বেকার হইয়া পড়ে।

শিল্পে তেজী ও মন্দা বাজার এবং তজ্জনিত বেকারত্ব

ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত হয়। কোন্ জিনিষ কি পরিমাণে উৎপন্ন হইবে তাহা ব্যবসায়ীরাই ঠিক করে। ব্যবসায়ীরা সর্বোচ্চ লাভ করিবার জন্য উৎপাদন করে। যখন তাহারা লাভ বেশী হইবে মনে করে, তখন উৎপাদন বাড়াইয়া দেয়। জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান তখন বাড়ে। লাভ কম হইবে বা লোকসান হইবে বলিয়া যখন আশঙ্কা হয়, তখন তাহারা উৎপাদন কমাইয়া দেয়। জাতীয় আয় কমে। বহু লোক বেকার হইয়া পড়ে।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যবসায় পরিচালনা এই বেকারত্বের প্রধান কারণ

জাতীয় আয় আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি ব্যয় হইলে তবেই আয় হয়। মন্দাজনিত বেকারত্ব দূর করিতে হইলে মন্দার সময় ব্যয় বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। করের হার কমাইলে করদাতার উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ বাড়িবে। ফলে তাহারা অধিক ব্যয় করিতে সাহস পাইবে। মূলধন তৈয়ার করিতে হইলে ধার করিতে হয়। সুদের হার কমাইলে, ধারের জন্য কম সুদ দিতে হইবে। মূলধনদ্রব্য প্রস্তুত করিবার খরচ কমিবে। ব্যবসায়ীরা মূলধনদ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যয় বাড়াইতে সাহস পাইবে। সরকার খয়রাতী সাহায্যের পরিমাণ বাড়াইতে পারে এবং রাস্তাঘাট, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য আরম্ভ করিতে পারে। ইহার ফলে তখন তখন অনেক লোকের কর্মসংস্থান হইবে। ইহাদের আয় বাড়িবে। ফলে ইহাদের ব্যয়ও বাড়িবে। অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িবে। ফলে ব্যবসায়ীর উৎপাদন বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। সেই সূত্রে আবার নূতন করিয়া লোকের কর্মসংস্থান হইবে।

জাতীয় ব্যয় বৃদ্ধির প্রয়োজন

(৪) **সাংগঠনিক বেকারত্ব** (Structural unemployment): শিল্পের গঠন পরিবর্তিত হইবার ফলে যে বেকারত্ব দেখা দেয় তাহার নাম সাংগঠনিক বেকারত্ব। শিল্পের গঠন দুই কারণে বদলায়—(১) চাহিদার স্থায়ী পরিবর্তন ও (২) উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন।

চাহিদার স্থায়ী পরিবর্তন ও বেকারত্ব

চাহিদার পরিবর্তন অনেক কারণে হইতে পারে। আগে লোক পাল্কী করিয়া যাতায়াত করিত। তারপর আসিল ঘোড়ার গাড়ী, পাল্কীবেহারা বেকার হইল। এখন ট্রাম, বাস, ট্যাক্সির যুগ। গাড়োয়ানেরা বেকার হইতেছে।

উন্নত ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন এবং বেকারত্ব

উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের ফলেও সাময়িকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিশিবোতল আমাদের দেশে বেশীর ভাগ হাতে তৈরী হয়—হাপর, চুল্লী ও ছাঁচের সাহায্যে। যদি স্বনিয়ন্ত্রিত (Automatic) যন্ত্রের প্রবর্তন হয়, তবে অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়িবে। উৎপাদন ব্যয় কমাইবার জন্যই উন্নত ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। শিশিবোতলের উৎপাদন ব্যয় কমিলে তাহার দামও কমিবে। বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িবে। যন্ত্র চালাইবার জন্যই লোকের দরকার হইবে। প্রথম প্রথম পর্যায়ে যাহারা কর্মবিচ্যুত হইবে, তাহাদের আবার কাজ জুটিবে। একই কাজ নহে, একটু অন্য ধরণের, হয়ত বা অন্য শিল্পে। প্রতিনিয়ত যন্ত্রের উন্নয়ন হইতেছে। ব্যক্তির দিক হইতে তাহার বেকারত্ব সাময়িক। সমাজের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় সব সময়ই এই ধরণের বেকারত্ব রহিয়া গিয়াছে।

বেকারত্বের মীমাংসা

শ্রমিকদের নূতন কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গাড়োয়ানদের ট্যাক্সি চালান শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদের স্থানগত ও শিল্পগত গতিশীলতা বাড়াইতে হইবে। কর্মনিয়োগ-সংস্থার মারফৎ চাহিদা ও যোগানের অধিকতর সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। তাহা হইলে আর বেশীদিন বেকার হইয়া থাকিতে হইবে না।

ভারতে বেকার সমস্যা (Unemployment Problem of India) : ভারতে সব রকম বেকারই দেখা যায়। ভারতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেকার সমস্যা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব। যুদ্ধের সময় মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যা খুবই কমিয়া গিয়াছিল। এখন ইহা আবার ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

ভারতে বেকার সমস্যার স্বরূপ

ভারতে কারখানা মজুরের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। অনেক বৃহৎ শিল্পদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। চা, পাট প্রভৃতি কাঁচামালও বিদেশে রপ্তানী হয়। বিদেশে মন্দা দেখা দিলে তাহার প্রভাব এই সব শিল্পের মাধ্যমে ভারতেও দেখা দেয়। তবে অর্ধোন্নত দেশের মত ভারতের বেকার সমস্যারও কিছু বিশেষত্ব আছে। ভারতে শ্রমিকদের অনেকে, বিশেষ করিয়া কৃষিতে, অন্যের অধীনে কাজ করে না। পাশ্চাত্য দেশে মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিক সংগঠকের নিকট শ্রম বিক্রয় করে। আমাদের দেশে শ্রমিক

নিজেই নিজের নিয়োগকর্তা। মন্দাজনিত বেকারত্ব আমাদের প্রধান সমস্যা নয়। আমাদের প্রধান সমস্যা হইল অর্ধ ও ছদ্ম বেকারত্ব (Under-employment & disguised unemployment)। কৃষি ও কুটির শিল্পেই এই ধরণের বেকারত্ব বেশী দেখা যায়। কৃষি ও কুটির শিল্পের মোট উৎপাদন বজায় রাখার জন্য এত লোকের প্রয়োজন নাই। বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতেই আরও কম লোকে এই উৎপাদন করিতে পারে। উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতিতে লোকের প্রয়োজন আরও কম। অনেক বাড়তি লোক কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত আছে। কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ বা তাহারও বেশী বাড়তি জনসংখ্যা। এই অর্ধ বেকারত্বের সঙ্গে আবার মরসুমী বেকারত্বও আছে। সেচ ব্যবস্থাযুক্ত জমিতেও কৃষকের বৎসরে ৬৫।৮০ দিন কাজ থাকে না। অন্য জমিতে বৎসরে ১৫০ দিন কাজ থাকে কি না সন্দেহ।

আমাদের এই অর্ধ বেকারত্বের মূল কারণ আমাদের জনসংখ্যার পেশাগত বণ্টন অত্যন্ত একপেশে। শিল্পে আমরা অনগ্রসর। বাধ্য হইয়া জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করিতে হয়। মূলধন ও কারিগরি দক্ষতার অপ্রাচুর্য ইহার জন্য দায়ী। ইহার একমাত্র প্রতিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন। জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে। জনসংখ্যা যে হারে বাড়িবে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাহার চেয়ে দ্রুতগতিতে হওয়া দরকার।

ভারতে বেকারত্বের অন্যতম কারণগুলি

বেকারসংখ্যা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দরকার। মধ্যবিত্ত বেকার শিক্ষিত। তাহাদের সম্বন্ধেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। সকলে কর্মনিয়োগ সংস্থাকে নাম ঠিকানা জানায় না। অনেকে আবার কর্মে নিযুক্ত হইবার খবর জানান দরকার মনে করে না। অনেকে বেকার না হইয়াও ভাল চাকরির আশায় নাম তালিকাভুক্ত করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়িবে। মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যাও কমিবে। মধ্যবিত্তের বেকারত্বের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও দায়ী। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার অত্যন্ত অভাব। পশ্চিমী শিল্পোন্নত দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী কারিগরি শিক্ষালাভ করে। আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষাদানের অপ্রাচুর্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভীড় করা ছাড়া উপায় নাই। ইহার ফলে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। একদিকে লোক কাজ চাহিয়া পায় না। অন্যদিকে উপযুক্ত লোকের অভাবে কাজের ক্ষতি হয়। এই অবস্থা দূর করার জন্য কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার করিতে হইবে। কেবলমাত্র উচ্চ স্তরের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেই হইবে না। সাধারণ

মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা ও সমাধানের উপায়

কারিগরি শিক্ষা দিবার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলে কায়িক পরিশ্রম করিতে আর লজ্জাবোধ হইবে না। ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ট্যাক্সি, বাস প্রভৃতির লাইসেন্স বিতরণে, শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের ব্যাপারে সরকার সমবায় প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিতেছেন। মধ্যবিত্তের পুঁজি নগণ্য। সমবায়ের ভিত্তি ব্যতীত তাহাদের পক্ষে এই সব কাজের যথাযোগ্য মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। মধ্যবিত্তশ্রেণীর বেকার সমস্যা লাঘব করিবার উদ্দেশ্যেই সমবায় প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

গ্রামীন বেকার সমস্যা ও সমাধানের উপায়

কৃষিকাজ বার মাস থাকে না। বৎসরে বেশ কিছুদিন কৃষককে বেকার অবস্থায় কাটাইতে হয়। এই মরসুমী বেকারত্ব দূর করিতে হইলে গ্রামীন কুটিরশিল্পের উন্নতি করা দরকার। মৃতপ্রায় কুটিরশিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। সেজন্য সরকারী সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দরকার হইবে। যখন চাষের কাজ থাকিবে না, এই কুটিরশিল্পে তখন চাষীর কর্মসংস্থান হইবে। সরকারী উদ্যোগে অনেক জনহিতকর নির্মাণ কার্য হয়—যেমন রাস্তাঘাট ও বিদ্যালয় নির্মাণ, খাল খনন। চাষের কাজ যখন থাকিবে না, সেই সময় এগুলি শুরু ও শেষ করিতে হইবে। একাধিক ফসলের চাষ শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলে আর একটি ফসল উঠিয়া গেলে বেকার হইয়া থাকিতে হইবে না। চাষের কাজের সঙ্গে হাঁস মুরগী চাষেরও ব্যবস্থা করিলে সুবিধা হইবে। যেখানে এসব ব্যবস্থার কোনটিই সম্ভব হইবে না, সেখানে চাষের কাজ শেষ হইলে আশেপাশের শিল্প বা খনি অঞ্চলে কৃষককে পাঠাইতে হইবে। চাষের কাজ পুনরায় সুরু হইবার আগে গ্রামে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

লঘু শিল্পে অধিক কর্মসংস্থান হয়

মরসুমী বেকারত্বের প্রতিকার বরং সহজ। কিন্তু বারমেসে ছদ্ম-বেকারত্বের প্রতিবিধান অনেক দুরূহ। শিল্প গঠন বেকার সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। সমস্ত শিল্পে কিন্তু সমান কর্মসংস্থান হয় না। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ভারী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু ভারী শিল্পে যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, সেই পরিমাণ বিনিয়োগ লঘু শিল্পে করিলে, কর্মসংস্থান হয় অনেক বেশী। ভারী শিল্প ও লঘু শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। তাহা হইলে শিল্পোন্নতির বনিয়াদ তৈয়ারী হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বেকার সমস্যার তীব্রতাও হ্রাস পাইবে

বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক বর্জন করা সম্ভব নয়। বৈদেশিক মন্দার প্রভাব হইতেও সম্পূর্ণ রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ব্যতীত মন্দাজনিত বেকারত্ব দূর করা কঠিন।

বৈদেশিক মন্দা ও বেকারত্ব

দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে বেকার সমস্যার তীব্রতা বাড়িতেছে। দেশের জনসংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছে, তাহাতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোকের জন্য কর্মসংস্থান দরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে ৫৩ লক্ষ লোক বেকার ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে তাহা হইলে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান দরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৯৫ লক্ষ লোককে নূতন নিয়োগ-পত্র দিবার কথা হইয়াছে। তাহা হইলেও ৫৮ লক্ষ বেকার থাকিয়া যাইবে। কার্যতঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনার অনেক ছাঁটকাট করিতে হইয়াছে। সুতরাং পরিকল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা ৫৮ লক্ষের বেশীই থাকিয়া যাইবে

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বেকার সমস্যা

॥ আদর্শ প্রশ্ন ॥

1. Analyse the factors that determine the Supply of Labour in a Country.
   শ্রমের যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ৬১-৬২]

2. Explain the factors on which Efficiency of Labour depends.
   শ্রমের দক্ষতা কি কি বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় ? [পৃষ্ঠা ৬২-৬৪]

3. What are the causes of inefficiency of Indian Labour ? Suggest remedies.
   ভারতীয় শ্রমিক দক্ষ নয় কেন ? ইহার প্রতিকার কি ? [পৃষ্ঠা ৬২-৬৪]

4. What are the signs of over population in a country ? Is India over-populated ?
   কোন দেশে জনাধিক্যের চিহ্ন কি কি ? ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিয়াছে ?
   [পৃষ্ঠা ৬৪-৬৭, ৬৯-৭১ (ভারতবর্ষের জনাধিক্য স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ)]

5. Discuss the Unemployment Problem in India. Suggest remedies.
   ভারতের বেকার সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা কর। এই সমস্যা দূর করিবার উপায় কি ?
   [পৃষ্ঠা ৭৬-৭৮]

সপ্তম অধ্যায়

মূলধন

(Capital)

'মূলধন' কথাটি আমরা বাস্তব (Physical) এবং আর্থিক দুই অর্থেই ব্যবহার করি। রাস্তাঘাট, কলকারখানা, জাহাজ বন্দর—এই সব দ্রব্য বস্তুগত, মানুষের দ্বারা উৎপাদিত এবং পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হইবে। ইহাদিগকে আমরা মূলধন বলি। আবার নগদ টাকাকড়ি, ঋণপত্র, শেয়ার, এগুলিকেও আমরা অনেক সময় মূলধন বলি।

'মূলধন' দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়

মনুষ্য-উৎপাদিত, বস্তুগত, অর্থমূল্যবিশিষ্ট দ্রব্যসমষ্টিকে আমরা **বাস্তব মূলধন** (Real Capital) বলি। বাস্তব মূলধনের যে অংশ ব্যবসায়ে খাটে তাহাকে **বাণিজ্যিক মূলধন** (Trade Capital) বলা হয়। এই বাণিজ্যিক মূলধনের একটা অংশ—রাস্তাঘাট, কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি **স্থির বা নিবদ্ধ মূলধন** (Fixed Capital) নামে পরিচিত। বাণিজ্যিক মূলধনের অপর অংশকে—সমাপ্ত ও অসমাপ্ত দ্রব্যের তহবিল বা **অনিবদ্ধ মূলধন** (Circulating Capital) বলা হয়। মূলধন বলিতে সাধারণতঃ আমরা বাণিজ্যিক মূলধনই বলি। বাসগৃহ, আসবাবপত্র, রেডিও এই সব বহুবার ব্যবহার্য দ্রব্যকে **ভোগকারীর মূলধন** (Consumers' Capital) বলা হয়। এগুলি কলকারকানার মতই উৎপাদনের কাজে লাগে। উৎপাদন মানে উপযোগের সৃষ্টি। এগুলির সাহায্যে ভবিষ্যতে অভাবপূরণ করিবার আশা না থাকিলে কেহ কষ্ট করিয়া এগুলি সঞ্চয় করিত না।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ

মূলধন ও সম্পদ (Capital and Wealth) : মূলধন মাত্রই সম্পদ। কিন্তু সম্পদ হইলেই যে মূলধন হইবে তাহা নহে। জমি মনুষ্য উৎপাদিত নয়। সুতরাং জমি মূলধন নয়। কিন্তু মানুষের সৃষ্ট সমস্ত সম্পদও মূলধন নয়। মানুষের তৈয়ারী যে সম্পদ আমরা সরাসরি ভোগ করি, তাহা পুনরায় উৎপাদনের কাজে লাগে না। সুতরাং তাহা মূলধন নয়। সম্পদ ও মূলধনের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করার বাধা আছে। যে জাহাজ মাল বা যাত্রী পরিবহন করে তাহাকে মূলধন বলিতে হইবে। সেই জাহাজই যদি প্রমোদভ্রমণের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহাকে মূলধন বলা চলিবে না। ব্যবহার ভেদে একই সামগ্রী এক সময় মূলধন হইবে, অন্য সময় মূলধন

হইবে না। যে খাদ্য আমরা আহার করি, তাহাকে মূলধন বলা হয় না। কিন্তু খাদ্য যদি ক্ষুন্নিবৃত্তি না করে, তবে দক্ষতা কি করিয়া অক্ষুণ্ণ থাকিবে? ভবিষ্যতের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্যই খাওয়া পরার দরকার আছে। অনেক কারখানায় শ্রমিকদের বিনামূল্যে জলযোগ করিতে দেওয়া হয়। শ্রমিক ইহা হইতে সরাসরি উপযোগ লাভ করে। তাহার চক্ষে ইহা সম্পদ। মালিকের দৃষ্টিতে কিন্তু ইহা মূলধন। কারণ ইহা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। জাতির দিক হইতে মূলধন ও মানুষের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদ এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। শ্রম ও জমি বাদে সম্পদের অবশিষ্ট অংশকে আমরা মূলধন বা সম্পদ দুইই বলিতে পারি। ভোগকারীর দৃষ্টিকোণ হইতে যাহা সম্পদ, তাহাই উৎপাদকের চোখ দিয়া দেখিলে মূলধন।

ভোগের জন্য ব্যবহৃত সম্পদ মূলধন নয়, যে সম্পদ উৎপাদনক্ষম তাহাই মূলধন

টাকাকড়ি ও মূলধন (Money and Capital): আমরা আর্থিক দুনিয়ায় বাস করি। সমস্ত কিছু আমরা অর্থের মাপকাঠিতে প্রকাশ করি। মূলধন আমরা অর্থের মাধ্যমেই হিসাব করি। মূলধন বিভিন্ন জাতীয়। সামগ্রিকভাবে মূলধন সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সাধারণ মাপকাঠি অর্থাৎ অর্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। ফলে টাকাকড়ি ও মূলধনের মধ্যে তফাৎ করিবার প্রয়োজন অনেক সময় আমরা বোধ করি না।

ব্যক্তিকে মূলধন বাড়াইতে হইলে, প্রথমে টাকাকড়ির যোগাড় করিতে হইবে। টাকা সঞ্চয় করিতে হইবে, অথবা অন্যের নিকট হইতে তাহার সঞ্চিত টাকা ধার লইতে হইবে। এই টাকা দিয়া ব্যক্তি মালমশলা কিনিয়া নিজে বা অন্যকে দিয়া মূলধন সৃষ্টি করে। ব্যক্তির হাতে টাকার পরিমাণ বাড়া মানেই মূলধন সৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়া। ব্যক্তির পক্ষে যাহা সত্য সমষ্টির পক্ষে তাহা সব সময় সত্য নহে। জাতির বাহিরে 'অন্য' কেহ নাই, যাহার নিকট হইতে টাকার বিনিময়ে মূলধন পাওয়া যাইবে। আবার ব্যক্তির পক্ষে টাকার পরিমাণ যথেচ্ছ বাড়ান সম্ভব নয়। কিন্তু জাতির পক্ষে তাহা সম্ভব। টাকাকড়ি যদি মূলধন হইত, তবে নোট ইচ্ছামত মুদ্রণ করিয়া মূলধন বাড়ান যাইত। ভারতের মত গরীব দেশের মূলধন বাড়াইবার কোন সমস্যা থাকিত না।

অর্থ ও মূলধন আপাতঃদৃষ্টিতে এক মনে হইলেও মূলতঃ এক নয়

মন্দার সময় টাকাকড়ি বাড়াইলে, ব্যয় ও চাহিদা বাড়ে। ফলে উৎপাদনও বাড়ে। বাজার তেজী হইলে মূলধন সৃষ্টির সহায়তাও হইতে পারে। এক্ষেত্রে টাকাকড়ি নিজে উৎপাদনের উপাদান নয়। নিষ্ক্রিয় উপাদানকে সক্রিয় করিতে সাহায্য

টাকা পরোক্ষভাবে মূলধন বৃদ্ধির সহায়ক হইতে পারে

করে মাত্র। টাকাকড়ি মূলধন নয়। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মূলধন সৃষ্টির সহায়তা করিতে পারে।

ঋণ মূলধন (Security Capital)ঃ মূলধন হইতে আয় হয়। আয় হইবে এই আশাতেই মানুষ মূলধন সৃষ্টি করিবার কষ্ট স্বীকার করে। সেইজন্য অনেক সময় যাহা কিছু হইতে আয় হয় তাহাকেই আমরা মূলধন বলি। ব্যক্তির আয় ও জাতীয় আয়ের পার্থক্য আছে। ক খকে ধার দিল। বিনিময়ে ক একটি ঋণপত্র পাইল। এই লেনদেনের ফলে বাস্তব মূলধনের সৃষ্টি হইবে কি না তাহা নির্ভর করিতেছে ঋণগ্রহীতা অর্থাৎ খ-এর উপর। খ এই টাকা বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় করিতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধনের সৃষ্টি হইল না। খ এই টাকা দিয়া যন্ত্রপাতি প্রস্তুত পারে। এক্ষেত্রে মূলধনের সৃষ্টি হইল না। খ এই টাকা দিয়া যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে বা করাইতে পারে। এক্ষেত্রে মূলধন উৎপাদিত হইল। এই যন্ত্রপাতি আগুনে পুড়িয়া যাইতে পারে। সৃষ্ট মূলধন আবার বিনষ্ট হইল। ঋণপত্র কিন্তু রহিয়া গেল। ইহা হইতে ক-এর আয় হইবে। জাতির আয় যাহা ছিল তাহাই থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ খ-এর আয় কমিবে। ঋণপত্র উৎপাদনের উপাদান নয়। ইহা মূলধন নয়, এমনকি সম্পদও নয়। আয় বণ্টন নিয়ন্ত্রণ করাই ইহার একমাত্র কাজ।

মূলধনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Capital)ঃ

(১) মূলধনের মালিক ব্যক্তি বা রাষ্ট্র যে কেহ হইতে পারে। ব্যক্তি যে মূলধনের মালিক তাহাকে **ব্যক্তিগত মূলধন** (Private Capital) বলে। রাষ্ট্র—সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি মালিক হইলে তাহাকে **সমষ্টিগত মূলধন** (Collective Capital) বলে। পোতাশ্রয়, রাজপথ এই পর্যায়ে পড়ে। ব্যক্তিগত মূলধন ও সমষ্টিগত মূলধন মিলিয়া **জাতীয় মূলধন** (National Capital) হয়। জাতীয় মূলধনের হিসাব করিবার সময় ঋণপত্র, শেয়ার প্রভৃতি বাদ দিতে হইবে।

(২) **স্থায়ী ও চলতি মূলধন** (Fixed and Ciculating Capital)ঃ যে মূলধন রূপান্তর না ঘটাইয়া বহুবার উৎপাদনের কাজে লাগান যায় তাহাকে **স্থায়ী মূলধন** বলে। আর যে মূলধন একবার ব্যবহার করিলেই ফুরাইয়া যায় তাহাকে **চলতি মূলধন** বলে। বীজধান একবার কৃষির কাজে ব্যবহার করিলে আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলে না। সুতরাং ইহা চলতি মূলধন। হালের বলদ উৎপাদনের কাজে কয়েক বৎসর ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ইহা **স্থায়ী মূলধন**। কলের লাঙ্গল আরও বেশীবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ইহা হালের বলদের চেয়ে অধিকতর স্থায়ী মূলধন। ব্যবহারের ফলে লাঙ্গলের নিশ্চয় রূপান্তর ঘটে। তবে এই রূপান্তর ধীরে ধীরে হয় বলিয়া আমাদের নজরে পড়ে না।

পূর্বে আমরা দেখিয়াছি দ্রব্যের বিনাশ আমরা করিতে পারি না। লাঙ্গল কিসে রূপান্তরিত হইল? ফসল উৎপাদন করিতে হইলে জমি ও শ্রমের মত লাঙ্গলেরও প্রয়োজন আছে। একটি লাঙ্গলের আয়ু যদি ২০ বৎসর হয়, ২০ বৎসরে যে পরিমাণ ফসল হইবে, ধরিতে হইবে, লাঙ্গলটি ২০ বৎসরে সেই পরিমাণ ফসলে রূপান্তরিত হইয়াছে। ধান একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায়। বীজধানের জন্য ১ বৎসরের মেয়াদে ধার পাইলেই চলিবে। বৎসরান্তে যে ফসল পাওয়া যাইবে, তাহা বিক্রয় করিয়া ধার শোধ করা যাইবে। লাঙ্গলের জন্য ২০ বৎসরের মেয়াদে ধার দরকার।

(৩) **নিবদ্ধ ও অ-নিবদ্ধ মূলধন** (Sunk or Specialised and Free or Generalised Capital): বাজারে প্রতিনিয়ত টাকার সঙ্গে মূলধনের বিনিময় হইতেছে। দোকানদার দ্রব্যভাণ্ডার হইতে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অর্থ পাইতেছে। আবার সেই অর্থদ্বারা পুনরায় মাল ক্রয় করিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে। অর্থ যে কোন রকম মূলধন তৈয়ারীর কাজে বিনিয়োগ করা যায়। টাকা দিয়া বীজধান, গরু, সার, লাঙ্গল বা অন্য যে কোনও মূলধন সংগ্রহ করা যায়। সেজন্য অর্থ হইল অ-নিবদ্ধ মূলধনের চরম নিদর্শন। অর্থ দিয়া গরু কিনিয়া ফেলিলে আর সেই অর্থ দিয়া লাঙ্গল কিনিবার উপায় নাই। অর্থ এখন নিবদ্ধ মূলধনে পর্যবসিত হইয়াছে। একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। অর্থের তুলনায় আকরিক লৌহকে নিবদ্ধ মূলধন বলিতে হয়। আবার আকরিক লৌহের তুলনায় ইস্পাত অনেক বেশী পরিমাণে নিবদ্ধ। আকরিক লৌহ দ্বারা ইস্পাত ভিন্ন অন্য দ্রব্য তৈয়ার হইতে পারে; ইস্পাতের ব্যবহার সে তুলনায় সীমাবদ্ধ। কোন তাঁতে হয়ত রেশম ও পশম দুইই বয়ন করা যায়; আবার কোন তাঁতে হয়ত শুধু পশম বয়ন করা যায়। প্রথম তাঁতটি দ্বিতীয়টির তুলনায় অনিবদ্ধ।

মূলধনের গতিশীলতা (Mobility of Capital): টাকাকড়ি এক স্থান হইতে অপর স্থানে বা এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে স্থানান্তর করা যায়। কিন্তু মূলধন ঠিক এই ভাবে স্থানান্তর করা যায় না। টাকা দিয়া রেলপথ নির্মিত হইয়াছে। এই রেলপথ বাস্তব নিবদ্ধ মূলধন। ইহা কি করিয়া মালবাহী লরীতে পরিণত হইতে পারে? রেলপথ অক্ষয় নহে। ইহার ক্ষয়ক্ষতি আছে। ইহার মেরামতের দরকার আছে, এবং মেরামত করিলেও এমন সময় আসিবে যখন সম্পূর্ণ রেলপথ নূতন করিয়া না বসাইলে আর ব্যবহার্য থাকিবে না। এই দুঃসময় হয়ত অনেক দিন বাদে আসিবে। কিন্তু অনেক দিন বাদে হইলেও সেই সময় আসিবে। রেলপথ হইতে যে আয় হইবে তাহার একটা অংশ এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার জন্য

সরাইয়া রাখা দরকার। এইভাবে যে তহবিল গঠিত হইবে তাহার সাহায্যে নূতন রেলপথ করা যাইবে। ইতিমধ্যে যদি রেলভ্রমণের চাহিদা কমিয়া যায় ও লরীর চাহিদা বাড়িয়া যায়, তবে এই তহবিল হইতে আর নূতন করিয়া রেলপথ তৈয়ার হইবে না। মেরামতও ভাল করিয়া করা হইবে না। এইভাবেও তহবিল বাড়িবে। এই তহবিল দিয়া এখন লরী ক্রয় বা তৈয়ারী করা হইবে। মূলধন এইভাবে এক শিল্প হইতে অপর শিল্পে স্থানান্তরিত হয়।

জমি ও মূলধন (Land and Capital): (১) জমি ও মূলধন উভয়ই উৎপাদনের উপাদান। জমি প্রকৃতির দান। ইহা মৌলিক উপাদান; মূলধন মানুষের সৃষ্টি। অতীতের শ্রম ও জমির সেবা হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা মৌলিক উপাদান নহে। (২) জমি প্রকৃতির দান, সুতরাং ইহার উৎপাদন ব্যয় নাই। মূলধন হইতে গেলে সঞ্চয়ের দরকার। আর সঞ্চয় করিতে হইলে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত হইতে হইবে। এই ত্যাগ বা ব্যয় স্বীকার না করিলে মূলধনের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। (৩) জমি প্রকৃতির দান। সুতরাং ইহার পরিমাণ নির্দিষ্ট। মূলধনের পরিমাণ বাড়ান, কমান চলে। বর্তমান ভোগ যত সঙ্কোচ করা হইবে, মূলধনের পরিমাণ তত বাড়িবে। আবার মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ না করিয়া যদি বর্তমান ভোগ বাড়ান যায়, তবে মূলধনের পরিমাণ কমিবে। (৪) জমিকে আমরা প্রকৃতির দান বলি। কিন্তু প্রকৃতির দান আদিম অবস্থায় আর দেখা যায় না। মানুষের সংস্পর্শে যেদিন হইতে আসিয়াছে জমির উপর মানুষের শ্রম নিযুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে জমির চেহারা পাল্টাইয়া গিয়াছে। জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে; বেড়া দেওয়া হইয়াছে; খাল কাটা হইয়াছে; সার দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ নানাভাবে জমিতে মূলধন বিনিয়োগ করা হইয়াছে বর্তমানে আমরা যে জমি ব্যবহার করি তাহা পূরাপূরি প্রকৃতির দান নয়। ইহাতে বেশ ভাল পরিমাণে মূলধন মিশ্রিত আছে। প্রকৃতির দান এবং মানুষের সৃষ্টি—যুক্তির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন, কেন না যোগানের ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই দুইটি ধারা এমন মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদের আর পৃথক্ করা যায় না। ২৮|৫|৭৩

জমি প্রকৃতির দান, কিন্তু ব্যক্তির নিকটে ইহা বর্তমানে মূলধন

মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনের প্রকৃতি ও মূলধনের কার্যাবলী: (Nature of Capitalistic Production and Function of Capital): উৎপাদনের আদি (original) উপাদান হইল শ্রম ও জমি। এই আদি উপাদানের সাহায্যে সরাসরি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। অথবা প্রথমে মূলধন

দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে পরে ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করা যাইতে পারে। ইহার নাম **পরোক্ষ উৎপাদন**। প্রত্যক্ষ উৎপাদন পরোক্ষ উৎপাদনের মত কাযকরী নয়। কিন্তু পরোক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থায় উপাদান প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না। আগে মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইবে। মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কিছু সংখ্যক আদি উপাদান ভোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত না করিয়া মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে থাকিবে। এই আদি উপাদান-গুলির জন্য ভোগ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা থাকা চাই। নতুবা মূলধনদ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব নয়।

সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার করা যায়। ধরা যাক কোন জনসমাজে ১০০ জন শ্রমিক ও কিছু জমি আছে। ইহারা হইল উৎপাদনের আদি উপাদান। অভাব পূরণের জন্য ইহাদের একটিমাত্র ভোগ্য দ্রব্য ‘ক’ প্রয়োজন প্রতি শ্রমিক সরাসরি উপাদান ব্যবহারে বৎসরে ১২০ একক ‘ক’ উৎপন্ন করিতে পারে। মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইল। দেখা গেল ২০ জন শ্রমিক ও কিছু জমি ১ বৎসর খাটিয়া এই মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। এই এক বৎসর এই ২০ জন শ্রমিক ‘ক’ উৎপন্ন করিতে পারে না। ভোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বৎসরে ২৪০০ একক কমিয়া যাইবে। মূলধন প্রস্তুত হইতে হইলে, এই ২০ জনের বাৎসরিক খোরাকের ব্যবস্থা দরকার। এই ব্যবস্থা তিন রকমে হইতে পারে। (১) এই বৎসরের গোড়ায় আমাদের হাতে যে সম্পদের ভাণ্ডার আছে তাহাতে ২৪০০ ‘ক’ থাকা চাই। অথবা (২) বাকী ৮০ জনের প্রত্যেকে বৎসরে গড়ে অতিরিক্ত ৩০ একক ‘ক’ তৈয়ার করিবে। (৩) বাকী ৮০ জন প্রত্যেকে ১২০ একক উৎপাদন করিবে কিন্তু ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহার করিবে ৯৬ একক করিয়া।

মূলধনের কাজঃ পরোক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থায় যে আদি উপাদানগুলি মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা মূলধনের প্রথম কাজ। মূলধন দ্রব্য তৈয়ার হইয়া তাহার সাহায্যে ভোগ দ্রব্য তৈয়ার হইতে অনেকটা সময় লাগে শ্রমিক ও অন্যান্য উপাদানের মালিক এই অন্তর্বর্তী কালে না খাইয়া থাকিতে পারে না। ভোগ্য দ্রব্যের তহবিল হিসাবে ইহাদের জীবন ধারণের ব্যবস্থা মূলধনের দ্বারাই সম্ভব নয়। এই তহবিলের আকারের উপরই উৎপাদন ব্যবস্থা কতটা পরোক্ষ হইতে পারে তাহা নির্ভর করে। হাতে ১ বৎসরের খোরাক থাকা অবস্থায় আমরা ২ বৎসরে প্রস্তুত হয় এই রকম মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ঝুঁকি লইতে পারি না।

(১)
পরোক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা চলতি মূলধনের কাজ।

মূলধন দ্রব্য তৈয়ার করিতে গেলে ভোগ হইতে কিছু সময় বিরত থাকিতেই হইবে। ভবিষ্যতে ভোগের পরিমাণ বাড়িবে এই আশাতেই আমরা বর্তমানে ভোগ হইতে বিরত হই। ২০ জন শ্রমিক ১ বৎসরের জন্য ভোগ্য দ্রব্য তৈয়ার করিতেছে না। বর্তমান বৎসরের ভোগের পরিমাণ ইহার ফলে কমিতে বাধ্য। যখন মূলধন দ্রব্য প্রস্তুত হইবে, শ্রমের উৎপাদিকা-শক্তি অনেক বাড়িয়া যাইবে। এই আশাতেই আমরা এই কষ্ট স্বীকার করি। যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, এই সব স্থায়ী মূলধন দ্রব্য শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ৫ বিঘা জমির ধান কাটিতে ১ জন লোকের শুধু হাতে কাজ করিলে ২ দিন লাগিবে। কাস্তে দিয়া কাটিলে ১ দিনেই কাটা শেষ হইবে। যন্ত্রচালিত কলের সাহায্য লইলে ১ ঘণ্টাতেই ধান কাটা শেষ হইয়া যাইবে। ঢেঁকিতে ধান ভানিতে যত সময় লাগে, চাউলের কলে সময় লাগে অনেক কম। ১০০ জনেও যে ভারী জিনিষ উঠাইতে পারে না, ক্রেনের সাহায্যে সেই বোঝা ৩।৪ জন লোক আরও বেশী উঁচুতে উঠাইতে পারে।

(২)
শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি স্থায়ী মূলধনের কাজ

আমরা জানি শ্রম বিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। রাস্তার ধারের মুচি একাই সম্পূর্ণ জুতা তৈয়ার করে। বাটার কারখানায় এক জোড়া জুতা তৈয়ার করিতে অনেক লোকের দরকার হয়। কেহ সম্পূর্ণ জুতা তৈয়ার করে না। জুতা তৈয়ারীর কাজ গোড়ালী, সুখতলা, প্রভৃতি করিয়া প্রায় ৬০টি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। যে গোড়ালী লাগাইতেছে, সে সমস্তক্ষণ ওই কাজই করিয়া যাইতেছে। একটি বিশেষ ছোট কাজে লাগিয়া থাকায় দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মুচির যন্ত্রপাতি যৎসামান্য। কিন্তু বাটায় বহুবিধ যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। মুচির তহবিলে কাঁচা চামড়া বেশী না থাকিলেও চলিবে। দিনান্তে সে একজোড়া জুতা শেষ করিতে পারে কি না সন্দেহ। বাটায় একদিনে হাজার হাজার জোড়া জুতা প্রস্তুত হইতেছে, কাঁচা চামড়া ও অন্যান্য কাঁচা মাল যথেষ্ট পরিমাণে মজুত না থাকিলে বাটার উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে। যন্ত্রপাতি ও অর্ধ-সমাপ্ত দ্রব্যের তহবিল হিসাবে মূলধন সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ সম্ভব করিয়া তুলে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(৩)
সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ সম্ভব করিয়া তোলা স্থায়ী মূলধন ও অর্ধ সমাপ্ত দ্রব্যের কাজ

মূলধন বৃদ্ধির উপায় (Factors determining the Accumulation of Capital): বর্তমান ভোগ না কমাইলে, মূলধন দ্রব্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। মানুষ তাহার সংগৃহীত শস্য সমস্তটা খাইয়া ফেলিলে, মূলধন সৃষ্টি হইবে না। কিছুটা শস্য যদি সে তখন খরচ না করে, তখনকার মত তাহার ভোগ কমিবে। আগামী বার এই সঞ্চিত শস্য বীজ হিসাবে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা চলিবে।

এই মূলধনের সাহায্যে এখন শস্য উৎপাদন ও ভোগ অনেক বাড়িয়া যাইবে। চাষী শস্য বিক্রয় করিয়া অর্থ পাইল। এই অর্থ দিয়া সে তীর্থভ্রমণ করিতে বা অলংকার ক্রয় করিতে পারে। তাহা হইলে তাহার মূলধন বাড়িবে না। এই অর্থের কিছুটা দিয়া যদি সে যন্ত্রপাতি ক্রয় করে, তাহার বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত হইবে—কিন্তু ভবিষ্যতে সে উৎপাদন করিতে পারিবে অধিক পরিমাণে। সম্পূর্ণ আয় বর্তমান ভোগের জন্য খরচ করিলে চলিবে না। বর্তমান ভোগ কিয়ং পরিমাণে স্থগিত রাখিতে হইবে। **আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয়িত হয় না তাহার নাম সঞ্চয়।** সঞ্চয় না হইলে মূলধন সৃষ্টি সম্ভব নয়।

সঞ্চয় = আয়—বর্তমান ভোগজনিত ব্যয়

মূলধন উৎপাদন সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে। রবিনসন ক্রুশোর ক্ষেত্রে এই নিয়ম দিনের মত স্পষ্ট। যে দেশে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে অর্থব্যবস্থা পরিচালিত হয়—যেমন সোভিয়েট রাশিয়ায়—সেখানেও এই সম্বন্ধ বুঝিতে কষ্ট হয় না। সেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন ঠিক করে মোট উৎপন্নের কত অংশ মূলধন সৃষ্টির কাজে নিয়োগ করা হইবে। বাকী অংশ বর্তমান ভোগের জন্য থাকিবে। এখানে বর্তমান ভোগ কমাইবার একমাত্র উদ্দেশ্য মূলধন বাড়ান। বর্তমান ভোগ যত কমান সম্ভব হইবে, মূলধনবৃদ্ধি তত বেশী হইবে। ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে নানা কারণে। কেহ ভবিষ্যৎ দুর্দিনের আশঙ্কায়, কেহ অপত্যস্নেহে, কেহ বা ব্যাঙ্কের সুদের লোভে বা শেয়ারে লগ্নী করিয়া সঞ্চয় করে। লাভের আশায় যাহারা সঞ্চয় করে, তাহারা তাহাদের অর্থসঞ্চয়ের সঙ্গে উৎপাদনের সম্বন্ধ আছে একথা ঘুণাক্ষরেও মনে করে না। খুব কম লোকেই নিজের সঞ্চয়কে স্বয়ং বাস্তব মূলধনে রূপান্তরিত করার কথা ভাবে। সঞ্চয় করে একদল লোক, বিনিয়োগ করে অন্য লোক। তবুও একথা বলা যায় যে জাতির বেলাতেও সঞ্চয় ব্যতীত মূলধন সৃষ্টি সম্ভব নয়। যে মূলধন সৃষ্টি করিবে সে সঞ্চয় নাও করিতে পারে। কিন্তু মূলধন সৃষ্টি করিতে হইলে কিছু উপাদান নিয়োগ করিতে হইবে। সেই উপাদান দিয়া তখনকার মত ভোগদ্রব্য প্রস্তুত করা যাইবে না। অন্য কেহ তাহা হইলে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত করিবে। সঞ্চয় হইলে যে তাহা বাস্তব মূলধনে রূপান্তরিত হইবে সে নিশ্চয়তা এখানে নাই।

একজন শিক্ষক তাহার আয় হইতে ১০০০৲ সঞ্চয় করিলেন। তিনি এই টাকা ব্যাঙ্কে আমানত রাখিলেন এবং সুদ পাইতে থাকিলেন। কোন কারবারী ব্যাঙ্ক হইতে এই টাকা ধার করিল। তারপর ইট কাঠ কিনিল ও শ্রমিক নিযুক্ত করিয়া

তাহাদের মজুরী দিল। শেষ পর্যন্ত একটি ছোট কারখানা গৃহ নির্মিত হইল। এখানে সঞ্চয় বাস্তব মূলধনে রূপান্তরিত হইল। ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কারবারীকেই ঋণ দেয়। কিন্তু যদি কোন লোক এই টাকা ধার করিয়া প্রমোদ-ভ্রমণ করে, তবে শিক্ষকের সঞ্চয় ইচ্ছা নিষ্ক্রিয় হইয়া গেল। আমাদের সমাজব্যবস্থায় মূলধন সৃষ্টি শুধু সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে না। এই সঞ্চয় বিনিয়োগ হইতেছে কিনা তাহার উপরও মূলধন সৃষ্টি নির্ভর করে।

সঞ্চয়ের ফলে মূলধন সৃষ্টি হইলেই, সঞ্চয়ের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় না। স্থায়ী মূলধনেরও ক্ষয় আছে। এই ক্ষয় পূরণ করার জন্যও সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে। মূলধনের ক্ষয় পূরণ না করিলে, মূলধন অকেজো হইয়া পড়িবে, উৎপাদন ব্যাহত হইবে। বেশী দিন এই অবস্থা চলিলে পরোক্ষ উৎপাদন বর্জন করিতে হইবে। যুদ্ধের সময় অনেক দেশেই মূলধনের ক্ষয় পূরণ করিবার দিকে নজর দেওয়া হয় নাই। যুদ্ধোত্তর কালে সেজন্য অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। রাশিয়ায় বিপ্লবের পর উৎপাদন ভীষণ কমিয়া যায়, যন্ত্রপাতি মেরামত না হওয়ায় জরাজীর্ণ হইয়া পড়ে। অনেক শিল্পে উৎপাদন একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। মূলধন বাড়াইতে গেলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

মূলধন বৃদ্ধি নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর—(১) সঞ্চয় এবং (২) ঐ সঞ্চয়ের বিনিয়োগ।

সঞ্চয় আবার নির্ভর করে সঞ্চয়ের ক্ষমতা (Power to Save) এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছার (Will to Save) উপর। সঞ্চয়ের ইচ্ছা যতই প্রবল হোক, সঞ্চয়ের ক্ষমতা না থাকিলে সঞ্চয় হওয়া সম্ভব নয়। আবার সঞ্চয়ের ক্ষমতা থাকিলেও সঞ্চয় বেশী নাও হইতে পারে। বর্তমান ভোগের ইচ্ছা যদি অত্যন্ত বেশী হয়, তবে ক্ষমতা থাকিলেও সঞ্চয় বেশী হইবে না। সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দুইই দরকার।

সঞ্চয়ের ক্ষমতা।—আয়ের উপর সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে। জীবন ধারণের জন্য আহার, বাসস্থান ও আশ্রয় দরকার। আয় হইতে প্রথমে এই অপরিহার্য ব্যয় করিতে হইবে। এই ব্যয় মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে তবেই সঞ্চয় সম্ভব। নুন আনিতে যার পান্তা ফুরায় তার পক্ষে সঞ্চয়ের প্রশ্নই উঠে না। জীবন ধারণের এই নিম্নতম ব্যয় ধনী এবং দরিদ্রের বেলায় প্রায় একই। এই নিম্নতম ব্যয় হইতে আয় যত বেশী হইবে, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও তত বেশী হইবে।

আয়—ব্যয় = সঞ্চয়ের ক্ষমতা

সঞ্চয়ের ইচ্ছা।—সঞ্চয় সকলে একই কারণে করে না। কেহ অপত্যস্নেহে, কেহ পুত্রকন্যার শিক্ষা-দীক্ষা ও বিবাহের ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চয় করে। মানুষের মৃত্যু

যখন তখন ঘটিতে পারে। নিজের মৃত্যুতে পরিবারের যাহাতে কষ্ট না হয় সেজন্য অনেক সঞ্চয় করে। ভবিষ্যতে বিপদ-আপদ ঘটিতে পারে, তখন যাহাতে অসুবিধা কম হয় সেজন্য অনেকে সঞ্চয় করে। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, দূরদৃষ্টি সকলের সমান নহে। যার দূরদৃষ্টি বেশী, যে ভবিষ্যতের কথা ভাবে, তার সঞ্চয়ের ইচ্ছাও হয় বেশী। অসভ্য বন্য মানুষ ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে জানিত না, ফলে তাহার ভাগ্যে ছিল হয় অতিভোজন নয় অনাহার। আধুনিক কালে অর্থ শুধু দ্রব্যমূল্যের নয়, প্রভাব-প্রতিপত্তিরও মাপকাঠি। সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করিবার জন্যও অনেকে সঞ্চয় করে। ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিতে হইলে ও ব্যবসায় বড় করিতে হইলে পুঁজির দরকার, সেজন্য অনেকে সঞ্চয় করে। আবার রেডিও-গ্রামোফোন একযোগে কিনিবার সংগতি থাকে না, তিল কুড়াইয়া তাল করিতে হইবে, এজন্যও অনেকে সঞ্চয় করে।

(১)
অপত্যস্নেহ, দূরদৃষ্টি, সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভ ও ব্যবসায়ে সাফল্য

বর্তমানে ভোগ সঙ্কুচিত করিলে সঞ্চয় হয়। ভবিষ্যতে ভোগের আশা আছে বলিয়াই লোক বর্তমানে ভোগ হইতে বিরত হয়। সেই ভবিষ্যৎ যদি অনিশ্চিত হয়, তবে সঞ্চয়ের ইচ্ছা থাকিতে পারে না। দেশে যদি অরাজকতা ও শান্তিশৃঙ্খলার অভাব থাকে, তবে ধনসম্পত্তি এমন কি জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিবে। আমার সঞ্চয় ভবিষ্যতে সুবিধামত ভোগ করিতে পারিব—এ নিশ্চয়তা থাকিবে না। সেক্ষেত্রে কেহই বর্তমানে ভোগ কমাইবার কষ্ট স্বীকার করিবে না। মগের মুলুকে বা বর্গীর রাজত্বে সঞ্চয়ের স্পৃহার অপমৃত্যু ঘটিতে বাধ্য। কর, বাণিজ্য ও জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকারের নীতির অনিশ্চয়তা থাকিলেও, এই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। বর্তমান অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সঞ্চয় বাদে, নানা ব্যবসায় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান মারফৎ সঞ্চয় হয়। জাতীয়করণের খড়্গ ঝুলিয়া থাকিলে ব্যবসায়ীদের মনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যবসায়ে পুনর্নিয়োগ না করিয়া জীবনযাত্রার মান বাড়াইবার জন্য খরচ করিবে।

(৩)
সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা

সঞ্চয় কিসের মাধ্যমে হইবে তাহাও সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ধারণে সাহায্য করে। বন্য শিকারীর অন্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ। বাস্তবিক সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাহার উপায় নাই। মাংস আগেকার দিনে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা ছিল না। অতি আহার বা অনাহার না হইয়া উপায় ছিল না। এখন যে শুধু অর্থের প্রচলন হইয়াছে তাহা নয়, ব্যাঙ্ক, ডাক বিভাগীয় ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি স্থাপিত

(৩)
লগ্নি ব্যবস্থা

হইয়াছে। সঞ্চয় সংরক্ষণ করিবার সুব্যবস্থা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইবার ব্যবস্থাও হইয়াছে। ফলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িয়াছে।

(৩)
সুদের হার

সুদের হারের সঙ্গেও সঞ্চয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। আয় ঠিক থাকিলে, সুদের হার যত বাড়িবে, সঞ্চয়ের স্পৃহাও তত বাড়িবে।

ভারতে মূলধন বৃদ্ধি (Accumulation of Capital in India) :

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়াও ভারত দরিদ্র ও অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে কাজে লাগাইবার মত পর্যাপ্ত মূলধন আমাদের নাই। কি কৃষি, কি শিল্প, সর্বত্র এই একই ব্যাপার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির উৎপাদিকাশক্তি বেশী—কারণ সেখানে কৃষিতে পরোক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি চালু আছে। ভারতীয় কৃষক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করে না বলিলেই চলে। পুরাতন দিনের লাঙ্গল ও বলদ আজও চলিতেছে, সার ও বীজ-ধানের বন্দোবস্ত নাই। আজও আমরা জলের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করি, জলবায়ুর একটু তারতম্যের ফলে সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যায়। পরিবহন ব্যবস্থা এখনও সেকেলে। গোযান এখনও আমরা ব্যবহার না করিয়া পারি না, যন্ত্রচালিত শকট ব্যবহার করিবার মত রাস্তাঘাটের একান্ত অভাব। প্রতি হাজার বর্গমাইলে রেলপথের দৈর্ঘ্য গ্রেট বৃটেনে ২০০০ মাইলের বেশী—ভারতে মোটে ৮০ মাইল। পশ্চিমী দেশগুলির শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের বাস্তব মূলধনের প্রাচুর্য। ভারতে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট, সব কিছুরই অভাব। বাস্তব মূলধন না বাড়াইতে পারিলে আমাদের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও শ্রমের সদ্ব্যবহার সম্ভব হইবে না। আমাদের অসহনীয় দারিদ্র্যেরও অবসান ঘটিবে না।

মূলধন দ্রব্যের অভাব আমাদের দারিদ্র্যের কারণ

ভারতের সঞ্চয়ের পরিমাণ কম। এই সামান্য সঞ্চয়ও আবার সব সময় উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হয় না। সঞ্চয়ের স্বল্পতা ও সঞ্চয়ের অপচয় —মূলধনের অপ্রাচুর্যের জন্য এই দুই কারণই দায়ী।

মূলধন অপ্রাচুর্যের দুই কারণ

সঞ্চয়ের ক্ষমতা নির্ভর করে আয়ের উপর। আমাদের মাথাপিছু আয় এখনও ৩০০৲-র কম। এই আয়ে কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন চলে। সুতরাং সঞ্চয় কম হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কারণ নাই। জাতীয় আয় কিছু কিছু বাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যাও বাড়িতেছে। বাড়তি আয় বাড়তি জনসংখ্যার খাওয়া-পরাতেই ব্যয় হইতেছে। সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়িতেছে না।

জাতীয় আয় বাড়িলেও সঞ্চয়ের ক্ষমতা বাড়িতেছে না

আমাদের সামাজিক রীতিনীতি অনেক সময় সঞ্চয়ের অনুকূল নয়। বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা অনেক অপব্যয় করি। বিদেশের খবর আমরা অনেক বেশী রাখি। তাদের জীবনযাত্রার মান কত উঁচু তাহা আমরা জানি। আমরা ভুলিয়া যাই তাহাদের আয় বেশী বলিয়াই তাহারা জীবনযাত্রার এই মান বজায় রাখিতে পারে। আমরাও দেখাদেখি তাহাদের অনুকরণ করিতে যাই। আমাদের মধ্যে যাহাদের আয় কম তাহারা ধনী লোকদিগকে অনুকরণ করিতে চায়। ঋণ করিয়াও ঘি খাওয়ার নীতি আবার জাতে উঠিয়াছে। ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় আয়কে অনেক সময় ছাড়াইয়া যায়। শিল্পপতিদের মনে জাতীয়করণের ভয় ঢুকিয়াছে। ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্র মালিক হইয়া বসিতে পারে। এই ভয়ে শিল্পপতিরা তাহাদের পুঁজি শিল্পে বিনিয়োগ করিতে চান না।

সামাজিক রীতিনীতি, ধনীর অনুকরণ, শিল্পের জাতীয়করণের আশঙ্কা—প্রভৃতি কারণে সঞ্চয় হয় না।

ভারতের মাথাপিছু আয় কম। আমাদের আয় অত্যন্ত অসমভাবে বণ্টিত। মোট জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশ ভোগ করে জনসংখ্যার ৫%। ইহাদের সঞ্চয়ের ক্ষমতা কম বলা চলে না। ইহাদের সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম। এই সমস্ত ধনীলোক আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত। বিলাসব্যসনে বহু অপব্যয় ইহারা করে। আমাদের দেশে সমস্ত শ্রেণীর লোক সোনাদানা কিনিতে ভালবাসে। জমির প্রতি আকর্ষণও অত্যন্ত প্রবল। একে সঞ্চয় সামান্য, এই সামান্য সঞ্চয়ের বেশ মোটা অংশ এইভাবে আটকাইয়া থাকে—উৎপাদনের কাজে লাগে না। উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করিতে ইচ্ছুক উপযুক্ত সংগঠকের সংখ্যা ভারতে নগণ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে কারবারীদের কিছু আগ্রহ আছে। পুঁজিপতিরা শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে পশ্চাদ্‌পদ। মৌল সম্পদ গঠন করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, এই সুফল পাইতে হইলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত মালিকানায় মালিক চোখের সম্মুখে লাভ দেখিতে চায়। মৌলসম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে তাহাদের আগ্রহ না থাকাই স্বাভাবিক। রাষ্ট্রও মৌলসম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে দীর্ঘদিন উদাসীন ছিল।

আয়ের অসাম্য, অপব্যয় ও মৌল সম্পদ সৃষ্টিতে উদাসীনতা

এই সব কারণে ভারতে সঞ্চয় কম। সঞ্চয় কম বলিয়া মূলধন কম। মূলধন কম, সেজন্য আয় কম। আয় সামান্য—সুতরাং সঞ্চয় সামান্য। এই গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ কোনমতে বাড়াইতে পারিলে, মূলধন বাড়িবে। ফলে আয় বাড়িবে। অধিকতর সঞ্চয় হইবে। আমাদের আয় এত

সঞ্চয়, মূলধন ও আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

কম যে সঞ্চয় বাড়ান রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। জাতীয় সরকার এই সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন। নানা প্রকারে সঞ্চয় ও মূলধন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে।

জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি

সরকার নানাভাবে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ লইবার চেষ্টা করিতেছেন। সেভিংস সার্টিফিকেট ও ডিফেন্স বণ্ড যাহাতে আমরা ক্রয় করি সেজন্য জোর প্রচার কার্য চালান হইতেছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইয়াছে। ডাকঘরে আমানতের উপর চেক কাটিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্বল্প সঞ্চয় সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ আন্দোলন করা হইতেছে। আমাদের উৎসাহিত করিবার জন্য সরকার সেভিংস সার্টিফিকেটের লটারীর প্রচলনও করিয়াছেন।

নানাভাবে সঞ্চয়বৃদ্ধি

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে ও জীবন বীমা কোম্পানীতে যে সঞ্চয় পড়িয়া থাকিত, সরকার তাহা মূলধন গঠনে লাগাইতেছেন। এজন্য জীবনবীমা রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে আনা হইয়াছে। রাষ্ট্রের পরিচালনায় অনেক শিল্প আছে। ইহার মধ্যে রেল পরিবহন উল্লেখযোগ্য। এইগুলি হইতে যে আয় হয় তাহাও সরকার বিনিয়োগ করিতেছেন।

সরকারী উদ্যোগে এইভাবে সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। পাশাপাশি, বেসরকারী উদ্যোগেও কিছু সঞ্চয় ও মূলধন গঠিত হইতেছে।

বাধ্যতামূলক ভোগ-সঙ্কোচ, ভোগদ্রব্যের উপর কর এবং মূলধন দ্রব্য আমদানীর জন্য উৎসাহ দান

লোকে স্বেচ্ছায় যতটা সঞ্চয় করিতে চায় তাহার পরিমাণ বেশী নয়। কেবলমাত্র স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করিলে, মৌলসম্পদ সৃষ্টি ত্বরান্বিত হইবে না। বাধ্যতামূলকভাবে বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত করার প্রয়োজনও আছে। কিন্তু লোকের চাহিদার তুলনায়, ভোগ্যবস্তুর যোগান জোর করিয়া কমাইলে, জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। চাহিদা কমাইবার জন্য অতিরিক্ত করভার লোকের উপর চাপাইতে হইবে। সরকার আয়কর, মৃত্যুকর, সম্পদকর, উৎপাদন শুল্ক প্রভৃতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করিয়া মূলধন গঠনে ব্যয় করিতেছেন। বিলাসদ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে। সাধারণভাবে ভোগ্যদ্রব্য আমদানীর উপর কঠোর বাধানিষেধ আরোপ করা হইয়াছে। মূলধন দ্রব্য আমদানীর বিধিনিষেধ অনেক শিথিল করা হইয়াছে, যাহাতে আমরা ভোগ্যদ্রব্যের পরিবর্তে মূলধন-দ্রব্য আমদানী করি।

করনীতি সফল করিতে হইলে যাহাদের হাতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা আছে, তাহাদের উপর অতিরিক্ত করভার চাপান দরকার। তাহা হইলে এক ঢিলে দুই

পাখী মরিবে। চাহিদা ছাঁটাই হইবে—ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিবারিত হইবে। সরকারের হাতে উদ্বৃত্ত বাড়িবে—মূলধন গঠন সহজ হইবে। আমাদের করনীতি সন্তোষজনক না হওয়ায়, রাজস্ব বাড়াইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফৎ নূতন নোট ছাপাইতে হইতেছে। এই নবনির্মিত মুদ্রা লোকের হাতে আসে এবং তার ব্যয় ক্ষমতা বাড়ায়। ফলে জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। লোকে বর্তমান ভোগ কমাইতে বাধ্য হয়। এই জন্য ইহাকে ছদ্ম কর বা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ও বলা যায়। সরকারের কর আদায় করিবার ক্ষমতা যতদিন সীমাবদ্ধ ততদিন রাজস্ব বাড়াইবার এই উপায় একেবারে বাতিল করা যায় না।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়

বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য পাইলে মূলধন গঠন অনেক সহজ হয়। বৈদেশিক ঋণ সরকারী বা বেসরকারী দুই প্রকারই হইতে পারে। বিদেশ হইতে অনেক সময় মূলধন-দ্রব্য সরাসরি সাহায্য হিসাবে পাওয়া যায়। এই মূলধন খাটাইতে গেলে আবার আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া এই ঋণ একসময় পরিশোধ করিতে হইবে। সুদও দিতে হইবে। প্রয়োজনের তুলনায় বৈদেশিক ঋণ পরিমাণে অনেক কম হইতে বাধ্য। আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় না বাড়াইলে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

বৈদেশিক ঋণ—
আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়

ভারতে অব্যবহৃত জনবলের পরিমাণ নগণ্য নয়। এই জনবল নিয়োগ করিয়া মৌলসম্পদ বাড়াইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বর্তমান ভোগ কমান দরকার হইবে না। কিন্তু কেবলমাত্র জনবলের সাহায্যে মূলধন প্রস্তুত করার সম্ভাবনা খুব বেশী নাই। এই অব্যবহৃত জনবলকে কাজে লাগাইতে হইলেও সঞ্চয় ও মূলধনের প্রয়োজন আছে।

জনশক্তি নিয়োগে মূলধন গঠন

শিল্পোন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য বার্ষিক আয়ের শতকরা ১৫-২০ ভাগ সঞ্চয় প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনার প্রাক্কালে আমাদের সঞ্চয়ের হার ছিল শতকরা ৫ ভাগ। পরিকল্পনার শেষে এই হার বাড়িয়া শতকরা ৮ ভাগ হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই হার বাড়াইয়া শতকরা ১১ ভাগ করিবার কথা হয়। দ্রুত শিল্পায়নের জন্য এই হার যথেষ্ট নয়। কিন্তু আমাদের মত দরিদ্র দেশে সঞ্চয়ের হার আর বাড়াইলে, বর্তমান ভোগ অত্যন্ত বেশী সঙ্কুচিত করিতে হইবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ইহা করা মুস্কিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ কাটছাঁট করিয়া ৪৮০০ কোটি হইতে ৪৫০০ কোটি

করা হইল। তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইল ৭২৫০ কোটি টাকা। অর্থ সংগ্রহের বর্তমান গতি যদি অপরিবর্তিত থাকে এবং নূতন মুদ্রা সৃষ্টি যদি বাড়ান না হয়—তবে এই অঙ্কে পৌঁছান যাইবে কিনা সন্দেহ আছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Define Capital and state the functions of Capital as a factor of production.
মূলধন কাহাকে বলে? উৎপাদনের উপাদান হিসাবে মূলধনের কার্যাবলী বর্ণনা কর।
[পৃষ্ঠা ৮০, ৮৪-৮৬]

2. Distinguish between (a) Fixed and Circulating Capital and (b) Sunk and Free Capital.
(ক) স্থায়ী ও চলতি মূলধন এবং (খ) নিবদ্ধ ও অ-নিবদ্ধ মূলধনের পার্থক্য কি?
[পৃষ্ঠা ৮২-৮৩]

3. Is money Capital? Explain the relation between Wealth and Capital.
টাকাকড়ি কি মূলধন? মূলধন ও সম্পদের মধ্যে পার্থক্য কি? [পৃষ্ঠা ৮১, ৮০]

4. What are the factors that determine the accumulation of Capital in a Country?
কোন দেশে মূলধন বৃদ্ধি কি কি জিনিষের উপর নির্ভর করে? [পৃষ্ঠা ৮৬-৯০]

5. What are the factors that hinder the accumulation of Capital in India? Suggest measures for increasing Capital accumulation in India.
ভারতে মূলধন বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক কি কি? এই বাধাগুলি কি করিয়া দূর করা যাইতে পারে।
[পৃষ্ঠা ৯০-৯৪]

6. Write notes on (a) Capitalistic Production and (b) Mobility of Capital.
টীকা রচনা কর—(ক) পরোক্ষ বা মূলধন-দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদন এবং (খ) মূলধনের গতিশীলতা। [পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫ ও ৮৩-৮৪]

অষ্টম অধ্যায়

কারিগরি দক্ষতা

(Technical Skill)

জাতির আর্থিক সমস্যার সুরাহা করিতে হইলে জাতীয় আয় বাড়াইতে হইবে। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য যে দেশে যত প্রচুর জাতীয় আয় বাড়াইবার সম্ভাবনা সে দেশে তত বেশী। এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে মূলধন-দ্রব্য প্রয়োজন। মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও নৈপুণ্যের প্রতীক এই মূলধন। বিদেশ হইতে হয়ত মূলধন-দ্রব্য সরাসরি আমদানী করা যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও মূলধন-দ্রব্য যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে হইলে নিপুণ কর্মী অপরিহার্য। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এশিয়া মহাদেশে শতকরা ৭০ খানা লরী অকালে অকেজো হইয়া পড়ে। ইহার কারণ চালকের নিপুণতার অভাব ও মিস্ত্রীর অজ্ঞতা। আমরা যান্ত্রিক যুগে বাস করি। কি কৃষি, কি শিল্প উৎপাদন সকল ক্ষেত্রেই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন কৌশলের নিয়ত উন্নতি ঘটিতেছে। নূতন নূতন সূক্ষ্ম

উৎপাদন ও জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে চাই দক্ষ শ্রমিক।

ও জটিলতর যন্ত্রের আবির্ভাব হইতেছে। যন্ত্র ব্যবহারে নৈপুণ্যের নামই কারিগরি দক্ষতা। যন্ত্রী বিহনে যন্ত্র অচল। কারিগরি দক্ষতা যে দেশে যত উন্নত পর্যায়ের, সেই দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার তত দ্রুত—জীবনযাত্রার স্তর তত উন্নত। অর্থনৈতিক দুনিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থান আজ সকলের শীর্ষে। ইহার মূলে রহিয়াছে মার্কিনীদের কারিগরি দক্ষতা। মূলধন গঠনের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষ কারিগর সৃষ্টি করিয়া রাশিয়া অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে। অন্যান্য উন্নত দেশের ইতিহাস একই শিক্ষা দেয়।

ভারতের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য নগণ্য নয়। ভারতের জনবল উল্লেখযোগ্য। এই জনসম্পদের বড় একটা অংশ অর্ধবেকার। এই নিষ্ক্রিয় জনবলকে কাজে লাগাইতে পারিলে, জাতীয় আয় বাড়িত। মূলধনের অভাব এই জনশক্তি ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে

দক্ষ শ্রমিক সংখ্যা বাড়াইতে হইলে বর্তমানে ভোগ কমাইতে হইবে।

কাজে লাগাইবার প্রথম অন্তরায়। দ্বিতীয় অন্তরায় হইল দক্ষ কারিগরের অভাব। বাস্তব মূলধনের মত দক্ষ কারিগর সৃষ্টি করিতে হইলেও বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত করা দরকার। দক্ষতা অর্জন করিতে সময় লাগে। ততদিন এই শ্রমশক্তি ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত করা যাইবে না। ততদিন ইহাদের ভরণপোষণ করিতে হইবে।

মূলধনের মত দক্ষতা সৃষ্টিরও প্রধান প্রতিবন্ধক হইল আয়ের স্বল্পতা। কিন্তু আয় বাড়ার জন্য বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দক্ষ কারিগর না হইলে আয় কোন দিনই বাড়িবে না।

আয় বাড়াইতে হইলে পরোক্ষ উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্য লইতে হইবে। পরোক্ষ উৎপাদনের অর্থই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন। দক্ষ কারিগর ব্যতীত এ ধরণের উৎপাদনের কথা কল্পনা করা যায় না। আধুনিক কালে কলকারখানার সাহায্যে উৎপাদন হয়। অনেক কাজ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া করা অসম্ভব। বিদ্যুৎ উৎপাদন, পাহাড় কাটিয়া রেললাইন স্থাপন, নদীতে বড বড বাঁধ দেওয়া, বড বড সহরে পানীয় জল সরবরাহ করা, ২০০০ ফুট নীচু হইতে কয়লা উত্তোলন করা,—এ সব কাজ যন্ত্র এবং দক্ষ কারিগর না থাকিলে করা অসম্ভব। অনেক কাজে মনে হয় শুধু গায়ের জোর থাকিলেই চলে। উদাহরণ স্বরূপ মালবহন বা মাটিকাটার উল্লেখ করা যায়। এই সব কাজ সোজাসুজি করিলে দক্ষতার প্রয়োজন খুব কম। মাথায় করিয়া মোট বহন করিতে বা কোদাল দিয়া মাটি কাটিতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত সময় লাগে বেশী। উৎপাদন হয় কম। মালবহনের জন্য লরী, রেলগাড়ী, জাহাজ ব্যবহার করিলে ব্যয় অনেক কম হইবে। উৎপাদন অনেক বেশী হইবে। লরী ইত্যাদি নির্মাণ করিতে, চালাইতে ও মেরামত করিতে দক্ষ কারিগর প্রয়োজন। মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি দক্ষতার প্রসার ও উৎকর্ষের উপর নির্ভর করিতেছে শিল্পায়নের গতিবেগ অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য।

পরোক্ষ উৎপাদনেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি হয় এবং ইহার জন্য চাই কারিগরি দক্ষতা।

কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির সমস্যা (Problem of Skill formation): মূলধন সৃষ্টি করিতে গেলে যে ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টি করিতে গেলেও সেই সমস্যাই দেখা দেয়। কারিগরি দক্ষতা মনুষ্যগত মূলধন। এই দক্ষতা রাতারাতি অর্জন করা সম্ভব নয়। ইহার জন্য দীর্ঘদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস প্রয়োজন। এই সময় ইহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে হইবে। ইহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইলে যে সাজসরঞ্জাম দরকার তাহা যোগাইতে হইবে। সেজন্য আমাদের বর্তমান ভোগ সঙ্কুচিত করিতে হইবে। বর্তমান ভোগ কমাইবার সুযোগ ও সম্ভাবনা ভারতে কম, কারণ আমাদের আয় অতি সামান্য। মূলধনের বেলায় আমরা দেখিয়াছি শুধু সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা থাকিলে কিংবা বর্তমান ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলেই মূলধন-দ্রব্য হয় না। সঞ্চয়ের যথাযথ নিয়োগ দরকার। কারিগরি দক্ষতার ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য করা চলে।

সঞ্চয়ের স্বল্পতা—প্রধান বাধা

সঞ্চয়ের যথাযথ ব্যবহারও প্রয়োজন।

মূলধনের মত এখানেও অগ্রাধিকারের তালিকা প্রস্তুত করা বাঞ্ছনীয়। কোন্ ধরণের কারিগর কত, কখন দরকার তাহার হিসাব দরকার। নয়ত সঞ্চয়ের অপব্যয় হইবে। চিকিৎসকের প্রয়োজন হইলে চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনীয়ার সৃষ্টি করিলে স্বাস্থ্যোন্নয়নের কাজ অগ্রসর হইবে না; অধিকন্তু বেকার ইঞ্জিনিয়ারের সৃষ্টি হইবে। পশ্চিমী দেশগুলি কারিগরি দক্ষতার দিক দিয়া ভারত অপেক্ষা উন্নত। তাই বলিয়া তাহাদের অন্ধ অনুকরণ করিলে চলিবে না। আমাদের নিজস্ব প্রয়োজনের কথা সব সময় মনে রাখিতে হইবে।

কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির উপায়ঃ নিরক্ষরের জন্য কারিগরি শিক্ষার দরজা খোলা নাই। সাধারণ শিক্ষা কারিগরি দক্ষতার প্রথম সোপান। সাধারণ শিক্ষার মান কি হওয়া দরকার সে বিষয় মতদ্বৈধ থাকিতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। কারিগরি দক্ষতার প্রসারের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দরকার। এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগে, নূতন চিন্তাধারায় আপন করিবার ক্ষমতা বাড়ে এবং জানিবার কৌতূহল জাগিয়া উঠে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী হিসাবে নিরক্ষরের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৮০ জন। অক্ষর-জ্ঞানের এই ব্যাপক অভাব কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের মোটেই অনুকূল নয়।

(১) সাধারণ শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষা সমাপ্তির পর প্রয়োজন প্রকৃত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিদ্যালয়, ডাক্তারী কলেজ ও বিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চস্তরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান থাকাই যথেষ্ট নয়। সকলের উচ্চতম দক্ষতা অর্জনের যোগ্যতা নাই। বিভিন্ন স্তরের দক্ষতা শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন মানের প্রতিষ্ঠান চাই। গবেষণার জন্যও আলাদা প্রতিষ্ঠান দরকার।

(২) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

কারিগরি বিদ্যালয়ে কাগজে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানে ব্যবহারিক শিক্ষাও কিছুটা দেওয়া হয়। তবুও কারিগরি দক্ষতার গোপন রহস্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়ায় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা যায় না। কলকারখানার কাজের মধ্য দিয়া দক্ষ কারিগরের সংস্পর্শে শিক্ষালাভ করিলে তবেই কারিগরি দক্ষতা মজ্জাগত হয়। যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে কলকারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে লইতে হয়। এখানে কাজের মধ্য দিয়া হাতে ধরিয়া তাহাকে কাজ শিখান হয়। শিক্ষানবীশদিগকে

(৩) শিক্ষানবীশী

কারখানায় কাজ শিখিবার কালে কারিগরি বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ দিলে দক্ষতার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

কারিগরি দক্ষতা দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন। আবার শিল্পায়ন এই দক্ষতা প্রসারের অব্যর্থ হাতিয়ার। দেশে ছোট বড় নানা রকম কলকারখানা স্থাপন করিলে, যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যবস্থা করিলে দক্ষতা প্রসারের সহায়তা হয়। শিল্পায়ন আরম্ভ করাই বড় সমস্যা। প্রাথমিক বাধা অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। কলকারখানা তৈয়ারী করিতে পারিলে, ইহার মধ্য দিয়াই দক্ষতা ও মূলধন সৃষ্টির সুযোগ হয়। নূতন কলকারখানা স্থাপন সহজসাধ্য হয়।

(৪) শিল্পায়ন

মূলধনের মত কারিগরি দক্ষতার ব্যাপারেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অর্ধোন্নত দেশের বিশেষ কাজে আসে। বিদেশ হইতে দক্ষ কারিগর আনিয়া বা বিদেশে যোগ্য কারিগর পাঠাইয়া দক্ষ কারিগর সৃষ্টি করা যায়। ইহার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। অধিকাংশ অর্ধোন্নত দেশের পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন রীতিমত কঠিন ব্যাপার। সাহায্য হিসাবে না পাইলে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিবার সঙ্গতি অর্ধোন্নত দেশের নাই। ফলে এইভাবে দক্ষ কারিগরের সংখ্যা বাড়াইবার সম্ভাবনা অনেকটা সীমাবদ্ধ।

(৫) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

ভারতে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা (Provision for Technical Education in India): মূলধনের ন্যায় কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা আগেকার তুলনায় অনেক সচেতন হইয়াছি। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ভারতে স্নাতকোত্তর (post-graduate) এবং গবেষণামূলক কারিগরি শিক্ষার জন্য ১৬টি প্রতিষ্ঠান ছিল। স্নাতক ও ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠান ছিল ১০৮টি। মুদ্রণ কৌশল (printing technology), কাচ ও মৃৎশিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা (glass and ceramic research). প্রভৃতিতে শিক্ষাদানের জন্য ১১টি বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে বৎসরে প্রায় ৮,৮০০ শিক্ষার্থী বাহির হইয়া আসিত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও ১৮টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ৬২টি কারিগরি বিদ্যালয় খোলার কথা হয়। খনিজ বিদ্যার প্রসারের জন্য ২১টি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার কথা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কিছুটা রদবদল করিতে হইয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও কারিগরি বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমাইয়া যথাক্রমে ৮টি ও ৩৭টি করা হইয়াছে। স্নাতকোত্তর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৬ হইতে ২০ করা হইয়াছে।

উচ্চস্তরের কারিগরি দক্ষতা সৃজনের জন্য ৪টি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার কথা ছিল। ইহার মধ্যে দুইটি স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে একটি এবং ১৯৫৯ সালে বোম্বাই সহরের নিকট পাওয়াই নামক স্থানে আর একটি ইতিমধ্যেই চালু হইয়াছে। কানপুরে ও মাদ্রাজে বাকী দুইটিরও শীঘ্রই কাজ সুরু হইবে। খড়্গপুরে ১,৩০০-র অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিতেছে।

বড় বড় কারখানায় শিক্ষানবীশ লইবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। রেলওয়ে, পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে সরকারী আওতাতেও শিক্ষানবীশ লওয়া হয়। টাটাতে এবং কলিকাতাতেও শিক্ষানবীশ থাকা কালীন কারিগরি বিদ্যালয়ে পড়িবার ব্যবস্থা আছে।

কলম্বো পরিকল্পনায় (Colombo Plan) ভারতীয়দের বৃত্তি দিয়া কমনওয়েলথ-ভুক্ত দেশগুলিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্দফা পরিকল্পনায় (Point Four Programme) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া কারিগরি শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ছাড়া যে সব বিদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখানে ব্যবসা করে বা নূতন ব্যবসা সুরু করিয়াছে, তাহারাও কিছু কিছু ভারতীয়কে স্ব স্ব দেশে কারিগরি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

শিল্পায়ন কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির গতিবেগ বাড়াইয়া দেয়। দুর্গাপুর, রৌরকেল্লা, ভিলাই প্রভৃতি স্থানে নূতন শিল্পের পত্তন হইয়াছে। এখানে হাজার হাজার কর্মী শিক্ষালাভ করিতেছে। হাতের কাজ হইল সবচেয়ে ভাল শিক্ষক। অধিকন্তু এসব জায়গায় দক্ষ বিদেশী কারিগরের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগও মিলিয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Indicate the importance of Technical Skill. Discuss the factors on which the formation of Technical Skill depends.**

   কারিগরি দক্ষতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টি কি উপায়ে হইতে পারে বুঝাইয়া লেখ। [পৃষ্ঠা ৯৫-৯৮]

2. **Describe the steps that have been taken in India for the formation of Technical Skill.**

   ভারতে কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টির জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯]

নবম অধ্যায়

অর্থনৈতিক কাঠামো

(Economic Structure)

প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ, মূলধনের পরিমাণ ও গঠন, সঞ্চয়ের হার, জনসংখ্যা ও তাহার গঠন, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে,—যেমন কৃষিতে ও শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত, জাতীয় আয় ও তাহার বণ্টন, মাথাপিছু জাতীয় আয়—এই সব হইতেই দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের অর্থনৈতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা করিতে হইলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো জানিতে হইবে।

অর্থনৈতিক কাঠামো সব দেশের একরকম নয়। কোন দেশ শিল্প ও কৃষিতে অগ্রসর। মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মানও তার ফলে অনেক উন্নত। কোন দেশ শিল্প বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ। সে দেশের জীবনযাত্রার মানও অনেক নীচু। কোন দেশ কৃষির প্রাধান্য সত্ত্বেও ধনী। আবার কোন কৃষিপ্রধান দেশ অত্যন্ত গরীব। অর্থনৈতিক উন্নতির মাপকাঠিতে দেশগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, গ্রেট বৃটেন প্রভৃতি দেশকে অতি উন্নত (highly developed) বলা হয়। ইতালী, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি অতি উন্নত দেশের তুলনায় কম। তবে অর্থনৈতিক উন্নতি সুরু হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আবার ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে অর্থনৈতিক উন্নতি প্রায় সুরু হয় নাই বলিলেই চলে। এই সব দেশে জাতীয় আয় ও জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নীচু। এই শ্রেণীর দেশকে অনুন্নত বা অর্ধোন্নত (under-developed) বলা হয়।

অর্ধোন্নত দেশ বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সূক্ষ্ম হিসাব না করিয়াও বলা যায় অর্ধোন্নত দেশের লক্ষণ তিনটি। প্রথমতঃ, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা। উন্নত দেশের তুলনায় অর্ধোন্নত দেশের মাথাপিছু আয় অতি নগণ্য। এদিক দিয়া ভারত নিশ্চয় অর্ধোন্নত দেশ। ১৯৫৭-৫৮ সালের হিসাবে মাথা পিছু আয় ভারতে ২৭৬ টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯,৬৮০ টাকা, কানাডায় ৭,০৩৫ টাকা। দ্বিতীয়তঃ, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি অত্যন্ত মন্থরগতিতে হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও খুব স্পষ্ট। ভারতের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৯৫১ হইতে ১৯৫৭ এই সময়ে বাৎসরিক শতকরা ২ হিসাবে বাড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ 'অর্ধোন্নত' মানে উন্নতির আরও

১। জাতীয় আয়ের স্বল্পতা
২। জাতীয় আয় বৃদ্ধির বাধা
৩। জাতীয় আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা অর্ধোন্নত দেশের লক্ষণ

সম্ভাবনা আছে। ভারতে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য অবহেলা করিবার মত নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিলে, মাথা পিছু আয় যথেষ্ট বাড়িবার সম্ভাবনা আছে। ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি অর্ধোন্নত দেশে জনাধিক্য বর্তমান। ব্রহ্ম প্রভৃতি অর্ধোন্নত দেশে জনাধিক্য এখনও ঘটে নাই। এই দুই জাতীয় অর্ধোন্নত দেশের সমস্যাগুলি কিছুটা স্বতন্ত্র ধরণের। আমরা জনাধিক্য-বিশিষ্ট অর্ধোন্নত দেশের আলোচনা করিব।

অর্ধোন্নত দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Economic Structure of Under-developed Country): অর্ধোন্নত দেশগুলির অর্থ ব্যবস্থার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতের উদাহরণ লইয়া ব্যাখ্যা করা হইল।

(১) মাথাপিছু আয় অতি সামান্য। জাতীয় আয় বণ্টনে ভীষণ অসাম্য দেখা যায়। মুষ্টিমেয় ধনী জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন করে। আর অধিকাংশ লোক কায়ক্লেশে জীবনরক্ষা করে। অনেক লোকের দুইবেলা আহার জোটে না। মাথাপিছু আয় হইতে যতটা দারিদ্র্য অনুমান করা হয়, সত্যকার অবস্থা আরও খারাপ।

(২) এই শোচনীয় দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বাস্তব মূলধনের অভাব। দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে সঞ্চয় সম্ভব নয়। সঞ্চয় না হইলে মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না। এই সামান্য সঞ্চয়েরও আবার অপপ্রয়োগ ঘটে। উন্নত দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫।২০ ভাগ সঞ্চয় হয়। ভারতে সঞ্চয়ের হার কিছুদিন পূর্বেও ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ। আমরা একেবারে স্থাণু হইয়া বসিয়া নাই। উন্নয়ন পরিকল্পনার আমলে ১৯৫৫-৫৬ সালে সঞ্চয়ের হার বাড়িয়া শতকরা ৭।৮ ভাগ হইয়াছে।

(৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুত। জন্মের হার কমে নাই। মৃত্যুর হার কমার ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলে। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৪৫।৫০ লক্ষ লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে। আমরা দেখিয়াছি সঞ্চয়ের হার শতকরা প্রায় ৮ ভাগ। যদি প্রতি ৪ একক মূলধন নিয়োগ করিয়া ১ একক অতিরিক্ত উৎপন্ন পাওয়া যায়, তবে এই হারে সঞ্চয় বাড়িলে উৎপাদন বৎসরে ২% হারে বাড়িতে পারে। জনসংখ্যা বৎসরে শতকরা ১.২৫% এর বেশী বাড়িতেছে। ফলে মাথাপিছু জাতীয় আয় অত্যন্ত ধীরে বাড়িতেছে।

(৪) দারিদ্র্যের গোলকধাঁধা। আয় কম—সঞ্চয় কম—বিনিয়োগ কম। সুতরাং আয় কমই থাকিয়া যাইতেছে। আবার আয় কম—ক্রয় ক্ষমতা কম—সুতরাং বিনিয়োগ করিয়া লাভের সম্ভাবনা কম। ফলে বিনিয়োগ হওয়া কঠিন। আয় বাড়াও কঠিন।

(৫) কারিগরী দক্ষতার অভাব। মাথাগুণতিতে আমরা অনেক লোক। কিন্তু কাজের লোক খুব কম। মূলধন তৈয়ার করিবার জন্য ও ইহা যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিবার জন্য দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন। আমাদের দেশে দক্ষ কারিগরের অভাব আয় বাড়াইবার একটি প্রধান প্রতিবন্ধক।

(৬) অর্ধোন্নত দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল শিল্পে অনগ্রসরতা ও কৃষির প্রাধান্য। কৃষি অর্ধোন্নত দেশের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এই কৃষিতেও অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত। ভারতে জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিকার্যে নিযুক্ত, শিল্পকার্যে মোটে শতকরা ১০ ভাগ। জাতীয় আয়ের অর্ধেক পাওয়া যায় কৃষি হইতে। সংগঠিত কারখানা-শিল্পে উৎপন্ন হয় শতকরা ৮ ভাগ। কৃষিতে আজও সেই মান্ধাতার আমলের উৎপাদন পদ্ধতিই চলিতেছে। জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। সেই ক্ষুদ্র জমিও আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সেচের ব্যবস্থা অপ্রচুর। সার কমই ব্যবহার করা হয়। বীজ নিকৃষ্ট।

(৭) আয় সামান্য হইলে, সেই ক্ষুদ্র আয়ের সম্পূর্ণ বা বেশীর ভাগ খাদ্য দ্রব্যের জন্য ব্যয় না করিয়া উপায় নাই। সেইজন্য খাদ্যের উপর অতিরিক্ত আনুপাতিক ব্যয় অর্ধোন্নত দেশের অপর একটি লক্ষণ। আমাদের দেশে গ্রামে আয়ের শতকরা ৬৬ ভাগ খাদ্যের জন্য ব্যয় হয়; সহরে ব্যয় হয় শতকরা ৫০ ভাগ। শিক্ষা, বাসস্থান চিকিৎসা ইত্যাদি খাতে ব্যয় যৎসামান্য। খাদ্যদ্রব্যের জন্য আয়ের বেশীর ভাগ খরচ হওয়া সত্ত্বেও, জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন মিটে না। আমাদের খাদ্য হইতে গড়ে আমরা দৈনিক ১৫০০ ক্যালোরি পাই। দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন হইল প্রায় ৩০০০ ক্যালোরি। আমাদের খাদ্যের প্রোটিনের ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা আরও মারাত্মক। জনসংখ্যা বেশী হওয়া সত্ত্বেও যে আমাদের দেশে শ্রমের যোগান কম ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

(৮) ছদ্ম বা অর্ধ বেকারত্বও অর্ধোন্নত দেশের একটি বৈশিষ্ট্য। শিল্প অনগ্রসর। জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কৃষির উপর চাপ বাড়িতেছে। অথচ বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদন বজায় রাখার জন্য এত লোকের দরকার নাই। বেশ কিছু লোক, প্রায় আড়াই কোটি, সরাইয়া নিলেও, উৎপাদন কমার ভয় নাই। এই বাড়তি লোককে বেকার ধরিতে হইবে।

(৯) অর্ধোন্নত দেশে বিনিয়োগের ঝুঁকি লইতে অনিচ্ছা দেখা যায়। শিল্পোন্নয়নের জন্য ভারী শিল্প গঠন অপরিহার্য। ভারী শিল্প গঠন করিয়া লাভ করিতে অনেক সময় কাটিয়া যায়। বে-সরকারী উদ্যোক্তা এত দিন সবুর করিতে পারে না। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে লাভ করিবার জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় না বলিয়া

এইদিকেই সংগঠকদের ঝোঁক দেখা যায়। অনেকে আবার এইটুকুই অপেক্ষা করিতেও নারাজ। তাহারা রাতারাতি বড়লোক হইতে চায়। সেজন্য চোরা কারবার ও ফটকাবাজারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। আবার কেহ কেহ সঞ্চয় দ্বারা অলঙ্কার ক্রয় করে। এই সব কারণে যে সামান্য সঞ্চয় আছে তাহাও পূরাপুরি বাস্তব মূলধন সৃষ্টির কাজে লাগে না।

(১) অর্ধোন্নত দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহারা বেশীর ভাগ কাঁচামাল রপ্তানি করে ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী করে। অধিকাংশ অর্ধোন্নত দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রতিকূল। অর্থাৎ ইহাদের বৈদিশিক মুদ্রা যতটা আয় করে, ব্যয় করে তাহার চেয়ে বেশী। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এই সব দেশের অর্থনৈতিক জীবন ও কাঠামোর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। শিল্পোন্নত দেশে মন্দার সময় কাঁচামালের চাহিদা বেশ কমিয়া যায়। এই সূত্রে মন্দার ঢেউ অর্ধোন্নত দেশকেও ধাক্কা দেয়। অর্ধোন্নত দেশে শিল্প সংগঠনে নূতন ও পুরাতনের বিচিত্র সমাবেশ দেখা দেয়; আন্তজাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত শিল্পে আধুনিক কলকব্জার ব্যবহার করা হয় এবং সংগঠিতরূপে পরিচালিত হয়। অন্য দিকে কুটির শিল্পে ও কৃষিতে উৎপাদন হয় গতানুগতিক ধারায়। অসংগঠিত শিল্পে ও কৃষিতে প্রথার প্রাধান্য বেশী। অর্থনৈতিক প্ররোচনা এখানে ফলপ্রসূ হয় না।

অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপায় (Requirements for the Development of Under-developed Countries):

অর্ধোন্নত দেশে উন্নতির চাবিকাঠি শিল্পায়ন। এ কথা হাজার বার সত্য। কিন্তু ইহার মানে এই নয় যে কৃষিকে অবহেলা করিয়া শিল্পের উন্নতি করিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে কৃষি ও শিল্প পরস্পর বিরোধী নয়। ইহাদের একে অন্যের অনুপূরক। শিল্পায়ন হইলে কৃষির উপর চাপ কমিবে। কৃষিজ পণ্যের চাহিদা বাড়িবে। সার ও চাষের যন্ত্রপাতি সুলভ হইবে। আবার কৃষির উন্নতি ঘটিলে, শিল্পে প্রয়োজনীয় কাঁচামালের যোগান বাড়িবে। কাঁচামালের উৎকর্ষ ঘটিবে। মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়াইতে হইলে শিল্পের প্রসার, কৃষি পদ্ধতির আমূল সংস্কার ও সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে।

আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি উন্নত দেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। উৎপাদনের উপকরণগুলির বে-সরকারী মালিকানা সেখানে স্বীকৃত। ব্যক্তি প্রাধান্যের আমলেই এই সব দেশের জাতীয় আয় বাড়িয়াছে। ভারতের মত অর্ধোন্নত দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটাইতে হইলে পুরাপুরি ব্যক্তিগত

উদ্যোগের উপর নির্ভর করা চলিবে না। শিল্প পরিচালক নিজের গরজে শিল্পকে চরম উন্নতির পর্যায়ে লইয়া যাইবে বা জমির মালিক নিজের স্বার্থে কৃষি পদ্ধতির সংস্কার করিবে, এ আশা নানা কারণে আমাদের দেশে করা চলে না। সম্পদ সৃষ্টি ত্বরান্বিত করিতে হইলে মৌল সম্পদ প্রয়োজন। এর জন্য সঞ্চয়ের প্রাচুর্য ও দূরদৃষ্টি থাকা চাই। আমাদের শিল্পপতিদের এই তুইটির কোনটিই নাই। উপযুক্ত সংগঠকের অভাব এখানে খুব বেশী। চাষীর বিনিয়োগ সামর্থ্য একেবারে নাই। সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে আর্থিক উন্নতির আশা নাই। সমাজতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা একেবারেই স্বীকার করা হয় না। পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটে না। বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে অবাধ স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করা হয়।

পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থা

কৃষি উন্নয়ন—ভারতে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক এখনও কৃষির উপর নির্ভর করে। কৃষির উন্নতির জন্য উন্নত ধরণের সার ও বীজ, উপযুক্ত সেচ ব্যবস্থা, একাধিক শস্য উৎপাদন ও পঙ্গপালের উপদ্রব নিবারণ দরকার। কৃষি যন্ত্রেরও পরিবর্তন প্রয়োজন। উন্নত যন্ত্র অবশ্যই প্রবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ করিলে চলিবে না। আমাদের সঞ্চয় সামান্য। এই সামান্য সঞ্চয় হইতে শিল্প ও কৃষি এবং সমষ্টিগত মূলধনের বরাদ্দ করিতে হইবে। অতিকায় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে গেলে, অন্যত্র মূলধনের অভাব দেখা দিবে। ট্রাকটরের বদলে লোহার লাঙ্গলই আমাদের কাজে লাগিবে বেশী। তা ছাড়া ভারতের চাষীর শিক্ষার মানের দিকে নজর রাখিয়া যন্ত্র ঠিক করিতে হইবে। সহজ সরল যন্ত্র যার ব্যবহার আমাদের চাষী বুঝে এই রকম যন্ত্রই কাম্য। সাধারণ মূলধন খরচে হাল্কা যন্ত্রই আমাদের প্রয়োজন। তবে এই যন্ত্রের প্রয়োগ সফলভাবে করিতে হইলে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গী (innovation) গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষকের উৎসাহ বাড়াইবার জন্য অবিলম্বে ভূমি সংস্কার করিয়া কৃষককে জমির মালিকানা দেওয়া দরকার। সমবায় পদ্ধতিতে চাষ চালাইতে হইবে। তাহা হইলে জমির ক্ষুদ্রতা ও অসম্বদ্ধতার বেশ খানিকটা প্রতিকার হইবে। কৃষককে অল্প সুদে প্রয়োজনমত ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষক যাহাতে ফসলের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য কৃষিজ পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। ফড়িয়াদের উচ্ছেদ করিয়া চাষীর সঙ্গে ভোগকারীর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। চাষীর এক একটি সমস্যা আলাদাভাবে সমাধান করার চেষ্টা করিলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা কম। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা একযোগে করিতে হইবে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community

Development) এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার (National Extension Service) মাধ্যমে এই চেষ্টাই করা হইতেছে।

শিল্পোন্নয়ন—জলসেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপন, পথঘাট নির্মাণ. —এই সব মৌল সম্পদের অভাবে শিল্প বা কৃষিতে ব্যাপক উন্নতি অসম্ভব। সরকারী উদ্যোগে এই সব মৌল সম্পদ সৃষ্টি হইলে, ক্রমশঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও বেশী সম্পদ সৃষ্টি হইবে। সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সমাজ কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে হইবে। শিল্পায়নের ছন্দ ত্বরান্বিত করার জন্য এই প্রাথমিক ব্যয়ের প্রয়োজন আছে। লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, রাসায়নিক দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি মূল ও ভারী (key and heavy industries) শিল্পের প্রসার দরকার। অন্যান্য শিল্পের উন্নতির জন্য মূল ও ভারী শিল্পের প্রসার প্রয়োজন। ভারী শিল্পে মূলধন খরচ বেশী—কর্মসংস্থান সে তুলনায় কম। ভারী শিল্প ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়ায়। অতিরিক্ত মূলধন ব্যয় হয় বলিয়া ভোগ্যদ্রব্যের যোগান বাড়াইবার সম্ভাবনা ইহার ফলে কমে। লঘু শিল্পে মূলধন কম লাগে—কর্মসংস্থান হয় বেশী—ভোগ্য দ্রব্যের যোগান বাড়ে। কিন্তু লঘু শিল্প সম্পদসৃষ্টির গতিবেগকে বাড়াইয়া দিতে পারে না। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলিতে হইবে।

ভারী বনাম লঘু শিল্প

কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য মূলধন দরকার। সেজন্য সঞ্চয় বাড়াইবার দিকে ও সঞ্চয়ের যথাযথ বিনিয়োগের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়, যথাসম্ভব সংগ্রহ ও বৃদ্ধি করিতে হইবে। করনীতির মাধ্যমে সরকারী সঞ্চয়ও উপেক্ষনীয় নয়। নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের সাহায্যও দরকার হইবে। বিদেশ হইতে ঋণ ও সাহায্য হিসাবে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে।

সঞ্চয় সংগ্রহ বৃদ্ধি

কারিগরি দক্ষতা মূলধনের মতই প্রয়োজনীয়। দক্ষতার প্রসারের জন্য সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা চাই। বিদেশ হইতে কারিগর আনা যাইতে পারে। বিদেশে কারিগর পাঠাইয়া তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা যায়। কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে কারিগর সহজেই দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাইবে।

কারিগরি দক্ষতা

আর্থিক উন্নতির গতিবেগ বাড়াইতে হইলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মাথাপিছু আয় বাড়াইতে হইবে। জনসাধারণ তার আয় বাড়ার নিরিখে পরিকল্পনার সাফল্য যাচাই করে। আয় না বাড়িলে উৎসাহ থাকিবে না। এই উৎসাহের অভাব পরিকল্পনায় ব্যর্থতা ডাকিয়া আনিবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

অর্থনৈতিক উন্নতির আলোচনায় আর্থিক ব্যাপারগুলিই প্রাধান্য লাভ করে। অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করার সময় আমরা দেখিয়াছি মানুষের একটা বিশেষ দিক লইয়া আমরা আলোচনা করি। তাই বলিয়া মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক আদর্শ বিলুপ্ত হইয়া যায় না। সেইজন্য স্রেফ আর্থিক উন্নতির খাতিরেও অন্যান্য কতকগুলি ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। আমরা সরকারী নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এই সরকার সত্যকার জনপ্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত সরকার হওয়া দরকার। গণতন্ত্রী সরকারই জনসাধারণের কল্যাণের রক্ষাকবচ। জনসাধারণের কর্তব্য আছে। সরকারের দায়িত্ব স্বীকার করা হইলে জনসাধারণের দায়িত্ব বিন্দুমাত্র কমে না। আমাদের সম্পদ ভোগ করার অধিকার আছে। কিন্তু সেজন্য সম্পদ সৃষ্টির দায়িত্বও স্বীকার করিতে হইবে। সরকার ও জনসাধারণকে দুর্নীতি মুক্ত হইতে হইবে।

অন্যান্য ব্যবস্থা—গণতন্ত্রী সরকার, জনসাধারণের সহযোগিতা, দুর্নীতি বিলোপ

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Describe the principal features of an under-developed country. Illustrate your answer with reference to India.

   অর্থোন্নত দেশের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর এবং ভারতের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ১০০-১০৩ দ্রষ্টব্য]

2 What are the requirements of the economic development of an under-developed country ?

   অর্থোন্নত দেশের আর্থিক উন্নয়নের জন্য কি কি প্রয়োজন ? [পৃষ্ঠা ১০৩-১০৬ দ্রষ্টব্য]

দশম শ্রেণীর পাঠ্য

দশম অধ্যায়

ব্যবসায় সংগঠন

(Forms of the Business Unit)

অভাব মিটাইতে হইলে দ্রব্য চাই। এক একটি দ্রব্য বা সেবাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে এক একটি শিল্প (industry)। এক বা একাধিক কারবার (firm) লইয়া শিল্প গঠিত। সরস্বতী প্রেস বা ঈগল প্রেস একটি কারবার। সমস্ত ছাপাখানা লইয়া গঠিত মুদ্রণ শিল্প। কারবারগুলি ব্যবসায়ে নিযুক্ত। ব্যবসায় করিতে হইলে চাই অর্থ। অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করা হয় নানাবিধ উপাদান, শ্রম, কাঁচামাল ইত্যাদি। এই উপাদানগুলির সমন্বয়ে প্রস্তুত হয় পণ্য দ্রব্য বা সেবা। পণ্য বাজারে বিক্রয় হয়। পরিবর্তে পাওয়া যায় টাকা। বিক্রয়লব্ধ অর্থ উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বেশী বা কম হইতে পারে। লাভ হইতে পারে, আবার লোকসানও হইতে পারে। ইহাই হইল **ব্যবসায়ের ঝুঁকি**। এই ঝুঁকি বহন করিতে যাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে কি প্রণালীতে প্রস্তুত হইবে, দাম কত হইবে—এই সব সমস্যার মীমাংসা করিতে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবসায়-সংগঠন রূপ পরিবর্তন করিয়াছে—ঝুঁকি বহন করিবার কায়দা বদলাইয়াছে। ব্যবসায় সংগঠন পাঁচ প্রকার।

(১) **এক মালিকানা কারবার** (Single-owner Firm) : এই ধরণের কারবারে মালিক একজন। লাভ হইলে, সম্পূর্ণ লাভ তিনি একাই ভোগ করিবেন। লোকসান হইলে, সম্পূর্ণ লোকসান তাঁহাকে একাই বহন করিতে হইবে। ব্যবসায়ের ঝুঁকি তিনি একা বহন করেন। জমি তাঁহার নিজের হইতে পারে বা তিনি জমি ভাড়াও লইতে পারেন। বাহিরের শ্রমিক তিনি নিয়োগ করিতে পারেন। সাধারণতঃ তিনি নিজেও শ্রম করেন। মূলধনের কিয়দংশ তিনি ধার করিতে পারেন। নিজস্ব মূলধন কিছু থাকা প্রয়োজন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে লোকে তেলা মাথায় তেল দেওয়াই পছন্দ করে। তিনি নিজে কপর্দকহীন হইলে তাঁহার ঝুঁকি বহন করিবার ক্ষমতায় কাহারও আস্থা থাকিবে না। কেহ তাঁহাকে ধার দিবে না।

একমালিকানা কারবারের মস্ত সুবিধা হইল মালিক নিজের গরজে ব্যবসায়ে সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। খুঁটিনাটি ব্যাপারেও তাঁহার তীক্ষ্ণ নজর থাকে। লাভ হইলে, কাহাকেও ভাগ দিবার ফলে লাভ হাল্কা হইবার ভয় নাই। লোকসান হইলে, অন্যের কাঁধে লোকসানের অংশ চাপাইয়া লোকসানের ভয় কমাইবার আশা

নাই। বড় দোকান দেরীতে খোলে, তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়। বেতনভুক্ কর্মচারীরা ৮ ঘণ্টার বেশী খাটিতে রাজী নয়। ছোট দোকান তাড়াতাড়ি খোলা হয়, বন্ধ হয় দেরীতে। মালিক নিজেই এখানে কর্মচারী। বিক্রয় বেশী হইলে, তাঁহার নিজের পকেটই ভারী হইবে।

অনেক শিল্পে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা সীমাবদ্ধ, অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের সাফল্যের জন্য সব সময় সকল দিকেই মালিককে নজর রাখিতে হয়। এই সব শিল্পে —যেমন কৃষি বা খুচরা বিক্রয়—একমালিকানা কারবার সুবিধা করিতে পারে। ব্যবসায় সংগঠনের আদিরূপ একমালিকানা কারবার। কিন্তু যে সমস্ত শিল্পে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা বেশী, সেখানে কারবার যত ছোট হইবে, উৎপাদন ব্যয়ও তত বেশী হইবে। বড কারবারের সঙ্গে ছোট কারবার প্রতিযোগিতায় হারিয়া যাইবে। বড কারবার করিতে গেলে মূলধনের প্রয়োজন বেশী। একমালিকানা কারবারে বেশী মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন। এককভাবে বেশী মূলধন যোগাইবার ক্ষমতা অধিকাংশের নাই। যাঁহার আছে, তিনিও এক কারবারে সমস্ত মূলধন লগ্নী করিবার ঝুঁকি নিতে চাহিবেন না। তা ছাড়া কারবার ভালভাবে চালাইতে হইলে অনেক রকম প্রতিভার দরকার। কেহ অর্থসংগ্রহ করিতে পটু, কিন্তু পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপারে একেবারে কাঁচা। একজন সমস্ত কাজ সমান ভালভাবে জানিবে এ আশা করা বৃথা। বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরণের কারবার এখন কোণঠাসা হইয়া আসিতেছে।

(২) **অংশীদারী কারবার (Partnership Firm) ঃ** এই ধরণের কারবারে মালিক দুই বা ততোধিক ব্যক্তি। সকলেই লাভ-লোকসানের অংশীদার। তবে লাভ লোকসানের অংশ সকলের সমান নাও হইতে পারে।

অংশীদারী কারবারে শ্রমবিভাগের সুযোগ লওয়া যায়। একজনের মূলধন আছে, দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রমিক নিয়ন্ত্রণে দক্ষ এবং তৃতীয় বক্তি হয়ত বাজারে পণ্য বিক্রয়ে পটু। এককভাবে ব্যবসা করিলে তিনজনের কেহই সুবিধা করিতে পারিবে না। কিন্তু তিনজন একত্রিত হইয়া যদি অংশীদারী কারবার করে, তবে কারবার চলিবে। সকলেই লাভবান হইবে। একজনের পক্ষে যতটা মূলধন যোগান দেওয়া সম্ভব—পাঁচজন মিলিয়া তাহার চেয়ে বেশী মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। এক মালিকানা কারবারের পরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ। অংশীদারী কারবারের পরিসর সে তুলনায় বৃহত্তর।

অনেক ক্ষেত্রে অংশীদারী কারবারে অংশীদারগণের দায় সীমাবদ্ধ নহে (unlimited liability)। ক এবং খ অংশীদারী কারবার সুরু করিল। ক-এর $\frac{1}{2}$ অংশ,

খ-এর ⅓ অংশ। কারবারে দেনা ৬০০০৲। এই দেনার জন্য ক ও খ উভয়েই পুরাপুরি দায়ী। কারবারের পাওনাদার এই ৬০০০৲ একা ক বা খ হইতে আদায় করিতে পারে। কারবারের দেনার জন্য ক বা খ-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি লইয়া টানাটানি হইতে পারে। অংশীদারের উপর পরিপূর্ণ আস্থা প্রয়োজন। এই আস্থা ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইলে হয় না। ঘনিষ্ঠতা বহুজনের সঙ্গে হওয়া সম্ভব নয়। এই ধরণের অংশীদারী কারবারে অংশীদারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। মূলধন সংগ্রহও সেইজন্য বেশী হইতে পারে না। আজকাল সসীম অংশীদার কারবার স্থাপনের সুবিধা দেওয়া হয়। অসীম দায়ের অসুবিধা দূর করা সম্ভব হইলেও অন্য অসুবিধাগুলি ইহাতে দূর হয় নাই।

অংশীদারী কারবারের স্থায়িত্ব অনিশ্চিত। মনোমালিন্যের ফলে, অথবা কোন অংশীদার দেউলিয়া বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে কারবার ভাঙ্গিয়া যায়। লোকের সব সময় স্বাচ্ছন্দ্য নাও থাকিতে পারে। কোন অংশীদার আর্থিক বিপাকে পড়িয়াছে; সে সময় অংশ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা খুব স্বাভাবিক। অংশীদারী কারবারে অংশীদারের অনুমতি ছাড়া অংশ বাহিরের কাহাকেও বিক্রয় করা যায় না। জলের দামে অংশ বিক্রয় করিতে হইতে পারে। অংশীদাররা অনুমতি দিতে দেরী করিলে বিক্রয়েচ্ছু অংশীদার অসুবিধায় পড়িবে।

(৩) **যৌথ মূলধনী কারবার** (Joint Stock Company): ব্যবসায়ের আধুনিক রূপ। বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রথম হইতেই যৌথ মূলধনী কারবার হিসাবে চালু হয়। এই ধরণের কারবারে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। সেই সুবিধাগুলি পাইবার জন্য অনেক একমালিকানা ও অংশীদারী কারবারও শেষ পর্যন্ত যৌথ মূলধনী কারবারে রূপান্তরিত হয়।

অল্প কয়েকজন লোক নিজেদের মধ্যে ব্যবসায় সম্বন্ধে ঘরোয়া আলোচনা করে। একটি বিশেষ ব্যবসায়, যেমন সাবান তৈয়ারী করা, লাভজনক হইবে মনে করিয়া তাহারা ঐ কারবার করা স্থির করিল। তখন তাহারা দুইটি খসড়া তৈয়ারী করে। তাহাতে কারবারের নাম, ঠিকানা, কারবারের প্রকৃতি, অফিস, পরিচালনা ব্যবস্থা, মূলধনের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ থাকে। এই খসড়া দুইটি যৌথ মূলধনী কারবারের রেজিষ্ট্রারের নিকট পেশ করিতে হইবে। এই রেজিষ্ট্রার রাষ্ট্রের কর্মচারী। এই খসড়া পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলে তিনি কাজ সুরু করিবার অনুমতিপত্র (writ of commencement) দেন। এখন যৌথ মূলধনী কারবার জন্মগ্রহণ করিল। রাষ্ট্রীয় আইনের বলে ইহার উৎপত্তি। আইনের চোখে এই কারবারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

এই কারবারের মূলধন সংগ্রহ হয় (১) ডিবেঞ্চার (debenture) ও (২) শেয়ার (share) বিক্রয় করিয়া। শেয়ার অনেক রকম হয়। তার মধ্যে সাধারণ শেয়ার ও সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার (preference share) উল্লেখযোগ্য। যাহারা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবে, তাহারা বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে সুদ পায়। লাভ কম হইলে, এমনকি লোকসান হইলেও নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হইবে। কোম্পানী বা কারবারের লাভ বেশী হইলেও, ডিবেঞ্চার ক্রয়কারী পূর্বনির্দিষ্ট হারেই সুদ পাইবেন। কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি এই ডিবেঞ্চারের জন্য জামিন থাকে। কোম্পানী উঠিয়া গেলে এই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও ইহাদের দেনা সকলের আগে মিটাইতে হইবে। ইহারা কোম্পানীর পাওনাদার। শেয়ার ক্রয়কারীরা কোম্পানীর মালিক। শেয়ার মূলধনের মোট পরিমাণ হয়ত ৫০,০০,০০০্ টাকা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা শেয়ারে এই মূলধন ভাগ করা হয়। প্রতি অংশ বা শেয়ারের দাম ১০০্ করিলে, শেয়ারের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৫০,০০০্। যে যতগুলি শেয়ার কিনিবে, সে তত অংশের মালিক হইবে। বাৎসরিক লাভ যাহা হইবে তাহা হইতে সবচেয়ে আগে ডিবেঞ্চার বণ্ডের সুদ দিতে হইবে। যদি উদ্বৃত্ত কিছু থাকে তাহা হইতে সর্বাগ্রগণ্য অংশীদারকে তাহার নির্দিষ্ট লভ্যাংশ—যেমন বার্ষিক শতকরা ৬ ভাগ—মিটাইয়া দিতে হইবে। তারপর যাহা থাকিবে তাহা সাধারণ অংশীদারদের ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। সাধারণ অংশীদারদের লভ্যাংশ, ধরাবাঁধা কিছু নাই। লাভ কম হইলে, তাহাদের ভাগ্যে কিছু নাও জুটিতে পারে। আবার মোটা লাভ হইলে ইহাদের ভাণ্ডার লুটিবার অবস্থা হইতে পারে। লভ্যাংশ শতকরা ২০।২৫ এমনকি ৫০ ভাগ হইতে পারে।

যৌথ মূলধনী কারবারের মালিক ইহার অংশীদারগণ। অংশীদারের সংখ্যা অনেক হইতে পারে। প্রত্যেকের পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা অসম্ভব। অংশীদারগণ সাধারণ সভায় (General meeting) মিলিত হইয়া নিজেদের মধ্য হইতে সামান্য কয়েকজন অংশীদারকে পরিচালক-মণ্ডলীতে (Board of Directors) নির্বাচিত করেন। নির্বাচন ভোটের সাহায্যে হয়। যার যতগুলি শেয়ার তার ততগুলি ভোট। কোম্পানীর কাজের তত্ত্বাবধান এই পরিচালক-মণ্ডলীই করেন।

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে যৌথ মূলধনী কারবারও প্রসার লাভ করিতেছে। বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা অল্প পুঁজিতে হয় না। বৃহৎ পুঁজি সংগ্রহের ব্যাপারে কারবারের যৌথ মূলধনী রূপ কতটা সাহায্য করে, তাহা দেখিতে হইবে। যৌথ মূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলির বিচার এই দৃষ্টিকোণ হইতে করিতে হইবে।

যৌথ মূলধনী কারবারের দোষগুণ ঃ

এই ধরণের কারবারে অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধ। ধরা যাক একটা শেয়ারের মূল্য ১০০৲ টাকা। আমি যদি দুইটি শেয়ার কিনি আমার দায় ২০০৲ টাকা। কোম্পানীর দায় যত বেশীই হোক, আমাকে ২০০৲র বেশী এক কাণাকড়িও দিতে হইবে না। অংশীদারী কারবারের মত মাটিবাটি ক্রোক হইবার আশংকা নাই। যে যতগুলি শেয়ার কিনিবে, তার দায় ঠিক ততখানি। অধিকপক্ষে এই পরিমাণ লোকসান হইতে পারে। শেয়ার কিনিবার সময় লোকসানের অঙ্ক জানা থাকে। দায় গ্রহণ করিবার সামর্থ্য অনুসারে লোকে শেয়ার ক্রয় করিতে পারে। সেইজন্য যৌথমূলধন কারবারের লোকে নিশ্চিন্ত মনে মূলধন লগ্নী করিতে পারে।

(১)
সীমাবদ্ধ দায়

প্রতি শেয়ারের মূল্য ১০০৲ টাকা না করিয়া আরও কম যেমন ১০৲ টাকা করা যায়। মূলধন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ারে ভাগ করার সুবিধা অনেক। অনেকের পুঁজিপাটা কম অথচ বিনিয়োগের ইচ্ছা আছে। অল্প মূল্যের শেয়ার হইলে ইহারাও লগ্নী করার সুযোগ লইতে পারে। যার অধিক মূলধন, তারও অসুবিধা নাই। ৫টার পরিবর্তে সে ৫০টি শেয়ার ক্রয় করিবে। অংশীদারী কারবারে ইহা সম্ভব হয় না। ৫ লক্ষ টাকা মূলধন যে কারবারের প্রয়োজন, সেখানে ১০৲র অংশ ক্রয় করার ইচ্ছা বাতুলতা মাত্র। মৃন্ময় পাত্রের সঙ্গে কাংস্য পাত্রের মিত্রতা সম্ভব নয়। যৌথ মূলধনী কারবারে কিন্তু ইহা সব সময় ঘটে। বাস্তবিক **যৌথমূলধনী কারবারে ব্যক্তি একত্রিত হয় না—একত্রিত হয় মূলধন। এখানে ভোটের অধিকার বিলি হয় শেয়ার হিসাবে—ব্যক্তি হিসাবে নয়।**

(২)
শেয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত

ঝুঁকি বহন করিবার ইচ্ছা সকলের এক রকম নয়। কেহ অত্যন্ত সাবধানী। কেহ আবার 'মারিত হাতী, লুটিত ভাণ্ডার' এই নীতিতে বিশ্বাসী। যৌথমূলধনী কারবারে সকলের পচ্ছন্দমাফিক ঝুঁকি লইবার ব্যবস্থা আছে। যাহারা অতি সাবধানী তাহারা ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবে। যাহারা আর একটু বেশী ঝুঁকি লইতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য আছে সর্বাগ্রগণ্য শেয়ার। যাহাদের ঝুঁকি লইবার আগ্রহ আরও বেশী, তাহারা কিনিবে সাধারণ শেয়ার। যার যে রকম রুচি সে সেই রকম ঝুঁকি লইয়া লগ্নী করিবে।

(৩)
তারতম্যের ভিত্তিতে শেয়ারের শ্রেণীভেদ

এই ধরণের কারবারে অংশীদারগণ কারবারের মালিক। বেশীর ভাগ অংশীদারের সঙ্গে কারবার পরিচালনার কোনও সম্বন্ধ নাই। অনেকে ঝুঁকি লইতে রাজী থাকিলেও—কারবার পরিচালনার ঝক্কি সহ্য করিতে নারাজ। এই ধরণের লোকের পক্ষে যৌথমূলধনী কারবারে লগ্নী করার ইচ্ছা অত্যন্ত স্বাভাবিক। যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান লোকের বিনিয়োগ অভ্যাস গঠন করিতে সাহায্য করে।

(৪) ঝুঁকি বহনকারীকে পরিচালনার ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয় না।

অংশীদারী বা একমালিকানা কারবারে এক ব্যবসায়ে মোটা লগ্নী করিতে হয়। ব্যবসায় লোকসান হইয়া উঠিয়া যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে পুঁজির মোটা অংশ নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। যৌথমূলধনী কারবারে শেয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত। ২০০০৲ এক কারবারে বিনিয়োগ না করিয়া ১০টি কারবারে খাটান যায়। ১টি কারবার নষ্ট হইবার আশঙ্কা যতখানি ১০টি কারবার একই সঙ্গে নষ্ট হইবার আশঙ্কা তার চেয়ে কম। কোথাও লাভ হইবে, কোথাও লোকসান হইবে, ইহাই আশা করা যায়। ঝুঁকি পাঁচটি কারবারের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে ঝুঁকির পরিমাণ কমে। এইভাবেও লোকের বিনিয়োগ করিবার ইচ্ছা ও সাহস বাড়ে।

(৫) ঝুঁকি ছড়াইয়া ঝুঁকি কমান যায়।

যৌথমূলধনী কারবারের স্বতন্ত্র সত্তা ও স্থায়িত্ব আছে। সমস্ত অংশীদার একযোগে মরিয়া গেলেও কোম্পানী যে রকম ছিল সেই রকমই থাকিবে। সেজন্য যৌথ মূলধনী কোম্পানীর সঙ্গে কারবার করিতে লোকে ভয় পায় না। যৌথ কোম্পানীকে লোকে সহজেই ঋণ দেয় ও ধারে মাল যোগান দেয়। দরকার হইলে পাওনাদার কোম্পানীর নামে মামলা রুজু করিতে পারে।

(৬) স্থায়িত্ব

ব্যয় করিবার পর আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ লোক বিনিয়োগ করে। লোকের দিন সমান যায় না! আর্থিক স্বাচ্ছল্যের সময় লোকে শেয়ার কেনে। তারপর আর্থিক দুর্দিন আসিতে পারে। আয় কমিতে বা ব্যয় বাড়িতে পারে। তখন লোক যে কোন প্রকারে টাকা চায়। শেয়ার বিক্রী করার কথা মনে হয়। অংশীদারী কারবারে শেয়ার বিক্রয় করিবার ঝামেলা অনেক। যৌথ মূলধনী কারবারের শেয়ার হস্তান্তর করা অনেক সহজ। ইহার জন্য অন্য অংশীদারের অনুমতির প্রয়োজন নাই। খরিদ্দার পাইলেই হইল। দামের ইতরবিশেষ হইতে পারে। বিক্রয় করিবার অন্য কোনও বাধা নাই। এই সহজ হস্তান্তরযোগ্যতা আছে বলিয়াই লোক এত সহজে যৌথমূলধন কারবারের শেয়ার কিনিতে রাজী হয়।

(৭) হস্তান্তরযোগ্যতা

যৌথ মূলধনী কারবারের কিছু কিছু অসুবিধাও দেখা যায়। বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রয়োজনে যৌথমূলধনী কারবারের সৃষ্টি। এই ধরণের ব্যবসা সংগঠন প্রচুর মূলধন সংগ্রহের সুযোগ করিয়া দেয়। এর ফলে অনেক সময় একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়। একচেটিয়া কারবারে উৎপাদন কম হয় ও দাম বাড়ে। জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(১)
একচেটিয়া কারবার

বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে অচল, যৌথমূলধনী কারবারের সার্থকতাও সেখানে অগ্রাহ্য। এই ধরণের কারবারে অংশীদারগণ মালিক। পরিচালকমণ্ডলী নামে চালক। অধিকাংশক্ষেত্রে পরিচালনার আসল ভার থাকে বেতনভোগী কর্মচারীর উপর। কর্মচারী উচ্চপদস্থ হইতে পারে, তাহার বেতন পাঁচ অঙ্কের হইতে পারে—তবুও সে কর্মচারী, মালিক নয়। কর্মচারী বেতন পাইলেই সন্তুষ্ট। বেতন পাইবার জন্য যতটুকু না করিলেই নয়, সে ততটুকুই করিবে। নূতন কিছু করার আগ্রহ ও সাহস তাহার না থাকাই স্বাভাবিক। অধস্তন কর্মচারীদের কাজের হিসাব কড়ায়ক্রান্তিতে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা সে করিবে না। মালিকের ব্যক্তিগত পরিচালনার প্রয়োজন যেখানে বেশী, বৃহদায়তন উৎপাদন ও যৌথমূলধনী কারবারও সেই সব ব্যবসার উপযোগী নয়।

(২)
পরিচালনায় শৈথিল্য

প্রভূত মূলধনের প্রয়োজন হইলে তবেই যৌথ সংগঠনের আশ্রয় লইতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই অংশীদারগণের সংখ্যা হয় অগুণতি। অংশীদাররা বিক্ষিপ্তভাবে দূরবর্তী জায়গায় থাকে। কেহ কাহাকেও জানে না। যাদের হাতে অল্পসংখ্যক শেয়ার, তারা পরিচালনার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না। যাদের শেয়ার বেশী ও যারা উদ্যোগী, তারা অন্যান্য অংশীদারগণের নিকট হইতে প্রতিনিধিপত্র (proxy) যোগাড় করে। বড় বড় কোম্পানীর সাধারণ সভায় ২০।২৫ জন অংশীদার উপস্থিত থাকে কিনা সন্দেহ। এই ঔদাসীন্যের সুযোগে মুষ্টিমেয় অংশীদার পরিচালনার ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। ইহারা নানা অসদুপায়ে নিজেদের স্বার্থে অংশীদারদের ক্ষতি সাধন করে। যেমন ৫,০০০ টাকার জমির দাম ১০,০০০ টাকা ধরিয়া সেই পরিমাণ শেয়ার জমির মালিককে বিলি করে। জমির মালিক পরিচালকবর্গের পেটোয়া লোক। তাহার লাভ হইল। কিন্তু অন্য অংশীদারদের লোকসান হইল।

(৩)
অংশীদারগণের উদাসীনতা অসাধুতার প্রশ্রয় দেয়

শেয়ারের হস্তান্তরযোগ্যতার জন্যও সময়ে সময়ে অসুবিধা হয়। শেয়ার বাস্তব মূলধনের প্রতীক মাত্র। শেয়ারের বাজার দর উঠা নামা করে। অনেকে রাতারাতি

ধনী হইবার আশায় শেয়ার কেনাবেচা করে। ইহাতে সঞ্চয়ের মোটা অংশ আটকাইয়া থাকে। বাস্তব মূলধন বৃদ্ধির কোনও সহায়তা হয় না। নূতন শেয়ার ক্রয় করিলেও অনেক সময় মূলধন গঠনে সাহায্য হয় না।

(৪) শেয়ার হস্তান্তরযোগ্যতার কুফল

বিশেষ করিয়া অনগ্রসর দেশে জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়া সুযোগসন্ধানী লোক ভূয়া শেয়ার বিক্রয় করে। পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ভয় পায়। জনসাধারণের বিশ্বাস নষ্ট হয়। সঞ্চয় বিনিয়োগে কুণ্ঠা জাগে। শেয়ারের দাম লভ্যাংশ (dividend) বিতরণের উপর নির্ভর করে। পরিচালকবর্গ কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যতটা ওয়াকিবহাল সাধারণ লোক সেরূপ নয়। কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা হয়ত শোচনীয়। সত্যকার অবস্থা অংশীদারগণ জানে না। পরিচালকবর্গ অধিক হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিল। শেয়ারের বাজার দর চড়িল। পরিচালকবর্গ নিজেদের শেয়ার চড়া দামে বিক্রয় করিল। তারপর সত্যকার অবস্থা জানাজানির পর শেয়ারের বাজার দর কমিয়া গেল। তখন যাহারা বেশী দামে বিক্রয় করিয়াছিল, তাহারাই আবার কম দামে সেই শেয়ারই কিনিয়া লইল।

যৌথ মূলধনী কারবারে মধুর সঙ্গে হুল আছে। তবে ব্যবসায় সংগঠন যেরূপই হোক, বৃহদায়তন উৎপাদন করিতে গেলে, এই অসুবিধাগুলির বেশীর ভাগ থাকিয়াই যাইবে। যৌথমূলধনী সংগঠনকে সেজন্য দায়ী করা চলে না। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা অত্যন্ত বেশী। সেজন্য বৃহদায়তন উৎপাদন বাদ দিবার কথা কল্পনাও করা যায় না। আর ঠিক একই কারণে যৌথমূলধনী কারবারও ব্যবসায় জগতে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে।

(৪) **সমবায়** (Co-operation) : শ্রমবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র ব্যবহার সুরু হইল। শ্রমবিভাগ ও যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা লইবার জন্য বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রয়োজন হইল। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা অনেক। সেজন্য বৃহদায়তন উৎপাদন প্রসার লাভ করিতে লাগিল। সাধারণ লোকের মালিক বা সংগঠক হইবার আশা থাকিল না। ভাড়াটিয়া শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ব্যবসার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা।

সমবায়ের ব্যাপক উদ্দেশ্য

ক্রেতার বা শ্রমিকের স্বার্থ উপেক্ষিত হইল। একচেটিয়া কারবারের আবির্ভাব হইল। আর্থিক অসাম্য দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ধনীদের ক্রয় ক্ষমতা অধিক। মুনাফা পাইবার জন্য ধনীদের চাহিদা মাফিক দ্রব্য উৎপাদন হইতে লাগিল। এই অবস্থার প্রতিরোধ করিবার জন্য সমবায় আন্দোলনের সৃষ্টি হইল। সমবায়কে শুধু ব্যবসায়ের সংগঠন হিসাবে দেখিলে ভুল হইবে। সমবায়ের উদ্দেশ্য ছিল আরও ব্যাপক।

গণতান্ত্রিক উপায়ে শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব—ইহাই ছিল সমবায় আন্দোলনের মহত্তর উদ্দেশ্য।

ব্যবসায় সংগঠন হিসাবে সমবায়ের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ্য কম। ধনী যে সুযোগ লাভ করিতে পারে, দরিদ্রের পক্ষে তাহা একক চেষ্টায় পাওয়া সম্ভব নয়। একক চেষ্টায় যাহা অসম্ভব সমবেত চেষ্টায় তাহা সম্ভব হইতে পারে। **সমবায় বিত্তহীনের সংগঠন**। যাহার পুঁজি আছে, সে ব্যক্তিগত মালিকানা, অংশীদারী বা যৌথমূলধনী কারবারে লগ্নী করিতে পারে। বেশ কিছু মূলধন না থাকিলে ব্যক্তিগত মালিকানা বা অংশীদারী কারবার করা যায় না। যৌথমূলধনী কারবারেও সুযোগ-সুবিধা পাইতে গেলে বেশ কিছু শেয়ারের মালিক হওয়া দরকার। এই প্রতিষ্ঠানগুলি পুঁজিহীন ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত নয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে পুঁজিপতিরা মূলধনের ভিত্তিতে মিলিত হন। ব্যক্তি হিসাবে মিলন সমবায় সংগঠনের ভিত্তি। সেজন্য এখানে মাথাপিছু ভোটের ব্যবস্থা। যৌথমূলধনী কারবারে শেয়ারপিছু ভোটের ব্যবস্থা। সমবায়ের সদস্য হওয়া ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যখন খুশী সদস্যপদে ইস্তফা দেওয়া যায়। প্রত্যেকে অন্য সকলের স্বার্থ নিজের স্বার্থের সমান করিয়া দেখিবে। তাহা না হইলে সমবায় সফল হইতে পারে না। জবরদস্তি করিয়া এই মনোভাব সৃষ্টি করা বা বজায় রাখা যায় না। সমবায় সংগঠনের কোন আর্থিক উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে। এই আর্থিক উদ্দেশ্য অনেক রকম হইতে পারে—যেমন ঋণদান, বিক্রয় ব্যবস্থা, খুচরা বণ্টন ব্যবস্থা ইত্যাদি। সমবায় সমিতির সভ্যদের আর্থিক স্বার্থ বাদে অন্য স্বার্থও আছে। সমিতির সাফল্যের জন্য এই সব ব্যাপার সমিতির এক্তিয়ারের বাহিরে রাখা দরকার।

(১) বিত্তহীনের সংগঠন

(২) সদস্যরা সকলে সমান ক্ষমতার অধিকারী।

(৩) ঐচ্ছিক সদস্যপদ

(৪) সভ্যদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন ইহার উদ্দেশ্য।

সংক্ষেপে বলা যায়—কোন আর্থিক উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য সাম্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছায় সহযোগিতাকে সমবায় বলা হয়। সমবায়ের ভিত্তিতে চালিত প্রতিষ্ঠানকে সমবায় সমিতি বলে।

সমবায়ের সংজ্ঞা

সমবায়ের দোষগুণ (Advantages and Disadvantages of Co-operation): ব্যবসায় পরিচালনার ব্যাপারেও শ্রমবিভাগের নীতি অনুসৃত হয়। সংগঠনের কাজ একটি বিশেষ পেশা হইয়া দাঁড়ায়। সংগঠনের সঙ্গে শ্রমিকের কোনও

সম্বন্ধ থাকে না। সমবায় সমিতির সদস্যদের ব্যবসায় পরিচালনার সঙ্গে সংযোগ বজায় থাকে। যে সমস্ত ব্যবসায় সংগঠন মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যেমন যৌথ-মূলধনী কারবার, সেখানে মূলধনের মালিক ও ক্রেতার মধ্যে স্বার্থের সঙ্ঘাত হয়। সমবায়ে ক্রেতারাই মালিক হিসাবে লাভ পায়। সংঘর্ষের কোনও স্থান এখানে নাই। সমবায় সংগঠনে সদস্যরা প্রত্যেকে সকলের জন্য কাজ করে। ভোটের ব্যাপারে সকলেই সমান। ফলে গণতান্ত্রিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়।

মূলধন ও শ্রমের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত দূর হয়।

এ সমস্ত কিন্তু তত্ত্বের কথা। ভারতে সমবায় আন্দোলনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য মিঃ নিকলসনকে নিযুক্ত করা হয়। সমবায় সফল করিতে হইলে রাইফিজিনকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, এই ছিল নিকলসনের বক্তব্য। রাইফিজিন ছিলেন জার্মানীর একজন সমাজ সংস্কারক। তাঁহার প্রেরণাকেই জার্মানীতে গ্রাম্য সমবায় আন্দোলন গড়িয়া উঠে। রাইফিজিনের মত আদর্শবাদী পুরুষ না হইলে সমবায় সফল হইতে পারে না। প্রত্যেকে সকলের জন্য কাজ করিবে এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য কাজ করিবে—ইহা না হইলে সমবায় সফল হইতে পারে না। এই ধরণের আদর্শ না থাকলে সমবায় মুখোস মাত্র হইয়া থাকিবে।

আদর্শনিষ্ঠা না থাকিলে সমবায় সফল হইতে পারে না।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে সমবায় সংগঠন ঋণদান ও ভোগপণ্য সরবরাহ বাদে উৎপাদনের অন্য কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। সঙ্কীর্ণ অর্থে উৎপাদনের বেলায় সমবায় নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। ঋণ দাতা সমবায় সমিতিও উচ্চ-হারে সুদ না লইলে সফল হইতে পারিত না। সমিতির সদস্যদের দেনাশোধে গাফিলতির জন্য চড়া সুদ গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। ভোগ্যপণ্য সরবরাহের বেলায় দেখা যায় যুদ্ধ বা অনুরূপ কোন কারণে যখন ভোগ্য-পণ্যের দাম অসম্ভব বাড়িয়া যায়, তখন অনেক সমিতি গজাইয়া উঠে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে আবার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। অন্যান্য ব্যবসায় সংগঠনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমবায় সমিতি পিছনে সরিয়া আসে। সমবায় সমিতির সদস্যরা সাংগঠনিক প্রতিভার কোন পরিচয় দিতে পারে নাই। সকলে সমান হওয়ার বিপদ আছে। বর্তমান যুগের বৃহদায়তন কারবার পরিচালনার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনার তুলনা করা যায়। শৃঙ্খলার প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই খুব বেশী। সংগঠককে ব্যবসায় সেনাপতি বলিলে কিছু ভুল বলা হয় না। দায়িত্ব ভাগ করিলে আর দায়িত্ব থাকে না। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। যে সমস্ত ব্যবসায়ে ঝুঁকি কম এবং সংগঠনের কাজ রুটিনে পরিণত করা যায়, সেই সমস্ত

ব্যবসায়ে সমবায় সফল হইতে পারে। এই ধরণের ব্যবসায় খুব বেশী। সুতরাং সমবায় সম্বন্ধে বেশী আশা না করাই শ্রেয়।

ভারতে সমবায় (Co-operation in India) : অর্ধ শতাব্দীরও বেশী হইল ভারতে সমবায় আন্দোলন সুরু করা হইয়াছে। দরিদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র কারিগর ও স্বল্প-বিত্তদের আর্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে ১৯০৪ সালে আইন করা হয়। এই আইনে ঋণ-দানের জন্য সমবায় সমিতি গঠনের সুবিধা দেওয়া হয়। সমিতিগুলি গ্রাম্য ও পৌর এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। গ্রাম্য সমিতিগুলি রাইফিজিন সমিতির আদর্শে গঠন করিবার কথা হয়।

১৯০৪এর আইন

ইহার বিশেষত্ব হইল :—(১) কমপক্ষে ১০ জন সভ্য হইতে হইবে, (২) শেয়ার বিক্রয় নিষিদ্ধ—সকল সদস্যের যৌথ দায়িত্বে ধার করিয়া ঋণ দিবার তহবিল সৃষ্টি করা হইবে, (৩) সদস্যদের দায়িত্ব অসীম, (৪) সদস্যদের বাসস্থান কাছাকাছি হইতে হইবে, (৫) বেতনভুক কর্মচারী (সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ বাদে) থাকিবে না, (৬) কেবলমাত্র উৎপাদনশীল উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হইবে, (৭) লভ্যাংশ বিতরণ নিষিদ্ধ ইত্যাদি। পৌর সমিতিগুলির আদর্শ 'সুলজডেলিৎস্' সমিতি। ইহার বৈশিষ্ট্য :— (১) বেতনভুক কর্মচারী থাকে, (২) লভ্যাংশ বিতরণ হয়, (৩) সীমাবদ্ধ দায়িত্ব, (৪) বিস্তৃত এলাকার লোক সদস্য হইতে পারে ইত্যাদি।

১৯১২ সালের আইনে কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি স্থাপনের ও ঋণদান ছাড়া অন্য জাতীয় সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনে সমিতিগুলিকে—সসীম ও অসীম দায়িত্বের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়। ১৯০৪ সালের আইনের ত্রুটিগুলি এইভাবে দূর হয়। ১৯১৯ সালে প্রাদেশিক সরকারের হাতে সমবায় ন্যস্ত হয়। ইহার পর সমবায় সমিতির সংখ্যা খুব দ্রুত বাড়িয়া চলে। ঋণদান ছাড়াও বীজ ক্রয়, ভোগপণ্য সরবরাহ, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমবায় ছড়াইয়া পড়ে। ১৯২৯ সালে জগদ্ব্যাপী মন্দা দেখা দেয়। অনেক সমিতি নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমস্ত জিনিষ অগ্নিমূল্য হইয়া পড়ে; ভোগপণ্য সরবরাহের জন্য সমিতিগুলি আবার ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতে সুরু করে। কৃষি পণ্যের দাম বাড়ায়, চাষীর আয় বাড়ে। চাষী সমিতির ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হয়। সমিতিগুলির অবস্থা ফিরিয়া যায়। ইহার পর পরিকল্পনার আমল।

১৯১২এর আইন ও তারপর

সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে প্রথমেই ঋণদান সমিতির নাম করিতে হয়। গ্রামে কৃষকদের মধ্যে এবং শহরে ক্ষুদ্র কারিগর ও মধ্যবিত্তদের মধ্যে ঋণদান সমিতি আছে। বড় বড় কোম্পানীর কর্মচারী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সমবায় ঋণদান সমিতি

আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্যও অনেক সমিতি স্থাপিত হয়েছে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে জোলাদের মধ্যে সমবায় সমিতি যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে। কর্মকার, কুম্ভকার, চর্মকারদের মধ্যেও সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। দুধ যোগান দিবার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি পশ্চিম বাংলা ও বোম্বাইতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে গৃহ নির্মাণ সমিতি কিছু সংখ্যক আছে। ভারতে বর্তমানে বহু-উদ্দেশ্যসাধন-সমিতি স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। নামে বহু-উদ্দেশ্য হইলেও কাজে ইহাদের কর্মক্ষেত্র ঋণদানে সীমাবদ্ধ আছে। যে সকল সমিতি সত্য সত্য বহু উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়াছে, তাহারা প্রায়ই সুবিধা করিতে পারে নাই।

বিভিন্ন জাতীয় সমিতি

ভারতে সমবায় সংগঠনের গুরুত্ব (Importance of Co-operation in India): ভারত দরিদ্র দেশ। ধনীর সংখ্যা এখানে মুষ্টিমেয়। চাকুরীজীবি মধ্যবিত্তের পক্ষে সমবায়ের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। আয় এত কম যে প্রায়ই ঋণ করিতে হয়। অফিস আদালতে 'অধমর্ণের'র প্রতীক্ষারত কাবুলিওয়ালাকে আমরা সকলেই দেখিয়াছি। এই শ্রেণীর মধ্যে ঋণদান সমিতি বেশ কিছুটা সাফল্যও অর্জন করিয়াছে। ভোগ্যপণ্য সরবরাহের জন্যও এই শ্রেণী সমবায়ের সাহায্য লইতে পারে। আমাদের দেশে এখন বিক্রেতার বাজার। দাম চাহিলেই হইল। জিনিষ চোরাবাজারে পাচার করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করা নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় সমবায় সমিতি মারফৎ সরবরাহের চেষ্টা করিলে ন্যায্য মূল্যে পণ্য দ্রব্য পাইবার আশা থাকে। সরকার লাইসেন্স ও কোটা সমিতির নামে বিলি করিয়া সমিতিগুলিকে উৎসাহিত করিতে পারেন। কলিকাতা ও বোম্বাই-এর ন্যায় বড় বড় সহরে ঘর ভাড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বেতনের তুলনায় ভাড়া বাবদ ব্যয় অত্যন্ত বেশী। ভাড়া বাড়ী পাওয়াও দুষ্কর। গৃহনির্মাণের ব্যাপারেও সমবায়ের সাহায্য লওয়া যায়।

ভোগ্যপণ্য সরবরাহ

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের দুর্দশা আমরা সকলেই জানি। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইহারা কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। কাঁচামাল কিনিবার সামর্থ্য ইহাদের কম। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কোনও সুব্যবস্থা নাই। সমবায়ের সাহায্যে ইহাদের সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা সফল হইতে পারে। মুচি, কামার, ছুতার, জোলা সকলেরই অল্পসুদে ঋণের প্রয়োজন আছে। মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সমবায় সমিতির প্রয়োজনীয়তা আছে। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি অনেকেই এককভাবে কিনিতে পারে

না। এখানেও সমবায় সাহায্য করিতে পারে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় ব্যবস্থা করিলে ন্যায্য মূল্য পাইবার আশা থাকে। পরিবহনের ক্ষেত্রেও সমবায় নীতি প্রয়োগ করিবার সুযোগ আছে।

ভারতে জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ কৃষিতে নিযুক্ত। ইহাদের অধিকাংশই সামান্য জমির মালিক এবং অত্যন্ত দরিদ্র। কৃষিকার্যের প্রতিটি ব্যাপারে সমবায় নীতি প্রযোজ্য। অনেক কারণে কৃষকের ঋণের প্রয়োজন হয়। মহাজনদের সুদের হার অত্যন্ত বেশী। সমবায় ঋণদান সমিতি কৃষককে ঋণ দিবার ভার লইতে পারে। বীজ, সার ও যন্ত্রপাতি কিনিবার ব্যাপারেও সমবায় সাহায্য করিতে পারে। ছোট খাট সেচ-ব্যবস্থা ও জমির সংহতি সাধন করিবার জন্যও সমবায় সমিতি গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভারতে বৃহৎ বহরের চাষ ব্যবস্থা নাই। কারণ জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত। জোর করিয়া একত্র করা আমাদের সংস্কার বিরোধী। ব্যক্তিগত মালিকানার লোপ কৃষক চায় না। একমাত্র সমবায় চাষ এই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। সাপও মরিবে, লাঠিও ভাঙ্গিবে না। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যাইবে অথচ ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুন্ন থাকিবে।

কৃষি

ভারতে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার সাহায্যে আর্থিক উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। আমাদের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন। একনায়কতন্ত্রে এই পরিবর্তন জোর করিয়া করা যাইতে পারে। গণতান্ত্রিক উপায়ে এই পরিবর্তন আনিতে হইলে সমবায়ের সাহায্য লইতেই হইবে।

ভারতে সমবায়ের ত্রুটি ও সাফল্য (Failures and Achievements of Co-operation in India) : সমবায়ের তিনটি উদ্দেশ্য—উন্নততর কৃষিকার্য, উন্নত-তর ব্যবসা ও উন্নততর জীবনযাত্রা (better farming, better business and better living)। ইহার কোনটি কার্যে পরিণত হয় নাই। মোট কৃষি ঋণের শতকরা মোটে তিন ভাগ সমবায় সমিতির মারফৎ পাওয়া যায়। স্বজন পোষণের চেষ্টা খুব বেশী। অনেক ক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল কাজে ঋণ দেওয়া হয়। ঋণ পরিশোধ যথাসময়ে হইয়া উঠে না। পুরাতন ঋণ গোপন রাখিয়া অনেকে নূতন ঋণ লয়। প্রভাবশালী সদস্যদের পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে ঋণ পাওয়া যায় না। সমিতিগুলির নিজস্ব মূলধন কম। চলতি মূলধনের মোটা অংশ বাহির হইতে ধার করিতে হয়। সুতরাং সুদের হার খুব কম নয়। ভারতে সমবায় আন্দোলন এখনও সরকারের হাতে ধরা। মহাজনদের বিরোধিতাও সাফল্যের অন্তরায়। সব চেয়ে বড় বাধা

ভারতে সমবায় আন্দোলনের ত্রুটি।

হইল সমবায় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার অভাব। সমবায়কে আমরা ফাঁকা বুলি মনে করি। নিজের স্বার্থ সাধনের জন্যই আমরা সুবিধামত সমিতিতে যোগ দেই। আবার স্বার্থের জন্য ছাড়িতেও দ্বিধা করি না। সমবায়ে বিশ্বাস না থাকিলে সমবায় সার্থক হইতে পারে না।

আন্দোলনের সাফল্য

সমবায় আন্দোলন একেবারে বিফল হইয়াছে বলা যায় না। মহাজনের সুদের হার অপেক্ষা সমিতি কম সুদ নেয়। সমিতি থাকার ফলে মহাজন সুদের হার কমাইতে বাধ্য হইয়াছে। চাষীদের মধ্যে সঞ্চয়, মিতব্যয়িতা ও বিনিয়োগের অভ্যাস কিছুটা গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য সমিতির সাফল্য আরও বেশী। কেবলমাত্র আর্থিক উন্নতি সমবায়ের লক্ষ্য নয়। সামাজিক ও নৈতিক ব্যাপারে সমবায় আন্দোলনের ফলে বেশ কিছুটা সুফল দেখা দিয়াছে। মামলা মোকদ্দমা, জুয়াখেলা কিছুটা কমিয়াছে। সহরের ধনী ও সমাজকর্মীদের মধ্যে গ্রামের সমস্যা সম্বন্ধে জানিবার উৎসাহ দেখা দিয়াছে।

সমবায় ও জাতীয় পরিকল্পনা (Co-operation and National Planning) : ভারতে সমবায় আন্দোলন সীমাবদ্ধ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। এই আন্দোলনের ব্যর্থতা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু ভারতে এই আন্দোলনকে ব্যর্থ হইতে দেওয়া চলিবে না। ইহাকে সফল করিতেই হইবে। নয়ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশকে গড়িয়া তুলিবার আশা নাই। সেজন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে সমবায়কে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

ভারত গ্রামপ্রধান দেশ। সমবায়ের সাহায্যে গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে হইবে। সেইজন্য ঠিক হইয়াছে শেষ পর্যন্ত প্রতি গ্রামে একটি করিয়া সমবায় সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আলাদা আলাদা সমিতি স্থাপন করা হইবে না। একই সমিতি ঋণদান, বিক্রয়ব্যবস্থা, ইত্যাদির ভার লইবে। এগুলি নানাভাবে গ্রামবাসীর সেবা করিবে। সেজন্য ইহাদের নামকরণ হইয়াছে সেবা সমবায় সমিতি (Service Co-operatives)। ঋণ আদায়ের সুবিধার জন্য ঋণদানের সঙ্গে বিক্রয় ব্যবস্থা যুক্ত রাখার দরকার আছে। কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হইবে। সমবায় কিছুটা প্রসার লাভ করিলে সমবায়িক চাষের (Co-operative farming) প্রবর্তন করা হইবে। বড় বড় সমিতিগুলির কিছু শেয়ার প্রাদেশিক সরকার কিনিবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে সাহায্য করিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য বাদে আরও ৪৭ কোটি টাকা সমবায়ের খাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ৬৭,০০০ সেবা সমবায় সমিতি স্থাপন করিবার

কথা হইয়াছে। স্বল্প মেয়াদী ঋণদানের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা হইতে বাড়াইয়া ১৫০ কোটি টাকা করা হইবে। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পোষকতায় সমবায় আন্দোলনের এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় পরিচালনা (State Management) : আধুনিকতম ফ্যাসান সমাজতন্ত্রবাদ। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এখন যথেষ্ট মনে করা হয় না। রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও পরিচালনার সমর্থন দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের দোষত্রুটির জন্যই রাষ্ট্রীয়করণের আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। বে-সরকারী উদ্যোক্তার লক্ষ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী মনে করা হয়। অনেকদিন হইতে রাষ্ট্রের হাতে এই ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। ব্যক্তির জীবন স্বল্পস্থায়ী। ব্যক্তির দূরদৃষ্টি নাই। জলসেচ বা রেলপথ নির্মাণে লাভ হয় অনেক দিন পরে। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা এতদিন সবুর করিতে চায় না। সমাজ-জীবন চিরস্থায়ী, রাষ্ট্র সেজন্য এই সব কাজ করিতে অগ্রসর হইবার ভরসা পায়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা লোকসান দিয়া কাজ করিতে পারে না। অথচ তাহার কাজের জন্য হয়ত অন্যান্যদের লাভ হইয়াছে। বে-সরকারী উদ্যোক্তাকে এ কথা জানাইলে কোন সান্ত্বনা সে পাইবে না। রাষ্ট্র সমাজের লাভের কথা ভাবিয়া কাজ করে। সেইজন্য মূল শিল্প গঠনে রাষ্ট্র অগ্রসর হইতে পারে। এই শিল্পে যদি লোকসান হয়, বে-সরকারী উদ্যোক্তা পশ্চাৎপদ হইবে, এই শিল্পের জন্য অন্যান্য শিল্প যতই উপকৃত হোক না কেন। এই সমস্ত কারণে প্রায় দেশেই ডাক-তার, জলসেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলপথ প্রভৃতি অনেক দিন হইতে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইতেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে আর্থিক উন্নয়নের প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করা দরকার। বে-সরকারী উদ্যোগে এই বাধা দূর হইবার সম্ভাবনা খুব কম। কারণ, মূলধন ও উপযুক্ত সংগঠনের অভাব। এই সব দেশে উন্নয়নের ব্যাপারে গতিবেগ সঞ্চারিত করিবার জন্য রাষ্ট্র নিজেই কলকারখানা স্থাপন করা সুরু করিয়াছে। ভারতে রাষ্ট্র অনেক কলকারখানার মালিক ও পরিচালক। উদাহরণস্বরূপ সিন্ধ্রীর সার তৈয়ারীর কারখানা, বাঙ্গালোরের বিমান নির্মাণের কারখানা, চিত্তরঞ্জনের রেলইঞ্জিন প্রস্তুতের কারখানা ও দুর্গাপুর, রৌরকেল্লা ও ভিলাইএর লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার উল্লেখ করা যায়।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বাড়িতেছে

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পরিধি ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে। অদূরভবিষ্যতে রাষ্ট্র নিরঙ্কুশ একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী হইবে। ইহার সম্ভাব্য ত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রীয় পরিচালনা হইলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান

হইয়া যাইবে না। বে-সরকারী উদ্যোগের লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। মুনাফার জন্য অনেক অনিষ্টকর সামগ্রীর উৎপাদন হয়। মুনাফার জন্য সময় সময় মিথ্যা প্রচারকার্যের অপব্যয় হয়। রাষ্ট্রের হাতে এক-চেটিয়া অধিকার আসিলে, প্রচারকার্যের আর প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু ক্রেতার স্বার্থে দ্রব্য উৎপাদন হইবে এরূপ নিশ্চয়তাও থাকিবে না। ক্রেতার আর অন্য সূত্রে অভাব পূরণের রাস্তা থাকিবে না। রাষ্ট্র যাহা যোগান দিবে, তাহাই চোখ বুজিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কলিকাতার রাষ্ট্রীয় পরিবহণ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাষ্ট্র অনিষ্টকর সামগ্রীর উৎপাদন বন্ধ করিতে পারে। ইষ্ট কি অনিষ্ট হইবে—তাহার বিচার কে করিবে? ক্রেতা না সরকারী কর্মচারী? বে-সরকারী উদ্যোগে মুনাফার অনগ্রসর কলাকৌশল উচ্ছেদ করা হয় না। রাষ্ট্র মুনাফার ভিত্তিতে কাজ করে না। সুতরাং উন্নতধরণের কলাকৌশল চালু করায় আপত্তি হইবে না। লাভ লোকসানের হিসাব না থাকিলে কিন্তু বিপদও আছে। সরকারী ব্যাপারে 'লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন'। ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা সরকারী ব্যয়ে নিজেদের খেয়ালখুসী চরিতার্থ করা সুরু করে। তুঘলকশাহীর সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় নেহাৎ রুটিন মাফিক কাজ হয়। কেহ পরিবর্তনের ঝুঁকি লইতে চায় না। কেন না, লোকসান হইলে গদান পর্যন্ত বিপন্ন হইতে পারে (একনায়কতন্ত্রে), লাভ হইলে কোনও ব্যক্তিগত সুবিধা নাই।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের সম্ভাব্য ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকা দরকার

যে সমস্ত কারবার সুষ্ঠুভাবে চলিতেছে, সেগুলি রাষ্ট্রীয়করণ করার কোনও যুক্তি নাই। আয় বৈষম্য কমাইতে হইলে কর-নীতির সাহায্যই যথেষ্ট। যে সমস্ত শিল্পে বা কারবারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে, রাষ্ট্রীয় পরিচালনার সেইগুলিই উপযুক্ত ক্ষেত্র। অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রীয় পরিচালনার স্বপক্ষে যুক্তি অনেক বেশী জোরালো। তবে এখানেও সাবধান হওয়া ভাল। যোগ্য কর্মচারী ও কর্ণধারের অপ্রাচুর্য থাকিলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দ্রুত প্রসার বাঞ্ছনীয় নয়। তাহা হইলে স্বজন-প্রীতি, উৎকোচ গ্রহণ, ও অন্যান্য দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করিবে। লোকের আস্থা নষ্ট হইবে। তবে এই সমস্ত দেশে বে-সরকারী উদ্যোগের ত্রুটি খুব বেশী প্রকট ও মারাত্মক। বিকল্প যে কোন ব্যবস্থা ইহার চেয়ে খারাপ হইতে পারে না। এই মনোভাবের ফলে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে।

অর্থোন্নত দেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের স্বপক্ষে বিশেষ যুক্তি আছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা

1. **What are the advantages and disavantages of the Joint Stock Company as a form of business organisation ?**
ব্যবসায় সংগঠন হিসাবে যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা অসুবিধা কি কি ? [পৃষ্ঠা ১১৩-১১৬]

2. **Show how a Joint Stock Company raises its capital. Indicate the advantages that it enjoys from limited liability and transferability of shares.**
যৌথমূলধনী কারবার কিভাবে মূলধন সংগ্রহ করে ? সীমাবদ্ধ দায় ও শেয়ারের হস্তান্তর-যোগ্যতা থাকায় যৌথ মূলধনী কারবারের কি সুবিধা হয় ? [পৃষ্ঠা ১১২, ১১৩ (১), ১১৪ (৭)]

3. **What is Co-operation ? Describe the various forms of Co-operative societies in India.**
সমবায় কাহাকে বলে ? ভারতে বিভিন্ন ধরণের সমবায় সমিতির বর্ণনা কর।
[পৃষ্ঠা ১১৬-১১৭, ১১৯-১২০]

4. **Describe the scope and importance of the Co-operative movement in India.**
ভারতে সমবায় আন্দোলনের ভূমিকা ও গুরুত্ব আলোচনা কর। [পৃষ্ঠা ১১৯-১২১]

5. **In what ways can Co-operation help in removing the difficulties of Indian Agriculture ?**
ভারতে কৃষির উন্নতি সাধনে সমবায় কি সাহায্য করিতে পারে ? [পৃষ্ঠা ১২১]

একাদশ অধ্যায়

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প

(Large and Small Scale Industries)

শ্রমবিভাগ (Division of Labur) : শ্রমবিভাগকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক অর্থব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। সুদূর অতীতে মানুষ ছিল যাযাবর। তখনও আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য সহযোগিতার প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সহজ সহযোগিতায় শ্রমবিভাগের স্থান ছিল না। সকলে একই ধরণের কাজ করিত। স্থায়ী বসতির সঙ্গে দেখা দিল পেশাগত শ্রমবিভাগ। প্রবণতা (aptitude) অনুসারে লোক ভিন্ন ভিন্ন পেশা বাছিয়া লইল। কেহ হইল কৃষক—শস্য উৎপাদন হইল তাহার কাজ। কেহ হইল তাঁতী—তাতে কাপড় বুনিতে লাগিল। তৃতীয় একজন হয়ত কামারশালায় হাপর চালাইতে সুরু করিল। একজন একটি বিশেষ শিল্পে—অর্থাৎ একটি বিশেষ দ্রব্য প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন করিতে নিজেকে নিয়োগ করিল। এইভাবে পেশাগত বা সরল শ্রমবিভাগ (simple division of labour) সুরু হইল।

পেশাগত বা সরল শ্রমবিভাগ

স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self-sufficient) জীবনযাত্রায় বিনিময়ের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকে নিজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করে। অভাব মিটাইবার জন্য বিনিময়-সহযোগিতার প্রশ্ন এখানে উঠে না। শ্রমবিভাগের ফলে বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা যায়। বিনিময়ের অভাবে শ্রমবিভাগ অর্থহীন হইয়া পড়ে। ব্যক্তির দিক হইতে শ্রমবিভাগ মানে বিশেষীকরণ। কৃষক শুধু খাদ্য উৎপাদন করিবে। তাঁতী শুধু কাপড় বুনিবে। মানুষের অভাব কিন্তু বহুবিধ। কৃষকের কাপড়ের প্রয়োজন আছে। তাঁতীরও খাদ্যের প্রয়োজন আছে। কৃষকে ও তাঁতীর মধ্যে বিনিময় হইলে কৃষকের পরিচ্ছদের অভাব থাকিবে না; তাঁতীরও খাদ্যের অভাব থাকিবে না। বিনিময় সম্ভব না হইলে কৃষককে উলঙ্গ ও তাঁতীকে ক্ষুধার্ত হইয়া থাকিতে হইবে। এ অবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে না। শ্রমবিভাগ ত্যাগ করিয়া লোকে আবার স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনে ফিরিয়া যাইবে। সাক্ষাৎ বিনিময়ের (barter) অসুবিধা অনেক। পরোক্ষ বা অর্থের মাধ্যমে বিনিময় হইলে এই অসুবিধাগুলি দূর হয়। বিনিময়ের পরিধি বিস্তৃত হয়। ফলে শ্রমবিভাগ আরও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে। ব্যক্তির দিক হইতে শ্রমবিভাগ মানে বিশেষীকরণ। সমাজের দিক হইতে শ্রমবিভাগ সহযোগিতার নামান্তর মাত্র।

শ্রমবিভাগ মানে বিনিময়

সরল শ্রমবিভাগে একজন একটি সম্পূর্ণ দ্রব্য উৎপাদন করে। শ্রমবিভাগ কিন্তু এখানে শেষ হয় নাই। এখন একটি দ্রব্য উৎপাদনের কাজ অনেকগুলি ক্ষুদ্র সহজ প্রক্রিয়ায় (operation or process) বিভক্ত হইয়াছে। মুচি এক জোড়া জুতা পুরাপুরি নিজেই প্রস্তুত করে। চামড়া তৈয়ার করা, চামড়া মাপমত কাটা, সেলাই করা গোড়ালী লাগান সমস্ত কাজ সে একাই করে। বাটার কারখানার জুতা তৈয়ারীর কাজ শতাধিক ক্ষুদ্র প্রক্রিয়ায় বিভক্ত। সম্পূর্ণ জুতা এখানে কেহ করে না। একজন একটি প্রক্রিয়াই বারংবার করিয়া যাইতেছে। কেহ শুধু সোল কাটিয়া যাইতেছে, কেহ সোলটি জুতার নীচে স্থাপন করিতেছে, তৃতীয় একজন সোলটি লাগাইতেছে,— এই রকম সকলেই ছোট ছোট এক একটি কাজ সমস্ত দিন ধরিয়া করিতেছে। এই ধরণের শ্রমবিভাগকে জটিল শ্রমবিভাগ (Complex division of labour) বলা হয়। এখানে একটি দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শত শত লোকের সহযোগিতা দরকার হয়। একজনের কাজ যেখানে শেষ, দ্বিতীয় জনের কাজ সেখানে হইতে সুরু। একজনের কাজের গোলমাল হইলে, সকলের কাজ বানচাল হইয়া যাইবে। সুনিপুণ সংগঠক না থাকিলে এই ধরণের শ্রমবিভাগ চলিতে পারে না।

জটিল শ্রমবিভাগ কার্যকর করিতে সংগঠনের প্রয়োজন

নিয়মিত পুনরাবৃত্তির ফলে এই সহজ প্রক্রিয়াগুলি নেহাৎ অভ্যাসে পরিণত হয়।

মানুষ তখন যন্ত্রের মত কাজ করিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রের আবির্ভাব হয়। মানুষের কাজ হয় যন্ত্র পরিচালনা। একটি যন্ত্র একটি বিশেষ কাজ করে। তুলাধুনার যন্ত্র (carding machine) দিয়া সুতা কাটা (spinning) যায় না। আবার সুতা-কাটা যন্ত্র দিয়া কাপড় বুনা (weaving) যায় না। যন্ত্রের বিশেষীকরণের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালকেরও বিশেষীকরণ ঘটে। যান্ত্রিক উৎপাদন চালু রাখিতে হইলে কিছু সংখ্যক লোককে যন্ত্র নির্মাণ ও যন্ত্র মেরামতের কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে। যন্ত্র নির্মাণ করিতে হইলে লৌহ ও অন্যান্য মালমশলা দরকার। কিছু সংখ্যক লোককে আবার এই সমস্ত উপকরণ উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে এইভাবে শ্রমবিভাগ আরও প্রসার লাভ করে। ছয় নয়া পয়সা খরচ করিতে পারিলেই দোকানে এক কাপ চা কেনা যায়। সামান্য এক কাপ চায়ের জন্য কত লোকের সহযোগিতার প্রয়োজন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দোকানে যাহারা কাজ করে, চা বাগানে যাহারা চা উৎপাদন করে, চা বাগান হইতে দোকানে পৌঁছাইতে যাহারা সাহায্য করে—সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। যুক্তরাজ্য হইতে আমদানী করা যন্ত্র চা বাগানে ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র হয়ত ডেনমার্কের জাহাজে এখানে আসিয়াছে। লরীতে ইরাকী পেট্রল ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সমস্ত দেশের বহু লোকের সহযোগিতাও প্রয়োজন। যন্ত্র ও চালকশক্তির ব্যবহারের ফলে শ্রমবিভাগ ও সহযোগিতা স্থান ও কাল দুইদিক হইতেই—ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে।

জটিল শ্রমবিভাগের ফলে যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার বাড়িয়াছে। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে শ্রমবিভাগ আরও প্রসার লাভ করিয়াছে।

একটি সামান্য অভাব মিটাইতে আজ বহু দেশের বহু লোকের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। একক প্রচেষ্টায় সমস্ত অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা বৃথা। শ্রমবিভাগ না থাকিলে রেলগাড়ী, ট্রামবাস, জাহাজ প্রভৃতি ব্যবহার করা সম্ভব হইত না। অনেক জিনিষ এককভাবে উৎপাদন করা যাইত কিন্তু সেগুলিও গুণে নিকৃষ্ট ও পরিমাণে সামান্য হইত। ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতে দর্পণ বিলাস সামগ্রী ছিল। আজ ঘরে ঘরে দর্পণ দেখা যায়। শ্রমবিভাগের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অতৃপ্ত অভাব সকলেরই আছে। কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন করিবার চেষ্টা করিলে অভাবপূরণের ক্ষমতা এখন যতখানি আছে তাহাও থাকিবে না। শ্রমবিভাগের ফলে আমাদের উৎপাদন-দক্ষতা ও অভাবপূরণের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া যায়।

উৎপাদনে দক্ষতা ও অভাব পূরণের ক্ষমতা বাড়ে।

শ্রমবিভাগের সুবিধা (Advantages of Division of Labur) : একজন লোক সমান কাজে সমান দক্ষ হয় না। যে যে-কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজ

দিলে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের মঙ্গল। শ্রমবিভাগ না থাকিলে একজনকে সকল কাজ করিতে হইত, দক্ষতার অপব্যয় হইত। সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ থাকায় অন্ধ ও খঞ্জকেও কাজে লাগান যায়। প্রত্যেককে তার ক্ষমতানুযায়ী কাজ দেওয়া সম্ভব হয়। মশা মারিতে কামান দাগার প্রয়োজন হয় না।

জুতা সিলাই হইতে চণ্ডীপাঠ সমস্ত কাজ করিতে গেলে জুতা সিলাই বা চণ্ডীপাঠ কোন কাজেই দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হইবে না। ধরা যাক ছয়জন লোকের প্রত্যেকে ছয়টি কাজে সমান দক্ষ। সেক্ষেত্রেও শ্রমবিভাগ সুবিধাজনক। একজন একটি কাজ বরাবর করিয়া চলিলে অধিকতর দক্ষ হইয়া উঠিবে। ছয়টি কাজ করিতে গেলে কোন কাজেই অধিক দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হইবে না। বিভিন্ন কাজের জন্য পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। চকোলেট প্রস্তুত করিতে হইলে চুল্লী জ্বালাইয়া মণ্ড তৈয়ার করিতে হইবে। তারপর সাইজ করিয়া কাটিতে হইবে। তারপর কাগজে মুড়িবার পালা। একজনকে সমস্ত কাজ করিতে হইলে অনর্থক সময় নষ্ট হয়। মণ্ড প্রস্তুত হইলে চুল্লী নিবাইয়া পরিষ্কার করিতে সময় নষ্ট হইবে। আবার কাটিবার জন্য ছুরিকাঁচি ইত্যাদি সাজাইতেও সময় লাগিবে। এইভাবে একটি কাজ শেষ করিয়া আরেকটি কাজ সুরু করিতে অনেকটা সময় নষ্ট হইবে। শ্রমবিভাগ থাকিলে এক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজ করার প্রশ্ন উঠে না। ফলে সময়ও নষ্ট হয় না। আবার ধরা যাক লোক ছয়টি, কাজও ছয়টি। যন্ত্রও ছয়টি লাগে। শ্রমবিভাগ থাকিলে ছয়টি যন্ত্র থাকিলেই চলিবে। নতুবা প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া একুনে ছত্রিশটি যন্ত্র দরকার হইবে। ছত্রিশটি যন্ত্র প্রস্তুত করিতে যত সময় লাগিবে, ছয়টি যন্ত্র তৈয়ার করিতে সময় লাগিবে তাহার চেয়ে অনেক কম। একই সময়ে একই লোক একাধিক কাজ করিতে পারে না। যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে মোট ছয়টি যন্ত্র ব্যবহৃত হইবে। বাকী ত্রিশটি যন্ত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়া থাকিবে। শ্রমবিভাগ থাকিলে সময় ও মূলধনের এই অপব্যয় হইত না।

সময় ও মূলধনের অপব্যয় কম হয়।

সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগে প্রক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও সরল হয়। ফলে যন্ত্রের ব্যবহার ত্বরান্বিত হয়। যন্ত্র চালনা অনেক সহজ। বালক ও স্ত্রীলোকও যন্ত্র চালাইতে পারে। সমর্থ পুরুষকে অন্য কঠিন কাজে নিয়োগ করার সুযোগ হয়। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন অনেকগুণ বাড়িয়া যায়।

যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ে

শ্রমবিভাগ হইলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে। কম সময় নষ্ট হয়। দক্ষতা ও মূলধনের অপব্যয় হয় না। ইহার ফলে আমাদের অভাব পূরণের ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। সমান

পরিশ্রমে অভাব পূরণের সামগ্রী অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারি। অথবা খাটুনি কমাইয়া অধিক পরিমাণে অবসর ভোগও করিতে পারি।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা (Disadvantages of Division of Labour): শ্রমবিভাগের অসুবিধাও কিছু কিছু আছে। ব্যক্তির দিক হইতে শ্রমবিভাগ মানে বিশেষীকরণ। একটি মাত্র কাজ একজন বাছিয়া লয়। পুনরাবৃত্তির ফলে দক্ষতা বাড়ে। ব্যক্তি যে কাজে বিশেষজ্ঞ হইল সেই কাজের বাজার খারাপ হইতে পারে—সেই শিল্পে মন্দা দেখা দিতে পারে। অন্য কাজ জানা না থাকায় বেকার হইবার আশঙ্কা থাকে। এই অসুবিধা বেশী বড করিয়া দেখা ঠিক হইবে না।

চাহিদা কমিলে বেকার হইবার ভয়।

উৎপাদনের দিক হইতেও শ্রমবিভাগের অসুবিধা আছে। বিশেষীকরণের ফলে বিশেষ কাজে বা প্রক্রিয়ায় অসামান্য দক্ষতা অর্জনের সুযোগ হয়। কিন্তু ইহার ফলে নূতন অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া চলিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। বিশেষজ্ঞ তাহার সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের বাহিরে কাজ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। নিত্য নূতন পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শিল্প অগ্রসর হয়। আজ যে কলাকৌশল অভিনব, আগামী কাল তাহাই পুরাতন বলিয়া বাতিল হইয়া যাইতেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্পজগতে চৌকস কর্মীর প্রয়োজন আছে। বিশেষীকরণের ফলে প্রতিভার সর্বমুখীত্ব নষ্ট হইয়া যায়। কারিগরী শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। কারিগরী শিক্ষার মূলে আছে বিভিন্ন বিজ্ঞান। এই সব বিজ্ঞানে যে কারিগরের পারদর্শিতা আছে, সে যে কোনও কারিগরী সমস্যার সমাধান নিজের চেষ্টাতেই করিতে পারে।

কলাকৌশলের দ্রুত পরিবর্তন হইলে, বিশেষজ্ঞের বিশেষ প্রতিভা অকেজো হইয়া পড়ে।

মানুষের মন সৃজনধর্মী। উৎপন্ন দ্রব্যের ভিতর দিয়া উৎপাদকের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে। কেনা সামগ্রী পুরাপুরি তৈয়ারী করিলে, তবেই কাজের মধ্য দিয়া ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হইতে পারে। বাটার কারখানায় কোন শ্রমিক বলিতে পারে না—এই জুতাজোড়া আমার হাতে তৈয়ারী। সমস্তক্ষণ সে শুধু জুতার ফিতা গলাইবার ছিদ্র করিয়াছে। ৯৯ নম্বর স্ক্রু ঘুরাইয়াছে। এই ধরণের কাজ অত্যন্ত একঘেয়ে। কাজের আনন্দ এখানে নাই। কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষালাভের কোন উপায় নাই। মানুষ এখানে উৎপাদন যন্ত্রের অংশবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়। সহযোগিতা ব্যাপক হওয়ায়, সংগঠন একটি পৃথক পেশা হইয়া দাঁড়ায়। শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে পুনরাবৃত্তির উপর। শ্রমিকের কাজ রুটিনমাফিক হইয়া পড়ে। সংগঠনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। স্বাধীন চিন্তা করিবার শক্তি লোপ পায়।

কাজের মধ্য দিয়া শিক্ষা-লাভের বা আনন্দ পাইবার সুযোগ থাকে না।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহার সুবিধা এত বেশী যে, ইহা বাদ দিয়া চলার কথা চিন্তাও করা যায় না। শ্রমবিভাগ যখন ছিল না, তখন কাজ শিক্ষাপ্রদ ছিল। কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা অভাবে জীবনযাত্রার মান তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। খাটুনীর পরিমাণ ছিল বেশী। শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন অনেক বাড়িয়াছে। অথচ দৈনিক কাজের সময় কমিয়াছে। কাজের বাহিরে শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা করিবার সুযোগ মিলিয়াছে। তাহা ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন ও ওয়ার্কস্ কমিটির মাধ্যমে সংগঠনের ব্যাপারে সক্রিয় হইবার ব্যবস্থা হইতে পারে।

যন্ত্র ব্যবহার (Uses of Machinery): শ্রমবিভাগের ফলে যন্ত্র ব্যবহার সুগম হইয়াছে। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে আবার শ্রমবিভাগ প্রসারলাভ করিয়াছে। যন্ত্র ব্যবহারের সুবিধা অনেক। যন্ত্র মানুষের ক্ষমতা বাড়ায়। বহু কাজ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া কোনদিন করা সম্ভব হইত না। সমুদ্রে বাঁধ দেওয়া, ৪ টনের হাতুড়ী চালান, বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের সাহায্য না পাইলে সম্ভব নয়। অনেক কাজ খালি হাতে করা যায়। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে কাজ দ্রুতগতিতে হয়। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাজ যন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। ওজনের অতি সামান্য পার্থক্যও যন্ত্রে ধরা পড়ে। যে জিনিষ চোখে দেখা যায় না, মাইক্রোস্কোপ দিয়া তাহা দেখা যায়। যন্ত্র ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কম খরচে উৎপাদন হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

সুবিধা

যন্ত্র ব্যবহার করিলে মাংসপেশীর উপর চাপ কমে; কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীর উপর চাপ বাড়ে। যে কাজ শুধু হাতে করিতে গেলে ১০ জন লোকের প্রয়োজন, সেই কাজই যন্ত্রের সাহায্যে করিলে ২ জন লোক দিয়াই করা যায়। তখনকার মত ৮ জন লোক বেকার হইতে পারে। কিন্তু উৎপাদন ব্যয় কম হওয়ায়, জিনিষের দাম কমে এবং চাহিদা বাড়ে। ৮ জনের মধ্যে কয়েক জনের কাজের যোগাড় এইভাবে হইতে পারে। যন্ত্র নির্মাণ করিতেও লোক লাগিবে। আয় বাড়ার ফলে অন্য শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও বাড়িবে। সেখানেও কর্মসংস্থান হইবে। দীর্ঘ সময়ের হিসাব লইলে যন্ত্র ব্যবহারের ফলে বেকারের সংখ্যা বাড়িবার আশঙ্কা নাই।

অসুবিধা

শিল্পের একদেশতা ও আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (Localisation of industries or territorial division of labour): আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল শ্রম ও যন্ত্রের বিশেষীকরণ। বিশেষজ্ঞ শ্রমিক বা বিশেষ যন্ত্রের পুরাপুরি ব্যবহার না করিতে পারিলে শ্রমবিভাগ করিয়া লাভ নাই। সেজন্য বিস্তৃত বাজারের প্রয়োজন। একই ধরণের কারবার যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেই অঞ্চলেই নূতন কারবার

সুরু করা শ্রেয়। তাহা হইলে সহজেই বিস্তৃত বাজারের সুবিধা পাওয়া যায়। সেজন্য বইয়ের দোকান করিতে হইলে লোকে কলেজ ষ্ট্রীটে ঘর চায়। এইভাবে এক এক অঞ্চলে এক একটি শিল্প গড়িয়া উঠে। ভারতে চটকলগুলি হুগলী নদীর দুইধারে অবস্থিত। কাপড়ের কলগুলি বোম্বাই ও আমেদাবাদে, চিনির কলগুলি বেশীর ভাগ বিহার ও উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। এক এক ব্যক্তি এক এক কাজে দক্ষ। আবার অনবরত একটি প্রক্রিয়া করার ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদন ব্যয় কম হয়। ঠিক সেই রকম বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে সুবিধা আছে। আবার একটি শিল্পে লাগিয়া থাকার ফলে দক্ষতা বাড়ে। ফলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।

শিল্পের একদেশতা অনেক কারণে হয়। প্রথমেই জলবায়ুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতে বস্ত্রশিল্প বোম্বাইয়ে কেন্দ্রভূত। সেখানকার জলবায়ু আর্দ্র। সুতা সহজে ছিঁড়িয়া যায় না। চালকশক্তির (Power) সুযোগ লাভও শিল্পে একদেশতার কারণ। ধানবাদ রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লার প্রাচুর্য থাকায় সেই অঞ্চলে অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কাঁচামালের সান্নিধ্যও অন্যতম কারণ। পশ্চিম বাংলায় পাট যত হয় ভারতের আর কোথাও সে পরিমাণ হয় না। পাট কলগুলি সেজন্য পশ্চিম বাংলায় ভীড় করিয়াছে। পশ্চিমবাংলার যেখানে পাট হয়, সেখানে কিন্তু পাটশিল্প গড়িয়া উঠে নাই। কালকাতার আশেপাশে হুগলী নদীর ধারে বেশীর ভাগ পাটকল। কলিকাতা হইতে বিদেশের বাজারে চালান দেওয়া সহজসাধ্য এবং কলিকাতায় সহজেই এই শিল্পে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। সেই জন্যই কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। যে কোন কারণেই হোক একবার একটি শিল্প এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হইলে, সেই অঞ্চলজাত দ্রব্যের সুনাম বাজারে ছড়াইয়া পড়ে। আনকোরা নূতন কারবারীও এই অঞ্চলে কারখানা করিলে এই সুনামের ভাগীদার হইতে পারে। ছুরিকাঁচি কাঞ্চননগরের হইলেই হইল। কোন্ কারিগরের বা কোন্ কোম্পানীর তৈয়ারী তাহা কেহ জানিতে চায় না। ফলে সহজেই বিস্তৃত বাজার পাওয়া যায়।

জলবায়ু, কাঁচামাল ও বিক্রয় বাজারের সান্নিধ্য, চালক-শক্তির নৈকট্য, আঞ্চলিক সুনাম, দক্ষ শ্রমিক পাইবার সুবিধা

কারণ আলোচনা করিবার সময়েই একদেশতার সুবিধাও বলা হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে অঞ্চলগত সুনাম সৃষ্টি হয়। অনেক দক্ষ শ্রমিক সহজে কাজ পাইবার আশায় একই অঞ্চলে আসিয়া বসবাস করে। নূতন কারবারে শ্রমিক সংগ্রহে সুবিধা হয়। কোন কারখানায় কিছু শ্রমিক কাজ ছাড়িয়া দিলে নূতন শ্রমিক পাইতে দেরী হয় না। শিল্পে একদেশতার ফলে শ্রম-বিভাগ সূক্ষ্মতর হয়। শ্রমিক

তার বিশেষ দক্ষতা বিক্রয় করিবার সুযোগ পায়। শ্রমের আরও বিশেষীকরণ হয়।

অধিকতর শ্রমবিভাগ, সহকারী প্রতিষ্ঠান, পরিবহন ব্যবস্থা ও গবেষণার উন্নতি

একটি কারবারের জন্য বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা বা বাণিজ্যিক সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা সম্ভব নয়। বহু কারবার একসঙ্গে থাকায় ইহা সম্ভব। একই ধরণের যন্ত্র অনেক সংখ্যায় দরকার হয়। এই বিশেষ যন্ত্র নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠে। যন্ত্র বিকল হইলে কাজ বন্ধ করিবার দরকার হয় না। বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে যন্ত্র সুলভ হয়। উপজাত দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে এক সঙ্গে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার সদ্ব্যবহার সম্ভব হয়।

একটি অঞ্চলে একটি বিশেষ শিল্প কেন্দ্রীভূত হইবার বিপদ আছে। কোন কারণে এই শিল্পের বাজারে মন্দা দেখা দিলে, ব্যাপকভাবে দুর্দশা দেখা দেয়। বহু কলকারখানা বন্ধ হইয়া যায়। শ্রমিকরা বেকার হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ার আর্থিক কাঠামোর প্রধান খুঁটি ছিল পশমশিল্প। বিদেশে কোনও কারণে পশমের চাহিদা কমিলে, সারা অষ্ট্রেলিয়া জুড়িয়া ব্যাপকভাবে আর্থিক দুরবস্থা দেখা দিত।

চাহিদার হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে মন্দা দেখা দিতে পারে

বৃহদায়তন শিল্প (Large-scale Industry) : (ব্যাপক অর্থে শিল্প বলিতে যে কোনও দ্রব্যের উৎপাদন বুঝায়। এই হিসাবে কৃষিকেও শিল্প বলা হয়। সাধারণতঃ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষ ও যন্ত্রের প্রাধান্য হইলে, তাহাকে শিল্প বলা হয়। কৃষিতে প্রকৃতির ভূমিকাই প্রধান। সেইজন্য কৃষিকে শিল্প বলা হয় না। একই দ্রব্য উৎপাদনকারী কতকগুলি প্রতিষ্ঠান লইয়া একটি বিশেষ শিল্প গঠিত হয়। বিশেষজ্ঞ শ্রমিক ও যন্ত্রকে পুরাপুরি কাজে লাগাইতে হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িবে—বিক্রয় বাজারের সম্প্রসারণ হইবে। শ্রমবিভাগ ও একদেশতার সুযোগ লইতে হইলে বৃহদায়তন উৎপাদন অর্থাৎ বৃহদায়তন শিল্প অপরিহার্য। শিল্পের আয়তন দুই প্রকারে বাড়িতে পারে। একই ধরণের দ্রব্য উৎপাদনকারী কতকগুলি প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত হয় একটি শিল্প। শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির আকার বাড়িবার ফলে শিল্পের আয়তন বাড়িতে পারে। ইহার ফলে যে সুবিধা হয় তাহাকে আভ্যন্তরীণ সুবিধা (Internal Economies) বলা হয়। বিশেষীকরণ এখানে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ঘটে। সমস্ত প্রতিষ্ঠান একই সুবিধার অধিকারী হয় না। বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান অধিকতর সুযোগসুবিধা ভোগ করে। প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বাড়ার ফলেও শিল্পের আয়তন বাড়িতে পারে। প্রতিষ্ঠানের আকার বাড়িবার দরকার নাই।

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধা

এমন কি প্রতিষ্ঠানগুলি আকারে ক্ষুদ্রতর হইতে পারে। এক্ষেত্রে যে সুবিধা দেখা দেয়, তাহাকে বাহ্যিক সুবিধা (External Economies) বলে। প্রতিষ্ঠানের আকারের সঙ্গে এই সুবিধার কোনও সম্বন্ধ নাই। ছোট বড় সমস্ত প্রতিষ্ঠান বাহ্যিক সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

শিল্পে একদেশতার ফলে যে সমস্ত সুবিধা হয়, সেইগুলিই বাহ্যিক সুবিধার উদাহরণ। একই অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া গেল, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে। ইহার ফলে কাঁচামাল আনার বা উৎপন্ন সামগ্রী বাজারে পাঠাইবার খরচ কমে। প্রতিষ্ঠান—ক্ষুদ্র হোক্ কিম্বা বৃহৎ হোক্—ব্যয় সংক্ষেপের ফলে লাভবান হয়। শিল্পের নিজস্ব সমস্যা থাকে। প্রতিষ্ঠান সংখ্যা কম হইলে, শুধু এই সমস্যা লইয়া উকীল, হিসাবরক্ষক বা বৈজ্ঞানিক বিশেষভাবে মাথা ঘামাইতে চায় না। প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বাড়িলে উকীল বা হিসাবরক্ষকের বিক্রয় বাজার প্রসারলাভ করিবে। তাহাদেরও বিশেষীকরণ দেখা দিবে। অনেক উকীল ও অনেক হিসাবরক্ষক এই বিশেষ শিল্পের সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইবার চেষ্টা করিবে। তাহাদের দক্ষতা বাড়িবে। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সুবিধা হইবে। গবেষণা ও দক্ষ শ্রমিকের সুবিধা, যন্ত্র নির্মাণের সহকারী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার সুবিধা ইত্যাদি সমস্তই বাহ্যিক সুবিধার উদাহরণ। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সুবিধার মধ্যে সব সময় তফাৎ করা যায় না। প্রতিষ্ঠান আকারে বড় হইলে, অনেক সময় অর্থ সংগ্রহের সুবিধা হয়। লোকে তেলা মাথায় তেল ঢালিতে চায়। ফলে বড় প্রতিষ্ঠান বেশী অর্থসংগ্রহ করিতে পারে—সুদও কম দিতে হয়। এক্ষেত্রে ইহাকে আভ্যন্তরীণ সুবিধা বলিতে হয়। আবার এক জায়গায় অনেক প্রতিষ্ঠান থাকিলে, সেই শিল্পের ভিতরের অবস্থা জানাজানি হইয়া পড়ে। সেই শিল্পের প্রকৃত ঝুঁকি হিসাব করা সহজসাধ্য হয়। ফলে অর্থ সংগ্রহের সুবিধা হইতে পারে। এক্ষেত্রে ইহাকে বাহ্যিক সুবিধা বলিতে হইবে।

একদেশতার সুবিধাগুলিই বাহ্যিক সুবিধার উদাহরণ

বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের সুবিধা (Advantages of Large-scale Firm) : আমরা এখন আভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলির আলোচনা করিব। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের ব্যাপারে কতকগুলি সুবিধা ভোগ করে।

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শ্রমবিভাগ যত সূক্ষ্ম হইতে পারে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে তাহা সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞ কর্মী একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিলে তবেই তাহার দক্ষতার সদ্ব্যবহার হয়। উৎপাদন কম হইলে তাহাকে বেশ কিছু সময় নিষ্ক্রিয় থাকিতে হইবে। অথবা তাহাকে অন্য কাজে নিয়োগ করিতে হইবে যেখানে তাহার বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন নাই। ফলে দক্ষতার অপব্যবহার হইবে

(১) সূক্ষ্মতর শ্রমবিভাগ

কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি একসঙ্গে অধিক পরিমাণে কিনিলে অনেক সময় দাম কম দিতে হয়। রেল বা ষ্টিমার কোম্পানী অনেক সময় বড় কারবারের মাল কম দরে বহন করিতে রাজী হয়। ইহার ফলে বড় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যয় কম হয়। সমাজের দিক হইতে উপাদান ব্যয় কমে না। বড় প্রতিষ্ঠান ক্রেতা হিসাবে যে লাভ করে—কাঁচামাল বা যন্ত্রপাতি উৎপাদকের লাভ সেই পরিমাণ কম হয়। অবশ্য কাঁচামাল অধিক পরিমাণে যোগান দিবার ফলে যদি উপাদান ব্যয় কম হয়, তবে শুধু বৃহৎ প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজও উপকৃত হয়।

(২)
একসঙ্গে বেশী কাঁচামাল বিক্রয়ের সুবিধা

উৎপাদনের উপাদানগুলির বিভাজ্যতা সীমাবদ্ধ। যন্ত্র, ম্যানেজার, কারখানা-গৃহ, ক্যানভাসার ইত্যাদি অধিক বা সিকি পরিমাণে নিয়োগ করিবার উপায় নাই। গোটা একটি যন্ত্র, একটি ম্যানেজার ইত্যাদি নিযুক্ত করিতে হইবে। যন্ত্রের নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন ক্ষমতা (capacity output) আছে। সেইরকম ক্যানভাসারের নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রয় ক্ষমতা আছে। উৎপাদন কম হইলেও যন্ত্রের ব্যয় বা ম্যানেজারের বেতন কমাইবার উপায় নাই। আবার উৎপাদন বাড়িলেও (নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত) এই বাবদে ব্যয় বাড়িবে না। এই ধরণের উপাদানকে নির্দিষ্ট উপাদান (fixed factor) এবং এই ধরণের উপাদানজনিত ব্যয়কে নির্দিষ্ট ব্যয় (fixed cost) বলে। কাঁচামাল বা সাধারণ শ্রমিকের জন্য যে ব্যয় হয় তাহা এই পর্যায়ে পড়ে না। উৎপাদন বাড়াইলে কাঁচামাল বেশী লাগিবে। আবার উৎপাদন কমাইলে, কাঁচামাল কম লাগিবে। এই ধরণের উপাদানকে পরিবর্তনশীল উপাদান (variable factors) বলে। এই বাবদ যে খরচ হয় তাহাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় (variable costs) বলে। উৎপাদন যত বাড়ান যাইবে, উৎপন্ন দ্রব্যের এককপিছু নির্দিষ্ট ব্যয় তত কম পড়িবে।

(৩)
স্থির বা অবিভাজ্য উপাদানের সম্যক প্রয়োগ

যন্ত্রের আকার এক রকম নয়। ছোটখাট যন্ত্রের পরিবর্তে বড় আকারের যন্ত্র বসাইতে পারিলে সুবিধা হয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বড় বড় ও মূল্যবান যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারে, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তাহা পারে না।

(৪)
যন্ত্র ব্যবহার

একটি দ্রব্য উৎপন্ন করিতে গেলে ছোটখাট কম মূল্যবান দ্রব্য সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। এই ছোটখাট দ্রব্যগুলিকে উপজাত দ্রব্য (by-products) বলা হয়। করাতকলে তক্তার সঙ্গে কাঠের গুঁড়া এবং কসাইখানায় মাংসের সঙ্গে শিং, ছাল, ক্ষুর, লোম ইত্যাদি পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে এই উপজাত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার

করা পোষায় না। কারণ পরিমাণ খুব কম। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শিং হইতে বোতাম, চিরুণী ইত্যাদি এবং ক্ষুর হইতে আঠা, তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা যায়। মোট উৎপাদন ব্যয়ের কিছু অংশ এইভাবে উঠাইয়া লইলে, মূল দ্রব্যের পড়তা কম হয়। প্রতি-যোগিতার সুবিধা হয়। শিল্পের একদেশতা থাকিলে অবশ্য যে কোন কসাই শিং ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া উপজাতদ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতে পারে।

(৫)
উপজাত দ্রব্যের সদ্ব্যবহার

কলাকৌশলের উন্নতির জন্য ব্যয়বহুল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষায় সাফল্য অনিশ্চিত। সব ভাল যার শেষ ভাল। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সঙ্গতি নাই। পরীক্ষা একবার ব্যর্থ হইলেই দেউলিয়া হইবার আশঙ্কা আছে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান সেজন্য সাহস করিয়া পরীক্ষায় হাত দিতে পারে না। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের আছে। কয়েকবার ব্যর্থ হইলেও ঘাবড়াইবার কারণ নাই। একবার সফল হইলেই, সমস্ত ব্যয় সুদে আসলে উঠিয়া আসিবে। বিক্রয়ের ব্যাপারে ও অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু সুবিধা আছে। বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্যের জন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অনেক ব্যয় করিতে পারে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সহজ জামিন রাখিয়া অল্প সুদে টাকা ধার করিতে পারে।

(৬)
গবেষণার জন্য বেশী খরচ করিতে পারে।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প (Small-scale Industry): প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র হইলেও শিল্প বৃহদায়তন হইতে পারে। তবে আভ্যন্তরীণ সুবিধার জন্য শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানও বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান থাকা অসম্ভব নয়। বিস্তৃত বিক্রয়বাজার না থাকিলে শিল্পের আয়তন বৃহৎ হইতে পারে না। বিক্রয় বাজার যেখানে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে প্রতিষ্ঠানও সাধারণতঃ ক্ষুদ্রই হয়। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা অনেক। তবুও বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান টিকিয়া থাকে। উৎপাদন বাড়িলে ব্যয় সংক্ষেপ হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে সুবিধার চেয়ে অসুবিধা বেশী হয়। ব্যয় না কমিয়া ব্যয় বাড়ে। তা যদি না হইত তবে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান তার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিত না। অনেক শিল্পে আবার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একেবারেই মিলে না। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা না থাকিলে এই রকমটি হইতে পারিত না.

আয় বাড়িয়া চলিয়াছে। সমস্ত শিল্পেই চাহিদা বাড়ার সঙ্গে শিল্পজাত মোট উৎপাদনও বাড়িয়া চলিয়াছে। মোট উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকিলে বৃহৎ

প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান কোণঠাসা হইয়া পড়িত। মোট উৎপাদন বাড়ার ফলে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় প্রতিষ্ঠানই যুগপৎ উৎপাদন করার সুযোগ পায়।

শিল্পোৎপাদন বাড়িয়া চলিয়াছে

মানুষের সংগঠনশক্তি সীমাবদ্ধ। প্রতিষ্ঠান যত বৃহৎ হইবে, সংগঠন তত দুরূহ হইবে। সৈন্যবিভাগে ক্যাপ্টেন হইবার যোগ্যতা অনেকের আছে। কর্ণেল হইবার যোগ্যতা কম লোকেরই আছে, সেনাপতির সংখ্যা হাতে গোণা যায়। সেইরকম হাজার টাকার কারবার অনেকেই সংগঠন করিতে পারে। লক্ষ্য টাকার কারবার করিতে অনেকেই হিমশিম খাইবে। কোটি টাকার কারবার সংগঠন করিবার মত লোক খুঁজিয়া পাওয়া মুস্কিল। টাটা বা ফোর্ডের মত সংগঠক বিরল। সংগঠনশক্তি স্থির উপাদানগুলির অন্যতম। প্রতিষ্ঠান অতিকায় হওয়া মানে এই নির্দিষ্ট উপাদানের সঙ্গে পরিবর্তনশীল উপাদানের কাম্যতম অনুপাত বজায় থাকিবে না। সংগঠনে দুর্বলতা দেখা দিবে। অপচয় বাড়িয়া চলিবে। ব্যয়হ্রাস না হইয়া ব্যয় বৃদ্ধি হইবে।

সংগঠনশক্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং ক্রমহ্রাসমান বিধিব প্রয়োগ হয়।

অ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন শ্রমবিভাগের প্রসার বিক্রয়বাজারের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। যে জিনিষের চাহিদা সীমাবদ্ধ সে জিনিষ অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা মূর্খতা। কাঁচা দুধ বা তরিতরকারির বাজার বেশী দূর বিস্তৃত হইতে পারে না। কারণ এই ধরণের সামগ্রীর পরিবহনযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব নাই। ইহাদের বাজার স্থানীয়। সেজন্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠান এইসব শিল্পে দেখা যায় না। আবার মূল্যবান কাশ্মীরী শাল বা চারুকলা সামগ্রীর চাহিদা কম। এই ধরণের দ্রব্য বৃহৎ আকারে উৎপাদন করিয়া লাভ নাই।

বিক্রয় বাজার সঙ্কীর্ণ হইলে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে না

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে যান্ত্রিক উৎপাদন হয়। যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়মিতভাবে একই প্রক্রিয়ার অবিকল পুনরাবৃত্তি। ইহার ফলে উৎপাদন বাড়ে এবং একক প্রতি ব্যয় হ্রাস পায়। যন্ত্রে প্রামাণিক (standardised) দ্রব্য উৎপন্ন হয়। দুইজনে ক্রেতার রুচি কোন সময় হুবহু এক-রকম হয় না। প্রত্যেকের মনের মত সামগ্রী উৎপাদন করিতে গেলে প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিতে হইবে। যান্ত্রিক উৎপাদনে ইহা সম্ভব নয়। সেইজন্য বাটার দোকানের পাশে ক্ষুদ্র পাদুকা প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। যাহারা ঠিক ঠিক মাপের এবং বিশেষ ধরণের জুতা চায় তাহারা সেজন্য দাম বেশী দিতে প্রস্তুত। তাহারা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের খরিদ্দার হইবে। কারণ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান

বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দিতে পারে না।

অর্ডারমত জুতা তৈয়ারী করে। এ ধরণের জিনিষের চাহিদা খুব বেশী হয় না। সেদিক দিয়া স্মিথের হিসাবেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায়।

চাহিদা বা উৎপাদনের আনুষঙ্গিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হইলে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানই অধিকতর উপযোগী।

বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে বহু বিভাগ। বহু নথীপত্র ও কেতাব এখানে রাখিতে হয়। সহজে কোনও সিদ্ধান্ত করা যায় না। ফাইল এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে চালান যাইবে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে এ ঝঞ্ঝাট নাই। মালিক নিজে সব সময় অকুস্থলে উপস্থিত। অবস্থা বুঝিয়া তিনি তখন তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। রুটিন মাফিক কাজ যেখানে চলে না, সেখানে স্পষ্টই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সুবিধা বেশী। কৃষিতে বীজ বপন, লাঙ্গল দেওয়া, ফসল কাটা ইত্যাদি ব্যাপারে কোন ধরাবাঁধা সময় সূচী (time table) থাকিতে পারে না। আকাশের অবস্থা বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি মন স্থির করিতে না পারিলে, লোকসান হইবে। সেজন্য কৃষিতে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা যায়। চাহিদার পরিবর্তন যেখানে দ্রুত ঘটে, সেখানেও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান অচল। মহিলাদের পরিচ্ছদের ব্যাপারে বৎসর বৎসর ফ্যাসান পাল্টায়। আজ যাহার চাহিদা ঘরে ঘরে আগামীকাল তাহাই সেকেলে বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান যেকোনও দ্রব্য অধিক পরিমাণ উৎপন্ন করে। চাহিদার হঠাৎ পরিবর্তন হইলে, ঘরে প্রচুর মাল অবিক্রীত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের এই ভয় নাই। সেজন্য এই ধরণের শিল্পে প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রই হইয়া থাকে।

শিল্পে একদেশতা ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের সহায়ক।

ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে মালিকের নজর সবদিকে থাকে। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে। তিক্ততা সৃষ্টি হইবার আশঙ্কা এখানে কম। শিল্পের একদেশতাও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়া থাকিতে সাহায্য করে। শিল্পে একদেশতার ফলে অনেক সুবিধা হয়। এই সুবিধাগুলি বাহ্যিক। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এই সব সুযোগ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমানভাবেই ভোগ করে। বৃহদায়তন না হইয়াও বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা সমভাবে পাইয়া যায়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা সম্ভব হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃহদায়তন উৎপাদনের দেশ। এখানেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। মোট প্রতিষ্ঠান সংখ্যার শতকরা প্রায় ৯২ ভাগই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। মোট উৎপাদনেরও শতকরা প্রায় ৩৪ ভাগ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিই উৎপন্ন করে। ভারতে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আরও বেশী। আমাদের দেশে শতকরা প্রায় ৯৮টি প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র। উৎপাদনের মূল্য ও নিয়োগের

ক্ষেত্রেও ভারতে এখন পর্যন্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনেক বেশী। জাতীয় আয় কমিটির হিসাবমত ১৯৫০-৫১ সালে বৃহৎশিল্পে প্রায় ৫৫০ কোটি টাকা মূল্যের উৎপাদন হয় এবং ২৯ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়। ক্ষুদ্র শিল্পে এই অঙ্কগুলি ছিল যথাক্রমে ২০০০ কোটি টাকা এবং ১ কোটি ১৫ লক্ষ লোক।

ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের স্থান (Role of Small-scale and Cottage Industries in India): বৃহৎ শিল্পের আবির্ভাবের ফলে শিল্প একেবারে উঠিয়া যায় না। আধুনিক কালে বৈদ্যুতিক শক্তির সুযোগ মিলিয়াছে। বিলাস সামগ্রী ও চারুকলাজাত দ্রব্যের চাহিদা ধনীদের মধ্যে নূতন করিয়া বাড়িয়াছে। সমবায় আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব কারণে ক্ষুদ্রশিল্পের টিকিয়া থাকার সুবিধা হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত শিল্পোন্নত দেশেও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মোট সংখ্যার ৯২%ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান। ভারতে এই অংশ প্রায় ৯৮%। কুটিরশিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্প হইতে পৃথক করিয়া দেখা হয়। কুটির শিল্প, পারিবারিক পরিবেশে পরিবারের লোকদের শ্রমের সাহায্যে পরিচালিত হয়। ক্ষুদ্র শিল্পে ভাড়া করা শ্রমিক নিযুক্ত থাকে। আমাদের আলোচনায় সব সময় এই পার্থক্য করা হইবে না। কারণ উভয়ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ একই ধরণের সমস্যা দেখা দেয়। বিভিন্ন ক্ষুদ্রশিল্পে ২ কোটির অধিক লোকের কর্মসংস্থান হয়—২০০০ কোটি টাকার বেশী উৎপাদন হয়। একমাত্র তাঁতশিল্পেই ৫০ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। সংগঠিত সমস্ত বৃহৎ শিল্পে একত্রে এই সংখ্যক লোকের নিয়োগ হয় না। রাতারাতি শত শত বৃহৎ শিল্প গঠন করা অসম্ভব। আমাদের মূলধন কম। বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী। বৃহৎশিল্পে মূলধন নিয়োগের তুলনায় কর্মসংস্থান হয় কম। ক্ষুদ্রশিল্পে মূলধনের তুলনায় কর্মসংস্থান হয় বেশী। ক্ষুদ্রশিল্পের পক্ষে ইহা মস্ত বড় যুক্তি। ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদন দক্ষতা বাড়াইতে পারিলে, মোট উৎপাদনের দিক দিয়াও ঠকিতে হইবে না। জাপান শিল্পে উন্নত। সেখানে কিন্তু ক্ষুদ্র শিল্প লুপ্ত হয় নাই। ভারতেও অনুরূপ হইবার কারণ নাই। বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্রশিল্প অনায়াসে চলিতে পারে। উভয়ের মধ্যে সঙ্ঘাতের কোনও কারণ নাই। একে অপরের পরিপূরক হিসাবে বাড়িয়া উঠিবে।

ভারতের শিল্প সংগঠন (Industrial Structure in India): ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়াছি। ঝুড়ি তৈয়ারী (এলাহাবাদ, বারাণসী ও জৌনপুরে), গুটিপোকা হইতে রেশম তৈয়ারী (আসাম ও মুর্শিদাবাদে), মাদুর ও নারিকেল দড়ি তৈয়ারী (মালাবারে), মৃৎশিল্প (কৃষ্ণনগরে), কাঁসা ও পিতলের বাসন তৈয়ারী (মুর্শিদাবাদের খাগড়ায়) এবং তাঁতশিল্প (ভারতের প্রায় সর্বত্র,

পশ্চিম বাংলায় শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, ধনেখালি প্রভৃতি স্থানে) ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বৃহৎ শিল্পের মধ্যে বস্ত্র, শর্করা, কাগজ, চর্ম, দিয়াশালাই ইত্যাদি শিল্পে ভোগ্যপণ্য প্রস্তুত হয়। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, পাট শিল্প—এই সব শিল্পে মূলধন দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সরকারী মালিকানায় ও তত্ত্বাবধানে অনেক শিল্প ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে। সিন্ধ্রীর সার-কারখানা, চিত্তরঞ্জনের রেল-ইঞ্জিন কারখানা এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক ভারত সরকার।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বাধা ও তাহা দূর করিবার উপায় (Handicaps of Small-scale and Cottage Industries and their removal) : কুটিরশিল্পীরা অত্যন্ত দরিদ্র। তাহাদের ঋণের বোঝা মোটেই হাল্কা নয়। উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা মোটেই সুসংগঠিত নয়। তার ফলে দালালরা শিল্পীদিগকে শোষণ করিবার সুযোগ পায়। উৎপাদন পদ্ধতি সেকেলে। উৎপাদন ব্যয় বেশী, লাভ হয় কম। ইহারা প্রায়ই অশিক্ষিত ও সংরক্ষণশীল। নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি বা উৎপন্ন দ্রব্যের কোন গুণগত পরিবর্তন করিতে ইহারা গররাজী। চালকশক্তির ব্যবহার হয় না বলিলেই চলে।

কুটির শিল্পের উন্নয়নের বাধা

সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সমাজ উন্নয়নের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। কাঁচামাল ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি যাহাতে শিল্পীরা ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করিতে পারে তাহার জন্য সমবায় সমিতির সাহায্য লইতে হইবে। ধারে কিনিবার সুযোগ দিতে হইবে। উন্নত-ধরণের ডিজাইনের সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় ঘটাইতে হইবে। তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া দেখাইতে হইবে। কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী মারফৎ প্রচারকার্য চালান যাইতে পারে। ভারতের বাহিরে ও বিদেশেও এই সব দ্রব্যের ক্রেতা আছে। অথচ আমরা তাহাদের খবর লই না। বিদেশেও প্রচারকার্য চালাইতে হইবে। শিল্প যাহাতে কেবলমাত্র উৎপাদনের দিকে সম্পূর্ণ নজর দিতে পারে, সেজন্য বিক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার। বিক্রয়কেন্দ্র বিক্রয়ের ঝামেলা ভোগ করিবে, শিল্পীকে এই কাজ হইতে রেহাই দিতে হইবে। সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ঋণদান ও বিক্রয় ব্যবস্থার কতকটা সুরাহা করা যায়। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের সমন্বয় সাধন করিয়া নিরর্থক প্রতিযোগিতা দূর করিতে হইবে। কাঁচামাল গ্রামে হয়। সোজাসুজি সহরের কারখানায় না আনিয়া, গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্রশিল্পে কিছু কিছু কাজ হওয়ার পর অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় চালান দিতে হইবে। পরিবহনের খরচ কমিবে। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পেরও কাজ মিলিবে।

বাধা দূর করিবার উপায়

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে কুটির শিল্পের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় গ্রাম উন্নয়ন ও শিল্পোন্নয়ন—উভক্ষেত্রেই কুটির-শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কুটিরশিল্পের উপর নির্ভর করিবার কথা বলা হয়।

সরকারী নীতিতে কুটির শিল্পের স্থান।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. What is Division of Labour? What are its advantages? Is there any disadvantage?

   শ্রমবিভাগ কাহাকে বলে? ইহার সুবিধাগুলি বর্ণনা কর। ইহার কোন অসুবিধা আছে কি? [পৃষ্ঠা ১২৫-১৩০]

2. Explain the following statements :—

   (a) Division of Labour is another name for Co-operation.

   (b) Division of Labour is limited by the extent of the market.

   নিম্ন লিখিত উক্তি দুইটি ব্যাখ্যা কর :—

   (ক) শ্রমবিভাগ সহযোগিতার নামান্তর মাত্র।

   (খ) শ্রমবিভাগের প্রসার বিক্রয়বাজারের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। [পৃষ্ঠা ১২৫-১২৬]

3. What is localisation of industries? What are its causes? Explain its advantages and disadvantages.

   শিল্পের একদেশতা কাহাকে বলে? ইহার কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। ইহার সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৩০-১৩২]

4. What are the advantages of large scale production?

   বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা কি কি? [পৃষ্ঠা ১৩৩-১৩৫]

5. Small-scale producers not only survive but also flourish sometimes inspite of the great advantages of large-scale production. How would you explain this phenomenon?

   বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হয় নাই, অনেক ক্ষেত্রে বরং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা যায়। ইহার কারণ কি? [পৃষ্ঠা ১৩৬-১৩৭]

6. Distinguish between internal and external economies. Give concrete illustration.

   আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুবিধার মধ্যে তফাৎ কি? অর্থনৈতিক জীবন হইতে এই দুই প্রকার সুবিধার কয়েকটি উদাহরণ দাও। [পৃষ্ঠা ১৩২-১৩৩]

7. Describe the handicaps of cottage and small-scale industries in India. How would you remove them?

   কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির বাধাগুলি বর্ণনা কর। এই বাধাগুলি কি করিয়া দূর করা যাইতে পারে? [পৃষ্ঠা ১৩৯-১৪০]

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারের ভূমিকা

(Role of the Government)

অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা (Role of the Government in relation to economic functions) : উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের অবিসংবাদিত প্রভাব ছিল। অর্থ-ব্যবস্থার সঙ্গে সরকারের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল নগণ্য। দেশরক্ষা, শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা আর বিচার ও শাসন পরিচালনা—এই ছিল পুলিশী রাষ্ট্রের কার্য। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করিত না। কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন হইবে, কিরূপে উৎপন্ন হইবে, উৎপন্ন আয় কি-ভাবে বাঁটোয়ারা হইবে—এ সম্বন্ধে সরকার ছিলেন নীরব দর্শকমাত্র। সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার (private property) এবং ব্যবসা করিবার অবাধ স্বাধীনতা (freedom of enterprise) মানিয়া লইলেই আর কোন গোলযোগ হইবে না। প্রতিযোগিতার যাদুমন্ত্রে ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ এক হইয়া যাইবে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কোন প্রয়োজন হইবে না। এই রকম ধারণা থাকার ফলেই সরকারের সঙ্গে আর্থিক জীবনের সম্পর্ক ছেদ হয়। আর্থিক জীবন নিজের তালেই চলিতে থাকে।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগ

এই ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য দেশগুলির আর্থিক উন্নতি হইলেও, ইহার বিষময় ফল পাইতেও মোটেই দেরী হয় নাই। আর্থিক অসাম্য বাড়িতে থাকিল। উৎপাদনের উপাদান—এই হইল শ্রমিকের একমাত্র পরিচয়। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটানা ১২।১৪ ঘণ্টা শ্রম করা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাড়াইল। বালক ও স্ত্রীলোকদের মজুরী কম ছিল। তাহারাও রেহাই পাইত না। মালিকের উদ্দেশ্য সর্বাধিক লাভ করা। কারখানায় কাজের পরিবেশের উন্নতি করিলে বা বালক ও স্ত্রীলোকদের নিয়োগ না করিলে তাহার লাভ বাড়িবে না। সেজন্য সমাজের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও এইসব ব্যাপার উপেক্ষিত হইতে লাগিল। শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হইল। কার্যের শর্তাবলীর উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে নানাবিধ কারখানা আইন প্রণয়ন করা হইল। কাজের সময়, শ্রমিকের বয়স

অবাধ স্বাধীনতার বিষময় ফলের অনিবার্য পরিণতি সরকারী হস্তক্ষেপ।

যন্ত্রপাতি ঘিরিবার ব্যবস্থা, কারখানা পরিষ্কার রাখা ও আলোহাওয়ার বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে আইন করিতে হইল। ব্যক্তিগত উদ্যোগ বা প্রতিযোগিতা উঠিয়া গেল না। তবে ব্যবসায় করিবার স্বাধীনতা ও প্রতিযোগিতার উপর কতগুলি শর্ত আরোপ করা হইল। ক্রেতার স্বার্থরক্ষার জন্যও সরকারী হস্তক্ষেপ দরকার হইল। ভেজাল নিবারণের জন্য ও মাদক দ্রব্যের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য আইন করা হইল।

সরকারী মালিকানার প্রয়োজন দেখা দিল।

অনেক ক্ষেত্রে শুধু নিয়ন্ত্রণ করাই যথেষ্ট বিবেচিত হইল না। প্রয়োজনবোধে মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে লইতে হইল। আভ্যন্তরীণ সুবিধা পাইবার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহদাকার ধারণ করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে। ফলে প্রতিযোগিতা অক্ষুণ্ণ থাকে না। আভ্যন্তরীণ সুবিধা খুব বেশী হইলে একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হইয়া প্রতিযোগিতা একেবারে লুপ্ত হইতে পারে। একচেটিয়া কারবার বাহির হইতে নিয়ন্ত্রণ করার অসুবিধা আছে। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা জোর করিয়া বাড়াইলে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং সরকারী মালিকানা প্রবর্তন না করিয়া উপায় থাকিল না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথনির্মাণ—এই সব ব্যাপারেও সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইল।

সমষ্টিবাদের যুগ

রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রের পরিবর্তে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এখন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়াছে। স্রেফ জীবনরক্ষার তাগিদে রাষ্ট্রের জন্ম। সুন্দর জীবন সম্ভব করিবার জন্যই রাষ্ট্র বাঁচিয়া আছে। জীবনের আর্থিক দিক বাদ রাখিয়া জীবনকে সুন্দর করা যায় না। সুন্দর ও সার্থক জীবন সম্ভবপর করিতে হইলে যে কোন আর্থিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করিবার অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। রাষ্ট্রের এই কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই আজকাল সন্দেহ আছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগকে তখনই স্বীকৃতি দেওয়া হইবে যখন সে তাহার সার্থকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিতে পারিবে। সরকারী উদ্যোগ আর কোন নির্দিষ্ট সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রয়োজনমত যে কোন ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে পারে। এই ধরণের মতবাদকে সমষ্টিবাদ (collectivism) বলা হয়।

সমস্ত দেশেই সমষ্টিবাদ অল্প বিস্তর স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সমষ্টিবাদের চরম রূপকে বলা সমাজতন্ত্রবাদ। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এখানে সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করিয়া রাষ্ট্রই এখানে উৎপাদনের উপাদানের একচ্ছত্র মালিক। কি উৎপাদন হইবে, কিরূপ হইবে, আয় বণ্টন কিভাবে হইবে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি

কোথায় অবস্থিত হইবে—সমস্তই সরকার নির্ধারণ করেন। অনেক দেশেই সরকার এতদূর অগ্রসর হন নাই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ একেবারে মুছিয়া ফেলা হয় নাই। ব্যক্তিগত উদ্যোগ থাকিলেও সামাজিক স্বার্থে সরকারের নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার এখানেও স্বীকার করা হয়। এই ধরণের রাষ্ট্রকে 'সমাজ-কল্যাণকর' রাষ্ট্র (Social Welfare State) বলা হয়।

সমষ্টিবাদের দুইরূপ—সমাজতান্ত্রিক ও সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র।

অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হইল অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা বাড়ান। সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপেরও সাধারণ উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা। এই উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী (Economic Function of the Govt.): সরকারের আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য হইল জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা—জনসাধারণের অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ইহারই অন্য নাম জীবনযাত্রার মানের উন্নতি। জীবনযাত্রার মান শুধু টাকার অঙ্কের উপর নির্ভর করে না। আর্থিক আয় যদি ঠিক থাকে, তবুও দ্রব্যমূল্য বাড়িলে প্রকৃত আয় কমিবে; দ্রব্যমূল্য কমিলে প্রকৃত আয় বাড়িবে। আর্থিক আয়ের পরিবর্তে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা পাওয়া যায় তাহাই প্রকৃত আয়। এই প্রকৃত আয় বাড়ানই সরকারের আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য। জীবনযাত্রার মান বা প্রকৃত আয় বাড়াইতে যাইয়া সরকারকে বহুবিধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হইতে হয়। জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। উৎপাদনের প্রধান উৎস কৃষি ও শিল্প। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা দরকার। সরকারকে সেজন্য কৃষি, শিল্প ও পরিবহনের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাদে অন্যত্র সরকার প্রত্যক্ষভাবে কৃষি পরিচালনা করেন না। কৃষি প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা না করিলেও কৃষির উন্নতির জন্য অল্প সুদে ঋণ দান, বিক্রয়ব্যবস্থা সংগঠন, কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাঁধিয়া দেওয়া, নির্দিষ্ট মূল্যে কৃষিপণ্য ক্রয় করা প্রভৃতি কাজ করেন। মূল শিল্প অনেক দেশেই সরকারী মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অন্যান্য শিল্পেও শ্রমিক ও ক্রেতার স্বার্থের খাতিরে সরকার নানাবিধ নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ করেন। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতির জন্য, শ্রমিক সংগঠন নিয়ন্ত্রণের জন্য, ভেজাল নিবারণের জন্য আইন করেন। একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইলে, সরকার তাহা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন। অনেক ক্ষেত্রে

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে কৃষি, শিল্প ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইবে।

কারবার সরকারী মালিকানায় লইয়া আসেন। পরিবহন শিল্পে গোড়ার দিকে অনেক সময় লাভ হয় না। সুতরাং বে-সরকারী ব্যবসায়ীর উপর পরিবহনের ভার সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

বেকার সমস্যার সমাধান

বহুসংখ্যক লোক যদি বেকার হইয়া থাকে, তবে উৎপাদন সর্বাধিক পরিমাণ হইতে পারে না। বেকারদের কাজে লাগাইতে পারিলে, সেই শিল্পে উৎপাদন বাড়িবে। অথচ এ জন্য অন্য শিল্পে উৎপাদন কমাইতে হইবে না। বেকারত্বের অন্য অনেক বিষময় ফল। সে সমস্ত বাদ দিলেও স্রেফ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকারকে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হইতে হয়।

টাকাকড়ি ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

কর্মসংস্থান ক্রেতাদের আর্থিক ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। ব্যাঙ্ক মুদ্রা সৃষ্টি—ইহার হ্রাসবৃদ্ধি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ না করিতে পারিলে নিয়োগের স্তর (level of employment) নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সঞ্চয় সৃষ্টির কাজেও ব্যাঙ্ক সহায়তা করে। ব্যাঙ্ক সংগঠন উত্তম হইলে, বিনিয়োগ অভ্যাস বাড়ে। এই সমস্ত কারণে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মারফৎ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

অর্থমূল্যের স্থায়িত্ব

অর্থের সাহায্যে আমরা অন্যান্য জিনিষের মূল্য মাপি। অর্থের নিজের মূল্যের স্থিরতা না থাকিলে অর্থ দিয়াই এই কাজ চলিতে পারে না। সর্বজনগ্রাহ্যতা না থাকিলে কোন দ্রব্য অর্থের কাজ করিতে পারে না। অনবরত মূল্যের পরিবর্তন হইলে অর্থের উপর লোক আস্থা হারাইবে। অর্থ আর অর্থ থাকিবে না, অনর্থের সৃষ্টি হইবে। অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের ফলে সামাজিক অবিচারও ঘটিতে পারে। একজন স্বল্প বেতনভোগী চাকুরে জীবনবীমা করিল। ২০ বৎসর ধরিয়া কষ্ট করিয়া প্রিমিয়াম দিল। ইতিমধ্যে যদি অর্থের মূল্য অর্ধেক হইয়া যায়, তাহার সঞ্চয়ের মূল্যও অর্ধেক হইয়া যাইবে। বিনা দোষে সে শাস্তি পাইবে। অর্থকে কেন্দ্র করিয়া অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে। অর্থের মূল্যের মান পরিবর্তন হইলে, লোক আর অর্থের মাধ্যমে কাজকর্ম চালাইবে না। প্রত্যক্ষ দ্রব্য বিনিময়ের যুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে, উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। জীবনযাত্রার মান নীচে নামিয়া যাইবে। সেজন্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মারফৎ অর্থ সৃষ্টির তত্ত্বাবধান করেন ও অর্থের মূল্য যথাসম্ভব স্থির রাখিবার চেষ্টা করেন।

সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে, কেবলমাত্র মাথাপিছু আয় বাড়াইলেই চলিবে না। মোট আয়ের বণ্টন ব্যাপারে গুরুতর বৈষম্য না থাকে তাহাও দেখিতে হইবে। বণ্টন একেবারে সমান করিতে হইবে এমন কথা নাই। উৎপাদনে উৎসাহ বজায় রাখিতে হইলে হয়ত কিছুটা অসাম্য স্বীকার করা দরকার। যে পরিমাণ বৈষম্য সমাজ ন্যায্য মনে করে, কার্যতঃ বৈষম্য তাহার চেয়ে বেশী হইলে, লোক ক্ষুব্ধ হইবে। এই ক্ষোভ সমাজের কাঠামোতে ঘুণ ধরাইবে, এককালে এই কাঠামো ধ্বসিয়া পড়িবে। মৃত্যুকর, গতিশীল আয়কর, সম্পদকর, বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ,—এই জাতীয় ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করেন অসাম্য হ্রাস করিবার জন্য।

আর্থিক অসাম্য হ্রাস

জীবনযাত্রার মান আজ বাড়িল। কিন্তু আজ একপা অগ্রসর হইয়া আগামী-কাল যদি দুই পা পিছনে সরিয়া আসিতে হয়, তবে এই অগ্রগতি নিষ্ফল। দীর্ঘকালীন সময় ধরিয়া জীবনযাত্রার মানের হিসাব করিতে হইবে। জীবযাত্রার মান যাহাতে ক্রমশই বাড়িয়া চলে তাহা দেখিতে হইবে। মুলধন দ্রব্য বাড়াইতে না পারিলে এই নিশ্চিতি আসে না। সরকার সেইজন্য সঞ্চয়ে উৎসাহ দেন। অনেক ক্ষেত্রে নিজেই বিনিয়োগ করেন।

জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতির জন্য মুলধন দ্রব্য উৎপাদন দরকার।

জীবনযাত্রার মান এলোমেলোভাবে বাড়িলে চলিবে না। এক বৎসর বাড়িয়া দ্বিতীয় বৎসর বাড়িল। আবার কমিল। তিন বৎসরে হয়ত শেষ পর্যন্ত বাড়িল। কিন্তু মন্দার বৎসরে জনসাধারণের দুঃখদুর্দশা বাড়িবে, অনেক লোক বেকার হইবে। বেকারত্বের কুফল আমরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি। সুদ কমাইয়া ও বিনিয়োগ বাড়াইয়া সরকার মন্দা দুর করিবার চেষ্টা করেন। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সরকারী রাজস্বনীতিও এই মন্দা দূর করিবার ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে।

মন্দা নিবারণ

মন্দা ও বেকারত্বের ফলে ব্যক্তির জীবনে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। এই অনিশ্চয়তা ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল: ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হইলে, লোকে স্বস্তি পায় না। বর্তমানেও ইহাতে কাজের লোকসান হয়। কাজের অনিশ্চয়তা থাকে বলিয়াই শ্রমিক হাল্কাভাবে কাজ করে (go slow), যাহাতে আগামী কালের জন্য কিছু কাজ থাকিয়া যায়। তাহা হইলে আগামী কাল কাজ না জুটিবার আশঙ্কা কমিয়া যাইবে। রাজমিস্ত্রীর কাজে রোজগার খারাপ নয়—যদি কাজ থাকে। তবুও লোক এই কাজ ছাড়িয়া কম বেতনে

স্থায়ী চাকুরী খুঁজে। স্থায়ী চাকুরীতে নিরাপত্তা (security) অনেক বেশী।

সামাজিক নিরাপত্তা বিধান

অনিশ্চয়তার উৎপত্তি কেবলমাত্র মন্দা হইতেই হয় না। অন্যান্য কারণেও অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। কারখানায় কাজ করিবার সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। হাত-পা হারাইয়া বাকী জীবন পঙ্গু হইয়া কাটাইতে বাধ্য হওয়া আশ্চর্য নয়। কঠিন পীড়ার ফলে রোজগার করিবার শক্তি সাময়িকভাবে নষ্ট হইতে পারে। যদি এ সমস্ত নাও ঘটে, বার্ধক্যজনিত জরা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। তখন আর রোজগার করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ভারতে যৌথ পরিবার থাকার সময়, এই ধরণের দুশ্চিন্তা অনেক কম ছিল। বর্ণভেদ প্রথাও কিছুটা নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিত। এখন এই প্রতিষ্ঠান দুইটি লোপ পাইতে বসিয়াছে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অন্য ব্যবস্থা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। মূলধনের ক্ষয়-ক্ষতিও হয়। মূলধনের চলতি আয়ের একটা অংশ এই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য সরাইয়া রাখা হয়। শ্রমিকেরও চলতি আয়ের একটা অংশ আলাদা করিয়া রাখা দরকার। অকর্মণ্য অবস্থায় এই তহবিল তাহাকে রক্ষা করিবে। কিন্তু মুস্কিল হইল অধিকাংশ শ্রমিকের আয় অত্যন্ত কম। বর্তমানের ন্যূনতম প্রয়োজন এতে মিটান যায় না। ক্ষয়ক্ষতির তহবিল গঠন তাহার ক্ষমতার বাহিরে। সুতরাং ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। সেজন্য সরকারকে অগ্রসর হইয়া নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, যেমন—দুর্ঘটনা জনিত ভাতা, স্বাস্থ্য বীমার মাধ্যমে চিকিৎসা-ব্যবস্থা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, বার্ধক্য পেন্সন ইত্যাদি।

সরকারের আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য জনসাধারণকে অভাব হইতে মুক্ত করা। অভাব-মুক্তি সরকারী বা ব্যক্তিগত যে উদ্যোগেই হোক, ইহার জন্য শ্রম করিতে হইবে। অতিরিক্ত শ্রম করিয়া যদি আয় করিতে হয়, তবে অবসর কমিয়া যাইবে, নূতন অভাবের সৃষ্টি হইবে। অস্বাস্থ্য কুৎসিত পরিবেশে যদি শ্রম

কাজের সর্তের উন্নতি

করিতে হয়, তবে স্বাস্থ্যহানি হইবে। একটি অভাব পূরণ করিতে যাইয়া অন্যদিকে অভাব সৃষ্টি হইবে। সাধারণ লোকের জীবনের বেশ একটি বড় অংশ কর্মস্থানে কাটাইতে হয়। কাজের পরিবেশ খারাপ হইলে, ব্যক্তিত্ব বিকাশ কঠিন হইয়া পড়িবে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একটানা দীর্ঘ সময় খাটিলে, বাকী সময় ইহার জের টানিয়া চলিতে হইবে। সৃজনীশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে। সেজন্য সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কাজের পরিবেশের উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন, যেমন—দৈনিক খাটুনির ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া, কারখানার আলোহাওয়ার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করা ইত্যাদি।

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নীচে আলোচনা করা হইল—

ভারতে কৃষির ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা (The Role of the Govt. in relation to Agriculture in India) :

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সরকার কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে কিছুটা সজাগ হন। প্রথম দিকে সরকারে কাজ খুব সীমাবদ্ধ ছিল। খাজনা মকুব করা, দুর্ভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা ও তকভি (Taccavi) ঋণ মকুব করার বেশী কিছু সরকার করেন নাই। ১৮৮৯ সালে কৃষি সম্বন্ধে ডাঃ ভোয়েলকারের রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহার পর ১৯০৪ সালে সমবায় আইন পাশ হইল। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় আন্দোলন গড়িয়া উঠিল। সমবায় নীতি কৃষির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে (বিক্রয় ব্যবস্থা, ঋণদান, বীজ ও সার ক্রয় ইত্যাদি) প্রযুক্ত হইল। ১৯২৬ সালে কৃষি সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য রয়্যাল কমিশন (Royal Commission) নিযুক্ত হইল। ১৯২৮ সালে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। এই রিপোর্টে কৃষি সম্বন্ধে বিভিন্ন সমস্যাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া সামগ্রিকভাবে সমাধানের সুপারিশ করা হইল। কৃষি সম্বন্ধে সরকারের আগ্রহের পরিচয় পাওয়া গেলেও, সরকারী প্রয়াস ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে ভারত সরকারের প্রচেষ্টা।

সরকারী ঋণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর ছিল। আবার সময়মত পাওয়াও যাইত না। সেচ ও বিক্রয়-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সরকারী প্রয়াস ছিল অপরিকল্পিত। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের সময় কৃষির ভার প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়। রাজ্য সরকার কৃষিশিক্ষা ও কৃষি-গবেষণার ব্যবস্থা কিছু কিছু করিয়াছেন। ১৯২৯ সালে সর্ব-ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্য কৃষিদপ্তরকে গবেষণার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। প্রচার ও প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকার কৃষককে উন্নততর কৃষি পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা করেন। উন্নত ধরণের বীজের প্রচলন, সার ব্যবহার, মৃত্তিকা ক্ষয় নিবারণ ইত্যাদি ব্যাপারেও কৃষি-দপ্তর চাষীকে সাহায্য করেন। পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করাতেও কৃষকের সুবিধা হয়। সরকার পঙ্গপালের উপদ্রব নিবারণকল্পে ব্যবস্থা করেন। কীট-পতঙ্গ বিনাশের জন্য ডিডিটি জাতীয় কীটবিনাশক দ্রব্য সরবরাহ করেন। খণ্ডিত জমির একত্রীকরণের সুবিধা দিবার জন্য আইন করা হইয়াছে। কোন কোন রাজ্যসরকার সমবায় কৃষিচাষে উদ্যোগী হইয়াছেন। একথা

রাজ্য সরকারের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত

স্বীকার করিতেই হইবে সরকারী প্রয়াসে কৃষির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথার বিলোপ করা হইয়াছে। ভূমিব্যবস্থা সংস্কারের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও পল্লী উন্নয়নের জন্য ২৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার জন্য বরাদ্দ ৫১০ কোটি টাকা। ১৯২৮ সালের কৃষি রিপোর্টে কৃষির উন্নতিকল্পে গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতির ইঙ্গিত করা হয়। ১৯৩৬ সালে এই উদ্দেশ্যে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়। ১৯৫২ সালে ইহা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অঙ্গীভূত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে উপেক্ষা করিয়া যে ভুল করা হয়, সরকার তৃতীয় পরিকল্পনায় তাহার পুনরাবৃত্তি করেন নাই। কৃষি উন্নয়নের গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকার এমন সম্পূর্ণ সচেতন। পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে রায় দিবার সময় এখনও আসে নাই।

কৃষির উন্নতি, সমাজোন্নয়নও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত

ভারতে শিল্প ও সরকার (Industry and Government in India) : বৃটিশ শাসনে শিল্প ছিল সরকার-উপেক্ষিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জনমতের চাপে সরকার ভারতীয় শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। এই উদ্দেশ্যে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি (Discriminating Protection) গৃহীত হয়। ঠিক হইল কতকগুলি শর্ত পূরণ হইলে তবেই সংরক্ষণ দেওয়া হইবে। কাঁচামাল ভারতে পাওয়া চাই। সেই শিল্প জাত দ্রব্যের ভারতে বিক্রয়বাজার চাই। সংরক্ষণ ছাড়া উন্নতি সম্ভব হইলে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে না। শেষ পর্যন্ত যেন সংরক্ষণ দরকার না হয়। অর্থাৎ স্বল্পকালের জন্যই সংরক্ষণ দেওয়া চলিবে। এই সমস্ত পূরণ হইলে তবেই সংরক্ষণ দিবার কথা বিবেচনা করা হইবে। সংরক্ষণ নীতির ফলে কাগজ, লৌহ ও ইস্পাত, শর্করা ও বস্ত্রশিল্পের প্রভৃত উন্নতি হয়। এই নীতি প্রয়োগের সময় অত্যন্ত বেশী কড়াকড়ি করা হয়। ফলে সিমেন্ট, কাঁচ ও ভারী রসায়ন শিল্প এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়।

বিচারমূলক শিল্প সংরক্ষণ নীতি

স্বাধীনতা লাভের পর শিল্প সম্বন্ধে সরকারী নীতি নূতন করিয়া নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হয়। ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল সরকারী শিল্পনীতি ঘোষিত হয়। শিল্পগুলিকে চারিভাগে ভাগ করা হয়। (১) কতকগুলি শিল্প কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হইবে। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র, এটমিক শক্তি ও রেলপথ পরিবহন এই পর্যায়ভুক্ত। (২) কতকগুলি শিল্পে সরকারী উদ্যোগের প্রাধান্য থাকিলেও, ব্যক্তিগত উদ্যোগকেও সাময়িকভাবে সুযোগ দেওয়া হইবে, যেমন—

কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ ও বিমান নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারের সাজসরঞ্জাম নির্মাণ এবং খনিজ তেল। (৩) লবণ, কাগজ, শর্করা ইত্যাদি শিল্পে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে ব্যক্তিগত উদ্যোগ চালু থাকিবে। (৪) অন্যান্য শিল্প ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকৃত হইবে। বৈদেশিক মূলধন লগ্নী হইতে পারিবে। তবে ভারতীয়দের শেয়ার সংখ্যায় অধিক হইতে হইবে এবং ভারতীয় কারিগরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সমবায় নীতি চালু করা অপেক্ষাকৃত সহজ। উদ্বাস্তু পুনর্বসতির পক্ষেও ইহাদের উপযোগিতা আছে। উৎপাদনের উপাদানগুলির স্থানীয় ব্যবহার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সম্ভব। এই সব কারণে ইহাদের গুরুত্ব স্বীকার হইল। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে সমন্বয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য শুল্কনীতির যথোপযুক্ত পরিবর্তন করিতে সররকার প্রতিশ্রুত হইলেন। শিল্প-শ্রমিকদের জন্য ১০ লক্ষ গৃহ নির্মাণের কথা হইল। কার্যক্ষেত্রে সরকারী নীতি প্রথমে জাতীয়করণের উপর জোর দিল। বামপন্থীদের খুসী করিবার জন্য শ্রমিকদের মুনাফা ও পরিচালনায় অংশ দিবারও কথা হইল। তারপর দক্ষিণপন্থীদের মন রাখার জন্য জাতীয়করণের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করা হইল। করের ব্যাপারে ধনীদের সুবিধা দেওয়া হইল। কর ফাঁকি দেওয়া মুনাফা খুঁজিয়া বাহির করিবার বিশেষ চেষ্টা হইল না। শ্রমিক কিংবা মালিক, বিনিয়োগকারী বা জনসাধারণ কেহই সন্তুষ্ট হইল না।

শিল্পের শ্রেণীবিভাগ—সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ এবং শ্রমিক-নীতি

১৯৫০ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতি ঘোষিত হইল। ১৯৫৬ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাপ্ত হইল। ১৯৫৪ সালে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের নীতি স্বীকৃত হইল। নূতন করিয়া শিল্পনীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল এই নীতি ঘোষিত হইল। (১) ১৯৪৮ সালে ৬টি শিল্প সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও একচেটিয়া মালিকানায় চালাইবার কথা হয়। এই সংখ্যা বাড়াইয়া ১৭ করা হইল। সমাজতান্ত্রিক কাঠামো হইতে হইলে মূল শিল্পগুলি রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকা দরকার। সেইজন্য এই সংখ্যাবৃদ্ধি। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহাকে বাড়িতে দেওয়া হইবে। নূতন প্রতিষ্ঠান একমাত্র সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত হইবে। (২) অন্য ১২টি শিল্পে যুগপৎ সরকারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ চালু থাকিবে। এলুমিনিয়াম, সড়ক পরিবহন, সামুদ্রিক পরিবহন ইত্যাদি এই শ্রেণীতে পড়ে। (৩) পরিকল্পনার কর্মসূচী

শিল্পে সরকারী মালিকানার পরিধি বৃদ্ধি

অনুসারে অন্যান্য শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে সুযোগ দেওয়া হইবে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পকে অর্থ সাহায্য করা হইবে। বৃহৎ শিল্পে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করিয়া ও করনীতি মারফৎ (differential tax) সুবিধা দিয়াও ইহাদিগকে সাহায্য করা হইবে। বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিজের শক্তিতে টিকিয়া থাকিবে এইরূপ ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে বিশেষ সুবিধা দিয়া শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভারসাম্য আনিতে হইবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমবায় নীতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ করিতে হইবে। পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিকদের ক্ষমতা দিতে হইবে। বৈদেশিক মূলধনের বেলায় ১৯৪৮-এর নীতেতে কোন পরিবর্তন হয় নাই। ১৭টি শিল্প বাদে অন্য সমস্ত শিল্পে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে বিস্তারলাভ করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দূর হইয়াছে। মূলশিল্পগুলি সরকারী মালিকানায় রাখা হইয়াছে। দ্রুত শিল্পোন্নতির জন্য এই শিল্পগুলি সরকারী উদ্যোগের পর এলাকাভুক্ত করা হইয়াছে। জাতীয়করণ সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলা হয় নাই। ইহাতে ভালমন্দ দুই-ই হইতে পারে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে সমবায় নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাতের স্মারক হিসাবে আঞ্চলিক ভারসাম্যের ও শ্রমিকদিগকে পরিচালনার অংশীদার করিবার কথাও রহিয়াছে।

বিশেষ ক্ষেত্রে ও অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্পোন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য

রাজ্যসরকারের শিল্পদপ্তর কারিগরি শিক্ষা, শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা ও শিল্প-বাণিজ্য ঘটিত সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করেন। রাজ্যসরকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও করেন।

সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা না হইলে অর্ধোন্নত দেশে শিল্পের উন্নতি হওয়া অত্যন্ত কঠিন। উৎপাদনের উপাদানের যথাযথ ব্যবহারের জন্য শিল্পের প্রসার দরকার। সরকারকেই উদ্যোগী হইয়া শিল্পোন্নতির প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করিতে হইবে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Discuss the economic functions of the Government.**
   সরকারের অর্থ নৈতিক কার্যাবলী বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৪৩-১৪৬]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা

(Government and Development Planning)

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা আর শাসনকার্য পরিচালনার মধ্যেই সরকারের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল। আর্থিক সমাধানে সরকারের কোন দায়িত্ব ছিল না। প্রতিযোগিতা বজায় রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ব্যক্তিগত উদ্যোগীই কৃষি ও শিল্পকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবে—এই ছিল সেই যুগের প্রচলিত বিশ্বাস। পরিকল্পনা ছিল অবান্তর। এই অর্থব্যবস্থায় পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জীবন যাত্রার মানের উন্নতিও হইল। মাঝে মাঝে কিন্তু মন্দা দেখা দিতে লাগিল। কিছু কিছু লোক বেকার এমনিতেই থাকিত। মন্দার সময় বেকার সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিত। অবাধ স্বাধীনতার (Laissez Faire) নীতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিতে থাকিল। অ-পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় আর্থিক বৈষম্যও বাড়িয়া চলিল। এই ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপন্ন হয় মুনাফার আশায়। দরিদ্রের ক্রয়-ক্ষমতা কম। সুতরাং বেশী দাম দিবার ক্ষমতা নাই। ধনীর প্রয়োজন (need) হয়ত কম। কিন্তু তাহার ক্রয়-ক্ষমতা বেশী। সে দামও দিতে পারে বেশী। সুতরাং ডাল-ভাতের অভাব থাকা সত্ত্বেও রেশমী সাড়ীর উৎপাদন হইতে থাকিল। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমশঃ তিক্ত হইয়া উঠিল। শিল্পবিরোধ—তার ফলে ধর্মঘট ও লক-আউট—উৎপাদনের লোকসান হইতে থাকিল। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা কম। অনেক উৎপাদিত সামগ্রী লাভজনকভাবে বিক্রয় করা সম্ভব হইত না। তার ফলে উৎপাদন কমিত। ছাঁটাই ও বেকার সমস্যা দেখা দিত, লোকের মন পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। সেজন্য অবাধ স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিতে কোন আপত্তি হইল না।

ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অ-পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থা এবং তাহার পরিণতি।

পরিকল্পনা কাহাকে বলে? (What is Planning?): পরিকল্পনার প্রয়োজন আজ প্রত্যেক দেশই স্বীকার করে। পরিকল্পনার রূপ প্রত্যেক দেশে অবিকল একরকম নয়। চীন ও ভারত দুই-ই অনুন্নত দেশ। উভয় দেশেই পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থা। কিন্তু চীনের পরিকল্পনা অনেক বিষয়ে ভারতীয় পরিকল্পনা হইতে স্বতন্ত্র। পার্থক্য যতই থাকুক ইঁহাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যও আছে। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হইল কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ

পরিকল্পনা ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ

(Central control)। অ-পরিকল্পিত অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি নিজ নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোন চেষ্টা নাই। পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র নীতি বা লক্ষ্য নির্ধারণ করে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংসদ রাষ্ট্র নির্ধারিত এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য উৎপাদনের উপাদান-গুলি ব্যবহার করার একটি সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী প্রণয়ন করেন।

পরিকল্পনার উপাদান (Elements of Planning): পরিকল্পনার সুরু করিতে হইলে দেশে যে সমস্ত উৎপাদনের উপাদান পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। তথ্য সংগ্রহ হইলে তবেই মূল পরিকল্পনা রচনায় হাত দেওয়া যায়। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, সঞ্চয়, সম্ভাব্য বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদির খতিয়ান প্রস্তুত করিতে হইবে। সঙ্গতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকিলে পরিকল্পনা মাঝপথে রদবদল করিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত হয়ত পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হইবে না। ভারতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা করা হইয়াছিল। বৈদেশিক সাহায্য যত সহজে পাওয়া যাইবে মনে করা হইয়াছিল, তত সহজে পাওয়া যায় নাই। সরকারী রাজস্ব উদ্বৃত্ত ও সরকারী ঋণও আশানুরূপ হয় নাই। তার ফলে পরিকল্পনার ছাঁটকাট অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল।

উপাদানের হিসাব-নিকাশ

উদ্দেশ্য—পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য জানা না থাকিলে পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদান করা সম্ভব নয়। উদ্দেশ্যভেদে পরিকল্পনার রূপেরও ভেদ হয়। হিটলারের অধীনে নাৎসী জার্মাণীতে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল যুদ্ধে জয়-লাভের উদ্দেশ্য। সুতরাং যুদ্ধজাহাজ, বিমান, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনায় কাঁচামাল তৈয়ারী অথবা আমদানী করার জন্য প্রচুর ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছিল। আমাদের পরিকল্পনা জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য। যুদ্ধ জাহাজের পরিবর্তে আমাদের দরকার বাণিজ্য জাহাজ এবং অন্যান্য মূলধন দ্রব্য।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই প্রধান লক্ষ্য

অগ্রাধিকার নির্ণয়—পরিকল্পিত উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে উৎপাদনের বিবিধ ক্ষেত্রে লিপ্ত হইতে হয়। যেমন জীবনযাত্রার মানের উন্নতি করিতে গেলে কৃষি, শিল্প, পরিবহন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি করিতে হইবে। উৎপাদনের উপকরণগুলি অপ্রচুর। আর্থিক সঙ্গতির অপ্রতুলতা এই অপ্রাচুর্যেরই প্রকাশ। সুতরাং অগ্রাধিকার নির্ণয় করিতে হইবে। মূল উদ্দেশ্য সাধন করার ব্যাপারে যে কাজের গুরুত্ব সর্বাধিক,

গুরুত্ব নির্ণয়

সর্বাগ্রে তাহার জন্য ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে। গুরুত্বের ক্রমানুসারে নীচের দিকে আসিতে হইবে। ভারতে প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল সবচেয়ে বেশী।

অভীষ্ট নির্ধারণ (Target): নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হইতে গেলে উৎপাদনের কোন্ ক্ষেত্রে অগ্রগতি কতটা হইবে এবং এই অগ্রগতি কি সময়ের মধ্যে করিতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। ভারতে পরিকল্পনার কার্যকাল ৫ বৎসর। কৃষিজ ও শিল্পজ দ্রব্যের সাধারণভাবে কতটা বাড়াইতে হইবে কেবলমাত্র তাহা নির্ণয় করিলে চলিবে না। আরও বিস্তারিতভাবে অভীষ্ট বর্ণনা করিতে হইবে। খাদ্যশস্য, তুলা পাট, কারখানার যন্ত্রপাতি, শক্তিচালিত পাম্প, জাহাজ, মিলবস্ত্র ইত্যাদি করিয়া কোন্ ক্ষেত্রে কতটা সুফল লাভের আশা করা যায় তাহা বলিয়া দিতে হইবে। নির্ধারিত অভীষ্টগুলির উপর নির্ভর করিবে কার্যতালিকার প্রকৃতি। অভীষ্ট নির্ণয়ের সময় দেখিতে হইবে অভীষ্টগুলির পরস্পরের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে। কয়লা উৎপাদন বাড়ান হইল। সঙ্গে সঙ্গে যদি পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা না করা হয় তবে কয়লা খনিমুখেই স্তূপীকৃত হইবে। কলকারখানার কাজে লাগিবে না।

অভীষ্ট নির্ধারণ ও সামঞ্জস্য বিধান

যতই সতর্কতা অবলম্বন করা হোক ভুলচুক করা খুবই স্বাভাবিক। তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে বা অভীষ্ট নির্ধারণে যে কোন ধাপে ভুল হইতে পারে। নির্ধারিত অভীষ্ট বাস্তবে কতদূর পরিণত হইল তাহা সব সময় যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। দরকার হইলে পরিকল্পনার সংশোধন করিতে হইবে।

সরকার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা (Government and Development Planning): পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত। উৎপাদন ও আয় প্রতি বৎসর কিছু কিছু বাড়িতেছে। অর্থ-ব্যবস্থার দোষে এই উন্নত মানের অবনতি না ঘটে ইহাই সেই সব দেশের চিন্তার বিষয়। জীবন যাত্রার মান যে স্তরে আছে সেই স্তরে টিকাইয়া রাখাই তাহাদের সমস্যা। অনুন্নত দেশের সমস্যা কিছুটা ভিন্ন ধরণের। আর্থিক অগ্রগতি এখানে সুরুই হয় নাই। কোন কোন দেশে বরং জীবনযাত্রার মানের অধোগতি হইতেছে। আর্থিক অগ্রগতির অন্তরায়গুলি এখানে অত্যন্ত প্রবল। অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যার বেশীর ভাগ জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। অথচ কৃষি এইসব দেশে অত্যন্ত অনগ্রসর।

কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা প্রয়োজন

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষির উপর চাপ বাড়িতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের প্রধান্য থাকায় বৃহদায়তন উৎপাদন প্রথার সুবিধা পাইবার উপায় নাই। কৃষক দরিদ্র, ঋণভারে জর্জরিত। উন্নত প্রণালী প্রবর্তনের সামর্থ্য বা উৎসাহ কোনটাই তাহার নাই। সরকারী প্রচেষ্টা ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

দেশের ক্রমবর্ধমান জনতা চাষের জমি হইতে সম্পর্কচ্যুত হইয়া অন্যত্র সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত হইবে তাহারও উপায় নাই। কারণ অনুন্নত দেশগুলি শিল্পেও পশ্চাৎপদ। ফলে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের বিত্তশালী লোকেরা সহজ উপায় রোজগার করিতে চায়। শিল্পে ঝুঁকি আছে। তার চেয়ে সুদে টাকা খাটান, জমিতে লগ্নী করা বা অলঙ্কারপত্র ক্রয় করাই তাহারা শ্রেয় মনে করে। বেশীর ভাগ লোকের আয় এত কম যে সঞ্চয়ের প্রশ্নই উঠে না। কারিগরি দক্ষতার অভাবও আছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে ঈপ্সিত শিল্পোন্নতি কোনদিনই হইবে না। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগকে স্বীকার করা হইলেও চূড়ান্ত দায়িত্ব সরকারকেই লইতে হইবে। সরকারী মালিকানার প্রসার কম বা বেশী হইতে পারে। কিন্তু সরকারী তত্ত্বাবধান উৎপাদনের সর্বস্তরেই দরকার হইয়া পড়ে। বিক্রয় বাজারের অভাব হইলে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে না। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা সেজন্য শিল্প গঠন করিবার ঝুঁকি লইতে নারাজ হন। দশটি শিল্প তিনি একযোগে সুরু করিতে পারেন না। সরকার তাহা পারেন। নয়টি শিল্পে যে আয় উৎপন্ন হইবে তাহা হইতে দশম শিল্পটির বিক্রয় বাজার সৃষ্টি হইবে। এই ধরণের সুষম উন্নয়ন (balanced development) একমাত্র সরকারী উদ্যোগেই সম্ভব। ব্যক্তিগত উদ্যোগে উদ্যোক্তা নিজের মুনাফা বাড়াইতেই ব্যস্ত থাকেন, তাহার মুনাফা বাড়াইতে যাইয়া অন্যশিল্পে আয় কমিয়া গেল কিনা তাহা দেখিবার প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না। এর ফলে শিল্পোন্নয়নের কোন সামঞ্জস্য থাকে না। বৃহৎ শিল্প প্রসারের ফলে হয়ত কুটির শিল্প ধ্বংস হইল। অনেক লোক বেকার হইল। বৃহৎ শিল্পপতি লাভের খতিয়ান করার সময় এই লোকসান বাদ দিবেন না। সমাজের দিক দিয়া ইহা গুরুতর লোকসান। অনুন্নত দেশের আর্থিক সঙ্গতি কম। ঐ রকম লোকসান এই সব দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সরকারী তত্ত্বাবধান ব্যতিরেকে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব নয়।

ঈপ্সিত শিল্পোন্নতির জন্য কিছু সরকারী মালিকানা ও সর্বত্র সরকারী তত্ত্বাবধান প্রয়োজন

কৃষি ও শিল্পে উন্নতি করিতে হইলে পরিবহন ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হইবে। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইলে কৃষি ও সমস্ত শিল্পেরই সুবিধা হয়। সেইজন্যই কোন শিল্প একক প্রচেষ্টায় এই উন্নতি করিতে পারে না। কারণ ইহার সুফল সে একভাবে ভোগ করিবে না। পরিবহনে লাভ হইতে অনেক দেরী হয়। ভারতে রেলপথে আজ যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হয়। কিন্তু যখন রেলপথ প্রথম স্থাপিত হয়, তখন অনেকদিন লোকসান দিতে হইয়াছিল। অনেক শিল্প গড়িয়া উঠিলে, পরিবহনের চাহিদা বাড়ে—লাভ হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা এতদিন সবুর করিতে চান না। এইসব কারণে পরিবর্তন ব্যবস্থার উন্নতি করিতে হইলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও অনেকক্ষেত্রে মালিকানা প্রয়োজন।

পরিবহনের উন্নতি একান্ত প্রয়োজন

উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমাজোন্নয়নমূলক কার্যেরও প্রয়োজন আছে। মূলধন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি মূলধন দ্রব্যগত বা মনুষ্যগত হইতে পারে। এই সব সমাজোন্নয়ন কার্যের ফলে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়ে, উৎপাদনে সহায়তা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তা নিজ ব্যয়ে কাজ করিতে পারে না। কেননা তাহার ব্যয়ে যে শ্রমিকের দক্ষতা বাড়িল, সেই শ্রমিক যে চিরকাল তাহার অধীনেই কাজ করিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। তা ছাড়া সমাজোন্নয়ন করিতে হইলে অনেকগুলি সমস্যার যুগপৎ সমাধান করিতে হয়। একযোগে অনেক ব্যয় করিতে হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তার এত অধিক ব্যয় করিবার সামর্থ্য নাই। সমাজোন্নয়ন একমাত্র সরকারী উদ্যোগেই সম্ভব।

জাতীয় জীবনের মানোন্নয়নের জন্য সমাজোন্নয়নও প্রয়োজন

সাধারণভাবে পরিকল্পনার ব্যাপারে যে সমস্ত বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়, উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনাকালেও সেইসব বিষয়ের দিকে নজর দিতে হয় তাহা বলাই বাহুল্য। তথ্যসংগ্রহ, উদ্দেশ্য নির্ণয় অভীষ্ট নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা এখানেও আছে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। সেই সব দেশে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপক না হইলেও ক্ষতি নাই। ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর অনেকটা নির্ভর করা যায়। **অনুন্নত দেশে আর্থিক অগ্রগতি সুরু করাই হইল পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। উন্নত দেশে অগ্রগতি বজায় রাখা হইল প্রধান সমস্যা।** অগ্রগতি একবার সুরু হইলে, তাহা বহাল রাখা তত কঠিন নয়। প্রাথমিক বাধাগুলি দূর করিয়া আর্থিক অগ্রগতি চালু করা অনেক বেশী কঠিন। উন্নয়ন পরিকল্পনায় সেইজন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানার পরিধি অনেক ব্যাপক। বর্তমান রাষ্ট্র পুরাপুরি সমাজতান্ত্রিক না হইলেও সমাজতন্ত্রঘেঁষা। ব্যক্তিগত উদ্যোগের

উচ্ছেদ না হইলেও, তাহার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত। ব্যক্তিগত ও সরকারী উদ্যোগের মধ্যে সঠিক সীমারেখা অঙ্কন করা সহজ নয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ অধিকমাত্রায় সঙ্কুচিত করিলে ধনিকশ্রেণীর সহানুভূতি হারাইতে হইবে। আবার সরকারী উদ্যোগ খর্ব করা হইলে, জনসাধারণ অসন্তুষ্ট হইবে। অথচ পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সকলের সহযোগিতা দরকার।

সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীর দক্ষতা, সহযোগিতা এবং সাধুতা একান্ত প্রয়োজন

প্রশাসনিক ব্যাপারের গুরুত্ব সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের প্রসার অনিবার্য। যে কর্মীবৃন্দের মাধ্যমে সরকার কাজ করিবেন, তাঁহাদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা যদি না পাওয়া যায়, তাঁহারা যদি দুর্নীতিমুক্ত না হন, ব্যবসা পরিচালনার ব্যর্থতা প্রায় সুনিশ্চিত।

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার ইতিহাস (History of India's Development Plans): ব্রিটিশ আমলে বিদেশী সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নয়নের জন্য কোন গরজ ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্যোগের উপর আর্থিক জীবন নির্ভর করিত। ১৯২৯-এর জগদ্ব্যাপী মন্দার পর ব্রিটেনের মত ব্যক্তিগত উদ্যোগের পীঠস্থানেও সরকারী পরিকল্পনার কথা উঠে। ১৯৩৪ সালে সুপ্রসিদ্ধ স্থপতি ও অর্থবিদ্যাবিদ বিশ্বেশ্বরায়া ভারতের অনগ্রসরতার জন্য সরকারী উদাসীনতাকে দায়ী করিয়া একটি বই লেখেন। ১৯৩৭ সালে জাতীয় কংগ্রেসের তরফ হইতে 'জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। জনমতের চাপে বিদেশী সরকার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষাশেষি 'পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করিলেন। ১৯৪৭ সালে ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকার 'পরিকল্পনা উপদেষ্টা সংস্থা' গঠন করিলেন। ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকাপাকিভাবে 'পরিকল্পনা সংসদ (Planning Commission) গঠন করা হইল। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা' চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হইল। ইহার আগেই কতকগুলি ছোটখাট উন্নয়ন পরিকল্পনা সুরু করা হইয়াছে। সেগুলিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরিকল্পনার কাল নির্দিষ্ট হইল ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত। ইহার পর আসিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। ইহার সময়কাল ১৯৫৬ সলের এপ্রিল হইতে ১৯৬১ সালের মার্চ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষ হইতে আর বেশী দেরী নাই। ইতিমধ্যে তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়াও প্রকাশিত

উন্নয়ন বিষয়ে বিদেশী সরকারের উদাসীনতা

স্বাধীন ভারত সরকার ও পরিকল্পনা পরিষদ

হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল হইবে ১৯৬১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৬ সালের মার্চ পর্যন্ত।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (First Five Year Plan): মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করিবে, হইবে, ইহাই হইল সাধারণভাবে ভারতে পরিকল্পনার লক্ষ্য। ইহার জন্য একাধিক পরিকল্পনা দরকার হইবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার প্রথম ধাপ। প্রথম পরিকল্পনার আমলে জাতীয় আয় ১৮% এবং মাথাপিছু আয় ১১% বাড়িবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। সাধারণ লোকের

লক্ষ্য

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিতে হইলে মাথাপিছু আয় বাড়াই যথেষ্ট নয়। জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টনও দরকার। ভারতে মোট জাতীয় আয় অত্যন্ত কম। সেজন্য প্রথম অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির দিকেই বেশী নজর দেওয়া হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে ২০৬৯ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন বে-সরকারী সূত্রে ৩৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়। বে-সরকারী উদ্যোগে মোট খরচের

বৈশিষ্ট্য

মধ্যে ২৩৩ কোটি টাকা শিল্পে নূতন মূলধন সরবরাহের জন্য এবং ১৫০ কোটি টাকা পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রপাতি সংস্কারের জন্য ব্যয় হইবে আশা করা হয়। সরকারী উদ্যোগে ব্যয়ের পরিমাণ জনমতের চাপে বাড়াইয়া ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হয়। বিভিন্ন খাতে মোট বরাদ্দ এবং কার্যতঃ কত ব্যয় হয় নীচের ছকে বর্ণনা করা হইল—

	পরিবর্তিত ব্যয়বরাদ্দ কোটি টাকায়	শতকরা	কার্যতঃ কোটি টাকা	শতকরা
১। কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	৩৫৪	১৪.৯	২৯৯	১৪.৮
২। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৬৪৭	২৭.২	৫৮৫	২৯.১
৩। শিল্প ও খনিজ	১৮৮	৭.৯	১০০	৫.০
৪। যানবাহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা	৫৭১	২৪.০	৫৩২	২৬.৪
৫। সমাজসেবা ও পুনর্বসতি	৫৩২	২২.৪	৪২৩	২১.০
৬। বিবিধ	৮৬	৩.৬	৭৪	৩.৭
	২,৩৭৮	১০০	২,০১৩	১০০

কার্যতঃ ব্যয়ের মোট অঙ্ক সংশোধিত করিয়া ১৯৬০ কোটি টাকা করা হয়। এই ছক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় সরকারী উন্নয়ন ব্যয়ের বেশীর ভাগ (৫১·২%) জলসেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদনের কেন্দ্র স্থাপন, পথঘাট নির্মাণ এবং রেলপথের সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী করার জন্য ব্যয় হইবার কথা। এই সব মৌল সম্পদের উপর কৃষি ও শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। সরকারী উদ্যোগে এই সব মৌল সম্পদ সৃষ্টি হইলে ক্রমশঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও বেশী সম্পদ সৃষ্টি হইবে—এই রকম মনে করা হইয়াছিল। কৃষির উন্নতির জন্য বরাদ্দ হয় প্রায় ১৫%। সমাজকল্যাণের পথে দেশকে অগ্রসর করিবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারেও সাধ্যমত ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। এই সমস্ত খাতে ব্যয় করিবার পর সাক্ষাৎভাবে শিল্পোন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব বে-সরকারী উদ্যোগের উপর ছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প অপেক্ষা কৃষির উপর বেশী জোর দিবার সঙ্গত কারণ আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। দেশবিভাগের ফলে পরিকল্পনার প্রাক্কালে খাদ্যাভাব আরও তীব্র হইয়া উঠে। অভুক্ত জনসাধারণের নিকট সহযোগিতার আশা করা চলে না। অথচ দেশবাসীর সহযোগিতা না পাইলে পরিকল্পনা কখনও সফল হইতে পারে না। খাদ্য সমস্যার সমাধান সেজন্য অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। দেশবিভাগের ফলে ভারত আরও একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। পাটকল ও কাপড়ের কলগুলির কাঁচামালের ঘাটতি দেখা দিল। তুলা ও পাট যে সমস্ত স্থানে উৎপন্ন হয়, সেগুলি বেশীর ভাগ পাকিস্তানের অংশে পড়ে। ফলে ভারতের পাটশিল্পে ও বস্ত্রশিল্পে সঙ্কট দেখা দেয়। খাদ্যাভাব ও কাঁচামালের ঘাটতি পূরণের জন্য কৃষির উপর জোর না দিয়া উপায় ছিল না।

কৃষির অগ্রাধিকার

কৃষির উন্নতির জন্য পতিত জমি উদ্ধার, জলসেচ, সার ও উন্নতধরণের বীজ প্রয়োগ, ইত্যাদি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। কৃষিজ উৎপাদন ৫২৭ লক্ষ টন হইতে বাড়াইয়া ৬১৬ লক্ষ টন করিবার কথা হয়। কৃষিজ উৎপাদন বাড়িয়া কার্যতঃ ৬৪৯ লক্ষ টন হয়। তুলা এবং পাটের নির্দিষ্ট অভীষ্ট (target) ছিল ৪২·২ ও ৫৩·৯ লক্ষ গাঁট। কার্যতঃ উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৪০ ও ৪২ লক্ষ গাঁট। কৃষির অন্যান্য প্রায় সকল স্তরেই ফলন কিছু কিছু বৃদ্ধি পায়।

ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা অপরিহার্য। প্রথম পরিকল্পনায় বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির উপর জোর দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা-গুলিতে সেচ-ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নৌ-চলাচল

ব্যবস্থাও হয়। বৃহৎ ও মাঝারি সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে ১ কোটি ৬৩ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বহুমুখী পরিকল্পনা-গুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দামোদর পরিকল্পনা, উড়িষ্যায় মহানদী পরিকল্পনা, পূর্ব-পাঞ্জাবে ভাকরানাঙ্গাল পরিকল্পনা, মধ্যপ্রদেশে চম্বল পরি-কল্পনা, বিহারে কোশী পরিকল্পনা ও উত্তর-প্রদেশে রিহান্দ পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

জলসেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন

কৃষির উন্নয়নের জন্য উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার আবশ্যকতা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। মোট ব্যয়ের প্রায় এক চতুর্থাংশ এই খাতে ব্যয় করা হইয়াছে। এই ব্যয়ের অধিকাংশ রেল-পরিবহনের উন্নতির জন্য খরচ করা হইয়াছে। রাজ্য ও জাতীয় সড়কগুলির সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্যও বেশ কিছু ব্যয় করা হয়।

পরিবহন

সমাজসেবার খাতে প্রায় এক পঞ্চমাংশ ব্যয় করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮৭ লক্ষ হইতে ২৭৮ লক্ষ হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ, শ্রমিককল্যাণের ব্যাপারেও নিরূপিত অভীষ্টের কাছাকাছি পৌছান সম্ভব হইয়াছে।

সমাজসেবা ও গ্রামোন্নয়ন

শিল্পের মিলবস্ত্র উৎপাদন নিরূপিত লক্ষ্য হইতে ৭০ কোটি গজ বেশী হইয়াছে। চিনি, সেলাইকল, কাগজ ও সাইকেল উৎপাদনে আমরা নির্দিষ্ট অভীষ্ট পথে পৌছাইয়াছি। ইঞ্জিনিয়ারীং ও রাসায়নিক শিল্পের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। জাহাজ ও বিমান নির্মাণ, ডি ডি টি ও পেনিসিলিন প্রস্তুত এবং খনিজ তৈল পরিশোধনের কারখানা প্রথম পরিকল্পনার আমলে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্প ও খনিজ

প্রথম পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Financing the First Five Year Plan) : পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পদ সৃষ্টি। সম্পদ সৃষ্টির প্রয়াসের সূত্রপাত অর্থের দ্বারাই হয়। পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে, বিভিন্ন খাতে পরিকল্পিত ব্যয়ের জন্য উপযুক্ত অর্থসংস্থান করিতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় অর্থের ব্যবস্থা ছিল—

		বরাদ্দ কোটি টাকা		কার্যতঃ কোটি টাকা
১। রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত (রেলের উদ্বৃত্তসহ)	—	৭৩৮	—	৭৫২
২। সরকারী ঋণ (জনসাধারণ, সরকারী আমানত ও বিবিধ তহবিল হইতে)	—	৫২০	—	৬০০
		১২৫৮	—	১৩৫২

		বরাদ্দমত	কার্যতঃ
		কোটি টাকা	কোটি টাকা
		১২৫৮	১৩৫২
৩।	বৈদেশিক সাহায্য	১৫৬	১৮৮
৭।	ঘাটতি (নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া যে অংশ মিটাইতে হইবে)	২৯০	৪২০
		১৭০৪	১৯৬০

অর্থের এই বিলি ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের সঙ্গতির হীনতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পবিকল্পনা সংসদ আমাদের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের ভিত্তিতেই ব্যয় বরাদ্দ হিসাব করিয়াছিলেন। কার্যতঃ এই সর্বনিম্ন ব্যয়ের অর্থও আমরা যোগাড় করিতে পারি নাই।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল (Evaluation of the First Five Year Plan): জাতীয় আয় আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি ভারত উন্নত দেশগুলির তুলনায় কত পশ্চাৎপদ। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করিয়া ইহাদের সমান হইতে সময় লাগিবে। পরপর অনেকগুলি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইবে। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল সীমিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দেশবিভাগের ফলে ভারতে দারুণ খাদ্যাভাব, কাঁচামালের ঘাটতি ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। দেশে ভীষণ দুঃখ-দর্দশা দেখা দেয়। মহাযুদ্ধের সময় যন্ত্রপাতির অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারও অবহেলা করা হয়। দেশ অনেকটা পিছনে পড়িয়া গেল। প্রথম পরিকল্পনার নির্বাচিত অভীষ্টগুলি সিদ্ধ হইলেও, জীবন যাত্রার মানের কোন চমকপ্রদ উন্নতি হইত না। পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় ১১% বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। ইহাকে নিশ্চয় উচ্চাশা বলা চলে না। বর্তমান সমস্যাগুলির কিছুটা সমাধান করা, দেশবাসীর অসহনীয় দারিদ্রের কিছুটা লাঘব করা, দ্বিতীয় পরিকল্পনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা—ইহাই ছিল প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

কৃষির প্রায় প্রত্যেক স্তরেই ফসল বাড়িয়াছিল। ইস্পাত, এলুমিনিয়ম, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি বাদ দিলে শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদন নির্ধারিত অভীষ্ট অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। পেনিসিলিন, ডি ডি টি, খনিজ তৈল পরিশোধন—এই সব নূতন শিল্পের গোড়া পত্তন হয়। সরকারী উদ্যোগে আর্থিক উন্নতির জন্য খরচ হয় ২০০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১৫০০ কোটি টাকা সরাসরি সম্পদ বৃদ্ধির কাজে খরচ হয়। বে-সরকারী উদ্যোগে মৌল সম্পদ সৃষ্টি হয় প্রায় ১৬০০ কোটি টাকার। পাঁচ বৎসরে

প্রায় ৩১০০ কোটি টাকার অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসর ৬২০ কোটি টাকার নূতন সম্পদ সৃষ্টি হয়। সম্পদ বৃদ্ধির কাজ পরিকল্পনার আমলে কিছুটা ত্বরান্বিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অগ্রগতি এখনও যে হারে, সেই হার বজায় রাখিতে হইলে বার্ষিক সঞ্চয় বাড়াইয়া ১৭/১৮% করিতে হইবে।

বেকার সমস্যা আরও তীব্র হইয়াছে। মৌসুমী বায়ুর অনিশ্চয়তা হইতে এখনও মুক্তি লাভ সম্ভব হয় নাই। এমন কি পরিকল্পনার ফলেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিয়াছে একথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। অনুকূল সুযোগ সমাবেশের ফলেই এই পরিমিত সাফল্য অর্জিত হইয়াছে। এ সম্ভাবনা উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবুও একথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রথম পরিকল্পনাকালীন পরিমিত সাফল্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সহজ করিয়া তুলিয়াছে। বৃহত্তর দ্বিতীয় পরিকল্পনা গ্রহণের সাহস যোগাইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (The Second Five Year Plan): দ্রুততর হারে অগ্রগতি সম্ভব হইলে মৌলসম্পদ সৃষ্টিকে প্রাধান্য দিতেই হইবে। মূলধন দ্রব্য ব্যতিরেকে শ্রমের সদ্ব্যবহার অসম্ভব। সেইজন্য দ্বিতীয় করিকল্পনায় ব্যয়ের বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করিতে হইল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকালে অর্থসঙ্কটের জন্য কিছু ছাঁটকাট করিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার চারটি মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্য

(১) **উন্নয়নের দ্রুততর গতি:** প্রথম পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় ১৭.৫% বৃদ্ধি পায়। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় ২৫% বাড়াইবার কথা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রধানতঃ শিল্প প্রসারের সাহায্যে আয় বাড়ানর চেষ্টা হয়।

(২) **শিল্পের ব্যাপকতর ভিত্তি:** প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা হয়। এই প্রচেষ্টা কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়। খাদ্য ও কাঁচামালের ঘাটতি কিছু কমে। কৃষির অধিকতর উন্নতির জন্য শিল্পোন্নয়ন দরকার। শিল্পোন্নয়ন সুগম করিতে হইলে মূল শিল্পগুলির উন্নতি আগে করিতে হইবে। সেজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কয়লা, লৌহ ও ইস্পাত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়।

(৩) **কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ:** দেশের জনসংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। মূল পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসর ১১০ লক্ষ লোকের নূতন নিয়োগ হইবে আশা করা হয়।

(৪) **সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাত:** আর্থিক অসাম্য হ্রাস করা এবং অর্থ নৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সমানভাবে বাঁটোয়ারার উপর জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে বে-সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সমবায় নীতির প্রসার করার কথা হয়। গতিশীল কর, শ্রমিক কল্যাণ ও সেবামূলক কাজের প্রসারও এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে সাহায্য করিবে।

প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও সরকারী উদ্যোগে দেশের সম্পদ

বৈশিষ্ট্য

বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন খাতে কতকগুলি বরাদ্দ ধরা হয়। সরকারী উদ্যোগে মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বিভিন্ন খাতে এই মোট অঙ্ক ভাগ করা হইয়াছে এইভাবে—

	কোটি টাকা	শতকরা ভাগ	শতকরা বৃদ্ধি প্রথম পরিকল্পনার তুলনায়
১। কৃষি ও গ্রাম উন্নয়ন	৫৬৮	১২	৫৯
২। জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি	৯১৩	১৯	৩০১
৩। শিল্প ও খনিজ	৮৯০	১৮	৩৯৭
৪। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১,৩৮৫	২৯	১৪৮
৫। সমাজ-উন্নয়ন ও পুনর্বসতি	৯৪৫	২০	৭৭
৬। বিবিধ	৯৯	২	৫৩
	৪,৮০০	১০০	

প্রথম পরিকল্পনার মত দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও বে-সরকারী উদ্যোগে সম্পদ সৃষ্টির একটা হিসাব করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। শুধু বড় বড় শিল্পসংস্থাকে প্রথম পরিকল্পনার আওতায় আনা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বে-সরকারী উদ্যোগে সম্পদ সৃষ্টির সামগ্রিক হিসাব নিকাশ করার চেষ্টা হয়। বে-সরকারী ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হয়। এই মোট ব্যয় যেভাবে বণ্টন হইবে অনুমান করা হয় তাহা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল—

		কোটি টাকা
১।	বড় শিল্প ও খনিজ	৫৭৫
২।	বিদ্যুৎ উৎপাদন ও রেলপথ বাদে অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা	১২৫
৩।	নির্মাণের কাজ	১,০০০
৪।	কৃষি এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	৩০০
৫।	মজুত কাঁচামালের জন্য	৪০০
		২,৪০০

স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ৩৩৮ কোটি টাকা এবং বাকি অংশ চলতি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে। ছোট আকারের সেচ ব্যবস্থা, চাষের জমির পুনরুদ্ধার, বনজঙ্গল রক্ষণাবেক্ষণ, ফসল সংরক্ষণের জন্য গোলাঘর নির্মাণ, পশু পালনের উন্নততর ব্যবস্থা, মাছের চাষ—এই সব উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হইবে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, সমবায় গঠন করা—এই সমস্ত ব্যয় চলতি হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন

জলসেচের পরিকল্পনা ও ৭৪টি নূতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র এই সময়ের মধ্যে শেষ করা হইবে। বাকী ৫০ কোটি টাকা চলতি হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

জলসেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি

লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে সব চেয়ে বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে। ভারী শিল্পের জন্য ৬৯০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

শিল্প ও খনিজ

৫০ কোটি টাকা চলতি হিসাবে ব্যয় হইবে, বাকি সমস্ত টাকা স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করা হইবে। এই টাকার বেশীর ভাগ খরচ হইবে রেলপথের সাজ সরঞ্জাম কেনার জন্য। নূতন রেলপথ, সড়ক নির্মাণ, বন্দর নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্যও কিছু ব্যয় করা হইবে।

পরিবহন

৪৫০ কোটি টাকা স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ও ৪৯০ কোটি টাকা চলতি হিসাবে খরচ হইবে। স্থায়ী সম্পদের মধ্যে নূতন গৃহ নির্মাণকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইবে, বিবিধ—১৯ কোটি টাকা নূতন বাড়ীঘর নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হইবে। বাকী সমস্ত টাকাই চলতি হিসাবে খরচ করা হইবে।

সমাজ উন্নয়ন

কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পাইবে ১৮%। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ৬২%। জাতীয় আয় বাড়িবে ২৫%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মাথাপিছু আয় বাড়িবে ১৮%। উৎপাদনের একটা ক্রমবর্ধমান অংশ কারখানা ও কলকব্জার আকার গ্রহণ করিবে। মোট উৎপাদন যে হারে বাড়িবে, ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়িবে তাহার চেয়ে কম হারে। ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ মাথাপিছু বাড়িবে ১৬%।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংগ্রহ: পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে, অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা থাকা দরকার। অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হইলে বরাদ্দমত ব্যয় করা সম্ভব হইবে না। পরিকল্পনার অভীষ্টে পৌছানও সম্ভব হইবে না। অর্থের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় কর ও ঋণের উপর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যে নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিয়াও কিছুটা অর্থসংস্থান করা যায়। বৈদেশিক সাহায্যও কিছু পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা এইরূপ—

		কোটি টাকা
১।	রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্ত (রেলের উদ্বৃত্তসহ)	৯৫০
২।	সরকারী ঋণ (জনসাধারণ, প্রভিডেণ্টফাণ্ড ও অন্যান্য আমানত হইতে)	১৪৫০
৩।	বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য	৮০০
৪।	ঘাটতি ব্যয় (নূতন মুদ্রা সৃষ্টি)	১,২০০
		৪,৪০০
	ভবিষ্যতে সংগৃহীতব্য	৪০০
		৪,৮০০

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনা: (১) দ্বিতীয় পরিকল্পনা অনেক বেশী ব্যয়বহুল। সমস্ত খাতেই ব্যয়বরাদ্দ বাড়ান হইয়াছে। কৃষি ও জলসেচের ব্যয় প্রথম পরিকল্পনায় ছিল মোট ব্যয়ের ৩৩%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে ২৩%। খনিজ ও শিল্পে ব্যয় ৭% হইতে বাড়িয়া ১৮% হইয়াছে। পরিবহনের উপর ব্যয় আনুপাতিক হিসাবে ছিল ২৩%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে ২৯%। প্রথম পরিকল্পনার সময় খাদ্য ও কাঁচামালে ঘাটতি ছিল। সেজন্য

স্বাভাবিকভাবেই কৃষির উপর নজর দেওয়া হইয়াছিল বেশী। সুষম (balanced) শিল্পোন্নয়নের জন্য কৃষির সঙ্গে শিল্পেরও উন্নয়ন দরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সেজন্য শিল্পের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। শিল্পের জন্য নির্ধারিত ব্যয়ের ৭৮% ব্যয় হইবে ভারী শিল্পের জন্য।

(২) প্রথম পরিকল্পনায় বে-সরকারী উদ্যোগে সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১৬০০ কোটি টাকা। সরকারী উদ্যোগে ১৫০০ কোটি টাকার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। বে-সরকারী উদ্যোগের অংশ ছিল প্রায় ৫২%। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে প্রায় ২৫০%—১৫০০ কোটি টাকা হইতে ৩৮০০ কোটি টাকা। বে সরকারী উদ্যোগে সম্পদ সৃষ্টি বাড়িবে ১৫০%—১৬০০ কোটি টাকা হইতে ২৪০০ কোটি টাকা। সরকারী উদ্যোগের পরিধি বাড়িবে। সেই অনুপাতে বে-সরকারী উদ্যোগের গুরুত্ব হ্রাস পাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগকে বিশেষ প্রাধান্য দিবার নীতি সমাজতান্ত্রিক পক্ষপাতের স্পষ্ট নিদর্শন।

(৩) প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়ের ৫%-৭% বিনিয়োগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের হার বাড়াইয়া ১০% করা হইয়াছে।

(৪) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সুষম উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির দিকেই নজর ছিল। শিল্পোন্নয়ন বে-সরকারী উদ্যোগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া হইলেও মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্পকে অবহেলা করা হয় নাই। কৃষির উপর চাপ কমাইবার জন্য ও অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সম্প্রসারণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কৃষি বাদে অন্যান্য শিল্পে ৮০ লক্ষ লোকের নূতন নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে।

(৫) দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর আর্থিক সাম্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। অনুন্নত গোষ্ঠী ও অঞ্চলের উন্নয়নকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্তন: পরিকল্পনার আমলে সাজ-সরঞ্জামের দাম আগের তুলনায় বাড়িয়া যায়। চলতি দামের হিসাবে মোট ৫৬০০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। ঘাটতি ব্যয় বাড়াইবার ফলে মুদ্রাস্ফীতি বাড়িয়া যায়। আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে ভোগ্যপণ্য আমদানীও বাড়িতে চায়। ভারী শিল্পের জন্য বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিতেই হইবে। পরিকল্পনা সংসদ কতটা বৈদেশিক সাহায্য দরকার হইবে তাহার সঠিক হিসাব করিতে পারেন নাই। পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ১১০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে দেখা গেল। অথচ বিদেশ হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইবার

কোন লক্ষণ দেখা গেল না। চারিদিকে এইসব অসুবিধা দেখা দেওয়ায় পরিকল্পনা সংসদ ছাঁটাই নীতি গ্রহণ করিলেন। ঠিক হইল আপাততঃ ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। পরে সুবিধা বুঝিলে আরও ব্যয় করা হইবে। পবিবর্তিত ব্যয় বরাদ্দ এইরূপ হইল—

	কোটি টাকা
কৃষি ও গ্রামোন্নতি	৫১০
সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	৮২০
শিল্প ও খনিজ	৯৫০
পরিবহন	১,৩৪০
সমাজকল্যাণ	৮১০
বিবিধ	৭০
	৪,৫০০

মূল পরিকল্পনার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায় মোট ব্যয় বরাদ্দ কমাইলেও শিল্প ও খনিজ খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ না কমাইয়া আরও ৬০ কোটি বাড়ান হইয়াছে। অন্যান্য সমস্ত খাতেই ব্যয় কমান হইয়াছে। শিল্প ও খনিজ সম্পদ বিকাশের কাজকে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কত বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার সমালোচনা : (১) কৃষির উপর যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনার সাফল্য সন্দেহের অতীত নয়—তাহা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। পরিকল্পনা সংসদ মনে করিয়াছিলেন খাদ্য সমস্যার সমাধান হইয়া গিয়াছে। খাদ্যমূল্য আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়া যাইতে থাকে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অভীষ্ট ১৫% হইতে বাড়াইয়া ২৫% করিতে হয়। পশুপালন, বনসংরক্ষণ ইত্যাদির ব্যয়বরাদ্দ কমাইয়া কৃষির ব্যয় বরাদ্দ বাড়াইতে হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় সংসদ কৃষির উপর উপযুক্ত ব্যয়বরাদ্দ না করিয়া ভুল করিয়াছিলেন।

(২) আমাদের সর্বনিম্ন প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে উচ্চাকাংখার দোষে দুষ্ট বলা যায় না। কিন্তু বলা যায়, আমাদের আর্থিক সঙ্গতির হিসাবে ব্যয়বরাদ্দ বড় বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। সরকারী ও বে-সরকারী উদ্যোগে মোট ৭২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব হয়। প্রথম তিন বৎসরে সরকারী রাজস্বে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৪৩৯ কোটি টাকা। ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া পাওয়া যায় মোটে ৫৪৪ কোটি টাকা। নূতন মুদ্রা সৃষ্টি হয় ৯২৭ কোটি টাকা। মূল পরিকল্পনায় ঘাটতি বরাদ্দ ছিল ১২০০ কোটি টাকা। এই হিসাব ঠিক রাখিতে গেলে আর

মোটে ২৮৩ কোটি টাকার নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করা চলে। এদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বাড়িয়া যাওয়ায় বিদেশ হইতে সাহায্যের আবশ্যকতা বাড়িয়া যায়। বিদেশ হইতে সহজেই সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। কাজে দেখা গেল অত সহজে সাহায্য পাওয়া যায় না। সংসদ এই সব অসুবিধার জন্য শেষ পর্যন্ত ব্যয়ের অঙ্ক কমাইতে বাধ্য হন। ছাঁটাইনীতি অনুসরণ করিলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে ক্রমেই দেরী হইয়া যাইবে। দ্রুতগতিতে শিল্পোন্নয়ন করিতে না পারিলে, বেকারের সংখ্যা ও অসন্তোষ বাড়িয়া চলিবে। সামাজিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িলে আশ্চর্য হইবার কিছু থাকিবে না। সংসদ ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করিয়াছেন। অর্থাভাবে সেই পরিকল্পনা ছাঁটকাট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অর্থ সংগ্রহের প্রচলিত রাস্তায় সাফল্যলাভ না হইলে, অন্য রাস্তা খুঁজিয়া বাহির করা দরকার ছিল। ব্যয়বরাদ্দ ঠিক করিবার বেলায় সংসদ কোন ভুল করেন নাই। ব্যয়বরাদ্দ কমাইতে যাওয়াই সংসদের ভুল হইয়াছে।

(৩) ঘাটতি ব্যয় ১২০০ কোটি টাকা ধার্য করা জনস্বার্থের প্রতিকূল হইবে। সরকার এই অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ হিসাবে লইবেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট মুদ্রণ করিয়া সরকারকে দিবেন। সরকারের ক্রয় ক্ষমতা বাড়িবে বটে, কিন্তু এই বাড়তি ক্রয়ক্ষমতা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিবে। মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। অনেক সমালোচকের মতে ঘাটতি ব্যয় ৫৯০-৬০০ কোটি টাকার বেশী হওয়া সঙ্গত নয়। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিতে হইলে যাহাদের হাতে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা আছে তাহাদের উপর কর চাপাইয়া তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা কমান দরকার। সরকারী করনীতিকে এই হিসাবে ব্যর্থই বলিতে হয়। সরকারের কর আদায় করিবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইলে পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ করিবার সহজ পথ হইল ঘাটতি ব্যয়। সুতরাং ঘাটতি ব্যয় একেবারে বাতিল করা যায় না। ঘাটতি ব্যয়ের অঙ্ক লইয়া মতভেদের অবকাশ আছে। পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ ন্যূনতম প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিলে এবং ব্যয় নির্বাহের অন্য রাস্তা খোলা না থাকিলে ঘাটতি ব্যয় সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কারণ নাই। ঘাটতি ব্যয়ের কুফল হ্রাস করিবার দায়িত্ব সংসদের নয়—সে দায়িত্ব সরকারের।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া (Draft Third Five Year Plan): ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাস হইতে তৃতীয় পরিকল্পনা শুরু হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে। এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য—

(১) তৃতীয় পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনা হইতেও বৃহত্তর হইবে। ইহা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। সরকারী উদ্যোগে ৭,২৫০ কোটি টাকা ও বে-সরকারী উদ্যোগে

৪০০০ কোটি টাকা, সর্বসাকুল্যে ১১,২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। জাতীয় আয় ইহার ফলে বার্ষিক ৫% হারে বাড়িবে। অর্থাৎ মোট জাতীয় আয় ২৮% এবং মাথাপিছু আয় ১৪% বৃদ্ধি পাইবে স্থির হইয়াছে।

(২) শিল্পোন্নতির জন্য কাঁচামালের দরকার। বিদেশে রপ্তানী করিবার জন্যও কিছু কিছু কাঁচামাল দরকার। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। শিল্প ও রপ্তানীর প্রয়োজন মিটাইবার মত কাঁচামাল উৎপাদন করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দিয়া ভুল হইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে দেওয়া হইবে না।

(৩) শিল্পোন্নয়নে গতিবেগ সঞ্চারিত করিতে হইলে, লৌহ ও ইস্পাত, চালকশক্তি ও অন্যান্য মূল শিল্পের আরও প্রসার করিতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সেজন্য মূলধন দ্রব্য উৎপাদনের উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হইয়াছে।

(৪) দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭০ লক্ষ লোক বেকার থাকিয়া যাইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে আরও ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নূতন কর্মসংস্থান করিতে হইবে। কর্মসংস্থানের উপর সেজন্য আরও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ভারতে এই বেকার ও ছদ্ম বেকারের সংখ্যাও নগন্য নয়। এই অব্যবহৃত জনবল কাজে লাগাইবার বিশেষ ব্যবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনায় করা হইয়াছে।

(৫) দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনায় মূল্যস্তরের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এখনকার মত ব্যয়বরাদ্দ বিভিন্ন খাতে কি ভাবে হইবে নীচে দেওয়া হইল—

	সরকারী উদ্যোগে মোট ব্যয় কোটি টাকা	বেসরকারী উদ্যোগে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির কাজে ব্যয় কোটি টাকা
১। কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও ছোটখাট সেচব্যবস্থা	১,০২৫	৮০০
২। মাঝারী ও বড় সেচ	৬৫০	
৩। চালকশক্তি	৯২৫	৫০
৪। গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৫০	২৭৫
৫। শিল্প ও খনিজ	১,৫০০	১,০০০
৬। পরিবহন	১,৪৫০	২০০
৭। সমাজসেবা	১,২৫০	১,০৭৫
৮। বিবিধ	২০০	৬০০
	৭,২৫০	৪,০০০

সরকারী উদ্যোগে ৭,২৫০ কোটি টাকার মধ্যে ৬,২০০ কোটি টাকা স্থায়ী সৃষ্টির কাজে ব্যয় করা হইবে। সুতরাং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ১০,২০০ কোটি টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সমাজতান্ত্রিক কাঠামো গঠনের দিকে আরও অগ্রসর হইবার কথা হইয়াছে। অনুন্নত গোষ্ঠী ও অঞ্চলের উন্নয়নের উপর আরও বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Describe what you know about our First Five year Plan.**
   আমাদের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে যাহা জান বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৫৭ ১৫৯]

2. **Give an account of the financing of the First Five Year Plan.**
   প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থসংস্থান কিরূপে হইয়াছিল বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৫৯ ১৬০]

3. **Briefly describe the result of First Five Year Plan. Can you justify the high priority accorded to agricultural development ?**
   প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার কোন সার্থকতা ছিল কি ? [পৃষ্ঠা ১৬০-১৬১, ১৫৮]

4. **Describe the main features of our Second Five Year Plan. How does it differ from our First Five Year Plan.**
   আমাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় ? [পৃষ্ঠা ১৬১-১৬২, ১৬৪-১৬৫]

5. **Give an account of the financing of the Second Five Year Plan.**
   দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ সংস্থান কিরূপে হইয়াছে বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৬৪]

6. **Briefly describe the progress achieved under the two Plans.**
   দুইটি পরিকল্পনার আমলে আমাদের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [পৃষ্ঠা ১৬০-১৬২]

7. **Give a brief outline of nhe Third Five Year Plan.**
   তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [পৃষ্ঠা ১৬৭-১৬৯]

8. **What do you mean by economic planning ?**
   অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায় বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৫২-১৫৫]

চতুর্দশ অধ্যায়

সরকারী আয়-ব্যয়

(Government Finances)

সমষ্টিবাদের আওতায় সরকারের কার্যকলাপ বাড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের বহরও বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন আর দেশরক্ষা, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিচার ও শাসন পরিচালনা করিলেই চলিবে না। এখন বেকার ও বার্দ্ধক্য ভাতা দিতে হইবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনুন্নত দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কাজ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। সরকারের ব্যয়ের অংশও বাড়তির দিকে চলিয়াছে। আয়ের যোগাড় না হইলে এই ক্রমবর্ধমান ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে না। এই আয়ের উৎস কি, ব্যয়ের বেলায় কি নীতি অনুসরণ করা হয়, জাতীয় আয় ও তাহার বণ্টনের উপর ইহাদের প্রভাব কি—সরকারী আয়-ব্যয়ে এই সমস্ত আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা চারিভাগে ভাগ করা হয়—(১) সরকারী আয় (২) সরকারী ব্যয় (৩) সরকারী ঋণ এবং (৪) সরকারী আয়-ব্যয়ের প্রশাসন (financial administration)। প্রশাসনের ব্যাপার আমাদের আলোচনা করিতে হইবে না। উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ সম্বন্ধে আলোচনা পৃথকভাবে করা হইবে। সরকারী আয়, ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত সাধারণ সমস্যাগুলিকে অনুন্নত দেশের উন্নয়নের পটভূমিকায় আলোচনা করিতে হইবে। জাতীয় আয় আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি মোট আয় মোট ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। মোট ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এখন সরকারী ব্যয়। জনসাধারণের ব্যয়ের উপর সরকারী আয়নীতির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়। সরকার আয় ও ব্যয় নীতির মাধ্যমে আয় বণ্টনেরও পরিবর্তন করিতে পারে। জাতীয় আয় ও উহার বণ্টন দুই দিক হইতেই সরকারী আয়-ব্যয়ের গুরুত্ব অসাধারণ।

সরকারী আয়-ব্যয়ের গুরুত্ব বাড়িতেছে

সরকারী আয় বা রাজস্বের উৎস (Sources of Public Income or Revenue): জরিমানা, দান, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি বাবদ সরকারের কিছু রাজস্ব আগম হয়। এই রাজস্বের কোনও স্থিরতা নাই। দান—কে, কত, কবে করিবে—তাহার কোন নিয়ম নাই।

অ-নিয়মিত রাজস্ব

উৎপাদনের উপাদানগুলি অপ্রচুর। এই উপাদানগুলির মালিকানা হইতেই ব্যক্তির আয় হয়। শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে মজুরী পায়। মূলধনের জন্য সুদ ও জমির খাজনা পাওয়া যায়। সংগঠক পায় লাভ। ব্যক্তি বিশেষের মত সরকারও উপাদানের মালিক হইতে পারে। সরকারী মালিকানায় খাসজমি, বনজঙ্গল ও খালবিল থাকিতে পারে খাসমহল বনবিভাগ ও সেচবিভাগ হইতে ভারতে রাজ্য-সরকারের আয় হয়। সরকার নানাবিধ ব্যবসার মালিকও বটে। এই সব ব্যবসায়ে উৎপন্ন দ্রব্যাদি হিসাব করিয়াও সরকারের রাজস্ব আগম হয়। ভারতে রেলপরিবহন সরকারী মালিকানায় পরিচালিত। এই ব্যবসায় হইতে সরকারের প্রভূত রাজস্ব আগম হয়। সরকারী মালিকানায় কয়লাখনি এবং লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাও আছে কয়লা ও ইস্পাত বিক্রয় করিয়া সরকারের আয় হয়। জমি বা বাড়ী হস্তান্তরের সময় সরকারী শীলমোহর আমাদের কাজে লাগে কেহ অন্যায় করিলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য আমরা সরকারী আদালতের সাহায্য লইতে পারি। এই সব সুযোগ সুবিধার প্রতিদানে সরকার ফী (fee) আদায় করে। সরকারী উদ্যোগে কোন অঞ্চলে নূতন রাস্তা বা উদ্যান তৈয়ারী হইল। ফলে সেই অঞ্চলের কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা হয় যার ফলে সেই অঞ্চলে জমির দাম বা বাড়ী ভাড়া বাড়ে। ইহার জন্য সরকার বিশেষ দাম (special assessment) ধার্য করে। এইভাবেই সরকারের আয় হয়।

(১)
সরকারী মালিকানার দরুণ রাজস্ব

উপরি-উক্ত বিভিন্ন উপায়ে সরকারের রাজস্ব আমদানী হয়। কিন্তু ব্যয়ের তুলনায় এই রাজস্ব পর্যাপ্ত নয়। সরকারী রাজস্বের প্রধান উৎস হইল কর (tax)। ঋণ করিয়াও ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে। ঋণের সমস্যার প্রকৃতি অন্যরূপ। সেজন্য ঋণের আলোচনা আলাদা করিয়া করা হয়।

(২)
কর

করের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য (Definition and Characteristics of Tax): রাজস্ব আদায় মানে লেনদেন বা বিনিময়। সরকার নানাবিধ সেবা বিক্রয় করে। নাগরিক সেগুলি ক্রয় করে, অনেক সেবা খুচরা বিক্রয় করা চলে। ক্রেতা ইচ্ছামত কিনিতে পারে। যাহার ইচ্ছা নাই সে নাও কিনিতে পারে। যখন খুশী কেনা সম্ভব। পছন্দ মাফিক কম বা বেশী কেনা যায়। সরকার ও প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে আলাদা আলাদা ব্যক্তিগত বিনিময় হয়। সরকার একটি বিশিষ্ট সেবা একজন বিশেষ নাগরিককে বিক্রয় করে। নাগরিক সেবার পরিমাণ অনুযায়ী দাম দেয়। এই ধরণের খুচরা বিক্রয়যোগ্য সেবা বিক্রয় করিয়া যে রাজস্ব হয় তাহাকে ফী বা

দাম বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে ডাকবিভাগের ও রেলপরিবহনের উল্লেখ করা যায়। আমি যদি চিঠিপত্র না লিখি তবে খামপোষ্টকার্ডের জন্য আমাকে খরচ করিতে হইবে না। যদি চিঠি লিখিতে চাই, আমার ইচ্ছামত আজ কাল যেদিন খুসী সেইদিন লিখিতে থারি। আমি একটি চিঠিও লিখিতে পারি। আবার দশটি চিঠিও ইচ্ছা করিলে পাঠাইতে পারি। পোষ্টকার্ডের দাম কম, যে খামে চিঠি পাঠাইতে চায় তাহাকে দাম দিতে হইবে বেশী। যার তাড়াতাড়ি খবর দিবার দরকার, সে তার প্রেরণ করিতে পারে। সেজন্য তাহাকে মাশুলও দিতে হইবে বেশী। এই ধরণের সেবার বিশেষত্ব হইল, যে ধরণের বা যে পরিমাণ সেবা কেনা হইবে, দাম সেই হিসাবে দিতে হইবে। যে একেবারে কিনিতে চায় না, তাহাকে কোন দাম দিতে হইবে না। কেনার ব্যাপারে অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে কোনও বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু অনেক সেবা আছে যেগুলি ভাগ করা সম্ভব নয় বা ভাগ করিয়া বিক্রয় করিতে গেলে অসুবিধা দেখা দেয়, যেমন দেশরক্ষা বা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা। চৌকিদার ও পুলিশ থাকায় সকলেরই সুবিধা হয়। কিন্তু কাহার কতখানি সুবিধা হয় তাহা হিসাব করা যায় না। আরও বিপদ এই যে শান্তি রক্ষার যত সুব্যবস্থা হইবে এবং যত কম শান্তিভঙ্গ হইবে, এই কাজের জন্য দাম দিবার ইচ্ছা নাগরিকের তত কম হইবে। নাগরিকের ইচ্ছার উপর নিভর করিলে এই ধরণের সেবার ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। পথঘাট সংখ্যায় কম হইলে কে কতবার ব্যবহার করিল তাহা হিসাব রাখা যায়। সেই হিসাব অনুসারে পথব্যবহারের দাম আদায় করা চলে। কিন্তু রাজপথের সংখ্যা যখন অনেক, এইভাবে ব্যয় নির্বাহ করিতে গেলে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী হইয়া যাইবে। এই ধরণের সেবায় ব্যয়নির্বাহ করার জন্য নাগরিকের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে হয়। এই বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত অর্থের নামই **কর**। করের বৈশিষ্ট্য দুইটি—(১) ইহা বাধ্যতামূলকভাবে দেয়। আইন-অনুসারে যাহার উপর কর ধার্য হইবে তাহার কর না দিয়া উপায় নাই। (২) করের বিনিময়ে নাগরিক কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিদান দাবী করিতে পারে না। বন্দুক বা রেডিও থাকিলে তাহার জন্য লাইসেন্স বাবদ কর দিতে হয়। সরকার বন্দুক বা রেডিও সম্বন্ধে কোন সেবামূলক কার্য করে না। আমি করের প্রতিদানে কোন নির্দিষ্ট সুবিধা, যেমন বিনামূল্যে 'বেতার জগৎ' দাবী করিতে পারি না।

সরকারের সাধারণ ব্যয়নির্বাহের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে, নির্দিষ্ট প্রতিদান ব্যতিরেকে দেয় অর্থকে কর বলা হয়।

করসংগ্রহের নীতি (Canons of Taxation) : রাজস্বের জন্য কর ধার্য না করিয়া উপায় নাই। তাই বলিয়া খেয়াল খুশীমত কর বসাইলে চলিবে না। কর সংগ্রহের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হইলে, মোট উৎপাদন ও উৎপাদনের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা আছে। কর এরূপভাবে ধার্য করিতে হইবে যাহাতে উৎপাদন ও দক্ষতার লোকসান না হয়। সেজন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া কর সংগ্রহ করিতে হয়। অ্যাডাম স্মিথ এইরূপ চারিটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) **সমতা** (Equality) : রাষ্ট্র সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। ধনী ও দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই রাষ্ট্রের নিকট ঋণী। সুতরাং সরকারের ব্যয়নির্বাহ ধনীদরিদ্র সকলেরই সমান দায়িত্ব। সকলেরই কর দেওয়া কর্তব্য। প্রত্যেককে সমান পরিমাণে কর দিতে হইবে এমন কথা নাই। যার যে রকম সামর্থ্য সে সেই পরিমাণে কর দিবে। কর দিতে গেলে ত্যাগ (sacrifice) স্বীকার করিতে হয়। কর এরূপ-ভাবে ধার্য হওয়া দরকার যাহাতে প্রত্যেকে সমান ত্যাগ স্বীকার করে। সমতা মানে ত্যাগের সমতা। প্রত্যেকে সামর্থ্য (ability or faculty) অনুযায়ী কর দিলে তবেই ত্যাগের সমতা হয়। ত্যাগের সমতা হইলে তবেই ন্যায় বিচার (equity) হয়। কর বাধ্যতামূলকভাবে দেয়। কর সংগ্রহের নীতি ন্যায়সঙ্গত (equitable) না হইলে করদাতা স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হইবে। সমতার নীতিকে ন্যায়বিচারের নীতি বলাই সঙ্গত।

(২) **নিশ্চয়তা** (Certainty) : করের সময় ও পরিমাণ অর্থাৎ কখন কত কর দিতে হইবে তাহা করদাতার সময় থাকিতেই জানা দরকার। ইহা জানিবার জন্য যেন তাহাকে বেগ পাইতে না হয়। এই সব বিষয় আগে হইতে জানা থাকিলে করদাতা সময় থাকিতে প্রস্তুত হইতে পারে। হঠাৎ কর দিতে হইলে, ব্যয় বরাদ্দ ধীরে ধীরে বদলাইবার অবকাশ থাকে না। অনেক সময় বাধ্য হইয়া ঋণ করিতে হয়। করদাতার নিরর্থক ক্লেশ হয়। সরকারের দিক হইতেও নিশ্চয়তার নীতির প্রয়োগ আছে। সরকারের তরফ হইতেও কর রাজস্ব কখন এবং কি পরিমাণে আমদানী হইবে জানা থাকিলে সুবিধা হয়।

(৩) **সুবিধা** (Convenience) : করদাতা কর দিবার ফলে ত্যাগ স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। কর দিতে যাইয়া যদি আরও অন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তবে তাহা বোঝার উপর শাকের আঁটি হইয়া দাঁড়াইবে। কর দিবার আনুষঙ্গিক অসুবিধা যত বেশী হইবে, কর আদায়ের খরচ তত বাড়িবে—করের উৎপাদনশীলতা তত কমিবে। অর্থাৎ সুবিধার নীতি মিতব্যয়িতা বা উৎপাদনশীলতার নীতির একটি বিশেষ প্রয়োগমাত্র। কর এরূপভাবে ধার্য করা উচিত যাহাতে করদাতার অসুবিধা

সবচেয়ে কম হয়। কৃষকের পক্ষে একযোগে বার্ষিক ভূমিরাজস্ব দেওয়া অসুবিধাজনক। সেজন্য ভূমিরাজস্ব কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করা হয়। চাকুরীজীবিদের পক্ষে যখন যখন বেতন পাওয়া যায়, তখন তখন কর দেওয়া সুবিধাজনক। সেজন্য চাকুরী-আয়কর মাসিক বেতন হইতে মাসে মাসে কাটিয়া লইবার বন্দোবস্ত করা হয়।

(৪) **মিতব্যয়িতা** (Economy): কর সংগ্রহের জন্য সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। করের সংগ্রহব্যয় যত বেশী হইবে, সেই কর হইতে নীট রাজস্ব আমদানী তত কম হইবে। অন্যান্য নীতিতে না আটকাইলে, যে কর যত কম ব্যয়বহুল, সেই কর ধার্য করিবার পক্ষে যুক্তি তত বেশী প্রবল। করদাতার দিক হইতেও এই নীতির প্রয়োগ আছে। কর আদায় করিতে যেমন সরকারের ব্যয় হয়, করদাতাকেও তেমনি কর দিবার জন্য কর বাদেও ব্যয় করিতে হয়, যেমন বিক্রয়কর দিবার জন্য দোকানদারকে হিসাব তৈয়ারী করিতে হয়। করদাতাকে ১০০৲ কর দিতে যাইয়া যদি আরও ১০০৲ পকেট হইতে খরচ করিতে হয়, তবে সে রকম কর বসাইবার সার্থকতা কম। সরকার ও করদাতা দুই তরফেই ব্যয়সঙ্কোচ হওয়া দরকার। বর্তমানে অনেক অর্থশাস্ত্রবিদ এ্যাডাম স্মিথের এই চারিটি নীতির সহিত আরও তিনটি নীতি যোগ করেন।

(৫) **উৎপাদনশীলতা** (Productivity): কোন কর ধার্য করিবার আগে দেখা দরকার সেই কর হইতে কি পরিমাণ রাজস্ব আমদানী হইতে পারে। সামান্যই রাজস্ব পাওয়া যাইতে পারে, এই রকম কর ধার্য করা ঠিক নয়। সরকারের ব্যয়-সঙ্কুলান করিতে হইলে এ রকম অনেকগুলি কর ধার্য করিতে হইবে। তাহার ফলে সংগ্রহ খরচ বাড়িবে এবং মিতব্যয়িতার নীতি লঙ্ঘিত হইবে। করের সংখ্যা বাড়িলে করব্যবস্থা জটিল হইবে এবং সরলতার (৭নং) নীতি ভঙ্গ হইবে। কর ধার্যের পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকিলে উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে—ইহা আমরা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। উৎপাদন কমিয়া গেলে করের হার অপরিবর্তিত থাকিলেও রাজস্ব আমদানী কম হইবে। কর বসাইবার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। সুতরাং ছোট ছোট অনেকগুলি করের পরিবর্তে উৎপাদনশীল একটি কর বসানই শ্রেয়। দ্বিতীয়তঃ এরূপ কর ধার্য করা দরকার, যাহার ফলে উৎপাদনের কোন ক্ষতি না হয়।

(৬) **সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতা** (Elasticity): পরিবর্তন আর্থিক জীবনের নিয়ম। কর ধার্যের সময় সরকারের যে পরিমাণ রাজস্ব প্রয়োজন হইবে মনে করা হইয়াছিল, পরে রাজস্বের প্রয়োজন বেশী বা কম হইতে পারে। করের হার বাড়াইয়া কমাইয়া কর রাজস্ব বাড়ান কমান যায়। এই রকম করই বাঞ্ছনীয়। আয়করের সঙ্কোচ ও প্রসার ক্ষমতা আছে। আয়করের হার বাড়াইলেই অধিক রাজস্ব আদায় হইবে। আবার হার কমাইলেই রাজস্বের পরিমাণও কমিয়া আসিবে।

(৭) **সরলতা** (Simplicity) : কর নির্ণয়প্রণালী সহজবোধ্য হইতে হইবে। সাধারণ করদাতা সহজবুদ্ধিতে যদি বুঝিতে না পারে তবে নিশ্চয়তার নীতি লঙ্ঘিত হইবে। বুঝিবার জন্য যদি বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হইতে হয়, তবে মিতব্যয়িতার নীতিও পালিত হইবে না।

এই নীতিগুলি প্রত্যেক করের বেলায় পৃথক পৃথকভাবে কিংবা সামগ্রিকভাবে কর ব্যবস্থার (System of taxes) সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যায়। এই নীতিগুলিকে কর বা কর ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসাবেও বর্ণনা করা যায়।

সমানুপাতিক ও ক্রমবর্ধমান হারে কর (Proportional and Progressive Taxation) : ডাক টিকিটের দাম অন্যায্য মনে হইলে ডাকটিকিট না কিনিবার স্বাধীনতা আমার আছে। ধার্য কর না দিয়া উপায় নাই। সেজন্য কর সংগ্রহের ব্যাপারে ন্যায়নীতির আলোচনা করিতেই হয়। এ্যাডাম স্মিথের মতে সমতার নীতি মানিয়া চলিলে সুবিচার হইবে। সমতা মানে ত্যাগের সমতা। সামর্থ্য অনুযায়ী কর ধার্য হইলে ত্যাগের সমতা—হইবে—ন্যায়নীতি পালিত হইবে। এ পর্যন্ত সকল মুনিরই একমত।

এই নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে সামর্থ্যের মাপকাঠি কি জানা দরকার। আজকাল ব্যক্তির আয়কে ব্যক্তির কর দিবার সামর্থ্যের মাপকাঠি ধরা হয়। আয় সমান হইলেও কিন্তু কর দিবার ক্ষমতার তারতম্য হইতে পারে। একজন চাকরি করিয়া মাসিক ৫০০৲ বেতন পায়। অপর একজন ব্যাঙ্কের সুদ হইতে মাসিক ৫০০৲ পায়। প্রথম ব্যক্তিকে আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশী অংশ সঞ্চয় করিতে হয়। প্রথম ব্যক্তি হঠাৎ অকর্মণ্য হইলে আয় বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির সে আশঙ্কা নাই। সুতরাং সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন তাহার কম হইবে। এক্ষেত্রে আয় সমান হইলেও প্রথম ব্যক্তির কর দিবার ক্ষমতা দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে কম। আবার এমনও হইতে পারে একজনের পোষ্য অনেকগুলি, অন্যজনের পোষ্য মোটে নাই বা সংখ্যায় কম। দুইজনের আয় যদি সমানও হয় এবং দুইজনের আয়ই যদি অর্জিত (earned) হয় তবুও প্রথম ব্যক্তির সামর্থ্য দ্বিতীয় ব্যক্তির চেয়ে কম। বাস্তবে প্রয়োগ করার সময় এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে সাবধান হইলে আয় দিয়া সামর্থ্য যাচাই করিতে আপত্তি নাই। এ পর্যন্তও অর্থশাস্ত্রবিদদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ নাই।

এখনও প্রশ্ন থাকিয়া গেল, আয় বাড়িলে কর দিবার সামর্থ্য সেই হারে বাড়িবে না তাহার চেয়ে বেশী হারে বাড়িবে। এ্যাডাম স্মিথের মতে আয় যে হারে বাড়িবে সামর্থ্যও সেই হারে বাড়িবে। অর্থাৎ সমানুপাতিক হারে কর ধার্য হওয়া উচিত।

যাহার ১০০৲ আয় সে যদি ১০৲ কর দেয়, তবে যাহার আয় ৫০০৲ আয় তাহার উপর ৫০৲ কর ধার্য করিলে ন্যায়নীতি পালিত হইবে।

সমতার অর্থ ত্যাগের সমতা হইলে সমানুপাতিক করকে ন্যায্য বলা কঠিন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতেই সামান্য আয় ফুরাইয়া যায়। আয় বাড়িলে ক্রমশঃ কম জরুরী অভাব মিটাইবার জন্য ব্যয় করা সম্ভব হয়। অন্যান্য জিনিষের মত টাকার পরিমাণ বাড়িলে টাকার গুরুত্ব কমে। যাহার ১০০৲ আয় তাহার নিকট হইতে কর বাবদ ১৲ আদায় করিলে তাহাকে কোন জরুরী অভাব মিটাইবার আশা ছাড়িতে হইবে। যাহার ৫০০৲ আয় তাহার নিকট হইতে ১৲ কর আদায় করিলে তাহাকেও ১৲ পরিমাণ ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে। এই ১৲র সংস্থান করিবার জন্য তাহাকে কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য ব্যয় কমাইতে হইবে না। ১০০৲ আয় বিশিষ্ট লোকের তুলনায় সে বিলাসদ্রব্য বেশী ব্যবহার করে। এই সমস্ত কম জরুরী খরচ কমাইয়া সে ১৲ যোগাড় করিবে। ১০০৲ আয় হইতে কর বাদ ১৲ দিতে যতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ৫০০৲ আয় হইতে ১৲ দিবার জন্য তাহার চেয়ে অনেক কম ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। সমানুপাতিক ত্যাগ (proportional real sacrifice) করাইতে হইলে আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে করের হার বাড়াইতে হইবে। যাহার ১০০৲ আয় সে যদি ১০৲ অর্থাৎ ১০% কর দেয়, তাহা হইলে যাহার ৫০০৲ আয় তাহাকে ৫০৲র বেশী অর্থাৎ ১০% এর বেশী কর দিতে হইবে। এই ধরণের করকে গতিশীল (Progressive) কর বলা হয়।

সমানুপাতিক করের মস্ত গুণ ইহার সরলতা। কিন্তু কর সংগ্রহের ব্যাপারে ন্যায্যতার দাবী উপেক্ষা করা যায় না। কর রাজস্ব যদি দরিদ্রের কল্যাণসাধনে ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে গতিশীল করের সাহায্যে আর্থিক বৈষম্য কমান যায়। আর্থিক বৈষম্য কিছুটা না থাকিলে উৎপাদনে উৎসাহ কমিতে পারে। তাই বলিয়া প্রকট আর্থিক অসাম্য প্রায় কেহই প্রকাশ্যে সমর্থন করে না। গতিশীল করের পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি—ইহা আমাদের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে খাপ খায়। গতিশীল কর মানিয়া লইলেও করের হার কি গতিতে বাড়িবে (rate of progression) সে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কতখানি আর্থিক বৈষম্য আমরা মানিয়া লইতে রাজী আছি তাহার উপরই করের হারবৃদ্ধির গতি নির্ভর করে।

করের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Taxes): কর সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—(১) প্রত্যক্ষ কর ও (২) পরোক্ষ কর। সরকার ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বিক্রয়কর আদায় করে। জিনিষের দাম না বাড়াইতে পারিলে ব্যবসায়ীর লোকসান হইবে। ব্যবসায়ী যদি জিনিষের দাম করের সমান বাড়াইতে

সক্ষম হয়, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত ক্রেতাদের ঘাড়েই করভার চাপিল। ব্যবসায়ীর উপর আপাততঃ করভার চাপিলেও শেষে করভার ক্রেতার উপর সরিয়া আসিল। করের আপাতভার (Impact) ও শেষভার (Incidence) যদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর পড়ে, তবে সেইরকম করকে পরোক্ষ কর (Indirect tax) বলা হয়। বিক্রয়কর, প্রমোদকর, আবগারী শুল্ক ইত্যাদি এই পর্যায়ে পড়ে। কোন ব্যক্তির উপর আয়কর ধার্য হইলে সে অন্য কাহারো ঘাড়ে উহা চাপাইতে পারে না। নিজেকেই করভার বহন করিতে হয়। আপাতভার ও শেষভার একই ব্যক্তি বহন করিলে তাহাকে প্রত্যক্ষ কর (Direct tax) বলা হয়। দামের পরিবর্তন হইয়া করভার স্থানান্তর হয়। দামেব পরিবর্তন হইবে কিনা, হইলে কতটা হইবে তাহা আগে হইতে বলা কঠিন। শেষভার কে বহন করিবে নির্ণয় করা মুস্কিল। অবস্থা-ভেদে শেষভার বিভিন্ন ব্যক্তি বহন করিতে পারে। অর্থাৎ এক অবস্থায় যাহা প্রত্যক্ষ কর, অন্য অবস্থায় তাহাকেই পরোক্ষ কর বলিয়া অভিহিত করিতে হইতে পারে। কর সরানর ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ সন্তোষজনক না হইলেও অনেকদিন হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে এই পার্থক্য চলিয়া আসিতেছে।

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা : এই কর সংগ্রহ করিবার ব্যয় কম। করদাতা স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ কর প্রদান করে। বাড়তি খরচ করিবার প্রয়োজন কম। কর যে পরিমাণ ধার্য হয়, সরকারী কোষাগারে নীট আদায় তাহা হইতে খুব কম হয় না।

(১) ব্যয়সংক্ষেপ

প্রত্যক্ষ করের নিশ্চয়তা আছে। কর কত দিতে হইবে করদাতা সুনির্দিষ্টরূপে জানে। সেই হিসাবে সে ব্যবস্থা আগে হইতেই করিতে পারে। সরকারও রাজস্ব আমদানী কি পরিমাণ হইবে তাহা হিসাব করিতে পারে। ইহাতে বাজেট তৈয়ার করিবার সুবিধা হয়।

(২) নিশ্চয়তা

দরকারমত করের হার বাড়াইয়া প্রত্যক্ষ কর হইতে আয় বৃদ্ধি করা যায়। আবার হার কমাইয়া আয় কমানও যায়। আয়করের মত আর কোন করের হার এতবার বদলান হয় নাই। প্রত্যক্ষ কর হইতে সরকারের যথেষ্ট রাজস্ব আমদানী হয়।

(৩) সংকোচ-প্রসার-ক্ষমতা-উৎপাদনশীল

প্রত্যক্ষ করের শেষভার কাহার উপর চাপিবে তাহা নির্ণয় করা অনেক সহজ। সাধারণ সংজ্ঞা অনুসারে যাহার উপর আপাতভার তাহাকেই শেষভারও বহন করিতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধারণা মিথ্যা হয় না। প্রত্যক্ষ কর সেইজন্য সহজেই গতিশীল করা যায়। পোষ্যসংখ্যা বেশী হইলে কর লাঘবের ব্যবস্থা সহজেই করা যায়। যাহাদের আয়ের

(৪) সমতা

উৎস শ্রম, তাহাদিগকে নিম্নহারে কর প্রদানের সুযোগ দেওয়া যায়। আবার আয় নিতান্ত কম হইলে তাহাকে কর প্রদানের দায় হইতে রেহাই দেওয়া যায়। প্রত্যক্ষ করের বেলায় সমতার নীতি পালন করা অনেক সহজ।

সরকারের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব সকল নাগরিকের। কর প্রদান করা তাঁহার কর্তব্য। নাগরিক যখন প্রত্যক্ষ কর প্রদান করে তখন সে সজ্ঞানে নিজ কর্তব্য পালন করে। নিজের অধিকার সম্বন্ধেও সে সজাগ হইয়া উঠে। সরকার কররাজস্ব কিভাবে ব্যয় করিতেছে সে ব্যাপারে নাগরিক অবহিত হয়, অপব্যয়ের সম্ভাবনাও কমে।

(৫) নাগরিক সচেতনতার প্রসার

অসুবিধা—সম্মুখ দিয়া সুঁচ গলিলেও লোকের আপত্তি হয়—পিছন দিয়া হাতী গেলেও বুঝা যায় না। প্রত্যক্ষ কর কম হইলেও করদাতা অনুভব করে তাহার পকেট হাল্কা হইল। প্রত্যক্ষ কর সেজন্য জনপ্রিয় হয় না। সরাসরি দিতে হয় বলিয়া করদাতা অসন্তুষ্ট হয়। প্রতি একক দ্রব্য কিনিবার সময় দামের সঙ্গে বিক্রয়কর দিতে হয়। একযোগে কর প্রদান করিতে হয় না। প্রত্যক্ষ কর কিস্তীবন্দী আদায় করা যায়। কিন্তু কিস্তির সংখ্যা বেশী বাড়ান যায় না। প্রত্যক্ষ কর দিতে করদাতার সেজন্য অসুবিধা হয় বেশী। করদাতার অসন্তোষের ইহাও আর একটি কারণ। করের হিসাব করিবার জন্য করদাতাকে কাগজপত্র ঠিক করিতে হয়। এই কাগজপত্র তদন্ত করিয়া দেখিবার জন্য সরকারকেও কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। কর ধার্য করাও কম ফ্যাসাদ নয়। তারপর কাছে আপীল ও আপীলের শুনানী। এই কারণেও প্রত্যক্ষ কর সব সময় ভাল চোখে দেখা হয় না।

(১) অসুবিধাজনক সুতরাং অপ্রিয়

'প্রত্যক্ষ করকে সততার উপর কর' বলা হয়। ভুয়া হিসাব-কেতাব তৈয়ার করিয়া করভার লাঘব করা যায়। অনেক সময় সম্পূর্ণ ফাঁকি দেওয়া যায়। লোক প্রত্যক্ষ কর আদৌ পছন্দ করে না। সুযোগ পাইলেই ফাঁকি দিতে ছাড়ে না।

(২) ফাকি দেওয়া সহজ

প্রত্যক্ষ কর কেবলমাত্র ধনিকশ্রেণী ও উচ্চ চাকুরীয়াদের উপর ধার্য হয়। সাধারণ লোকের উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করিলে আদায় করার ঝামেলাই বাড়িবে। আদায় বিশেষ বাড়িবে না। সেজন্য যাহাদের আয় কম তাহাদের উপর এই কর ধার্য হয় না। ফলে তাহাদের নাগরিক চেতনার উদয় হয় না।

(৩) সকলে প্রত্যক্ষ কর দেয় না

করের হার যাহাই হোক না, কোন না কোন শ্রেণী ন্যায়বিচার পাইবে না।

(৪) অসাম্য — সরকারী কর্মচারীরা অনেক সময় খুসীমত কর ধার্য করে। এক শ্রেণীর উপর করভার বেশী আর অন্য শ্রেণীর উপর করভার কম ধার্য হইতে পারে।

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধার চেয়ে সুবিধা অনেক বেশী। ইহার প্রয়োগবিধি ও পরিচালনা ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে। নীতির দিক হইতে প্রত্যক্ষ করের বিরূপ সমালোচনা করা চলে না।

পরোক্ষ করের সুবিধা ঃ সাধারণতঃ জিনিষপত্রের দামের সঙ্গে পরোক্ষ কর দিতে হয়। দামের মধ্যে কর ধরা আছে একথা মনেই থাকে না। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় না। নিজের সুবিধা বুঝিয়া করদাতা জিনিষ কেনে। প্রায় জিনিষই একেবারে অনেকখানি দরকার হয় না। যখন যেমন দরকার জিনিষ কেনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সামান্য পরিমাণে করও দেওয়া হইয়া যায়। আবার অর্থাভাব থাকিলে তখনকার মত জিনিষ কেনা হইবে না। কর প্রদানও তখনকার মত স্থগিত থাকিবে। টাকা নাই এই অজুহাতে প্রত্যক্ষ কর স্থগিত রাখা যায় না। প্রত্যক্ষ কর কিস্তিবন্দী আদায় করা যায়। পরোক্ষ কর যেমন তিলে তিলে আদায় হয়, প্রত্যক্ষ কর সেভাবে আদায় করা যায় না। কিস্তার সংখ্যাও খুব বেশী বাড়ান যায় না। করদাতার পক্ষে পরোক্ষ কর দেওয়া অনেক বেশী সুবিধাজনক। সরকারের দিক হইতেও পরোক্ষ করের সুবিধা আছে। বিক্রেতা বা দোকানদার যখন যেরকম বিক্রয় করিতেছে, সেই হিসাবে কর আদায় করিতেছে। সরকার কিন্তু বিক্রেতার নিকট হইতে একযোগে বিক্রয়-কর আদায় করিয়া লয়। সরকারকে বিক্রয়-কর আদায় করিতে সামান্যই ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয়। ঝক্কি বিক্রেতার। ধরিতে গেলে বিক্রেতা সরকারের অবৈতনিক কর্মচারী হিসাবে কাজ করে।

(১) করদাতা ও সরকার উভয়ের সুবিধা

(২) ফাঁকি দেওয়া যায় না — পরোক্ষ কর ফাঁকি দেওয়া যায় না। মিথ্যা হিসাব-পত্র দাখিল করিয়া, আয় করা সত্ত্বেও আয়-কর হইতে রেহাই পাওয়া যায়। জিনিষ কিনিলে, বিক্রয় কর তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

(৩) সকলকে দিতে হয় — পরোক্ষ-কর সকলের নিকট হইতে আদায় করা যায়। ধনী, দরিদ্র—যেই জিনিষ কিনুক—কর দিতে হইবে। সকলকেই সরকারের ব্যয় নির্বাহের অংশীদার করা যায়।

দামের সামান্য পরিবর্তনন হইলে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা বিশেষ কমে না। এই ধরণের সামগ্রীর উপর করের হার সামান্য বাড়াইলেও চাহিদা বিশেষ কমিবে না। ফলে কররাজস্ব বাড়িবে। সেইজন্য বহুজন ব্যবহার্য নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলির উপর পরোক্ষ-কর বসাইয়া প্রভূত রাজস্ব আদায় করা যায়। প্রত্যক্ষ কর উৎপাদনশীল। কিন্তু তামাক, চিনি, কেরোসিন প্রভৃতি দ্রব্যের উপর ধার্য পরোক্ষ-করও কম উৎপাদনশীল নয়। ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের অন্যতম প্রধান উৎস এই ধরণের আবগারী শুল্ক। রাজ্য সরকারও বিক্রয়-কর হইতে প্রচুর রাজস্ব পাইয়া থাকে। বিলাসদ্রব্যের দামের সামান্য পরিবর্তন হইলে চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। এই ধরণের সামগ্রীর উপর ধার্য করের হার সামান্য কমাইলে দাম সামান্য কমিবে। ফলে চাহিদা যদি ব্যাপক বাড়ে, তাহা হইলে করের হার কমান সত্ত্বেও কররাজস্বের পরিমাণ বাড়িবে।

(৪) (খ) সঙ্কোচ-প্রসারক্ষম— সুতরাং উৎপাদনশীল

মদ, গাঁজা, আফিং প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষে অনিষ্টকর। ইহাদের উপর পরোক্ষ-কর ধার্য করিলে ইহাদের দাম চড়িবে। অনেকে কেনার পরিমাণ কমাইবে। ইহাতে সমাজের মঙ্গল হইবে। করদাতার দক্ষতাও বাড়িবে। যদি কেনার পরিমাণ বিশেষ না কমে, তাহা হইলে অন্ততঃ সরকারের যথেষ্ট রাজস্ব আমদানী হইবে। তাহাও মন্দের ভাল বলিতে হয়।

(৫) অনিষ্টকর দ্রব্যের ব্যবহার কমান যায়

অসুবিধা—দাম পরিবর্তিত হইলে, চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। চাহিদার পরিবর্তন কতটা ব্যাপক হইবে তাহার উপর নির্ভর করে কররাজস্ব বাড়িবে কি কমিবে, কতটা বাড়িবে বা কতটা কমিবে। অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাদ দিলে, অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার এই পরিবর্তন সম্পর্কে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। কররাজস্বের পরিমাণ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। বিশেষ কোন ব্যক্তি কতটা কর দিবে, তাহাও বলা যায় না। কারণ কে কতটা কিনিবে তাহা আগে হইতে বলা যায় না। কর কতদূর স্থানান্তর করা যাইবে তাহাও জানা মুস্কিল। কার ঘাড়ে কতটা করভার চাপিল তাহা বলা যায় না।

(১) অনিশ্চয়তা

করদাতার বা অন্য ব্যক্তির যতটা খরচ হয়, সে তুলনায় সরকারের রাজস্ব আগম হয় কম। বিক্রয়কর টাকায় ৩৫ নয়া হইলে জিনিষের দাম বাড়িবে ৪ নয়া পয়সা। আবার চামড়ার উপর ৫ ন. প. কর ধার্য হইলে জুতার দাম ৫ নয়া পয়সার চেয়ে বেশী বাড়িতে পারে। ক্রেতা যাহা দিল

সরকারের কোষাগারে তাহা জমা পড়িল না। অনেক সময় বিক্রয় কর আদায় করিবার জন্য অনেক বেতন দিয়াই কর্মচারী নিয়োগ করিতে হয়। আয়করের বেলাতেও অবশ্য এই অসুবিধা দেখা দেয়।

(২)
মিতব্যয় হয় না

পরোক্ষ কর বসাইলে ন্যায় বিচার করা যায় না। যাহার ১০০৲ আয় সে টাকায় যত ন. প. কর দেয়, যাহার ১০০০৲ আয় সেও টাকায় তত ন. প. কর দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সকলেই কেনে এবং দাম বাড়িলেও ইহাদের চাহিদা বিশেষ কমে না। কর-রাজস্ব বাড়াইতে হইলে এই ধরণের জিনিষের উপর কর ধার্য করিতে হয়। গরীব লোকের আয়ের বেশীরভাগ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পিছনে খরচ হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর ধনী ব্যক্তির মোট খরচ বেশী হইতে পারে। কিন্তু আয়ের অনুপাতে ধনী ব্যক্তি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য গরীবের চেয়ে কম খরচ করে। কর গতিশীল হওয়া দূরে থাক, সমানুপাতিকও হয় না। একজনের আয় ১০০৲—অপর জনের আয় ১০০০৲। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য খরচ যথাক্রমে ৮০৲ ও ২০০৲। টাকায় ৫ ন. প. কর ধার্য হইল। জিনিষের দাম ৫ ন. প. বাড়িল। চাহিদার কোন পরিবর্তন হইল না। প্রথম ব্যক্তি কর দিবে ৪৲ বা ৪%। দ্বিতীয় ব্যক্তি কর দিবে ১০৲ বা ১%। আয় বাড়ার ফলে করের হার না বাড়িয়া বরং কমিয়াছে। ইহা ন্যায়নীতির প্রহসন মাত্র। বিলাসদ্রব্যের উপর উচ্চ হারে কর ধার্য করিয়া পরোক্ষ করকে গতিশীল করিবার চেষ্টা বৃথা। কেবলমাত্র বিলাসদ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে রাজস্ব আদায় কম হইবে। বিলাস-দ্রব্যের দাম বাড়ার ফলে যদি চাহিদা অত্যন্ত কমিয়া যায়, তবে ধনী ব্যক্তির উপর করভার বৃদ্ধি করা যাইবে না। একটিমাত্র বিলাসদ্রব্যের উপর কর ধার্য করিলে অন্য বিলাসদ্রব্য কিনিয়া কর দেওয়া হইতে রেহাই মিলিবার সুযোগ থাকিবে। সমস্ত বিলাস দ্রব্যের উপর একযোগে কর ধার্য করিলে কিছুটা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। পরোক্ষ করের প্রধান অসুবিধা পরোক্ষ করকে সহজে গতিশীল করা যায় না।

(৩)
পরোক্ষ কর গতিশীল করা যায় না। সুতরাং ন্যায় বিচার অসম্ভব হইয়া পড়ে।

পরোক্ষ কর দামের মধ্যে লুকাইয়া থাকে। অনেক ক্রেতাই ঘুণাক্ষরেও ভাবে না যে দামের সঙ্গে কর দিতে হইতেছে। সে যে করদাতা একথা বেমালুম ভুলিয়া যায়। কররাজস্ব সরকার কিভাবে ব্যয় করিতেছে তাহাও জানিবার অধিকার করদাতার

(৪)
সরকারী আয়-ব্যয় সম্বন্ধে উদাসীনতা

আছে। সে কথা তাহার খেয়াল থাকে না। তাহার নাগরিক সচেতনতা সুপ্ত থাকিয়া যায়।

সরকারী ব্যয় (Public Expenditure) : ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের আমলে সরকারের কাজ ছিল ন্যূনতম, সরকারী ব্যয়ও ছিল কম। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্রে সরকারের কার্যাবলী কোন নির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। সরকারের কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়া চলিয়াছে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক সন্তোষ লাভ করা। সরকারী ব্যয়ের উদ্দেশ্য হইল সমাজের সর্বাধিক মঙ্গল সাধন করা।

সরকারী ব্যয় তিন রকম হইতে পারে—কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ব্যয়, প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক ব্যয় এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যয়।

সরকারী ব্যয়ের অন্যভাবেও শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে, যথা—(১) দেশরক্ষা ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, (২) অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য, (৩) সমাজকল্যাণকর কাজের জন্য, (৪) প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এবং (৫) ঋণসংক্রান্ত কাজের জন্য।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল—এইভাবেও সরকারী ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। রেলপথ নির্মাণ বা জলসেচের জন্য ব্যয় স্পষ্টতঃ উৎপাদনশীল। ইহার ফলে ভবিষ্যতে আয় বাড়িবে। শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের খাতে ব্যয় করিলে দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয় উৎপাদন পরোক্ষভাবে বাড়িবে। সুতরাং এই জাতীয় ব্যয়কেও উৎপাদনশীল বলিতে হয়। গোলাগুলি প্রস্তুত না করিলে দেশরক্ষা হইবে না—উৎপাদন ব্যাহত হইবে। দেশরক্ষার ব্যয়কেও অনুৎপাদনশীল বলা যায় না। সমাজকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমস্ত ব্যয়ই উৎপাদনশীল ধরিতে হইবে। যে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয়, সেই উদ্দেশ্য যদি একেবারে সফল না হয়, তবেই তাহাকে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বলা চলে। জানিয়া শুনিয়া এরকম ব্যয় কেহ করে না।

সরকারী ঋণ (Public Debt or Borrowing) : আর্থিক জগতে আয় বুঝিয়া ব্যয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু সব সময় এই আদর্শ মানিয়া চলা সম্ভব হয় না। রাজস্ব আদায়ের বিলিব্যবস্থা করিতে হয় আগে—ব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা দেয় পরে। হামেশা কম বেশী বাড়তি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। অথচ রাজস্ব আদায় আশানুরূপ নাও হইতে পারে। তখন বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। তখন ঋণ করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করিতে হয়।

(১) বাজেটের সাধারণ ঘাটতি

অনেক সময়ে জরুরী (extra-ordinary) ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। করভার বাড়াইয়া এই ব্যয় নির্বাহ করিতে পারিলে ভালই হয়। কিন্তু করভার বাড়াইবার সীমা আছে। করের হার অতিরিক্ত বাড়াইলে এই সীমা ছাড়াইয়া যাইবে। জাতির দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা কমিবে। সঞ্চয় হ্রাস পাইবে। আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কররাজস্বের সাহায্যে এই ব্যয় মিটাইতে চেষ্টা করা ঠিক নয়। এই ধরণের জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্যও ঋণের প্রয়োজন হয়।

(২) জরুরী ব্যয়

(৩) উন্নয়ন

রেল পরিবহন, সেচব্যবস্থা ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজের জন্যও ঋণ করিতে হয়। এই ধরণের কাজে সমাজের স্থায়ী উপকার হয়। চলতি আয়ের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়।

সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Public Debt) **:**

(১) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক

ব্যক্তি নিজের নিকট হইতে ঋণ লইতে পারে না। সরকার নিজের নিকট হইতে বা বাহির হইতে দুই সূত্রেই ঋণ পাইতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে নাগরিকদের নিকট হইতে যে ঋণ সরকার নেয়, তাহাকে আভ্যন্তরীণ ঋণ বলে। বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহাকে বৈদেশিক ঋণ বলে।

(২) স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী

আয় ও ব্যয়ের বৈষম্য যদি সাময়িক হয়, তাহা হইলে ৩ মাস বা ৬ মাসের স্বল্প মেয়াদী ঋণ লওয়া হয়। দীর্ঘকালের জন্য ঋণ লইলে তাহাকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বলে।

(৩) উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল

ঋণ উৎপাদনশীল বা অনুৎপাদনশীল হইতে পারে। ধার করা টাকা দিয়া কোন লাভজনক সম্পত্তি (asset) উৎপাদন করিলে তাহাকে উৎপাদনশীল ঋণ বলে। সম্পত্তি হইতে আয় হইবে। এই আয় হইতেই ক্রমে ক্রমে সুদে আসলে ঋণ পরিশোধ করা যায়। দেনা মিটাইবার জন্য করভার বাড়াইবার প্রয়োজন হয় না। রেলপথ নির্মাণ বা সেচব্যবস্থা প্রসারের জন্য ঋণ করিলে রেলের আয় ও জল ব্যবহারের জন্য দাম হইতেই এই দেনা শোধ করা যায়। সুতরাং ইহা উৎপাদনশীল ঋণ। যুদ্ধ চালাইবার জন্য ঋণ করিলে কোন লাভজনক সম্পত্তি সৃষ্টি হয় না। করের হার বাড়াইয়া বা নূতন কর বসাইয়া এই দেনা শোধ করিতে হইবে। সুতরাং ইহা অনুৎপাদনশীল ঋণ।

উন্নয়নমূলক কার্যের জন্য অর্থসংস্থান (Financing of Development) **:** উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইলে অর্থ-সংগ্রহের কথাও সরকারকে ভাবিতে হইবে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নানাবিধ সম্পদসৃষ্টি—বিশেষ করিয়া

সামাজিক ও বাস্তব মূলধন বৃদ্ধি। এজন্য বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের বিলি-ব্যবস্থাও করিতে হইবে। অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা ফলপ্রসূ না হইলে পরিকল্পনার সাফল্য অনিশ্চিত হইয়া পড়িবে। কর-রাজস্ব বাড়াইয়া আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ যোগাড় করিয়া এবং ঘাটতি ব্যয় অর্থাৎ নূতন মুদ্রা ছাপাইয়া অর্থ-সংস্থান হইতে পারে।

সাধারণ অবস্থায় সরকারী রাজস্বের প্রধান উৎস কর। উন্নয়ন কাজের জন্যও সরকারের দৃষ্টি প্রথমে এইদিকেই পড়ে। করের হার বাড়াইয়া ও অতিরিক্ত কর বসাইয়া কিছু অর্থ যোগাড় হইতে পারে। উন্নয়নের জন্য বিপুল ব্যয় দরকার হয়। কর রাজস্ব বাড়াইয়া এই বিপুল ব্যয়ের সম্পূর্ণ সংস্থান সম্ভব নয়। করভার অতিরিক্ত বাড়াইলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ব্যাহত হইবে। তখন কর রাজস্ব না বাড়িয়া বরং কমিবে। বিরাট বহরে ব্যয় করিতে হইলে, কর বাদে অন্য উপায়ে, যেমন ঋণ করিয়া—অর্থসংস্থানের কথা ভাবিতে হইবে। অনেকে মনে করেন ভারতে জনসাধারণের কর দিবার ক্ষমতা (taxable capacity) শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে। আর কর বাড়াইবার উপায় নাই। ভারতে জাতীয় আয়ের প্রায় ৮% কর দিতে হয়। কর ব্যবস্থা ন্যায্য হইলে ও পরিকল্পনার কাজে জনসাধারণের উৎসাহ জাগাইতে পারিলে কররাজস্ব কিছু বাড়াইবার সুযোগ এখনও আছে। ভারতে ধার্য কর অনেকেই ফাঁকি দেয়। প্রশাসনের ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া কর ফাঁকি বন্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলে করের ভার না বাড়াইয়াও কররাজস্ব বেশ খানিকটা বাড়ান যায়। চলতি রাজস্ব হইতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ শুধু কররাজস্বের উপর নির্ভর করে না। প্রশাসনিক ব্যয় কমাইয়াও উদ্বৃত্তের পরিমাণ কিছুটা বাড়ান যায়। প্রথম পরিকল্পনায় ৫৬৮ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮০০ কোটি টাকা চলতি রাজস্বের উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছিল। ৮০০ কোটি টাকার মধ্যে ৪৫০ কোটি টাকা নূতন কর হইতে আমদানী হইবে ধরা হইয়াছিল।

(১)
চলতি রাজস্বের উদ্বৃত্ত—
(ক) অতিরিক্ত কর
(খ) কর আদায়ের সুব্যবস্থা
(গ) ব্যয়সঙ্কোচ

সরকারী মালিকানায় অনেক ব্যবসা পরিচালিত হয়। ভারতে রেল পরিবহন সরকারী মালিকানায় পরিচালিত। ভাড়া বাড়ালেই সব সময় আয় বাড়ে না। অতিরিক্ত মাশুল ধার্য করিলে জনসাধারণ সোজাসুজি ফাঁকি দিবে এবং রেলে যাওয়া কমাইয়া বা একেবারে ছাড়িয়া দিবে। ফলে আয় কমিবে। বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ কমাইয়া ও পরিচালনার খরচ কমাইয়া উদ্বৃত্ত সামান্য পরিমাণ বাড়ান যায়। প্রথম পরিকল্পনায় ১৯৬১ কোটি টাকার মধ্যে চলতি রাজস্ব ও রেলের উদ্বৃত্তের পরিমাণ

(২)
সরকারী ব্যবসায়ের মুনাফা

ছিল ৭৫২ কোটি টাকা—অর্থাৎ ৩৮%। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪৮০ কোটি টাকার মধ্যে ৯৫০ কোটি টাকা বা প্রায় ১৯% এই দুই খাতে পাওয়া যাইবে ধরা হইয়াছিল। রেলের উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছিল যথাক্রমে ১৭০ কোটি টাকা ও ১৫০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও রেলের উদ্বৃত্ত ধরা হইয়াছে ১৫০ কোটি টাকা। শুধু কররাজস্ব ও রেলের উদ্বৃত্ত দিয়া বিপুল উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করা অসম্ভব।

জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিয়া উন্নয়ন ব্যয়ের কিছুটা অংশ যোগাড় করা যায়। ভারত দরিদ্র দেশ। ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের প্রতি এখানে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। ১৯৫৮-৫৯ সালে স্বল্প সঞ্চয় ঋণের খাতে নীট ৭৮ কোটি টাকা পাইয়াছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে ইহা বাড়িয়া ৮২ কোটি টাকা হইতে পারে। স্বল্প সঞ্চয়সূত্রে পরিকল্পিত বার্ষিক ১০০ কোটি টাকায় পৌঁছাইতে এখনও দেরী আছে। ভারতে সরকার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য তহবিল হইতেও ঋণ লইয়াছেন।

(৩)
আভ্যন্তরীণ ঋণ

প্রথম পরিকল্পনায় এই খাতে ৯১ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৫০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সূত্রে ৫১০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে আশা করা হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিয়াও অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সমস্ত রকম আভ্যন্তরীণ ঋণ হইতে প্রথম পরিকল্পনায় পাওয়া যায় ৬০০ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৩১% এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৪৫০ কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের ৩০%। আভ্যন্তরীণ ঋণ খাতে তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৪০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে আশা করা হইয়াছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এই ব্যয়বরাদ্দের ছাঁটকাট না করাই ভাল। দরিদ্র দেশের প্রয়োজন বেশী—কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি সামান্য। বিদেশ হইতে ঋণ পাইলে ব্যয়বরাদ্দ অপরিবর্তিত রাখা সম্ভব হয়। ভারতে আয় কম। এই স্বল্প আয় হইতে সঞ্চয় করিতে গেলে বর্তমান ভোগ ভীষণভাবে কমাইতে হইবে। তাহাতে স্বাস্থ্য ও দক্ষতা ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া ভোগ বেশী কমাইতে গেলে লোক অসন্তুষ্ট হইবে। সরকার ভোট হারাইবে। সেই ভয়েও গণতান্ত্রিক সরকার ভোগ অধিক মাত্রায় কমাইতে সাহস করে না। অনেক উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দেশীয় ও বৈদেশিক উভয় মুদ্রায় খরচ দরকার হয়। দুর্গাপুরে কারখানা করার জন্য স্থানীয় শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইতেছে। গৃহ নির্মাণের জন্য স্থানীয় মালমসলা দরকার হইয়াছে। এই ধরণের ব্যয় নির্বাহ করিতে দেশীয় মুদ্রা

(৪)
বৈদেশিক ঋণ কোন কোন ক্ষেত্রে অপরিহার্য। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ইহা পরিকল্পনা রূপায়নে সাহায্য করে

দরকার। ধরিয়া লইলাম ভারত সরকার কর রাজস্ব মারফৎ বা আভ্যন্তরীণ ঋণ করিয়া এই টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই কারখানার জন্য যন্ত্রপাতিও দরকার। এই যন্ত্রপাতির অনেকগুলি ভারতে তৈয়ারী হয় না। বিদেশ হইতে আনিতে হইবে। বিদেশী বিক্রেতাকে তাহার দেশীয় মুদ্রা দিতে হইবে। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত থাকিলে, সেই উদ্বৃত্ত দিয়া আমরা এই বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে পারি। ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রতিকুল, সুতরাং ঋণ করিয়া এই বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিতে হইবে। অন্য উপায় নাই। বৈদেশিক ঋণ পাইলে এই ধরণের উন্নয়ন কাজ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। বিদেশ হইতে ঋণ পাইলে শুধু যে ইহাই সম্ভব তাহা নয়। আমাদের বর্তমান ভোগ কমাইবার প্রয়োজনও কিছুটা কম হইবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সহজতর হইবে। বিদেশী নাগরিক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অথবা সরকার হইতে ঋণ পাওয়া যায়। প্রথম পরিকল্পনায় ১৭৮ কোটি টাকা বা মোট ব্যয়ের প্রায় ১০% বৈদেশিক ঋণ হইতে পাওয়া গিয়াছিল। মূল দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিদেশ হইতে ৮০০ কোটি টাকা বা পরিকল্পিত ব্যয় বরাদ্দের প্রায় ১৭% বিদেশ হইতে ঋণ দরকার হইবে মনে করা হইয়াছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি চলিতে থাকায় ও ভারী শিল্প গঠনে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের প্রয়োজন বেশী হওয়ায়, বিদেশী সাহায্যের আবশ্যকতা আরও ৫০০-৬০০ কোটি বাড়িয়া যায়। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত অবস্থা রীতিমত সঙ্কটজনক ছিল। সেই সময় বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির একটি সভা হয়। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মাণী, কানাডা প্রভৃতি দেশ হইতে উল্লেখযোগ্য সাহায্য পাওয়া যায়। শেষ মুহূর্তের এই সাহায্যের দৌলতে কোনমতে মুখরক্ষা হয়। প্রায় ৪৬২০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়।

কর রাজস্ব, সরকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লাভ ও ঋণ হইতে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় তাহাকে চলতি আয় বলে। চলতি আয় হইতে পরিকল্পিত ব্যয়বরাদ্দ বেশী হইতে পারে। এই ব্যয়বরাদ্দ ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে রচিত। চলিত আয় ও ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে গেলে ব্যয় কমাইতে হইবে। গোঁড়ামী বজায় থাকিবে কিন্তু উন্নয়ন শিকায় উঠিবে। উন্নয়নের গতি অক্ষুন্ন রাখিতে হইলে নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া ব্যয় ঠিক রাখিতে হইবে। ইহাকেই ঘাটতি ব্যয় (deficit financing) বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট সঞ্চিত টাকা উঠাইয়া ব্যয় করা চলে। অথবা সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে ধার লইতে পারে। সরকারী প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট ছাপাইয়া সরকারকে ধার দিবে। উভয় ক্ষেত্রেই বাজার-চলতি (active) টাকার

(৫)
চলতি আয় হইতে বেশী ব্যয়কে ঘাটতি ব্যয় বলে। সাবধান না হইলে ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি হয়।

পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। মূল্যস্তর বাড়িবে। ঘাটতি ব্যয় মাত্রা ছাড়াইয়া গেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। শেষ পর্যন্ত জনসাধারণ মুদ্রার উপর একেবারে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিতে পারে। দেশের অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। ব্যয় নির্বাহ করার সহজ পথ হইল ঘাটতি ব্যয়। কর আদায় ও ঋণ সংগ্রহ যদি সন্তোষ জনক না হয়, এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে যদি না-লাভ না লোকসানের নিরামিষ নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে এই সহজ পথ নাকচ করা ঠিক হইবে না।

তবুও ইহা বাতিল করা যায় না।

উৎপাদন বাড়িলে অবশ্য দাম বাড়িবে না। তখন তখন উৎপাদন বেশী বাড়ান সম্ভব নয়। রেশনিং করিয়া মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ করা যায়। কর পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া দামের উচ্চগতি রোধ করা যায়। ভারতে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম পরিকল্পনার আমলে ছিল ৫৩২ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহার পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫০ কোটি টাকা ধরা হয়। ভারতে মূল্যস্ফীতি রোধ করা যায় নাই। ব্যয় ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় উৎপাদন আশানুরূপ বাড়ে নাই। সরকারের কর আদায়ের পদ্ধতিও অসন্তোষজনক। যাদের হাতে অতিরিক্ত ব্যয় ক্ষমতা আছে, তাদের ব্যয়ক্ষমতা যথেষ্ট সঙ্কুচিত করা হয় নাই। ফলে দামই বাড়িয়াছে। আয় বণ্টনের বৈষম্য কমে নাই। সরকার শুধু জনসমর্থন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Define a Tax. Explain the characteristics of a good tax.
   কর কাহাকে বলে? উত্তম করের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৭১-১৭৫]

2. Distinguish between Direct and Indirect Taxes. What are their advantages and disadvantages? [পৃষ্ঠা ১৭৬-১৮১]
   প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। ইহাদের সুবিধা অসুবিধা বর্ণনা কর।

3. What is Progressive Taxation and what are its merits? Give two examples of progressive taxes.
   ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য কাহাকে বলে? ইহার সমর্থনে কি বলিবার আছে? দুইটি ক্রমবর্ধমান হারে করের উদাহরণ দাও। [পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৬]

4. What is public expenditure and what is its aim?
   সরকারী ব্যয় কাহাকে বলে? ইহার উদ্দেশ্য কি? [পৃষ্ঠা ১৮২]

5. What is Public Debt? Classify the different kinds of Public Debt.
   সরকারী ঋণ কাহাকে বলে? সরকারী ঋণের শ্রেণীবিভাগ কর। [পৃষ্ঠা ১৮২-১৮৩]

6. How does a government finance its Development Programme? Illustrate with reference to India. [পৃষ্ঠা ১৮৩-১৮৭]
   সরকার কি উপায়ে উন্নয়ন ব্যয় সংস্থান করে? ভারতের দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

পঞ্চদশ অধ্যায়

অর্থ ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা

(Money and Banking)

শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি। বিনিময়ের অভাবে শ্রমবিভাগ অচল। একটি দ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি দ্রব্যের সরাসরি বিনিময়কে প্রত্যক্ষ বিনিময় (barter) বলে। প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা অনেক। পরস্পরের অভাবের সামঞ্জস্য (double coincidence of wants) না থাকিলে প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্ভব হয় না। নাপিতের তোয়ালে কাচাইবার দরকার আছে। ইহার পরিবর্তে সে চুল কাটিতে রাজী আছে। ধোপার হয়ত তখন চুল কাটাইবার প্রয়োজন নাই। নাপিতের আগ্রহ সত্ত্বেও বিনিময় হইবে না। চুল কাটার ইচ্ছা আছে এই রকম ধোপা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বার বার এই ঝকমারি কেহ করিবে না। শেষ পর্যন্ত নাপিত বিরক্ত হইয়া নিজের তোয়ালে নিজেই কাচা সুরু করিবে। পারস্পরিক অভাবের সামঞ্জস্য থাকিলেও বিভাজ্যতার (sub-division without loss of value) অভাবে প্রত্যক্ষ বিনিময়ে অসুবিধা দেখা দেয়। ধোপার চুল কাটাইবার ইচ্ছা আছে। এদিকে নাপিত একটিমাত্র ছোট তোয়ালে কাচাইতে চায়। ইহার বিনিময়ে সে পুরা চুল কাটিতে রাজী হইবে না। অথচ অর্ধেক বা সিকি পরিমাণ চুল কাটাও চলে না। উভয়ক্ষেত্রে আগ্রহ আছে। তবুও বিনিময় সম্ভব হইবে না। দ্রব্যের সংখ্যা অনেক। প্রত্যক্ষ বিনিময়ে ইহাদের পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণ রীতিমত সমস্যার সৃষ্টি করে। ৬ সের চালের বিনিময়ে ৫ সের চিনি, ১৫ সের তেলের পরিবর্তে ১ মণ চাল এবং ২ সের তেলের বিনিময়ে ২ সের আলু পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ চিনির বিনিময়ে কতখানি আলু পাওয়া যাইবে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিবার জন্য খাতা-পেনসিল লইয়া অঙ্ক কষিতে হইবে। পারস্পরিক মূল্য একনজরে নির্ধারণ না করা গেলে বিনিময়ে লাভ-লোকসান বুঝা কঠিন হইয়া পড়ে। এই সমস্ত অসুবিধার জন্য প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বিনিময়ের উপর নির্ভর করিয়া শ্রম-বিভাগ কখনই অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিত না। সূক্ষ্ম শ্রম-বিভাগে একজন একটি দ্রব্যের অংশমাত্র বা একটিমাত্র প্রক্রিয়া করিয়া যায়। সরাসরি অভাব

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা অনেক

মিটাইবার উপায় এখানে নাই। সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ তাহা হইলে কখনই সম্ভব হইত না।

অর্থ ব্যবহারের ফলে এই সব অসুবিধা দূর হয়। বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। সূক্ষ্মতর শ্রমবিভার সম্ভবপর হয়। ইহার ফলে আমাদের আয় বাড়ে। চুল কাটাইবার ইচ্ছা আছে এই রকম ধোপা নাপিতকে খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। শিক্ষক, কেরাণী, ছাত্র—যার চুল কাটাইবার প্রয়োজন আছে—নাপিত তার চুল কাটিয়া বিনিময়ে পাইবে অর্থ। যে ধোপার একগোছা চুলও নাই, সেও অর্থের বিনিময়ে নাপিতের তোয়ালে কাচিয়া দিতে রাজী হইবে। চুল কাটাইবার প্রয়োজন তার কোন দিন হইবে না। কিন্তু অন্য অনেক জিনিসের প্রযোজন ধোপার আছে। তোয়ালে কাচিয়া যে অর্থ পাইবে তাহা দিয়া এই সমস্ত জিনিস সে সংগ্রহ করিতে পারিবে। চিনি ও আলু উভয়ের মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হইবে। সহজেই তাহাদের পারস্পরিক মূল্য (relative value) নির্ধারণ করা যাইবে।

অর্থ ব্যবহারের ফলে এই সব অসুবিধা দূর হয়

অর্থ কাহাকে বলে? (What is Money ?): ধোপার প্রয়োজন হয়ত রুটি, নাপিত তাহাকে রুটি না দিয়া দিতেছে অর্থ। ধোপা অর্থের বিনিময়ে তোয়ালে কাচিয়া দিল। কেন না সে জানে তার খুসীমত সময়ে সে রুটিওয়ালার নিকট হইতে অর্থের বিনিময়ে রুটি পাইতে পারে। সে জানে অর্থ দিয়া তাহার যে কোন দেনা সে শোধ করিতে পারে। রুটিওয়ালা বা পাওনাদার অর্থ লইতে অস্বীকার করিবে—এ কথা যদি সে ঘুণাক্ষরে মনে করিত তবে সে কখনই নাপিতের তোয়ালে কাচিয়া দিতে রাজী হইত না। অর্থের বৈশিষ্ট্য হইল ইহার সাধারণ গ্রাহ্যতা (general acceptability)। কাহারও নিকট হইতে ৫৲ ধার করিলে আমার ৫৲ দেনা হয়। ঠিক সেইরূপ কোন দোকান হইতে ৫৲র জিনিষ লইলেও দোকানদারের নিকট আমার ৫৲ দেনা হয়। সেই হিসাবে বলা চলে—কোন সমাজে যে দ্রব্যের সাহায্যে সচরাচর দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি হয় তাহাকেই অর্থ বলে। ক্রয়-বিক্রয় করিতে গেলেই দেনা-পাওনার উদ্ভব হয়। অর্থের মাধ্যমেই ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন চলে। বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম (common medium of exchange) হিসাবে কাজ করাই অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোন দ্রব্য এই কাজ করে, তাহাকেই অর্থ বলা চলে। নোট, চেক ও বিল মারফৎ যদি ক্রয়-বিক্রয় চলে, ইহাদের সাহায্যে যতক্ষণ দেনা চুকান চলে ততক্ষণ ইহাদিগকে অর্থ বলিতে হইবে।

ব্যাপক অর্থে, যাহার সাহায্যে সচরাচর দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি হয়, তাহাকেই অর্থ বলা হয়।

অর্থ হিসাবে কাজ করার যোগ্যতা যে সমস্ত গুণের উপর নির্ভর করে (Qualities of good money material) :

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দ্রব্য অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। মহাভারতে বিরাট রাজার গোধনের বর্ণনা আছে। তখন ভারতে গরুই অর্থের কাজ করিত। আফ্রিকার উপকূলে কড়ি, তিব্বতে চায়ের পিণ্ড, জাপানে ধান অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এখন কিন্তু সকল দেশেই স্বর্ণ ও রৌপ্য এই মূল্যবান ধাতু দুইটি অন্যান্য জিনিষের পরিবর্তে অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকার জন্যই স্বর্ণ ও রৌপ্যের এই বহুল প্রচলন সম্ভব হইয়াছিল।

গ্রহণযোগ্যতা

সর্বসাধারণ যাহাকে দ্রব্যাদির বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য মনে না করে, তাহা কোন দিন অর্থ হিসাবে কাজ করিতে পারে না। স্বর্ণরৌপ্যের আর্থিক ব্যবহার বাদেও অন্য ব্যবহার আছে। ইহাদের স্বাভাবিক জৌলুষের জন্য অনেকেই ইহা পছন্দ করে। অলঙ্কার নির্মাণের কাজে ব্যবহার করা যায়।

বহনযোগ্যতা

গরু বা তামাক এক জায়গা হইতে দূরবর্তী জায়গায় লইয়া যাইতে অনেক খরচ হয়। ফলে দুই জায়গায় মূল্যের তারতম্য হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য অল্পখরচে পাঠান যায়। দুই জায়গায় মূল্যের পার্থক্য বেশী হইতে পারে না।

অর্থের বৈশিষ্ট্য হইল ইহা সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা (generalised purchasing power)। অর্থের মালিক যখন খুশী ইহার বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাইতে পারে।

স্থায়িত্ব

গরু বা তামাকের স্থায়িত্ব নাই। বেশীদিন রাখিলে গরু মরিয়া যাইতে পারে—তামাক নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। স্থায়িত্ব না থাকিলে আবার বহনযোগ্যতাও থাকে না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের, বিশেষ করিয়া স্বর্ণের স্থায়িত্ব খুব বেশী। সহজে মরিচা ধরে না। একটি স্বর্ণমুদ্রা ক্ষয় হইতে ৩০০০ বৎসর লাগে।

একজাতীয়ত্ব ও বিভাজ্যতা

সব গরু এক রকম নয়। সমস্ত তামাক একজাতীয় নয়। এই ধরণের জিনিষ ব্যবহার করিলে বিনিময়ে ঝামেলা বাড়িবে বই কমিবে না। স্বর্ণমুদ্রার একটির সঙ্গে অপরটির বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই। বিক্রেতা যে কোনটি পাইলেই সন্তুষ্ট। ক্রেতারও যে কোনটি দিতে আপত্তি নাই। বিভাজ্যতার প্রয়োজন কি তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। স্বর্ণপিণ্ড যত ভাগেই ভাগ করা হোক, সমস্ত ভাগের একত্রে মূল্য সম্পূর্ণ স্বর্ণপিণ্ডের মূল্যের প্রায় সমান হয়।

অর্থের মাধ্যমে অন্যান্য জিনিষের মূল্য প্রকাশ করা হয়। যে জিনিষের নিজের মূল্যের স্থিরতা নাই, সে জিনিষ অর্থ হইবার অনুপযোগী। অজন্মা হইলে ধানের দাম অনেক বাড়ে। আবার ফলন ভাল হইলে দাম কমিয়া যায়। স্বর্ণ অত্যন্ত স্থায়ী, যে পরিমাণ স্বর্ণ লোকের কাছে আছে, বার্ষিক স্বর্ণ উৎপাদন তাহার তুলনায় নিতান্ত কম। বার্ষিক উৎপাদন কমা বাড়ার ফলে মোট যোগানের সামান্যই পরিবর্তন হয়। দামেরও সেজন্য সামান্য ইতর বিশেষ হয়।

মূল্যের স্থিরতা

কাগজী অর্থের সুবিধা (Advantages of Paper Money) : আজকাল কাগজী অর্থের প্রচলন সব বেশী। কাগজী অর্থের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা থাকার ফলেই কাগজী অর্থের এই বহুল প্রচলন সম্ভব হইয়াছে।

কাগজী অর্থের বহনযোগ্যতা অনেক বেশী। ধাতব মুদ্রার ওজন বেশী। অধিক সংখ্যক ধাতব মুদ্রা বহন করিতে কষ্ট হইবে। চোর ডাকাত বুঝিয়া ফেলিবে। অনেকগুলি নোট পকেটে বা কোমরে গুঁজিয়া রাখিলেও, কেহ সহজে বুঝিতে পারিবে না। কাগজী নোটের আসল নকল সহজেই বুঝা যায়। সোনা ও পিতলের পার্থক্যও সব সময় করা যায় না। সোনার গুণের তারতম্য করা আরও কঠিন। কষ্টিপাথর লইয়া সব সময় প্রস্তুত থাকা সম্ভব নয়। সোনা ও রূপার বিভাজ্যতা আছে। কাগজী অর্থের বিভাজ্যতা আরও বেশী। ১ টাকার ৫টি নোট ও ৫ টাকার ১টি নোট—একেবারে সমান। ১ খণ্ড সোনা ৫ ভাগ করিলে, কিছু খোয়া যাইবেই।

(১)
বহনযোগ্যতা ও বিভাজ্যতা
সহজে চেনা যায়

ধাতু পরিস্রুত করিয়া নির্দিষ্ট বিশুদ্ধতায় আনিয়া তারপর ধাতু হইতে মুদ্রা তৈয়ার হয়। সে তুলনায় কাগজী নোটের মুদ্রণব্যয় অকিঞ্চিৎকর। সোনা কিনিবার ব্যয় অপেক্ষা কাগজ কিনিবার ব্যয় অনেক কম। কাগজী অর্থ-ব্যবহারের ফলে যথেষ্ট ব্যয় সংক্ষেপ হয়। টাকা-পয়সা এক হাত হইতে অন্য হাতে ঘুরিতেছে। অবিরত হস্তান্তরের ফলে ধাতুর ক্ষয় হয়। কাগজী অর্থ ব্যবহার করিলে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার জনিত ক্ষয় নিবারিত হয়। এদিক দিয়াও কাগজী অর্থ-ব্যবহারের ফলে ব্যয় সংক্ষেপ হয়। কাগজী অর্থ-ব্যবহারের ফলে যে পরিমাণ ধাতু সঞ্চয় হয়, তাহা অন্য উৎপাদনশীল কাজে লাগান যায়। ধাতব মুদ্রা নষ্ট হইলে, তাহার পরিবর্তে নূতন মুদ্রা চালু করিতে গেলে খরচ করিয়া ধাতু সংগ্রহ করিতে হয়। কাগজী অর্থ নষ্ট হইলে সহজেই নূতন কাগজী অর্থ অর্থ চালু করা যায়।

(২)
ব্যয়সঙ্কোচ

অর্থের চাহিদা বাড়িলে কাগজী অর্থের যোগান সহজেই বাড়ান যায়। জাতীয় আয় বাড়ার ফলে দেশে ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন বাড়ে। আর্থর চাহিদাও বাড়ে।

(৩)
কাগজী অর্থের যোগান সহজেই বাড়ান যায়

কেবলমাত্র সোনারূপার টাকার প্রচলন থাকিলে, অর্থের যোগান তাড়াতাড়ি বাড়ান যায় না। দেশে সোনারূপার খনি থাকিলেও প্রয়োজনমত সোনারূপার যোগান বাড়ান সব সময় সম্ভব হয় না। বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি থাকিলে, সেই ঘাটতি মিটাইতে বরং সোনারূপা দেশের বাহিরে চালান দিতে হইবে। অর্থের যোগান বাডাইতে না পারিলে, সুদের হার বাড়িতে পারে ও জিনিষের দাম কমিতে পারে। তাহাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে। কাগজী অর্থের যোগান বাড়ান অতি সহজ। সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাপিয়া দিলেই যোগান বাড়িবে। অনেক ক্ষেত্রে কাগজী অর্থের পরিবর্তে ধাতু গচ্ছিত রাখিতে হয়। যে মূল্যের নোট ছাপান হয়, তাহার সমমূল্যের ধাতু গচ্ছিত রাখিতে হয় না। কাগজী অর্থের আংশিক (fractional) মূল্য ধাতুরূপে জমা রাখিতে হয়। যে পরিমাণ বাড়তি ধাতু সংগ্রহ হয়, তাহার কয়েকগুণ নোট ছাপান যায়।

কাগজী অর্থের অসুবিধা (Disadvantges of Paper Money): কোন জিনিষেরই অতি ভাল নয়। কাগজী অর্থ অতি সহজে বাড়ান যায়। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত বিপদ দেখা দিতে পারে। সরকারের ব্যয় নির্বাহের সহজতম উপায় হইল নূতন নোট ছাপান। কর ধার্য করিলে লোক অসন্তুষ্ট হয়। ঋণ সব সময় পাওয়া যায় না। ঋণের সুদ দিতে হইবে। আসলও একসময় শোধ করিতে হইবে।

(১)
যোগান সহজে বাড়ান যায় বলিয়া যোগান অতিরিক্ত বাড়িতে পারে।

তখন আবার কর ধার্যের প্রয়োজন হইবে, কাগজী নোট স্বল্প আয়াসে ও সামান্য খরচে ছাপান যায়। দুর্বল সরকার এই সহজ পথই বাছিয়া লয়। নোটের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। অতিরিক্ত পরিমাণ নোট প্রবর্তনের ফলে নোটগুলি আর ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। গোড়াতে সোনারূপায় পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি থাকে। গচ্ছিত ধাতু ফুরাইয়া গেলে, এই প্রতিশ্রুতি পালন অসম্ভব হইয়া পড়ে। বাকী নোটগুলি অপরিবর্তনীয় বলিয়া ঘোষণা করিতে সরকার বাধ্য হয়। জিনিষপত্রের দাম বাড়ায় সরকারী ব্যয় বাড়িয়া যায়। এদিকে নোটগুলি ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার দায়িত্ব থাকে না। নোট অত্যন্ত

ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়

দ্রুত গতিতে ছাপান হয়। মূল্যস্তরও হু হু করিয়া ঊর্ধ্বমুখী হয়। কাগজী নোট মূল্যহীন হইয়া পড়ে। ক্রয় বিক্রয় কি লেনদেনের ব্যাপারে ইহা আর গ্রাহ্য হয় না। এক কথায় ইহা অর্থের মর্যাদা

হারাইয়া ফেলে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে এইরূপ মুদ্রাস্ফীতি (hiper inflation) ঘটিয়াছিল। সে দেশের কাগজী নোট 'মার্ক' বিয়ার বোতলের লেবেল হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

(২)
সহজে নষ্ট হয়

কাগজী অর্থ সহজে নষ্ট হইয়া যায়। জলে ভিজিলে বা আগুনে পুড়িলে, কাগজী নোট নষ্ট হইয়া যায়।

(৩)
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষতি হয়।

কাগজী নোট দেশের অভ্যন্তরে অর্থের কাজ করে, একদেশের কাগজী নোট অন্য দেশে অচল। সোনার সর্বদেশগ্রাহ্যতা আছে। সোনা আন্তর্জাতিক অর্থ। একদেশের কাগজী নোটের সঙ্গে অন্য দেশের কাগজী নোটের বিনিময়হার নির্দিষ্ট রাখা দুরূহ ব্যাপার। কাগজী নোটের যোগান সহজেই বাড়িতে পারে। সেক্ষেত্রে ইহার ক্রয় ক্ষমতার কোন স্থিরতা থাকিবে না। বিদেশীরা ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

কাগজী নোটের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিলাম বিশেষ অবস্থায় কাগজী নোট অর্থের কাজ করিতে পারে না। জনসাধারণ যখন ইহা গ্রহণ করিতে গররাজী হয়, তখন সরকারী নির্দেশ সত্ত্বেও ইহাকে আর অর্থ বলা হয়। অর্থের কাজ যে করে তাহার নামই অর্থ (Money is what money does), বিনিময়ের কাজে যাহা সর্বাচর গ্রাহ্য তাহাই অর্থ।

অর্থের কার্যাবলী (Functions of Money): প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা দূর করবার জন্যই অর্থের ব্যবহার সুরু হয়। অর্থ বিনিময়ের সাধারণ

(১)
বিনিময়ের মাধ্যম

মাধ্যম। ইহাই অর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ। অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য বা সেবা বিক্রয় করিতে লোক সব সময় রাজী থাকে। সুতরাং যে জিনিষ যখন প্রয়োজন অর্থের সাহায্যে অনায়াসেই পাওয়া যায়। চুল কাটাইবার প্রয়োজন না থাকিলেও ধোপা নাপিতের তোয়ালে কাচিয়া দিতে রাজী হয়। কারণ ইহার বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যাইবে এবং এই অর্থের সাহায্যে ধোপা যাহা প্রয়োজন মনে করে তাহাই কিনিতে পারিবে।

অর্থ অনেক প্রকার হয়। কিন্তু অর্থ আখ্যা পাইতে গেলে এই প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করিতেই হইবে। তবে অর্থ হইতে গেলে কেবলমাত্র এই কাজটি করিলেই চলিবে না। নিম্নলিখিত কাজগুলি যুগপৎ সম্পন্ন করিলে তবেই অর্থ বলা চলে।

প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অন্যতম অসুবিধা হইল পারস্পরিক মূল্য নির্ধারণের সমস্যা। আজকাল সমস্ত জিনিষের মূল্য অর্থের সাহায্যে পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়। এই অর্থ

মূল্যের নাম দাম। দামের সাহায্যে সহজেই বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করা যায়। ১টি কলমের দাম ৫ টাকা। সেইরকম অন্যান্য জিনিষের মূল্যও টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য জিনিষ ৫্-র বিনিময়ে যতটা পাওয়া যাইবে, তাহাই হইবে কলমের বিনিময় মূল্য। আমাদের দেশে মূল্য পরিমাপের একক হইল টাকা (Rupee)। অন্যান্য দেশেও এইরকম একক আছে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডলার, ব্রহ্মদেশে কিয়াট, ব্রিটেনে পাউণ্ড ইত্যাদি। অন্যান্য অর্থও এই এককের গুণিতক বা ভগ্নাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। মূল্য পরিমাপের এককের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তাহারাও অর্থ আখ্যা পাইতে পারে।

(২)
মূল্যের সপরিমাপক

ব্যয় প্রতিনিয়ত করিতে হয়, আয় হাতে আসে দীর্ঘতর সময়ের ব্যবধানে। মাসান্তে বা সপ্তাহান্তে বেতন পাওয়া যায়। বাজার খরচ দিন দিন করিতে হয়। ভবিষ্যৎ ব্যয়নির্বাহের জন্য সঞ্চয় দরকার। জিনিষপত্র মজুত করিয়াও সঞ্চয় করা যায়। যে জিনিষ ভবিষ্যতে দরকার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, শেষে সেই জিনিষই অদরকারী মনে হইতে পারে। জিনিষপত্র মজুত করিতে ও তাহার তদারক করিতে খরচ লাগিবে। ভবিষ্যতে আধিব্যাধি হইতে পারে এবং আয় কমিয়া যাইতে পারে। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার জন্যও সঞ্চয় দরকার। সোনাদানা কিনিয়া সঞ্চয় করা যায়। সোনাদানা চুরি হইতে পারে। অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করিলে, ব্যাঙ্কে বা পোষ্টাফিসে রাখিয়া নিরাপদে থাকা যায়। কখন্ কোন্ জিনিষের দাম হঠাৎ কমিবে তাহা বলা যায় না। অর্থ হাতে থাকিলে এরকম দাও মারিবার সুযোগ গ্রহণ করা চলে। বর্তমান ভোগ কমাইয়া সঞ্চয় করিতে হয়। কোন দ্রব্যবিশেষের মাধ্যমে সঞ্চয় করার বিপদ আছে। সেই বিশেষ দ্রব্যের হঠাৎ মূল্যহ্রাস হইলে সঞ্চয়ের মূল্যও কমিয়া যাইবে। বিনা দোষে শাস্তি পাইবে। অন্য যে কোন জিনিষ অপেক্ষা অর্থের মূল্যের স্থায়িত্ব বেশী। অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করিলে এই বিপদ হইতে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যায়।

(৩)
সঞ্চয়ের বাহন

দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ করা অর্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আগেকার দিনে লোক জিনিষ ধার লইত, আবার জিনিষ ফেরৎ দিয়া দেনা শোধ করিত। এইভাবে দেনা পাওনা মিটাইবার দুইটি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ অর্থ বাদে অন্য দ্রব্যের দুইটি একক হুবহু একরকম নয়। কামধেনু ধার লইয়া সাধারণ গরু ফেরৎ দিলে মহাজন নিশ্চয় ওজর আপত্তি করিবে। দেনা শোধ হইয়াছে স্বীকার করিবে না। দ্বিতীয়তঃ

(৪)
দেনাপাওনার মান

অর্থ বাদে অন্যান্য জিনিষের মূল্যের হঠাৎ এবং জোরালো পরিবর্তন অনেক বেশী সম্ভব। আমি যখন গরু ধার লইলাম তখন ১টি গরুর পরিবর্তে ১০টি ভেড়া পাওয়া যাইত। যখন ফেরৎ দিতেছি তখন ৮টি ভেড়া পাওয়া যায়। আপাতদৃষ্টিতে আমি যাহা লইয়াছিলাম তাহাই ফেরৎ দিতেছি, বাস্তবিক কিন্তু আমি ফেরৎ দিতেছি কম। মহাজন ন্যায্যভাবেই আপত্তি করিতে পারে। অর্থের মূল্যের স্থায়িত্ব অনেক বেশী, ৫ টাকা ধার লইয়া ৫ টাকা আসল শোধ দিল, মোটামুটি যাহা লওয়া হইয়াছিল তাহাই ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে। দেনাদারকে মারিয়া পাওনাদার বেশী পায় নাই। পাওনাদারকে মারিয়া দেনাদার লাভ করে নাই। অর্থ না থাকিলে দেনা পাওনার ব্যাপার কমিয়া আসিত। অসুবিধা দেখা দিত: শ্রমিক পাওনাদার, সংগঠক দেনাদার। পাওনাদার যদি অপেক্ষা করিতে নারাজ হয় তবে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহার দেনা মিটাইতে হইবে। তাহাতে কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে।

বিভিন্ন প্রকারের অর্থ (Kinds of Money): মূল্যের পরিমাপক অর্থকে হিসাবনিকাশের অর্থ (Money of account) বলা হয়। যে অর্থ দিয়া বিনিময় কার্য সম্পন্ন হয় তাহাকে বাস্তব অর্থ (Actual money) বলে। বাস্তব অর্থের রূপান্তর হইলে হিসাবনিকাশের অর্থের পরিবর্তন হইতে হইবে এমন নহে। আমাদের দেশে সম্পত্তি, বাড়ীঘর, দেনা পাওনা সব কিছু মান টাকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। ২০০ বৎসর আগেও হিসাবনিকাশ টাকার মাধ্যমেই হইত। কিন্তু তখন বাজারে যে টাকা চলিত, এখন সে টাকা চলে না। ইংলণ্ডে পাউণ্ড ষ্টার্লিং হইল হিসাবনিকাশের মাধ্যম। বাজারে কোন দিন কেহ ইহা দেখে নাই।

(১) হিসাবনিকাশের অর্থ ও বাস্তব অর্থ

বাস্তব অর্থ বিহিত (Legel Tender) বা অ-বিহিত হইতে পারে। সরকারী ঘোষণার বলে যে অর্থের সাহায্যে পাওনাদারের পাওনা আইনত মিটান যায় তাহাকে বিহিত অর্থ বলে। বিহিত অর্থে দেনা মিটান হইলে পাওনাদার তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারে না। অস্বীকার করিলে তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে। সব অর্থ বিহিত অর্থ নহে। চেক, বিল বা ঋণপত্র দিয়া অনেক ক্ষেত্রে দেনা মিটান যায়। যদি কেহ চেক গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তবে তাহাকে আইনের সাহায্যে চেক লইতে বাধ্য করা যায় না। সুতরাং ইহা বিহিত অর্থ নয়। বিহিত অর্থ আবার অসীম ও সসীম হইতে পারে। যে অর্থ পাওনাদার যে কোন পরিমাণে লইতে বাধ্য তাহাকে অসীম বিহিত অর্থ (Unlimited Legal Tender) বলা হয়। যে অর্থ পাওনাদার দেনা মিটানর

(২) বিহিত-অর্থ দুই রকম

অসীম ও সসীম

ব্যাপারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী লইতে বাধ্য নয় তাহাকে সসীম অর্থ (Limited Legal Tender) বলা হয়। আমাদের দেশে এক টাকার নোট বা মুদ্রা অসীম বিহিত অর্থ। লক্ষ টাকার দেনাও এক টাকার নোট দিয়া শোধ করিলে পাওনাদারের 'না' করিবার উপায় নাই। ২ নয়া পয়সা, ৫ ন.প., ১০ ন.প., এইগুলি সসীম বিহিত অর্থ, কারণ এক টাকার অধিক দেনা এই অর্থে পরিশোধ করিতে গেলে, পাওনাদার লইতে অস্বীকার করিলে কিছু করিবার নাই।

বাস্তব অর্থ কাগজী (Paper Money) বা ধাতব (Metallic Money) হইতে পারে। ধাতব অর্থ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। কাগজী অর্থ সরকার বা ব্যাঙ্ক প্রচলন করিতে পারে। সরকার কর্তৃক অথবা সরকারী নির্দেশে প্রবর্তিত অর্থকে কারেন্সী (Currency) বলা হয়। সরকার যে কাগজী অর্থ প্রবর্তন করে তাহাকে কারেন্সী নোট বলে। ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রচলিত কাগজী অর্থকে ব্যাঙ্ক নোট (Bank Note) বলা হয়। কাগজী অর্থ আবার দুই রকম হয়—পরিবর্তনীয় (Convertible) এবং অ-পরিবর্তনীয় (Inconvertible)। নোটের মালিক নোটের পরিবর্তে স্বর্ণ রৌপ্য বা ধাতব অর্থ দাবী করিতে পারে। নোট প্রচলনকারী কর্তপক্ষ যদি এই দাবী মানিয়া লইতে রাজী থাকেন অর্থাৎ নোটের বিনিময়ে যদি ইচ্ছামত স্বর্ণ রৌপ্য বা ধাতব মুদ্রা পাওয়া যায় তাহা হইলে এই নোটকে পরিবর্তনীয় কাগজী টাকা বলা হইবে। কাগজী অর্থের পরিবর্তে স্বর্ণ রৌপ্য বা ধাতব অর্থ দিবার অঙ্গীকার না থাকিলে, তাহাকে অপবিবর্তনীয় কাগজী অর্থ বলে। ব্যাঙ্ক নোট সব সময় পরিবর্তনীয়। কারেন্সী নোট পরিবর্তনীয় ও অ-পরিবর্তনীয় দুই রকমই হইতে পারে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১ টাকার নোট অ-পরির্তনীয় কাগজী অর্থ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত ২, ৫ ও ১০ টাকার নোট পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ।

(৩)
ধাতব ও কাগজী অর্থ। পরিবর্তনীয় ও অ-পরিবর্তনীয় কাগজী অর্থ।

ব্যাঙ্ক নোট সব সময় পরিবর্তনীয়

যে মুদ্রার ধাতুমূল্য (metallic value) উহার লিখিত বা বিনিময় মূল্যের (face or exchange value) সমান হয় তাহাকে প্রামাণিক মুদ্রা (Standard coin) বলে। প্রামাণিক মুদ্রা স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা নির্মিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ব্রিটেনে যে স্বর্ণমুদ্রা (Sovereign) প্রচলিত ছিল তাহা এই ধরণের প্রামাণিক মুদ্রা। প্রামাণিক মুদ্রা যে বিহিত অর্থ হইবে তাহা খুবই স্পষ্ট। ইহা বিনিময়ের হার হিসাবেও ব্যবহৃত হইত। তাহাতেও আশ্চর্য বোধ করিবার কারণ নাই। নিকৃষ্ট ধাতু নির্মিত মুদ্রাগুলির ধাতুমূল্য

ধাতব মুদ্রা দুই প্রকার

লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম। এইগুলিকে প্রতীক মুদ্রা (Token coin) বলে।

প্রামাণিক ও প্রতীক

প্রতীক মুদ্রা গলাইয়া কোন লাভ নাই। কম টাকার লেন-দেন প্রতীক মুদ্রার সাহায্যে হয়। এগুলি সসীম বিহিত মুদ্রা। ভারতের নিকেলের টাকা ও নয়া পয়সার মুদ্রাগুলি সমস্তই প্রতীক মুদ্রা। অর্থ হিসাবে ব্যবহার না হইলে প্রামাণিক মুদ্রা গলাইয়া ধাতু হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই বিকল্প ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। কারণ ইহার ধাতব মূল্য ইহার লিখিত মূল্যের সমান। সেইজন্য ইহা অর্থ হিসাবে গ্রহণ করিতে লোকের আপত্তি হয় না। প্রতীক মুদ্রার ধাতব মূল্য লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম। গলাইয়া ব্যবহার করিলে লোকসান হয়। তবুও আমরা অর্থ হিসাবে প্রতীক মুদ্রা

আদিষ্ট অর্থ

গ্রহণ করিতে রাজী হই। কারণ আমাদের ভরসা আছে। অন্যান্য লোকও ইহা গ্রহণ করিবে। সরকারী আদেশের (fiat) জোরেই আমাদের এই ভরসা হয় এবং প্রতীক মুদ্রা অর্থের মর্যাদা পায়। সেজন্য ইহাকে আদিষ্ট অর্থও (fiat money) বলা হয়।

ভারতের টাকা (The Indian Rupee) : আমাদের টাকার ধাতু মূল্য অপেক্ষা লিখিত মূল্য অনেক বেশী। সে হিসাবে ইহাকে প্রতীক মুদ্রা বলিতে হয়। ধাতুমূল্য লিখিত মূল্যের সমান—এরকম মুদ্রা কোন দেশে আজকাল দেখা

প্রামাণিক মুদ্রার সকল গুণ ইহাতে নাই

যায় না। বিনিময়ের মান হিসাবে কাজ করিলেই তাহাকে আজকাল প্রামাণিক মুদ্রা বলা হয়। আমরা টাকার অঙ্কে হিসাব নিকাশ করি। যাবতীয় দ্রব্যের মূল্য এবং অন্যান্য অর্থের মূল্যও টাকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। টাকা অসীম বিহিত মুদ্রাও বটে। সে হিসাবে টাকাকে প্রামাণিক মুদ্রা বলা যায়।

মুদ্রামান (Monetary Standards) : প্রামাণিক অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্য ও দেনাপাওনার মান এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে। প্রামাণিক

মুদ্রা প্রচলন সম্বন্ধে-রীতি নীতিকে মুদ্রামান বলে

অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই অন্যান্য অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিতে পারে। নিজের মূল্যের স্থিরতা না থাকিলে প্রামাণিক অর্থ দ্বারা উপরি-উক্ত কাজগুলি হওয়া সম্ভব নয়। অর্থমূল্যের স্থিরতা রক্ষার জন্য মুদ্রা প্রচলন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে করিতে হয়। ইহাকে মুদ্রামান বলে।

প্রামাণিক মুদ্রা ধাতু নির্মিত হইলে তাহাকে ধাতব মুদ্রামান (Metallic Standard) বলা হয়। প্রামাণিক মুদ্রা কেবলমাত্র স্বর্ণ বা কেবলমাত্র রৌপ্য নির্মিত হইলে তাহাকে একধাতুমান (Monometallic Standard) বলে। স্বর্ণ

ও রৌপ্য উভয় মুদ্রা বাজারে প্রামাণিত মুদ্রা হিসাবে চালু থাকিলে তাহাকে দ্বিধাতুমান (Bimetallic Standard) বলে।

একধাতুমানে স্বর্ণ বা রৌপ্য প্রামাণিত মুদ্রা চালু থাকে। এই প্রামাণিক মুদ্রা অসীম বিহীত মুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয়। সসীম বিহিত মুদ্রা হিসাবে প্রতীক মুদ্রার প্রচলন থাকে। রৌপ্যমান খুব কম সংখ্যক দেশেই প্রচলিত ছিল। ভারতে ১৮৩৫ সালে রৌপ্যমান প্রবর্তিত হয়।

স্বর্ণ-ধাতুমানের প্রচলন অনেক ব্যাপক ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল। কোন দেশে বিহিত মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণে পরিবর্তিত করা গেলে, সেই দেশে স্বর্ণমান চালু আছে বলা হয়। এব ব্যবস্থায় অর্থের মূল্য স্বর্ণমূল্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্বর্ণমূল্য বাড়িলে কমিলে, অর্থের মূল্যও বাড়ে কমে। স্বর্ণমান বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে।

স্বর্ণমানের রকমারি আছে

পূর্ণ স্বর্ণমান বা স্বর্ণমুদ্রামানের (Full Gold Standard or Gold Circulation Standard) তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (১) কাগজী অর্থের বিনিময়ে অবাধে সমমূল্যের স্বর্ণমুদ্রা দিবার ব্যবস্থা থাকে। (২) সোনার অবাধ আমদানী রপ্তানী হইতে পারে। বিহিত মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ দিবার ব্যবস্থা থাকে এবং (৩) স্বর্ণের পরিবর্তে নিদিষ্ট হারে বিহিত মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রা দিবার ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রা কাযতঃ বাজারে চলে বলিয়া ইহাকে স্বর্ণমুদ্রামান বলে।

(১) স্বর্ণমুদ্রামানে স্বর্ণমুদ্রা বাজারে চালু থাকে।

স্বর্ণপিণ্ডমানে অর্থের মূল্য স্বর্ণমূল্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা বাজারে চলে না। স্বর্ণপিণ্ড আমদানী রপ্তানী করা যায়। বিহিত মুদ্রার পরিবর্তে স্বর্ণপিণ্ড নির্দিষ্ট হারে পাওয়া যায়—স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয় না। স্বর্ণপিণ্ডের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয় না। কাগজী নোট এবং প্রতীক মুদ্রা বিহিত অর্থ হিসাবে বাজারে চলে এবং ইহাদের পরিবর্তে নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণপিণ্ড দেওয়া হয়। স্বর্ণপিণ্ডের প্রয়োজন একমাত্র আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে হয়। অন্তর্দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যে স্বর্ণ-মুদ্রার ব্যবহার না হওয়ায় ব্যয় সংক্ষেপ হয়। ভারতে ১৯২৭-৩১ সালে স্বর্ণপিণ্ডমান প্রচলিত ছিল।

(২) স্বর্ণপিণ্ডমান

বিহিত মুদ্রার বদলে স্বর্ণপিণ্ড দেওয়া হয়, স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয় না।

কয়েকটি দেশে একসঙ্গে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে, তাহাদের পরস্পরের মুদ্রা বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট থাকে। ১০০ টাকা = ১ তোলা স্বর্ণ। আবার মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রে ১ তোলা স্বর্ণ=২০ ডলার। তাহা হইলে ৫ টাকা=১ ডলার। ডলার ও টাকার বিনিময়ের হার ইহার চেয়ে বিশেষ বেশী কম হইতে পারে না। স্বর্ণমানের ইহাই বিশেষ সুবিধা। স্বর্ণমুদ্রামান বা স্বর্ণপিণ্ডমান বজায় না রাখিয়া এই সুবিধা পাইবার চেষ্টা হইতে **স্বর্ণ বিনিময় মানের** (Gold Exchange Standard) উৎপত্তি হয়। এই ব্যবস্থায় কাগজী নোট বা প্রতীক মুদ্রা অসীম বিহিত অর্থ বলিয়া ঘোষিত হয়। অন্তর্দেশীয় বিনিময় কাজের জন্য ইহার পরিবর্তে স্বর্ণ দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকে না। আন্তর্জাতিক লেনদেনের প্রয়োজনে বিহিত মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে অন্য এক দেশের মুদ্রা দেওয়া হয়।

(৩) স্বর্ণবিনিময় মান

দ্বিতীয় দেশটিতে স্বর্ণমুদ্রামান বা স্বর্ণপিণ্ড মান প্রচলিত থাকে। প্রথম দেশটির স্বর্ণ গচ্ছিত রাখার দরকার নাই। দ্বিতীয় দেশের মুদ্রা জমা থাকিলে দরকার মত তাহার বিনিময়ে স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। গচ্ছিত মুদ্রার উপর ইতিমধ্যে সুদও পাওয়া যাইবে। এই ব্যবস্থায় সাপও মরিল অথচ লাঠিও ভাঙ্গিল না। স্বর্ণমানের সুবিধা অর্থাৎ বিনিময় হারের স্থিরতা বজায় থাকিল। সেজন্য স্বর্ণ আমানত রাখার ব্যয় স্বীকার করিতে হইল না। ভারতে ১৯১৮-১৯২৭ পর্যন্ত স্বর্ণবিনিময় মান প্রচলিত ছিল। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে টাকার বদলে স্বর্ণ দেওয়া হইত না। টাকার সঙ্গে ষ্টার্লিং এর বিনিময় হার নির্দিষ্ট ছিল ১ টাকা=১ শি. ৪ পে। বৈদেশিক দেনা শোধ করিবার দরকার হইলে টাকার পরিবর্তে এই হারে ষ্টার্লিং দেওয়া হইত। ষ্টার্লিং ইচ্ছামত স্বর্ণে পরিবর্তিত করা যাইত। ষ্টার্লিং এ পাওনা লইতে সেজন্য অন্য দেশের আপত্তি হইত না। এদিকে ষ্টার্লিং এর সঙ্গে স্বর্ণের বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকায়, টাকার সঙ্গেও স্বর্ণের বিনিময়হার নির্দিষ্ট থাকিত।

স্বর্ণ মজুত রাখার ব্যয় নাই

অথচ

বৈদেশিক বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকে

স্বর্ণমুদ্রামানে স্বর্ণমুদ্রা বাজারে চালু থাকে অর্থাৎ অন্তর্দেশীয় বিনিময় কার্যে ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণপিণ্ডমানে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকে না এবং আভ্যন্তরীণ দেনা পাওনা সাধারণতঃ স্বর্ণের সাহায্যে মিটান হয় না। স্বর্ণবিনিময় মানে আভ্যন্তরীণ বিনিময় কার্যে স্বর্ণ মুদ্রা বা ধাতু কোন হিসাবেই ব্যবহৃত হয় না।

দ্বিধাতুমান

দ্বিধাতুমানে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় মুদ্রাই প্রামাণিক অর্থ হিসাবে চালু থাকে। উভয় মুদ্রাই অসীম বিহিত অর্থ বলিয়া ঘোষিত হয়। উভয় মুদ্রার মধ্যে বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। এই হার বজায় রাখিবার জন্য উভয়ের অবাধ মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা থাকে।

দ্বিধাতুমানের সুবিধা হিসাবে বলা হয়—অর্থের মূল্য পরিবর্তন ইহার ফলে কম হইবে।

উভয় ধাতুর যোগান একসঙ্গে কমিতে বা বাড়িতে পারে

একটি ধাতুর যোগানের পরিবর্তন যত বেশী হইবে, দুইটি ধাতুর একত্রে যোগান তত বেশী পরিবর্তিত হইবে না। স্বর্ণের যোগান বাড়িলে, রৌপ্যের যোগান কমিতে পারে। মোট যোগানের পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত কম হইবে। অর্থের মূল্য পরিবর্তনও কম মাত্রায় হইবে। এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। স্বর্ণের যোগান বাড়ার সময়, রৌপ্যের যোগান না কমিয়া বাড়িতেও পারে। তাহা হইলে মোট যোগানের পরিবর্তন আরও মারাত্মক হইবে। অর্থের মূল্য আরও অধিক মাত্রায় পরিবর্তিত হইবে।

দ্বি-ধাতুমান ব্যবস্থায় গ্রেসামের নিয়ম কার্যকর হইবে। স্বর্ণ ও রৌপের

উভয় মুদ্রা যুগপৎ চালু রাখার অসুবিধা

বাজার দর, সরকারী বিনিময় হারের সমান নাও হইতে পারে। বাজারে যাহার মূল্য কম, সেই ধাতু নির্মিত মুদ্রাই শেষ পর্যন্ত বাজার ছাইয়া ফেলিবে। দ্বিধাতুমান একধাতুমানে পর্যবসিত হইবে।

গ্রেসামের নিয়ম (Gresham's Law): ভাল মন্দ উভয় রকম মুদ্রা বাজারে একই সঙ্গে চালু থাকিলে, মন্দ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে সরাইয়া বাজার দখল করিবে। (Bad money drives out good money out of circulation) বাজার হইতে ভাল মুদ্রা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। কেবল মাত্র মন্দ মুদ্রা বাজারে চালু থাকিবে। ইহাই হইল গ্রেসামের নিয়ম।

প্রত্যেক মুদ্রার দুই রকম মূল্য থাকে—লিখিত মূল্য ও ধাতব মূল্য (body

ভালমুদ্রা অদৃশ্য হওয়ার কারণ

value)। ধাতব মূল্যের তুলনায় লিখিত মূল্য যত বেশী হইবে সেই মুদ্রাকে তত মন্দ বলিতে হইবে। ভাল মুদ্রা তিন প্রকারে অদৃশ্য হয়। যদি জমাইতে হয়, লোক মন্দ টাকা বিনিময়ের কাজে

(১) জমান

ব্যবহার করিয়া ভাল টাকা জমাইবে। ট্রামে বাসে আমরা পুরাতন ঘষা মুদ্রাই আগে চালাই। যার হাতে পড়িল সে ওইভাবে প্রথমে ওইগুলিকে চালাইতে চেষ্টা করে। ফলে হাতে হাতে পুরাতন মুদ্রাগুলিই চলিতে থাকে। নূতন মুদ্রাগুলি জমা

(২) গলান

হইতে থাকে। ধাতুর প্রয়োজনে মুদ্রা গলাইতে হইলে লোকে যে মুদ্রার ধাতব মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী, সেই মুদ্রাই গলায়। চালের দাম প্রতি সের ৫০ নয়া পয়সা। পুরাতন টাকা দিলে ২ সের পাওয়া যাইবে। নূতন টাকা দিলে ২ সেরই পাওয়া যাইবে। অথচ গলাইলে নূতন টাকা হইতে অধিক পরিমাণে ধাতু মিলিবে।

সুতরাং ভাল মুদ্রা গলান বুদ্ধিমানের কাজ। অন্য দেশে আমাদের টাকা চলে নাই। ধাতুর মূল্য সব দেশেই আছে। বৈদেশিক দেনা দেশীয় টাকা দিয়া শোধ করা যায় না। ধাতু প্রেরণ করিয়া শোধ করা যায়। এজন্য মুদ্রা গলাইতে হইলেও আগের যুক্তি অনুসারে ভাল মুদ্রাই গলান হইবে।

(৩) বিদেশীদের পাওনা মিটান

পুরাতন ও নূতন মুদ্রার মধ্যে পুরাতন মুদ্রার লিখিত মূল্য ধাতব মূল্যের তুলনায় বেশী। সুতরাং ইহা মন্দ মুদ্রা। কাগজী নোট ও ধাতব মুদ্রার মধ্যে কাগজী নোট মন্দ মুদ্রা—ইহার ধাতব মূল্য নাই বলিলেই চলে। দ্বি-ধাতুমানে কোন্ মুদ্রা মন্দ মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হইবে তাহা আর একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার।

ধরা যাক কোন দেশে রৌপ্য ডলার ও স্বর্ণ ডলার বিহিত অর্থ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। প্রতি ডলারে ১ আউন্স ধাতু আছে। সরকার উভয় ডলারের মধ্যে বিনিময় হার নির্ধারিত করিয়াছেন ১ স্ব. ড.=১৬ রৌ. ড.। প্রকারান্তরে বলা যায় সরকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময় হার নির্দিষ্ট করিয়াছেন, ১ আ. স্ব=১৬ আ. রৌ.। বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের এই বিনিময় হার নাও থাকিতে পারে। ধরা যাক বাজারে ১ আ. স্ব.=১৭ আ. রৌ। রৌপ্যের ধাতব (বাজার) মূল্যের তুলনায় সরকারী লিখিত মূল্য বেশী। সুতরাং রৌপ্য ডলারকে মন্দ মুদ্রা বলিতে হইবে। বাজারে শেষ পর্যন্ত কেবলমাত্র রৌপ্য ডলারই চালু থাকিবে। সরকার আমার নিকট ১ স্ব. ড. বা ১৬ রৌ ড পায়। আমার স্ব. ড গলাইয়া ১ আ. স্বর্ণ পাওয়া যাইবে। বাজার হইতে ইহার বিনিময়ে ১৭ আ. রৌপ্য পাওয়া যাইবে। টাঁকশাল হইতে ইহার বিনিময়ে ১৭টি রৌ. ড পাওয়া যাইবে। সরকারের দেনা ১৬ রৌ. ড. দিয়া শোধ হইয়া যাইবে। আমার ১টি রৌ. ড. লাভ থাকিয়া যাইবে। সকলেই এই ভাবে স্ব. ড. গলাইয়া রৌ. ড. সাহায্যে দেনা চুকাইবে। বাজারে শুধু রৌপ্য ডলারই চালু থাকিবে।

গ্রেশামের নিয়ম কিভাবে দ্বি-ধাতুমানকে একধাতু-মানে রূপান্তরিত করে

স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজার বিনিময়ের হার ক্ষণে ক্ষণে বদলাইবে। সরকারকেও সেই হিসাবে উভয় মুদ্রার বিনিময় হার বদলাইতে হইবে। তাহা হইলে আর অর্থ-মূল্যের স্থিরতা থাকিবে না। নতুবা সরকার স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয় করা সুরু করিবে। বাজারে রৌপ্যের চাহিদা বাড়িবে ও স্বর্ণের যোগান বাড়িবে। স্বর্ণের মূল্য কমিতে থাকিবে যতক্ষণ ১ আ স্বর্ণের বিনিময় মূল্য ১৬ আ রৌপ্য না হয়। সরকারকে স্বর্ণ বিক্রয় করিতে

দ্বি-ধাতুমান চালাইবার শর্ত

হইবে। অর্থাৎ সরকারের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ গচ্ছিত থাকা চাই। বিপরীত ক্ষেত্রে সরকার রৌপ্য বিক্রয় করিবে। তাহা করিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণ রৌপ্য গচ্ছিত থাকা চাই। স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতু প্রচুর পরিমাণে হাতে না থাকিলে উভয় মুদ্রা যুগপৎ চালান যাইবে না। আর উভয় ধাতুই যদি এত প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবে দ্বিধাতুমানের কোন প্রয়োজন নাই। যে কোন একধাতুমান প্রচলন করা যাইতে পারে।

কাগজী মুদ্রামান (Paper Standard): কেবলমাত্র ধাতুনির্মিত মুদ্রাই প্রামাণিক অর্থ হইবে এমন কথা নাই। কাগজী নোটও প্রামাণিক অর্থ হিসাবে কাজ করিতে পারে। এই কাগজী নোট অসীম বিহিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষিত হয়। কাগজী নোট চালু থাকিলেই কাগজী মুদ্রামান হয় না। কাগজী নোট যদি পরিবর্তনীয় হয় অর্থাৎ ইহার পরিবর্তে যদি স্বর্ণ, রৌপ্য বা ধাতব প্রামাণিক মুদ্রা পাওয়া যায়—তবে কাগজী নোটের মুখোসে ধাতব মুদ্রাই চলিতেছে বলিতে হয়। কাগজী মুদ্রা প্রামাণিক ধাতব মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। কাগজী মুদ্রামাণের বিশেষত্ব কাগজী মুদ্রার অ-পরিবর্তনীয়তা—ধাতুর সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুতি।

কাগজী মুদ্রামানের সুবিধা: ইহা চালাইবার জন্য স্বর্ণ আমানত রাখার প্রয়োজন নাই। স্বর্ণের সঙ্গে বিহিত মুদ্রাকে গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়না। জাতীয় স্বার্থে মুদ্রা-ব্যবস্থা পরিচালনার স্বাধীনতা আছে। স্বর্ণমানে বৈদেশিক যিনিময় হার স্থির থাকে। কাগজী মানে সে নিশ্চয়তা নাই। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্দিষ্ট রাখিতে হইলে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কাগজী মানে বিহিত মুদ্রার মূল্য স্বর্ণমূল্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বিহিত মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য ঠিক রাখার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালনা দরকার। সেজন্য ইহাকে **পরিচালিত মানও** (Managed Money) বলা হয়।

অর্থ সৃষ্টি (Creation of Money): অর্থ সৃষ্টি করে কে? অর্থ বলিতে কি বুঝিব তাহার উপর এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর নির্ভর করে। কেবলমাত্র প্রামাণিক অর্থ বা বিহিত অর্থকে যদি অর্থ আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় সরকার এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থসৃষ্টির মালিক। ধাতব মুদ্রা সকল দেশে সরকার কর্তৃক প্রচলিত হয়। ধাতব মুদ্রা প্রামাণিক বা প্রতীক হইতে পারে। কাগজী অর্থ বা নোট সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা এককালে সাধারণ ব্যাঙ্কের হাতে ছিল। বর্তমানে সকল দেশেই নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্পিত হইয়াছে। নোট প্রচলন সম্বন্ধে সরকার বিধিনিষেধ আরোপ

সরকারী টাঁকশাল ও ধাতব মুদ্রা

করিয়া আইন প্রণয়ন করে। এই আইন অমান্য করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট প্রচলন করিতে পারে না। সরকারী নির্দেশ কিছু থাকিলে তাহাও মানিয়া চলিতে হয়। আমাদের দেশে ১, ২, ৫, ১০ ন. প. প্রভৃতি ধাতব মুদ্রা সরকারী টাঁকশালে প্রস্তুত হয়। ২, ৫, ১০ প্রভৃতি কাগজী অর্থ বা নোট প্রচলন করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক)। ভারতে ১ টাকার নোট সরকার নিজেই প্রবর্তন করে। সরকার এবং সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক—এই দুই প্রতিষ্ঠানকেই প্রথম দৃষ্টিতে অর্থ সৃষ্টির মালিক বলিয়া মনে হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট

আমরা কিন্তু বিনিময়ের মাধ্যম হইলেই তাহাকে অর্থ আখ্যা দিয়াছি। লোকে যদি ক্রয় বিক্রয় বা লেনদেনের ব্যাপারে স্বীকৃতি দিতে রাজী থাকে, তবে বিহিত অর্থ না হইলেও অর্থ বলিতে আপত্তি নাই। এই হিসাবে চেক বা ব্যাঙ্ক আমানতকেও অর্থের মর্যাদা দিতে হয়। কেন না ইহাদের মাধ্যমেও দেনাপাওনার নিষ্পত্তি হয়। আজ-কাল সকল দেশেই চেক বা ব্যাঙ্ক আমানতের সাহায্যে নিষ্পন্ন বিনিময় কার্যের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ব্যাঙ্কব্যবস্থার যদি আমানত সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও অর্থ সৃষ্টি করিবার অধিকার আছে স্বীকার করিতে হইবে।

অন্যান্য ব্যাঙ্ক চেক বা আমানতী অর্থ সৃষ্টি করে

চেক কি অর্থ? (Are Cheques money ?): চেক বা আমানতের সাহায্যে কিরূপে বিনিময় কার্য সম্পন্ন হয় দেখা যাক। আমি একটি দোকানে ১০০ টাকার মাল খরিদ করিলাম। আমি দেনাদার, দোকানদার হইল পাওনাদার। দেনা শোধ করিবার জন্য আমি দোকানদারকে ১০০ টাকার চেক দিলাম। দোকানদার চেকটি তাহার নামে (account) জমা দিল। ব্যাঙ্কে আমার আমানত ১০০্ কমিল, দোকানদারের আমানত ১০০্ বাড়িল। মালের মালিকানা দোকানদার আমাকে হস্তান্তরিত করিয়াছিল। তাহার বিনিময়ে ১০০্ আমানতের মালিকানা আমার হইয়া ব্যাঙ্ক দোকানদারকে হস্তান্তরিত করিল। লওয়া ও দেওয়া বিনিময়ের দুইটি অংশই সম্পন্ন হইল, বিনিময় চুকিয়া গেল।

চেকের সাহায্যে দেনা পাওনা মিটান

অর্থের সাহায্যে দেনাপাওনা মিটান হয়। আমি চেক দিলেই কিন্তু আমার দেনা মিটিয়া যায় না। ব্যাঙ্কে আমার আমানত না থাকিতে পারে। আমানত থাকিলেও ১০০ টাকার কম হইতে পারে। এই কারণে বা অন্য কারণে ব্যাঙ্ক চেক ফেরৎ পাঠাইতে পারে। তাহা হইলে আমার দেনা রহিয়া গেল। ব্যাঙ্ক আমার নামীয় আমানত কমাইয়া

আমানত হস্তান্তরিত না হইলে দেনার নিষ্পত্তি হয় না

দোকানদারের নামে আমানত ১০০্ বাড়াইয়া লিখিলে তখন আমার দেনা শোধ হইল। অর্থের অনেকবার হাতবদল হইতে পারে। আমাকে দোকানদার বিশ্বাস করে। আমার চেক সে লইতে রাজী হইল। দোকানদার তার নিজের দেনা মিটাইবার জন্য আবার সেই একই চেক ব্যবহার করিতে পারিবে এ সম্ভাবনা কম। দোকানদারের পাওনাদার আমাকে সাক্ষাৎভাবে না চিনিতে পারে। আমার চেক গ্রহণ করিতে সে দ্বিধা বোধ করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বিনিময় কার্য আমার নিকট হইতে যতধাপ দূরে সরিয়া যাইবে, আমার চেকের গ্রাহ্যতাও তত কমিয়া আসিবে। একই চেক দিয়া সাধারণতঃ একাধিক বিনিময় কার্য সম্পন্ন করা যায় না। আমানত হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা নাই, আমানত ১০০্ কমিয়া দোকানদারের আমানত ১০০্ বাড়িল। দোকানদার আবার পাওনাদারকে নিজের চেক দিল। দোকানদারের আমানত ১০০্ কমিয়া দোকানদারের যে পাওনাদার তাহার আমানত ১০০্ বাড়িল। এই ১০০্ আমানত শুধু কলমের আঁচড়ে যতবার খুসী হস্তান্তর করা যায়। এই সমস্ত কারণে অনেকে চেককে অর্থ বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। তাহাদের মতে ব্যাঙ্ক আমানতই হইল অর্থ—চেক আমানত হস্তান্তর করার সুবিধা করিয়া দেয় মাত্র।

একটি চেকের সাহায্যে একাধিক বিনিময় কার্য সম্পন্ন করা যায় না

কিন্তু একই আমানত অনেকবার হস্তান্তরিত হইতে পারে

চুলচেরা বিশ্লেষণ করিলে চেককে অর্থ না বলিয়া ব্যাঙ্ক আমানতকেই অর্থ বলা হয়ত সঙ্গত। কিন্তু আসল প্রশ্ন হইল আমানত কে সৃষ্টি করে? আমানত সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যাঙ্ক বিশেষের এককভাবে অথবা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সমবেতভাবে কতদূর হাত আছে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সেজন্য ব্যাঙ্কের কার্যাবলী ভালভাবে আলোচনা করা দরকার।

ব্যাঙ্ক (Banks): প্রাচীনকালে ধনপ্রাণের নিরাপত্তা ছিল কম। উদ্বৃত্ত টাকাকড়ি বা সোনাদানা নিজের হেপাজতে রাখিতে সাধারণ লোক সাহস পাইত না। যাহাদের ঘরবাড়ী অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত তাহাদের নিকট টাকাকড়ি সোনাদানা গচ্ছিত রাখিয়া নিরাপদ হইত। আমানতকারী এজন্য কোন সুদ পাইত না। বরঞ্চ আমানত গ্রহীতাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হইবে। আমানতকারী টাকাকড়ি বা সোনাদানা গচ্ছিত রাখিয়া তাহার পরিবর্তে আমানত-গ্রহীতার স্বাক্ষর সম্বলিত রসিদ লইত। এই রসিদ দিয়া দেনা মিটান যায়—একথা আবিষ্কার হইতে বেশী সময় লাগিল না। রসিদের বয়ান ক্রমে ক্রমে এইরূপ করা হইল যাহাতে রসিদ যার কাছেই

পরিবর্তনীয় ব্যাঙ্ক নোটের জন্মকথা

থাকুক সে যেন রসিদের বিনিময়ে টাকাকড়ি বা সোনা পাইতে পারে। লোকের সুবিধার জন্য শীঘ্রই ক্ষুদ্র অঙ্কের কতকগুলি রসিদ দিবার প্রথা চালু হইল। এইভাবে আধুনিক পরিবর্তনীয় ব্যাঙ্ক নোটের জন্ম হইল।

লোকে টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখিত সুবিধার জন্য। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে এই গচ্ছিত টাকাকড়ি বা সোনা ফেরৎ লইবার গরজ দেখা যাইত না। পাওনাদার হৃষ্টচিত্তেই রসিদ বা নোট গ্রহণ করিত। নোট দিয়াই ক্রয় বিক্রয় ও লেনদেন প্রচলিত। সুতরাং পাওনাদারও নোটের বিনিময়ে টাকা বা সোনা দাবী করিত না। আমানতগ্রহীতার হাতে টাকাকড়ি ও সোনার পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। গচ্ছিত অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ করার ঝঞ্ঝাট ছিল। ইহার জন্য খরচও করিতে হইত। অন্যদিকে আবার জামিন রাখিয়া ঋণ লইবার লোকেরও অভাব ছিল না। আমানতগ্রহীতা পরের ধনে পোদ্দারী করিবার এই স্বর্ণ সুযোগ ছাড়িয়া দিল না। গচ্ছিত অর্থের বেশ কিছুটা অংশ ধার দিয়া সে সুদ অর্জন করিতে লাগিল। আমানত পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। প্রতিযোগিতার চাপে আমানত গ্রহীতা আমানতকারীকে কিছু সুদ দিতেও রাজী হইল। আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান এই আমানতগ্রহীতার উত্তম পুরুষ।

আমানত গ্রহীতা ঋণ দিতে সুরু করায় পুরোপুরি ব্যাঙ্ক হইয়া পড়িল।

ব্যাঙ্ক সকলকেই টাকা বা সোনা ধার দিত না। অনেক ঋণগ্রহীতাকে নোট ধার দিলেই চলিত। সুদের লোভে কতক কতক ব্যাঙ্ক যথেচ্ছা নোট ধার দিতে লাগিল। কিছুসংখ্যক ঋণগ্রহীতা নোটের পরিবর্তে টাকা বা সোনা দাবী করিবে—ইহা জানা কথা। নোটের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা বা সোনা ফেরৎ লইবার দাবীও বাড়িতে লাগিল। নোটের প্রচলন অতিরিক্ত বাড়ানর ফলে এই দাবীপূরণ করিতে যাইয়া অনেক ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা ও সোনা ফুরাইয়া গেল। তারপর যাহারা নোট ভাঙ্গাইতে আসিল তাহাদিগকে আর টাকা বা সোনা দেওয়া সম্ভব হইল না। অনেক ব্যাঙ্ক ফেল হইল। সাধারণের স্বার্থে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হইল। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য ব্যাঙ্কের নোট প্রচলনের অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইল।

আজকাল অন্যান্য ব্যাঙ্ক নোট প্রবর্তন করিতে পারে না। নোটের স্থান দখল করিয়াছে চেক। ১, ২, ৫, ১০ এই রকম কোন নির্দিষ্ট টাকার নোট হয়। যে কোন টাকার অঙ্কের জন্য চেক ব্যবহার করা যায়। ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা চেক মারফৎ দেওয়া যায়। নোটের সাহায্যে ৫ বা ৬ টাকা দেওয়া যায়, কিন্তু টাকার ভগ্নাংশ দেওয়া চলে না।

চেক ও নোট

নোট খোয়া গেলে কিছু করিবার থাকে না। চেক হারাইয়া গেলেও লোকসান না হয় তার ব্যবস্থা করা সম্ভব। নোট নগদ টাকার পর্যায়ে পড়ে। কে নোট দিল তাহা দেখিবার দরকার নাই। নোট অবাধে হাতবদল হয়। চেক যে সই করিবে, তাহার উপর আস্থা না থাকিলে চেক কেহ লইবে না। একই চেক সেজন্য একাধিকবার ব্যবহৃত হয় না। কেহ চেক গ্রহণ করিলে ধরা চলে যে জানিয়া শুনিয়াই চেক লইয়াছে। সেজন্য চেকের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাই, কিন্তু নোট প্রচলন সরকার কঠোরহস্তে নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত

ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই আমানতকারী ব্যাঙ্কের নিকট টাকাকড়ি গচ্ছিত রাখে। গচ্ছিত টাকা চাহিবামাত্র ফেরৎ পাওয়া যাইবে। এই বিশ্বাস না থাকিলে কেহ ব্যাঙ্কে টাকাকড়ি আমানত রাখিত না। ব্যাঙ্কের পক্ষেও কারবার চালাইবার সুযোগ হইত না। লাভ করিতে হইলে টাকা আমানত রাখিলেই চলিবে না। আমানতী টাকা সুদে খাটানও দরকার। ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যাহারা ঋণ গ্রহণ করে তাহাদের উপর বিশ্বাস না থাকিলে ব্যাঙ্ক পরের টাকা ধার দিতে সাহস করিত না। আমানতকারীর নিকট হইতে ঋণ (credit) লওয়া এবং ব্যবসায়ীকে ঋণ দেওয়া—এই হইল ব্যাঙ্কের কাজ। দুইদিক হইতেই বলা চলে ব্যাঙ্কের কারবার বিশ্বাসের (credit) উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of Banks): ব্যাঙ্কের কাজের ইঙ্গিত উপরের আলোচনা হইতেই পাওয়া যায়। ঋণ লওয়া ও ঋণ দেওয়া এবং অর্থসৃষ্টি—এই তিনটি হইল ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক ছোটখাট অন্যান্য কাজও করে।

(১) সঞ্চয় সংগ্রহ বা ঋণ লওয়া

ব্যাঙ্কের প্রথম কাজ সঞ্চয় সংগ্রহ। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাহাদের সঞ্চয় আমানত হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যাঙ্ক ইহার জন্য আমানতকারীকে সুদ দেয়। আমানতকারী একটি পাসবই ও টাকা তুলিবার জন্য চেকবই পায়। আমানত দুইপ্রকার—(১) চলতি আমানত (Current Deposit) ও (২) স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit)।

চলতি ও স্থায়ী আমানতের মারফৎ সঞ্চয় সংগ্রহ হয়

চলতি আমানতের টাকা যে কোন সময় চেক-মারফৎ ইচ্ছামত উঠান যায়। চলতি আমানতের উপর সাধারণতঃ সুদ দেওয়া হয় না। সুদ দিলেও সুদের পরিমাণ অত্যন্ত কম হয়। স্থায়ী আমানত ২, ৩ বা ৪ বৎসর—এই রকম একটি নির্দিষ্ট সময় বাদে উঠান যায়। ইহার আগে উঠাইবার উপায় নাই। তবে নিজের আমানত জামিন রাখিয়া ধার পাওয়া যায়। এই ধারের উপর অবশ্য সুদ

দিতে হইবে। স্থায়ী আমানতের টাকা ব্যাঙ্ক অনেকদিন নিশ্চিন্তভাবে খাটাইবার সুযোগ পায়। সেজন্য স্থায়ী আমানতের উপর সুদ দেওয়া হয়। চলতি আমানতের সুদের চেয়ে এই সুদ বেশী। আমাদের দেশ আর একপ্রকার আমানত দেখা যায়। ইহার নাম সঞ্চয় আমানত (Savings Deposit)। এই আমানতের টাকা সপ্তাহে একবার উঠান যায়। একযোগে ১০০০্‌র বেশী তুলিতে হইলে পূর্ব্বাহ্নে নোটিশ দিতে হয়। আমানতের উপর সুদের হার চলতি আমানতের তুলনায় বেশী হইলেও স্থায়ী আমানতের তুলনায় কম।

(২) ঋণ দেওয়া

আমানতের উপর সুদ দিতে হয়। ব্যাঙ্ক চালাইতে নানারকম খরচও করিতে হয়। এই খরচ চালাইয়া লাভ করিতে হইলে টাকা খাটাইবার ব্যবস্থা দরকার। ঋণ দেওয়া হইল ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় কাজ। উপযুক্ত জামিন রাখিয়া ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক ধার দিতে পারে। জামিন হিসাবে সোনা বা প্রথমশ্রেণীর শেয়ার দাবী করা হয়। সময় সময় স্রেফ ব্যক্তিগত জামিনেও টাকা ধার দেওয়া হয়।

(ক) সরাসরি ঋণ

ব্যবসাজগতে হুণ্ডি বা বিলের প্রচলন আছে। বিক্রেতা বিলের পরিবর্তে জিনিষ হস্তান্তর করে। বিলের টাকা পাইতে ৯০ দিন পর্যন্ত দেরী হইতে পারে। বিক্রেতার পক্ষে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করা কঠিন। বিক্রেতা তখন বিল বাট্টার (dis-counting) জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে পারে। ৯০ দিনে মেয়াদী ৫০০্‌র বিল ১৭ দিন বাদে ব্যাঙ্কের নিকট বাট্টার জন্য উপস্থিত করা হইল। ক্রেতার নিকট হইতে টাকা পাইতে এখনও ৭৩ দিন বাকী আছে। ব্যাঙ্ক এই টাকার উপর নির্দিষ্ট হারে যেমন ৫% সুদ অগ্রিম কাটিয়া রাখিয়া বাকী ৪৯৫্‌ বিল-বিক্রেতাকে দিয়া দিবে। কার্যতঃ বিলের জামিনে ঋণ দেওয়া হইল। আমানতের উপর ব্যাঙ্ক যে হারে সুদ দেয়, ঋণ দিবার সময় ব্যাঙ্ক সুদ আদায় করে উচ্চতর হারে। এইভাবেই ব্যাঙ্কের লাভ হয়।

(খ) বিলবাট্টা

(গ) বিনিয়োগ

প্রথম শ্রেণীর শেয়ার, বণ্ড বা সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া ব্যাঙ্ক টাকা লগ্নী করিতে পারে। এই ধরণের লগ্নীতে ঝুঁকি নাই বলিলেও চলে। নির্দিষ্টভাবে সুদ পাওয়া যাইবেই। ইহাও ঋণদানের সামিল।

(৩) অর্থসৃষ্টি

আগে নোট ছাপানর অধিকার ব্যাঙ্কের ছিল। বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই অধিকার ভোগ করে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে পারে বা আমানত কমাইয়া অর্থের পরিমাণ কমাইতে পারে।

ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক অন্যান্য টুকিটাকি কাজও করে। মক্কেলের হইয়া জীবনবীমার কিস্তি দেওয়া, শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করা, টাকাকড়ি স্থানান্তরে প্রেরণ করা, ট্রাষ্টি বা এজেণ্ট হিসাবে কাজ করা, ডিভিডেণ্ড আদায় করা ইত্যাদি কাজও করে। এই সব কাজ করার জন্য ব্যাঙ্ক কিছু কমিশন পায়। আগেকার দিনের মত এখনও আমরা মূল্যবান অলঙ্কার ও দলিলপত্র ব্যাঙ্কের হেপাজতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত। এই নিরাপত্তার জন্য আগে যেমন আমানতগ্রহীতাকে অর্থ দিতে হইত, এখনও ব্যাঙ্ককে এজন্য পারিশ্রমিক দিতে হয়।

(৪) বিবিধ

ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার উপযোগিতা (Utility of Banking): বাঙ্কের কার্যাবলী আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায় বর্তমান আর্থিক জগতে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার বিশেষ গুরুত্ব আছে। ব্যাঙ্কে টাকা রাখা অনেক নিরাপদ। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিলে কিছু সুদও পাওয়া যায়। লোকের সঞ্চয় করিবার উৎসাহ বাড়ে। সঞ্চয় না হইলে মূলধন সৃষ্টি সম্ভব নয়। সুসংগঠিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সঞ্চয় বাড়াইয়া মূলধন বাড়াইতে সাহায্য করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে মূলধন সৃষ্টির সুবিধা হয় না। একটি কারখানা ঘর করিতে ১০,০০০৲ দরকার। ৫০ জনের ২০০৲ করিয়া থাকিলে কাহারও পক্ষে এই ঘর তৈয়ার করা সম্ভব হইবে না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাঙ্কে জমা হইয়া কেন্দ্রীভূত হয়। তিল কুড়াইয়া তাল হয়। এখন একযোগে ১০,০০০৲ পাওয়া যাইবে। কারখানা ঘর তৈয়ার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিবে। শুধু সঞ্চয় হইলেই মূলধন হয় না। মূলধন হইতে গেলে বিনিয়োগও প্রয়োজন। বিনিয়োগ করিতে হইলে ঝুঁকি লইতে হইবে। বিনিয়োগ করিতে বিশেষ কুশলতারও প্রয়োজন হয়। সঞ্চয়কারীর এই সব গুণ থাকিবেই এ রকম কোন নিশ্চয়তা নাই। ব্যাঙ্কের ব্যবসায়ই হইল ঋণ দেওয়া। ব্যাঙ্ক ঋণ দিবার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হইয়া উঠে। বিনিয়োগের যোগ্যতা যাচাই করিবার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে। ব্যাঙ্ক সহজে ফাটকাবাজারে (speculation) লগ্নী করিবার জন্য ধার দিবে না। ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। ফলে মূলধনবৃদ্ধির সহায়তা করে।

সঞ্চয় বৃদ্ধি

সঞ্চয় সংগ্রহ

এবং সঞ্চয় বিনিয়োগ

(১) ফলে মূলধন বৃদ্ধি হয়

বিনিয়োগকারীর সাময়িক অসুবিধা দূর করিবার জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রয়োজন।

(২)
দুই রকম ঋণ

অধিকাংশ ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। অধিকাংশ ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত ও শেয়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে চলতি আমানত অনেক বেশী। ইহাদিগকে **বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক** বলে। চলতি আমানত যে কোন সময় চেকের সাহায্যে তুলিয়া লওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া সম্ভবপর নয়।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়

অথচ বিনিয়োগকারীর চলতি মূলধনের জন্য যেমন স্বল্পমেয়াদী ঋণ দরকার, স্থায়ী মূলধনের জন্য সেই রকম দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দরকার। দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিবার জন্য অন্য ধরণের ব্যাঙ্ক আছে। এই সব ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত বেশী। স্বল্পমেয়াদী ঋণ হিসাবে বিলবাট্টার বিশেষ উল্লেখ করা যায়। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রেই বিলের বহুল প্রচলন আছে।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা অন্য ধরণের ব্যাঙ্ক মারফৎ হয়

ব্যাঙ্ক বিলবাট্টা করায় বিক্রেতা দরকারমত টাকা পাইতে পারে। ধার দিতে আপত্তি হয় কম। ধারে কারবার না চলিলে ব্যবসা-বাণিজ্য অনেক সঙ্কুচিত হইত।

বাণিজ্যের প্রসার হয়

নিরন্তর ব্যবহারের ফলে মুদ্রার চাকচিক্য নষ্ট হয় ও ওজন কমিয়া যায়। শেষ পর্যন্ত অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। কাগজী নোট আরও তাড়াতাড়ি নোংরা হয়। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে এই সব পুরাতন প্রায় অব্যবহার্য মুদ্রা সরাইয়া তাহার পরিবর্তে নূতন মুদ্রা চালু হয়। নগদ টাকার চাহিদা দেশের সর্বত্র সমান হয়। চাহিদা কোন অঞ্চলে কম, কোন অঞ্চলে বেশী। এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে নগদ টাকা ব্যাঙ্কের সাহায্যেই স্থানান্তর করা হয়। ব্যাঙ্ক চেকের প্রচলন করায় কারেন্সীর প্রয়োজন কম হয়।

(৩)
কারেন্সী কম দরকার হয়

ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করিয়া অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে পারে। উৎপাদন যখন বাড়ার দিকে থাকে ক্রয়বিক্রয় ও লেনদেন বাড়ে। অর্থের চাহিদাও বাড়ে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থের যোগান না বাড়াইতে পারিলে উৎপাদন বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে।

(৪)
অর্থের যোগান প্রয়োজনমত বৃদ্ধি করে

ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করিতে এবং মূল্যবান অলঙ্কার ও দলিলপত্র সংরক্ষণ করিতে আমাদিগকে সাহায্য করে। ভ্রমণকারীদের জন্য বিশেষ চেকের ব্যবস্থা ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার অন্যতম সুফল। অল্প খরচে টাকা পাঠানর ব্যবস্থা করিয়া ব্যবসায়ী-সমাজের ও জনসাধারণের অশেষ উপকার করে।

(৫)
বিবিধ

বিভিন্ন ধরণের ব্যাঙ্ক (Type of Banks): বিক্রয়-বাজার সম্প্রসারিত হইলে বিশেষীকরণ দেখা দেয়। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ব্যাঙ্কের কাজ বর্তমানে বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক জগতেও বিশেষীকরণ দেখা দিয়াছে। একটি বিশেষ ব্যাঙ্ক এখন ব্যাঙ্কের সমস্ত কাজ করিবার চেষ্টা করে না। এক একটি ব্যাঙ্ক এক একটি বিশেষ কাজ করে। ইহার ফলে বিভিন্ন ধরণের ব্যাঙ্কের উদ্ভব হয়। এই ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Banks): কার্যতঃ প্রায় সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বর্তমানে যৌথ মূলধনী ভিত্তিতে সংগঠিত এবং ইংলণ্ডের প্রথম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড যৌথ মূলধনী ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছিল। এই দ্বিবিধ কারণে যৌথ মূলধনী ভিত্তিতে গঠিত হইবার বাধ্যবাধকতা না থাকিলেও ইহাদের যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক বলা হয়।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে পারে না

ইহারা চলতি কারবারের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। ইহাদের বেশীর ভাগ আমানত চলতি আমানত। স্বল্পমেযাদী আমানত রাখিয়া দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া চলে না। ২।৩ মাসের অধিক মেয়াদে ইহারা ধার দেয় না। সাধারণতঃ সোনা, হুণ্ডী বা প্রথম শ্রেণীর শেয়ার জামিন রাখিয়া ধার দেয়। সোনা যখন তখন বিক্রয় করা যায়। হুণ্ডীর টাকা আদায় হইতে ৯০ দিনের বেশী লাগিবে না। হুণ্ডী ও ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ার ইচ্ছামত বিক্রয় করাও যায়। প্রয়োজন হইলে এই জামিন বিক্রয় করিয়া টাকা ওয়াশীল করিতে বেগ পাইতে হয় না। স্থাবর সম্পত্তি সহজে বিক্রয় করা যায় না। সেজন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বাড়ীঘর বা জমি জামিন রাখিয়া টাকা দেয় না।

জামিন সহজে বিক্রয়যোগ্য না হইলে ঋণ দেয় না

ব্যাঙ্ক বলিলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককেই বুঝায়। অন্য ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার হইলে তাহার নাম স্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে।

বিনিময় ব্যাঙ্ক, শিল্প ব্যাঙ্ক, জমীবন্ধকী ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক: বিনিময় ব্যাঙ্কের (Exchange Banks) প্রধান কাজ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করা বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রসদ যোগান দেওয়া। শিল্প ব্যাঙ্কের (Industrial Banks) কাজ হইল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরাসরি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া বা সেই উদ্দেশ্যে ইহাদের শেয়ার বা বণ্ড ক্রয় করা। জমী বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Banks) জমি বন্ধক রাখিয়া জমির স্থায়ী উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়। সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Banks)-এর স্বাতন্ত্র্য হইল ইহা মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Banks): প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা দূর করিবার জন্য অর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। মানুষের ভৃত্য অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিলে অর্থের দ্বারা প্রভূত উপকার হয়। এই অর্থ ই যখন প্রভু হইয়া আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়া যায় তখন বিপর্যয় দেখা দেয়। সরকারের আর্থিক নীতি বানচাল হইয়া যাইতে পারে। সরকার মূল্যস্তর অপরিবর্তিত রাখিতে চায়। এদিকে ব্যাঙ্কগুলি যদি ঋণ (loan) বাড়াইয়া চলে এবং ফাটকাবাজারীদের ঋণ দেওয়া না কমায়, তবে টাকাকড়ির যোগান বাড়িবে। জিনিষপত্রের দামও উর্ধ্বমুখী হইবে। সরকারী নীতি ব্যর্থ হইবে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক মুনাফার আশায় ব্যবসা করে। ঋণ বাড়াইলে যদি মুনাফা বাড়ে, তাহারা জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়া ঋণ বাড়াইতে ইতস্ততঃ করিবে না। সরকার প্রচলিত টাকাই একমাত্র টাকা নয়। ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণ বাড়িলে তাহাও অর্থবৃদ্ধির সামিল। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহায। সরকারী আর্থিক নীতি কাযকরী করিতে হইলে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা জাতীয় স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সকল দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিরপেক্ষ দর্শক হইয়া থাকিলে চলিবে না। আর্থিক নীতি সফল করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সকল দেশেই ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়।

(১) নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকারী। অন্যান্য ব্যাঙ্ক মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত। তাহাদের হাতে নোট প্রচলনের ক্ষমতা দেওয়া বিপজ্জনক। মুনাফার লোভে তাহারা অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া বসে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। নোটের উপর আস্থা থাকে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুনাফার জন্য কাজ করে না। সেজন্য নোট প্রবর্তনের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। তা ছাড়া সমস্ত নোট এক জাতীয় (uniform) হইলে জনসাধারণের মনে সহজে আস্থা হয়।

(২) ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে ঋণ-ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। ব্যাঙ্ক ঋণ দিলে আমানত সৃষ্টি হয়। এই আমানতও টাকাকড়ির কাজ করে। ব্যাঙ্কের আমানত সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ না করিতে পারিলে টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে না। ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত ব্যাঙ্কের নগদ টাকার উপর নির্ভর করে। নোটের পরিমাণ বাড়াইলে কমাইলে অন্যান্য ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা বাড়িবে কমিবে। সঙ্গে সঙ্গে ঋণ দিবার ক্ষমতাও বাড়িবে কমিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে

নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার কতকটা এইজন্য দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি করিয়া ঋণ-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে তাহা একটু পরেই আমরা আলোচনা করিব।

(৩) অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানত রাখে। এই আমানতের উপর সুদ দেওয়া হয় না। তবে ইহার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই ব্যাঙ্কগুলিকে কিছু কিছু সুবিধা দেয়। একবার বাট্টা করা বিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট পুনর্বাট্টা করিয়া (rediscounting) ইহারা নোট পাইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের শেষ ভরসাস্থল। সাময়িক বিপদের সময় অন্য কোথাও সুবিধা না হইলে ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ পাইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ দিবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। অবশ্য এই ঋণ বিনামূল্যে দেওয়া হয় না। বাস্তবিক এই ঋণের উপর সুদের হার কমাইয়া বাড়াইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

(৪) সরকারের ব্যাঙ্কার

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহিত সরকারের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। সরকারের উদ্বৃত্ত টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে আমানত থাকে। আবার দরকার হইলে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে। সরকারের ঋণ পরিচালনার ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের হইয়া টাকাকড়ি এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় প্রেরণ করে। সরকারী আয়-ব্যয় ও সরকারী ঋণ আজকাল অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থের বাজার ইহা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর অর্থের বাজার (Money Market) নিয়ন্ত্রণ করার ভার। সরকারী কাজকর্ম কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে না হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে কাজ করা কঠিন হইয়া উঠিবে।

(৫) বৈদেশিক বিনিময় হার বজায় রাখা

বৈদেশিক বিনিময়হার স্থির না থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধা হয়। অন্যান্য দেশের মুদ্রার সহিত দেশীয় মুদ্রার নির্দিষ্ট বিনিময়-হার বজায় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কাজ। এজন্য বৈদেশিক মুদ্রা ও সোনা ক্রয়-বিক্রয় করিতে হয়।

(৬) বিবিধ

ইহা ছাড়া প্রতীক মুদ্রাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া বাজারে চালু রাখা, নিকাশী ঘর (clearing house) হিসাবে অন্যান্য ব্যাঙ্ককে পারস্পরিক দেনা মিটাইতে সাহায্য করা এবং সাধারণভাবে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির খবরদারী করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Central Bank and Credit control) : ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আমরা আগেই আলোচনা করিয়াছি। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কাজ ঋণ নিয়ন্ত্রণ তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি করিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে সেই আলোচনা এখন করা হইবে।

সলা-পরামর্শ ও উপদেশ (Informal contacts and Advice) : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক সমাজের মধ্যমণি। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতা আছে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক সে কথা জানে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের শেষ ভরসাস্থল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপদেশের দাম আছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণনীতি অনিষ্টকর মনে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণনীতির পরিবর্তন করার জন্য অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট আবেদন জানাইতে পারে। অন্যান্য ব্যাঙ্ক সচরাচর এই উপদেশ অমান্য করিতে সাহস পায় না। তাহারা ঋণনীতির যথোপযুক্ত পরিবর্তন করিলে অন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না।

(ক) নৈতিক প্ররোচনা ও উপদেশ

অনেক সময় কেবলমাত্র উপদেশ ও পরামর্শে কাজ হয় না। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত উপায়ে অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর চাপ দিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার পরিবর্তন (Changes in the Bank Rate) : অন্যান্য ব্যাঙ্কের নগদ টাকা কমিয়া গেলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হোলোশুন্ডি ধার লইবার জন্য বা বিল পুনর্বাটার জন্য আসিতে হয়। ঋণের পরিমাণ কমান দরকার মনে করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার বাড়াইয়া দেয়। অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণ লইবার উৎসাহ কমিয়া আসে। তাহারাও সুদের হার বাড়াইতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্কের মক্কেলরাও ঋণ কম করিয়া লয়। মোট ঋণদানের পরিমাণও কমিয়া আসে।

সুদের হার পরিবর্তন

খোলাবাজারী কারবার (Open Market Operations) : অন্যান্য ব্যাঙ্কের তহবিলে উদ্বৃত্ত নগদ টাকা থাকিতে পারে। তাহা হইলে ঋণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যাইবার দরকার নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সুদের হার কমান বাড়ানর সঙ্গে এক্ষেত্রে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ঋণদানের কোন সম্বন্ধ নাই। উদ্বৃত্ত নগদ টাকা যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরোয়া না করিয়া অন্যান্য ব্যাঙ্ক অনায়াসে ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়া চলিতে পারে। এই সময় খোলাবাজারী কারবার শুরু করার দরকার হয়। খোলাবাজারী কারবার মানে সরকারী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়। ঋণের পরিমাণ কমান দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রয় করিতে পারে। ঋণপত্রের ক্রেতা ——

(২) খোলাবাজারী কারবার

আমানত হইতে টাকা তুলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দাম দেয়। ব্যাঙ্কের নগদ টাকা কমিয়া যাইবে। ক্রেতা অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে চেক দিতেও পারে। তাহা হইলে যে ব্যাঙ্কের উপর চেক দেওয়া হইবে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে রক্ষিত সেই ব্যাঙ্কের আমানত কমিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রক্ষিত আমানতকে অন্যান্য ব্যাঙ্ক নগদ টাকার সামিল মনে করে। এক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের নগদ টাকা কমিয়া যাইবে। ক্রমান্বয়ে নগদ টাকা কমিয়া গেলে আমানতের তুলনায় নগদ টাকার পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়া যাইবে। তখন নূতন করিয়া আর আমানত সৃষ্টি করা চলিবে না। যে সমস্ত পুরাতন ঋণ শোধ হইবে তাহার পরিবর্তে আর নূতন আমানত সৃষ্টি করা হইবে না। নগদ টাকা কমিয়া যাওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের জন্য যাইতে হইবে। তখন 'সুদের হার পরিবর্তন' নীতি কার্যকর হইবে।

জমার অনুপাতের পরিবর্তন (Variation in the Reserve Ratio): অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই অংশ বাড়াইতে কমাইতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ২% এর জায়গায় ৪% গচ্ছিত রাখিতে হইলে ব্যাঙ্কের নগদ টাকা কমিয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঋণদান ও আমানত সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যাইবে।

(৩)
জমার অনুপাতের পরিবর্তন

ঋণ বরাদ্দ নীতি (Rationing of Credit): কোন কোন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে আরও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন্ ব্যাঙ্ক কত ঋণ দিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে।

(৪)
ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে

গুণগত নিয়ন্ত্রণ (Qualitative Control): কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মোট ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করে। এই মোট ঋণ বিভিন্ন শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিবার ভার থাকে সাধারণতঃ অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির উপর। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সচরাচর উচ্চবাচ্য করে না। সময় সময় এই ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতে হয়। আমাদের দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সময় সময় চাল, চিনি বা অন্য বিশেষ দ্রব্যের ব্যাপারে ঋণ কমাইবার নির্দেশ জারী করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া আমরা বরাবর ঋণদান সঙ্কুচিত করিবার ক্ষমতা আলোচনা করিয়াছি। ঋণদান বাড়াইবার কথা একবারও বলা হয় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণদান বাড়াইবার জন্য সুদের হার জমার অনুপাতে কমাইতে পারে। ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের হাতে উদ্বৃত্ত নোট তুলিয়া দিতে পারে। ঋণ বাড়াইবার এই সুযোগ ব্যাঙ্ক নাও লইতে পারে। ঋণ দিলে ঋণ

পরিশোধ হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা দেখিতে হইবে। বিশ্বাসযোগ্য (Credit-worthy) খাতক না মিলিলে ঋণ দেওয়া চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ ব্যাঙ্কের ইচ্ছা থাকিলেই হইবে না। যে ঋণ লইবে তাহারও আগ্রহ দরকার। ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা চলিলে লোকে লোকসানের ভয়ে ঋণ পাইলেও ঋণ লইতে চায় না। ঋণদান সংযত করিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পারে। মন্দার সময় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রায় অপরাগ।

ব্যাঙ্ক কি করিয়া অর্থ সৃষ্টি করে (How banks create money) : ব্যাঙ্কের আমানত হস্তান্তর করিয়া ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন হয়। আমানতকে সেজন্য আমরা অর্থ আখ্যা দিয়াছি। আমানত সৃষ্টির ব্যাপারে যদি সব সময় আমানতকারীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, তবে বলিতে হইবে অর্থ সৃষ্টির ক্ষমতা ব্যাঙ্কের নাই। ব্যাঙ্কের যদি নিজস্ব উদ্যোগে আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা থাকে, তবে অর্থসৃষ্টির ক্ষমতাও আছে স্বীকার করিতে হইবে।

আমানতকারীর উদ্যোগে আমানত সৃষ্টি

আমি নগদ ১০০ টাকা ব্যাঙ্কে লইয়া জমা দিলাম। বিনিময়ে ব্যাঙ্ক আমার নামে ১০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করিল। নগদ ১০০ টাকার পরিবর্তে আমানতী ১০০ টাকা চালু হইল। চালু টাকাকড়ির পরিমাণ আমানত সৃষ্টির আগে যা ছিল পরেও তাহাই রহিল।

ব্যাঙ্কের উদ্যোগে আমানত সৃষ্টি

আমার এই টাকা না পাইলেও কিন্তু ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়া আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। কার্যাবলী আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি ঋণ দেওয়া ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ। ঋণ নগদ টাকায় দেওয়া হয় না। যাহাকে ঋণ দেওয়া হয় তাহার নামে ঋণের পরিমাণ আমানত সৃষ্টি করা হয়। এই ধরণের আমানত সৃষ্টিই হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক অর্থ সৃষ্টি।

অর্থসৃষ্টির ক্ষমতা ব্যাঙ্কের কতদূর আছে তাহা বুঝিতে হইলে ব্যাপারটির আরও বিশদ আলোচনা দরকার। ধরা যাক দেশে একটি মাত্র ব্যাঙ্ক। আমাদের সকলের এই ব্যাঙ্কে আমানত আছে। আমি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে করকরে ১০০০ টাকা লইয়া ব্যাঙ্কে জমা দিলাম। ব্যাঙ্ক আমার নামে ১০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি করিল। বেশীর ভাগ পাওনাদারকে আমি দেনা শোধ করিবার জন্য চেক দিলাম। সামান্য কিছু নগদ টাকাও আমার দরকার মত তুলিলাম। আমার নিকট হইতে যাহারা চেক পাইল, তাহারা সেই সমস্ত চেক ব্যাঙ্কে তাহাদের নামে জমা দিল। তাহাদেরও কিছু কিছু নগদ টাকা দরকার হইতে পারে। তাহারাও বেশীর ভাগ দেনা চেকে শোধ

করিল। এই চেকগুলি যাহারা পাইল তাহারা আবার সেগুলি ব্যাঙ্কে জমা দিল। আমানতের সামান্য অংশই নগদ টাকা হিসাবে তুবিবার দরকার হইবে। প্রত্যেক দিন আমানতের একই অংশ নগদ টাকায় পরিবর্তিত হইবে না। কোন দিন একটু বেশী, কোন দিন একটু কম নগদ টাকার দরকার হইবে। ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা ব্যাঙ্ককে বলিয়া দেয় আমানতের কত অংশ নগদ টাকায় রাখিলে আমানতকারীদের নগদ টাকার চাহিদা মিটান যাইবে। ধরা যাক আমানতের ১০% নগদ টাকায় রাখা দরকার বলিয়া ব্যাঙ্ক মনে করে।

আমানতের একাংশ মাত্র নগদ টাকায় রাখিতে হয়

তাহা হইলে ১০০০ টাকা আমানতের জন্য ১০% বা ১০০ টাকা নগদ রাখিলেই হইবে। বাকী ৯০০ টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ দিতে পারে। ব্যাঙ্ক ঋণদাতাকে নগদ টাকা ঋণ দেয় না। ঋণ গ্রহীতার নামে ঋণের পরিমাণ আমানত দেখায়। ঋণগ্রহীতা তাহার সুবিধামত চেকের সাহায্যে খরচ করে। ব্যাঙ্ক ৯০০ টাকা ককে ধার দিল। ক-এর নামে ৯০০ টাকা আমানত দেখান হইল। ক কিন্তু নগদ টাকা জমা দেয় নাই। এখানে তাহা হইলে আমানতের দরুণ টাকা না পাইয়াও ব্যাঙ্ক আমানত সৃষ্টি করিতে পারিল। এই ৯০০ টাকার আমানত হইল ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট অর্থ।

সুতরাং নূতন আমানত সৃষ্টি করা যায়

এই ৯০০ টাকা সম্পূর্ণ নগদ রাখিবার দরকার নাই। ইহারাও একাংশ মাত্র নগদ টাকায় তুলিবার প্রয়োজন হইবে। ধরা যাক, আগের মত ১০% নগদ টাকা রাখা দরকার। ৯০০ টাকা আমানতের জন্য ৯০ টাকা নগদ রাখিয়া, বাকী ৮১০ টাকা নূতন ধার দেওয়া যাইবে। ৮১০ টাকার নূতন আমানত সৃষ্টি হইবে। ইহার জন্য আবার ৮১ টাকার নগদ রাখিতে হইবে। বাকী ৭২৯ টাকা নূতন ধার দেওয়া যাইবে। ৭২৯ টাকার নূতন আমানত সৃষ্টি হইবে। এই ভাবে পর পর ব্যাঙ্ক নূতন আমানত সৃষ্টি করিয়া চলিবে। প্রতিবারের নূতন আমানত আগের বারের চেয়ে পরিমাণে কম। প্রত্যেক আমানত সৃষ্টির সময় কিছু নগদ টাকা জমা রাখিতে হয়। সমস্ত কাজই যদি চেক মারফৎ হইত তবে নগদ টাকা জমা রাখিবার কোন প্রয়োজন হইত না। ব্যাঙ্কের আমানতী অর্থ সৃষ্টি করিবার অবাধ ক্ষমতা থাকিত।

আমাদের দৃষ্টান্তে ব্যাঙ্ক ১০০০ টাকা নগদ পাইয়া আমানত সৃষ্টি করিতে পারে ১০০০+৯০০+৮১০+৭২৯.........=১০,০০০ টাকা।* ইহার মধ্যে ব্যাঙ্ক ঋণ

*$১০০০+৯০০+৮১০+৭২৯\cdots\cdots = \frac{১০০০}{১-\frac{৯}{১০}} = ১০,০০০$ ইহা একটি জ্যামিতিক প্রগতি

দিবার ফলে ৯০০০ টাকার আমানত সৃষ্টি হইয়াছে। চেকের তুলনায় নগদ টাকার ব্যবহার যত বেশী হইবে, আমানতের তত বেশী অংশ নগদ টাকায় রাখিতে হইবে। নূতন আমানত সৃষ্টির ক্ষমতাও তাহা হইলে কমিয়া আসিবে। আমানতের ২০% যদি নগদ টাকায় রাখিতে হয়, তবে ১০০০ টাকা নগদ পাইলে মোট আমানত সৃষ্টি করা চলিবে ৫০০০ টাকার। অর্থাৎ নূতন আমানত সৃষ্টি হইবে মাত্র ৪০০০ টাকার।

আমানতকারীদের নগদ টাকার প্রয়োজন যত কম হইবে, আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা তত বেশী হইবে

দেশে একটি মাত্র ব্যাঙ্ক থাকে না। ব্যাঙ্কের সংখ্যা যত বেশী হোক, ব্যাঙ্কগুলির আমানত সৃষ্টি করিবার ক্ষমতার কোন তারতম্য এজন্য হয় না। একটি মাত্র ব্যাঙ্ক থাকিলে, নোট ও চেক ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই ব্যাঙ্কেই জমা পড়িবে। একাধিক ব্যাঙ্ক থাকিলে আমি যে ব্যাঙ্কের মক্কেল, আমার পাওনাদাররা সেই ব্যাঙ্কের মক্কেল নাও হইতে পারে। আমি আমার পাওনাদারকে যে চেক দিলাম, তাহা অন্য ব্যাঙ্কে জমা পড়িতে পারে। টাকাকড়ি আমার ব্যাঙ্ক হইতে পাওনাদারের ব্যাঙ্কে স্থানান্তরিত হইবে, আমার ব্যাঙ্কের আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা কমিবে। কিন্তু আমার পাওনাদারের ব্যাঙ্ক এখন বেশী পরিমাণে আমানত সৃষ্টি করিতে পারিবে। হরেদরে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আমানত সৃষ্টির ক্ষমতা আগের মতই থাকিয়া যায়।

একাধিক ব্যাঙ্ক থাকিলে ব্যাঙ্কের পরিবর্তে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা লিখিলেই চলিবে

ঋণ দিবার আগে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার দেনাপাওনার হিসাব হইবে—

দেনা		পাওনা	
আমানত	১০০০৲	নগদ	১০০০৲

ঋণ দিবার পর এই হিসাব দাড়াইবে—

আমানত	১০,০০০৲	নগদ	১০০০৲
		(ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ	৯০০০৲
	১০,০০০৲		১০,০০০৲

যখনই ঋণ দেওয়া হয়, সঙ্গে সঙ্গে আমানত অর্থের সৃষ্টি হয়। ব্যাঙ্কের ঋণ দিবার ক্ষমতা ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। নগদ টাকার যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করে। ব্যাঙ্কের ঋণদান নিয়ন্ত্রণ করিতে হইলে, নগদ টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দরকার। এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারী কারবার করে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার যোগান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আমানত সৃষ্টিতে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে

অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানতের কিছু অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখে। অনেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে। জমার অনুপাত যত বাড়ান যাইবে, বাঙ্কের হাতে নগত টাকার পরিমাণ তত কমিবে। ব্যাঙ্কের ঋণদানের ক্ষমতাও কমিবে।

অন্যান্য ব্যাঙ্ক তাহাদের আমানতের একটা নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ইহা ছাড়াও ব্যাঙ্কগুলি উদ্বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই আমানতের সমপরিমাণ বিহিত মুদ্রা রাখে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আবার ইহার ভিত্তিতে ঋণদান করে। আমরা নগদ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই। ব্যাঙ্কগুলি আবার নগদ টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে তুলিয়া দেয়। জনে জনে নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নগদ টাকা জমা রাখিলে অনেক নগদ টাকার দরকার হইত। নগদ টাকার জমা (reserve) এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে, এই বিরাট বহরে ও ধাপে ধাপে ঋণ দেওয়া সম্ভব হয়। ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সেইজন্য সমস্ত দেশেই স্বীকার করা হয়। এই কারণেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিপত্তি এত বাড়িয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজেও আমানতের পরিমাণ বাড়াইতে পারে

ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (Banking System in India) : পাশ্চাত্য প্রথায় পরিচালিত বৃহৎ ব্যাঙ্ক, দেশীয় প্রথায় পরিচালিত মহাজনী ব্যাঙ্ক, সরকারী ঋণদান প্রতিষ্ঠান এবং আরও অন্যান্য ব্যাঙ্ক ভারতে আছে। বিভিন্ন জাতীয় ব্যাঙ্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খবরদারি সর্বত্র সমানভাবে খাটে না। একটি নয়, মনে হয় কয়েকটি ব্যাঙ্কব্যবস্থা পাশাপাশি চলিতেছে। রকমারি ব্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও ভারতে দশ লক্ষ লোকপিছু মাত্র ১১টি ব্যাঙ্ক আছে। অষ্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫০ ও ২২৯।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India) : ইহা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ১৯৩৩ সালের আইন অনুসারে ১৯৩৫ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা। ইহা ছিল অংশীদারগণের ব্যাঙ্ক। প্রতি শেয়ারের দাম ধার্য হয় ১০০৲। বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন যোগাড় হয়। ১৯৪৯ সালে ইহা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। ক্ষতিপূরণ দিয়া সরকার সমস্ত শেয়ার কিনিয়া লয়।

রাষ্ট্র ইহার বর্তমান মালিক

একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের উপর ইহার পরিচালনাভার ন্যস্ত। বোর্ডের প্রধান কর্মসচিবকে 'গভর্ণর' বলা হয়। কেন্দ্রীয় বোর্ডের কার্যালয় বোম্বাইয়ে। ইহা ছাড়া কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও দিল্লীতে চারিটি স্থানীয় বোর্ডও আছে। কেন্দ্রীয় ও

স্থানীয় বোর্ডগুলির সদস্যরা সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি নির্ধারণ করিয়া দেয়। এই নীতি অনুসরণ করিয়া কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বোর্ডগুলি কাজ করে।

পরিচালনা

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত কিছু কিছু সাধারণ কাজকর্ম (General Banking functions) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে, যেমন বিলবাট্টা, ষ্টার্লিং কেনাবেচা, রাজ্য সরকার ও সমবায় সমিতি প্রভৃতিকে ঋণ দেওয়া, আমানত (বিনা সুদে) গ্রহণ করা ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ (Central Banking functions) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুইটি বিভাগ আছে—(১) নোট প্রচলন বিভাগ (Note-issue Department) ও (২) ব্যাঙ্কিং বিভাগ (Banking Department)।

এক টাকার নোট বাদে অন্যান্য কাগজী নোট প্রচলনের একমাত্র অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে। আগেকার নিয়মে নোট প্রচলন বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রার জমাও বাড়াইতে হইত। পরিকল্পনার খাতিরে ঘাটতি ব্যয় করিতে হইতেছে। সেজন্য নোট বেশী ছাপাইতে হইতেছে। এদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি মিটাইতে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিলে হাত দিতে হইতেছে, সেজন্য জমার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ শিথিল করার প্রয়োজন হয়। বর্তমানে ২০০ কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন পরিমাণ নোট ছাপাইতে পারে।

**(১)
নোট প্রচলন**

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের চলতি আমানতের ৫% এবং স্থায়ী আমানতের ২% রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়। প্রয়োজন বোধ করিলে জমার পরিমাণ ৪ গুণ বাড়াইবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে। তপশীলী ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট সাপ্তাহিক হিসাব নিকাশ দাখিল করিতে হয়। ইহার বিনিময়ে তপশীলী ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে জামিন রাখিয়া ঋণ পাইবার ও বিল পুনর্বাট্টা করিবার সুবিধা পায়।

**(২)
ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার**

সরকারের ব্যাঙ্কের হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাজ করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলি তাহাদের উদ্বৃত্ত অর্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ ঋণপত্র বিক্রয় করে। ঋণ পরিশোধের কাজও এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হয়। সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

**(৩)
সরকারের ব্যাঙ্কার**

শিল্পঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Industrial Finance Corporation) স্থাপন করিয়াছেন। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। ভারত সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ইত্যাদি ইহার শেয়ার কিনিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান ২০ বৎসরের মেয়াদে ঋণ দিতে পারে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ঋণ দিবার জন্য ১৯৫২ সাল হইতে সুরু করিয়া বিভিন্ন রাজ্য সরকার রাজ্য ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (State Finance Corporations) স্থাপন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (Industrial Credit and Investment Corporation), শিল্পোন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (Industrial Development Corporation), পুনঃ ঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Re-finance Corporation) এবং জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান (National Small Industrial Corporation) স্থাপিত হইয়াছে।

সরকারের ব্যাঙ্কিং কার্য (Government as Banker) : ভারত সরকার পোষ্ট অফিস সঞ্চয় ব্যাঙ্ক পরিচালনা করে। বর্তমানে এক নামে (account) ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত রাখা হয়। ১০,০০০, টাকা পর্যন্ত ২½% এবং তাহার বেশী হইলে ২% সুদ দেওয়া হয়। আজকাল অনেক পোষ্ট অফিসে চেক মারফৎ টাকা উঠাইবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক না থাকিলেও, পোষ্ট অফিস অনেক জায়গায় আছে। সরকারের উপর আস্থাও বেশী হয়। পোষ্ট অফিসে টাকা আমানত রাখিতে কেহ ভয় পায় না। ১৯৫৮-৫৯ সালে ৫৮২ কোটি টাকা পোষ্ট অফিসে আমানত ছিল। ইহা ছাড়া সরকার কৃষককে তকভি (Taccvi) ঋণ এবং ক্ষুদ্রশিল্প সংরক্ষণের জন্য অগ্রিম ঋণও দেয়।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Banks) : শিল্পের মত কৃষিতেও স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয় প্রকার ঋণের প্রয়োজন হয়। চলতি মূলধনের জন্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ। স্থায়ী উন্নতির জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ। সমবায় ব্যাঙ্ক স্বল্পমেয়াদী ঋণ দেয়। কৃষককে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুবিধা দিবার জন্য জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হয়। জমি বন্ধক রাখিয়া জমির দামের অর্ধেক ধার দেওয়া যায়। পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্যই বেশীর ভাগ ঋণ দেওয়া হয়। জমির স্থায়ী উন্নতিকল্পে ঋণদানের পরিমাণ সামান্য। মাদ্রাজ ও বোম্বাই ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে ইহা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

দেশীয় ব্যাঙ্ক (Indigenous Banks) : সাবেকী পদ্ধতিতেই ইহারা কাজ করে। বিভিন্ন জায়গায় ইহারা মহাজন, সাহুকর, চেট্টি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত ; ব্যক্তিগত বা পারিবারিক মালিকানায় ও পরিচালনায় ইহাদের কাজ

চলে। ইহারা বাহিরের আমানত সামান্যই রাখে। নিজের টাকাই ধার দেয়। এই ব্যাঙ্কগুলি হুণ্ডী কাটে। এই হুণ্ডী দেশের সর্বত্র গ্রাহ্য হয়। কৃষকদের মোট ঋণের ৬% যোগায় সরকার ও সমবায় সমিতি। মহাজনের উপর অনেকদিন নির্ভর করিতে হইবে। ইহাদের সুদের হার চড়া। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব ইহাদের উপর খাটে না। অথচ ইহাদের বাদ দিলে চাষীর ঋণের প্রয়োজন মিটান অসম্ভব। ইহাদের উন্নয়ন ব্যবস্থা করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অন্য অংশের সহিত ইহাদের সম্পর্ক স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার।

সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Banks): ইহাদের সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হইয়াছে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **What are the difficulties attending exchange by barter. Show how these difficulties are overcome by the use of money.**
   প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা কি কি? অর্থ ব্যবহারের ফলে এই সব অসুবিধা কি করিয়া দূর হয় বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ১৮৮-১৮৯]
2. **What is money? What are its functions?**
   অর্থ কাহাকে বলে? অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৮৯, ১৯৩-১৯৫]
3. **Explain the qualities of a good money material.**
   অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য জিনিষের কি কি গুণ থাকা দরকার বুঝাইয়া লিখ। [পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১]
4. **Describe the merits and demerits of paper money.**
   কাগজী অর্থের সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ১৯১-১৯৩]
5. **Distinguish between standard money and token money. Illustrate your answer with reference to the Indian rupee.**
   প্রামাণিক মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রার মধ্যে পার্থক্য কি? ভারতের টাকার দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া লিখ। [পৃষ্ঠা ১৯৬-১৯৭]
6. **What is a bimetallic standard? What are the difficulties of operating such a standard?**
   দ্বিধাতুমান কাহাকে বলে? দ্বিধাতুমান চালু রাখিবার বাধা কি? [পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০]
7. **Are cheques money?**
   'চেক'কে কি অর্থ বলা যায়? [পৃষ্ঠা ২০৩-২০৪]
8. **What is a Bank? What are its functions?**
   ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে? ইহার কার্যাবলী বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২০৪-২০৮]
9. **Discuss the utility of a good banking system.**
   সুপরিচালিত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপযোগিতা বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২০৮-২০৯]

10. **What is a Central Bank? What are its functions?**
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে? ইহার কার্যাবলী বর্ণনা কর। [পৃঃ ২১১-২১২]

11. **How do banks create money?**
ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কি করিয়া অর্থ সৃষ্টি করে বুঝাইয়া দাও। [পৃঃ ২১৫-২১৮]

12. **Give a brief description of the Indian Banking System.**
ভারতের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। [পৃঃ ২১৮-২২০]

ষোড়শ অধ্যায়

অর্থের মূল্য

(Value of Money)

অর্থের মূল্য ও মূল্যস্তর (Value of money and Price-level) **:** মূল্য দুই রকম হইতে পারে—ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্য। অন্যান্য দ্রব্যের দুই রকম মূল্যই আছে। তাহা হইলেও মূল্য বলিতে অর্থশাস্ত্রে বিনিময়-মূল্যকেই বুঝায়। অর্থের ব্যবহার-মূল্য নাই। বিনিময়ের কাজেই ইহার একমাত্র ব্যবহার। অন্য বিকল্প ব্যবহার নাই। অর্থের মূল্য বলিতে ইহার বিনিময়-মূল্য ছাড়া অন্য কিছু বুঝান সম্ভব নয়। অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যের মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত মূল্যের নাম দাম। বিভিন্ন দ্রব্যের দাম জানা থাকিলে তাহাদের পারস্পরিক বিনিময়-মূল্য নির্ণয় করিতে কোন অসুবিধা হয় না। অর্থের মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করার কোন মানেই হয় না। অর্থের বিনিময় বিশেষ একটি দ্রব্যের সঙ্গে হয় না। সাধারণভাবে সকল জিনিষের সঙ্গে অর্থের বিনিময় হয়। এক-একক অর্থের পরিবর্তে দ্রব্য বা সেবামূলক কার্য্য যে পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহাই অর্থের মূল্য। ১টি টেবিলের মূল্য যে রকম ২টি চেয়ার হইতে পারে, সেই রকম এক একক অর্থের মূল্য ২ সের চাল বা ১ সের চিনি এইভাবে প্রকাশ করা যায়। ইহাকে অর্থের ক্রয়-ক্ষমতাও (purchasing power) বলা হয়।

অর্থের শুধু বিনিময়-মূল্য আছে

এক একক অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বা কাজ পাওয়া যায় তাহাই অর্থের মূল্য

সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ও দেনা-পাওনার মান হিসাবে সুষ্ঠুভাবে কার্য করিতে হইলে অর্থের মূল্য স্থায়ী হওয়া প্রয়োজন। অর্থমূল্যের মোটামুটি স্থায়িত্বরক্ষা সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কায। অর্থমূল্য পরিবর্তিত হইতেছে কি তাহা জানা দরকার।

অর্থমূল্যের পরিবর্তন

একটি মাত্র জিনিষের দামের পরিবর্তন দেখিয়া অর্থমূল্যের পরিবর্তন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা যায় না। একটি নয়, বিক্রয়যোগ্য সকল দ্রব্যের সঙ্গেই অর্থের বিনিময় সম্বন্ধ আছে। কলমের দাম ৫ টাকা হইতে বাড়িয়া ১০ টাকা হইলে বলিতে হয় অর্থের দাম বা কলমের ব্যাপারে ক্রয়-ক্ষমতা কমিয়াছে। একই সময়ে আবার চালের দাম ২৫ টাকা হইতে কমিয়া ২০ টাকা হইতে পারে। এখন আবার বলিতে হয় চালের ব্যাপারে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বা দাম বাড়িয়াছে। অর্থমূল্য একই সঙ্গে কমিতে ও বাড়িতে পারে না। সকল দ্রব্যের দাম একসঙ্গে বা এক হারে পরিবর্তিত না হইলেই এই বিভ্রাট দেখা দিবে। বিভিন্ন জিনিষের গড়পড়তা দাম নির্ণয় করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হয়। বিভিন্ন জিনিষের গড়পড়তা দামকে মূল্যস্তর (Price-level) বলে। মূল্যস্তর অর্থাৎ জিনিষের গড়পড়তা দাম বাড়িলে বুঝিতে হইবে অর্থের সাধারণভাবে ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে অর্থাৎ অর্থমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। সেই রকম মূল্যস্তর কমিলে অর্থমূল্য বাড়িয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

অর্থমূল্য ও মূল্যস্তরের সম্পর্ক বিপরীতমুখী

সাধারণ মূল্যস্তর (The general Price-level): মূল্যস্তর বা বিভিন্ন জিনিষের গড়পড়তা দাম অনেক রকম হইতে পারে, যেমন—শ্রমিকের ব্যবহার্য জিনিষের মূল্যস্তর আমদানীকৃত দ্রব্যের মূল্যস্তর, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তর ইত্যাদি। বাজারে দ্রব্য ও সেবার সংখ্যা অগুন্তি। একটিও বাদ না দিয়া ইহাদের সকলের গড়পড়তা দাম নির্ণয় করা অসম্ভব। বিভিন্ন ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা ও প্রয়োজনীয় কাচামাল প্রভৃতি মোটামুটি সকল জিনিষের গড়পড়তা দামকে 'সাধারণ মূল্যস্তর' বলা যায়। সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করিতে পারিলে অর্থমূল্য কতটা কমিয়াছে বা বাড়িয়াছে তাহা বুঝা যায়। কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে অর্থের মূল্য কত? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে এক একক অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন দ্রব্য কোন্‌টি কি পরিমাণ পাওয়া যায় তাহার ফর্দ তৈয়ার করিতে হইবে। দ্রব্যের শেষ নাই—এ ফর্দেরও শেষ নাই। বস্তুতঃ এ প্রশ্নের গুরুত্বও নাই। অর্থের মূল্য আজ কত? জানিবার প্রয়োজন নাই। অর্থমূল্য আজ যাহাই থাকুক, আগামীকাল তাহাই থাকিবে কিনা ইহাই হইল আসল প্রশ্ন। অর্থমূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করিবার জন্য সূচক-সংখ্যা ব্যবহার করা হয়।

সরল সূচক-সংখ্যা প্রণয়ন (Construction of Simple Index Numbers): সময়ের ব্যবধানে মূল্যস্তরের পরিবর্তন কতটা হইয়াছে বুঝিতে হইলে বিভিন্ন সময়ের মূল্যস্তর পাশাপাশি সাজাইয়া পরীক্ষা করিতে হয়। কতকগুলি মূল্যস্তরের বিশেষ সংস্থানকেই সূচক-সংখ্যা বলা হয়। সূচক-সংখ্যার সাহায্যে গড়-পড়তা দাম বা অর্থমূল্যের পরিবর্তন মাপা যায়। সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া দরকার।

(১) **ভিত্তি বৎসর নির্বাচন** (Selection of base-year): এই বৎসর অর্থমূল্য বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে তাহা কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরের সঙ্গে তুলনা না করিয়া বলা যায় না। যে বৎসরের সঙ্গে তুলনা করিয়া অন্যান্য বৎসরে অর্থমূল্যের পরিবর্তন নিরূপণ করিতে হয়, তাহাকে ভিত্তি বৎসর বলা হয়। ভিত্তি বৎসর যথাসম্ভব স্বাভাবিক হওয়া দরকার। ভীষণ অজন্মার বৎসরে খাদ্যের দাম অনেকটা বাড়িতে পারে। সেই তুলনায় দাম কমিলে আহ্লাদিত হইবার কারণ নাই। আবার ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৬০ সালের মূল্যস্তর ৫ গুণ বেশী বলিয়া আতঙ্কিত হইবার কারণ নাই। ১৯৩৭ সালের অবস্থা এখন আর স্বাভাবিক নয়।

ভিত্তি-বৎসর যথাসম্ভব স্বাভাবিক হইতে হইবে

(২) **দ্রব্যের সংখ্যা** (Number of commodities): এ সম্বন্ধে ধরাবাধা কোন নিয়ম নাই। দ্রব্যের সংখ্যা যত বেশী হইবে, নির্ণীত গড়পড়তা দামের নির্ভরযোগ্যতা তত বেশী হইবে।

দ্রব্যের সংখ্যা একেবারে কম হইবে না

(৩) **দ্রব্য নির্বাচন** (Selection of commodities): দ্রব্য নির্বাচন সূচক-সংখ্যার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে জানিতে হইলে রেডিও বা পার্কার কলমের দাম হিসাব করিয়া লাভ নাই। শ্রমিকেরা যে সকল দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করিতে অভ্যস্ত সেই সমস্ত দ্রব্য ও সেবার দামের হিসাব করিতে হইবে। বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত সূচক-সংখ্যা তৈয়ারী করিতে হইলে যতগুলি দ্রব্যের হিসাব করিতে হয়, সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করিতে হইলে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক দ্রব্যের হিসাব করিতে হয়।

সূচক সংখ্যার উদ্দেশ্য দ্বারা দ্রব্য নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত হয়

(৪) **দাম সংগ্রহ** (Collection of Prices): সংশ্লিষ্ট সকল বৎসরে নির্বাচিত দ্রব্যগুলির দাম সংগ্রহ করিতে হইবে। একই দ্রব্যের বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন দাম দেখা যায়। জীবন যাত্রার ব্যয় নির্বাহ সম্বন্ধীয় সূচক-সংখ্যা নির্মাণ করিতে হইলে খুচরা দাম যোগাড়

খুচরা অথবা পাইকারী দাম?

করাই প্রশস্ত। সাধারণ মূল্যস্তরের বেলায় পাইকারী দাম সংগ্রহ করাই উত্তম।

(৫) গড় নির্ণয় (Averaging) : দাম সংগ্রহের পর গড় নির্ণয়ের পালা। হিসাবের সুবিধার জন্য ভিত্তি বৎসরের প্রত্যেকটি দাম ১০০ ধরা হয়। তাহা হইলে দ্রব্যসংখ্যা যাহাই হোক, ভিত্তি বৎসরের গড় দাম দাঁড়াইবে ১০০। ভিত্তি বৎসরের দাম ১০০ ধরিয়া ঐ ঐ দ্রব্যের পরবর্তী বৎসরে দাম কত দাঁড়ায় তাহা হিসাব করিতে হইবে। এখন পরবর্তী সময়ের দ্রব্যমূল্যের সমষ্টিকে দ্রব্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলেই এই সময়ের গড়পড়তা দাম পাওয়া যাইবে। এই গড়পড়তা দাম ১০০ অপেক্ষা যতটা কম বা বেশী হইবে, মূল্যস্তর ততটা কম বা অধিক ধরিতে হইবে।

ভিত্তি বৎসরের গড়পড়তা দাম সব সময় ১০০ রাখা হয়

একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত লইলে সূচক-সংখ্যার ধারণা আরও সহজে বোধগম্য হইবে। ১৯৫৯ সালের সঙ্গে ১৯৬০ সালের তুলনা করা হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি জানা আমাদের উদ্দেশ্য। ৪টি দ্রব্য লইয়া আমরা সূচক-সংখ্যা প্রস্তুত করিব। এই চারিটি দ্রব্য হইল—চাল, মাছ, তেল ও দুধ।

দ্রব্য	ভিত্তি বৎসরে (১৯৫৯ সাল) গড়	ভিত্তি বৎসরের গড়	১৯৬০ সালের দাম	১৯৬০ সালের গড় ভিত্তি বৎসরের তুলনায় শতকরা কত ভাগ হ্রাসবৃদ্ধি
	টা. ন. প.		টা. ন.প	
১। চাল প্রতি মণ	২৫ —	১০০	২২ —	৮৮
২। মাছ প্রতি সের	৩ —	১০০	৩ ৩০	১১০
৩। তেল „ „	১ ৫০	১০০	১ ৫৩	১০২
৪। দুধ „ „	— ৭৫	১০০	— ৮১	১০৮
		৪০০ ÷ ৪ = ১০০		৪০৮ ÷ ৪ = ১০২

এই কাল্পনিক সূচক-সংখ্যা অনুসারে ১৯৫৯ সালের তুলনায় খাদ্যদ্রব্যের দাম গড়পড়তা ২% বাড়িয়াছে। সাধারণ মূল্যস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করার জন্য ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। শুধু দ্রব্যের সংখ্যা ও রকমারি দুই-ই অনেক বেশী হইবে। যদি দেখা যায় ১৯৫৯ সালের তুলনায় সাধারণ মূল্যস্তর ১৯৬০ সালে ১০৫ হইয়াছে তবে বলিতে হইবে অর্থের মূল্য ১৯৫৯ সালের তুলনায় $\frac{২০}{২১}$ হইয়াছে।

সূচক-সংখ্যার উপযোগিতা (Utility of Index Numbers): দাম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও—যেমন উৎপাদন—সূচক-সংখ্যার প্রয়োগ করা যায়। আমরা দামের সূচক-সংখ্যার (Price Index Numbers) কথাই আলোচনা করিব। অর্থ মূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে সরকার কতটা সফল বা বিফল হইয়াছে তাহা সূচক-সংখ্যার সাহায্যেই বুঝা যায়। কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য সূচক-সংখ্যার সাহায্যেই বুঝা যায়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মচারী-দিগকে মাগ্‌গীভাতা দেওয়া হয়। সূচক-সংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি মাগ্‌গী-ভাতা কমান বাড়ান হয়, তবে মাগ্‌গীভাতার পরিমাণ লইয়া গোলমাল কম হইবে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকেরা মজুরীবৃদ্ধি দাবী করে। সূচক-সংখ্যার সাহায্যে মজুরী হ্রাস বৃদ্ধি করিলে, ধর্মঘটজনিত লোকসান কম হইবে। অর্থ মূল্যের পরিবর্তন হইলে সঞ্চয়ের বাহন ও দেনা-পাওনার মান হিসাবে কাজ করার অসুবিধা হয়। সূচকসংখ্যার সাহায্যে এই পরিবর্তন মাপা গেলে অসুবিধা অনেক কম হইবে।

অর্থের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money): অর্থমূল্যের স্থায়িত্ব রক্ষা করিতে হইলে অর্থমূল্য কেন পরিবর্তিত হয় জানা দরকার। অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যের মত অর্থের মূল্যও অর্থের যোগান ও অর্থের চাহিদার উপর নির্ভর করে। অর্থের যোগান বলিতে শুধু অর্থের পরিমাণ বুঝায় না। এক একক অর্থের সাহায্যে একাধিক বিনিময় কায নিষ্পন্ন হইতে পারে। কোন মুদ্রা বৎসরে ১০ বার, কোন মুদ্রা ৫ বার, কোন মুদ্রা ১ বার বিনিময়কার্যে ব্যবহৃত হয়। গড়ে হয়ত একটি মুদ্রা ৪ বার ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাকে **অর্থের প্রচলনগতি** বলে।* অর্থের পরিমাণকে অর্থের প্রচলনগতি দ্বারা গুণ করিলে অর্থের যোগান নির্ণীত হইবে। অর্থের সাহায্যে যে পরিমাণ বিনিময় কার্য সম্পন্ন করা হইবে তাহার উপর নির্ভর করে অর্থের চাহিদা। দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অর্থের চাহিদা বাড়িতে পারে। আবার উৎপাদন ঠিক থাকিয়াও যদি একই দ্রব্য অধিকবার হাতবদল হয় তাহা হইলেও অর্থের চাহিদা বাড়িতে পারে।

* কোন শ্রেণীতে ১০ জন বালক চক্রাকারে বসিয়াছে। প্রত্যেকের হাতে কিছু টাকা আছে। ঘণ্টা বাজিলেই হাতের টাকা পাশের ছেলেকে চালান করিতে হইবে। প্রত্যেকের হাতে ২্ আছে এবং মিনিটে একবার ঘণ্টা বাজে ধরা যাক। তাহা হইলে টাকার পরিমাণ ২০ এবং এই ২০ টাকা দিয়া মিনিটে ২০ টাকার কাজ হইতেছে। এখন ধরা যাক প্রত্যেকের হাতে ১ টাকা করিয়া আছে। কিন্তু মিনিটে ২ বার করিয়া ঘণ্টা বাজে। এখন টাকার পরিমাণ ১০ টাকা—এই ১০ টাকাতেও কিন্তু ২০ টাকার কাজ হইতেছে। কেননা টাকার প্রচলনগতি আগের তুলনায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

আমি কোন দোকানদারের নিকট হইতে ২০ টাকা মণ দরে ৫ মণ চাউল কিনিলাম। আমার খরচ হইল ১০০ টাকা। বিক্রেতাও ঠিক ১০০ টাকাই পাইল। ক্রেতারা যাহা ব্যয় করিবে বিক্রেতারা ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ ই পাইবে—এক কপর্দক কম বেশী হইতে পারে না। জিনিষপত্রের পরিমাণ যদি T এবং ইহাদের গড় দাম P ধরা যায়, তাহা হইলে বিক্রেতারা PT পাইবে। টাকার পরিমাণ M এবং ইহার প্রচলনগতি V হইলে ক্রেতাদের MV পরিমাণ খরচ হইবে।

ফিসারের প্রথম সমীকরণ

$$\text{সুতরাং } PT = MV$$

$$\text{অথবা } P = \frac{MV}{T}$$

এই সমীকরণটির স্রষ্টা মার্কিন অর্থশাস্ত্রবিদ ফিসার (Fisher)। এখানে PT হইল অর্থের চাহিদার দিক এবং MV হইল অর্থের যোগানের দিক। T হইল বিক্রয়যোগ্য জিনিষের পরিমাণ এবং P হইল এই জিনিষের গড়পড়তা দাম। বিনিময় কার্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য PT পরিমাণ অর্থের চাহিদা হইবে। M হইল নগদ টাকাকড়ি এবং V ইহার প্রচলন গতি। সুতরাং মোট টাকাকড়ির যোগান MV হইবে।

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি ব্যাঙ্কও অর্থসৃষ্টি করিতে পারে। কেবলমাত্র সরকারসৃষ্ট টাকাকড়ির হিসাব ধরিলে সমীকরণটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার জন্য ফিসার সমীকরণটির নিম্নলিখিত রূপ পরিবর্তন করেন—

ফিসারের সংশোধিত সমীকরণ

$$\text{সুতরাং } PT = MV + M^1V^1$$

$$\text{অথবা } P = \frac{MV + M^1V^1}{T}$$

ইহার ফলে সমীকরণটির প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। M^1 হইল ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ এবং V^1 হইল এই অর্থের প্রচলনবেগ। অর্থের যোগান নির্ণয় করিবার সময় M^1 এবং V^1 এর গুণফলকে বাদ দিলে চলিবে না—ইহা স্মরণ করান হইল মাত্র।

P অর্থাৎ মূল্যস্তর M, V, M^1, V^1 এবং T এর উপর নির্ভর করে দেখা যাইতেছে। ইহাদের যে কোনও একটির পরিবর্তন হইলে, P এর পরিবর্তন হইতে পারে। অর্থের পরিমাণতত্ত্বে যাহারা গোঁড়া বিশ্বাসী তাঁহাদের মতে M এর পরিবর্তনই হইল P এর পরিবর্তনের মুখ্য কারণ। শুধু তাই নয়, Mএর যে অনুপাতে এবং যে দিকে পরিবর্তন হইবে P এর ঠিক সেই অনুপাতে এবং সেই দিকে ঘটিবে—অর্থাৎ অর্থমূল্যের পরিবর্তন ঠিক সেই অনুপাতে বিপরীত মুখে ঘটিবে। তাঁহাদের যুক্তি অনেকটা এইরূপ—T, V এবং V^1 এর পরিবর্তন হয় না—অন্ততঃ M এর পরিবর্তনের

ফলে ইহাদের কোন পরিবর্তন হয় না; M^1 এর সহিত M এর নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে, ফলে M যে হারে বাড়ে কমে M^1 সেই হারে বাড়ে কমে এবং M এর পরিবর্তন না হইলে M^1 এর পরিবর্তন হইতে পারে না। সুতরাং M এর পরিমাণ যে দিকে এবং যে অনুপাতে পরিবর্তন হইবে P এরও ঠিক সেই দিকে এবং সেই অনুপাতে পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য। M অর্থাৎ নগদ অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের উপর মূল্যস্তর বা অর্থের দাম নির্ভর করে। সেইজন্যই ইহাকে অর্থের পরিমাণতত্ত্ব বলা হয়।

উদাহরণ: একটি দৃষ্টান্ত লইলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হইবে। কোন দেশে ধরা যাক, মোট উৎপাদন ১০০০। এই মোট উৎপাদনের যে অংশ উৎপাদক নিজেই ভোগ করে তাহার জন্য কোন অর্থের চাহিদা হইবে না। ধরা যাক ২০% যাহারা উৎপাদন করে তাহারা নিজেই ভোগ করে। বাকী ৮০% অর্থাৎ ৮০০ ক্রয় বিক্রয়ের জন্য বাজারে আসে। এই অংশের লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা হয়। নগদ টাকাকড়ির সংখ্যা ধরা যাক ৫০০ এবং ইহার প্রচলন গতি ৩ অর্থাৎ একটি মুদ্রা গড়ে ৩ বার হাতবদল হয়। ব্যাঙ্কসৃষ্ট অর্থের পরিমাণ ১০০০ এবং ইহার প্রচলগতি ২ ধরা যাক। তাহা হইলে

$$P = \frac{M(৫০০) \times V(২) + M^1(১০০০) \times V^1(৩)}{T(১,০০০)}$$

$$\text{অথবা} \quad P = \frac{৪,০০০}{১,০০০} = ৪$$

অর্থাৎ জিনিষপত্রের গড়পড়তা দাম বা মূল্যস্তর হইল ৪ টাকা।

এখন ধরা যাক কোন কারণে ঐ দেশে নগদ টাকার পরিমাণ দ্বিগুণ হইল। V, V^1 ও T পূর্ববৎ রহিল। আমরা ধরিয়াছিলাম M^1 হইবে M-এর দ্বিগুণ। M এবং M^1 এর এই সম্বন্ধও ঠিক রহিল। তাহা হইলে নূতন অবস্থায়

$$P = \frac{M(১,০০০) \times V(২) + M^1(২,০০০) \times V^1(৩)}{T(১,০০০)}$$

$$\text{অথবা} \quad P = \frac{৮,০০০}{১,০০০} = ৮$$

অর্থাৎ P বা মূল্যস্তরও দ্বিগুণ হইয়াছে।

সমালোচনা: ব্যাঙ্ক সৃষ্ট অর্থ এবং নগদ টাকাকড়ির মধ্যে বরাবর নির্দিষ্ট সম্বন্ধ না থাকিতে পারে। অর্থ সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার স্বাধীনতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। M দ্বিগুণ হইলে M^1 ও যে গুণ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। টাকাকড়ির যোগান বাড়িলে কমিলেও উৎপাদন ও তজ্জন্য টাকাকড়ির চাহিদার

কোন পরিবর্তন হইবে না—এ ধারণা ভুল। দাম বাড়িলে মুনাফা বাড়িবে। উৎপাদনকারী উৎপাদন বাড়াইতে চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ Mএর পরিবর্তনের ফলে T এর পরিবর্তন ঘটিবে। আবার চাহিদা কেবলমাত্র ক্রয় বিক্রয়ের জন্য হয় এ—অনুমান ঠিক নয়। টাকাকড়ি হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি (general purchasing power)। (১) আয়-ব্যয় এক সঙ্গে না হওয়ায় হাতে টাকা রাখা দরকার হইয়া পড়ে। (২) হঠাৎ বিপদ আপদ হইতে পারে—সেজন্যও হাতে টাকা রাখা দরকার। (৩) জিনিষ পত্রের দাম কমিলে সেই সুযোগে লাভবান হইতে গেলেও টাকা হাতে থাকা দরকার। ধরা যাক কোনও কারণে লোকে আগের তুলনায় অধিক সংখ্যক টাকাকড়ি হাতে রাখিতে চায়। টাকার পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে, এখন কম টাকায় ক্রয়বিক্রয়ের কাজ সারিতে হইবে। মূল্যস্তর কমিবে—যদিও টাকাকড়ির পরিমাণ কমে নাই। টাকাকড়ি না কমিলেও ইহার গড় প্রচলনগতি কমিয়াছে। এইজন্যই মূল্যস্তরও হ্রাস পাইয়াছে।

মূল্যস্তর টাকার প্রচলনগতি ও বিক্রয়যোগ্য জিনিষপত্রের যোগানের উপরও নির্ভর করে

P বা মূল্যস্তরের পরিবর্তন M, M^1, V, V^1 এবং T এর পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। M^1, V, V^1 এবং T এর পরিবর্তন অনেক কারণে হইতে পারে। একের পরিবর্তন অন্যের পরিবর্তনের বিপরীতমুখী হইতে পারে। M এর পরিবর্তন হইলে P এর পরিবর্তন আদৌ না হইতে পারে, এমনকি ভিন্ন দিকেও হইতে পারে।

মূল্যস্তরের পরিবর্তন মানে দ্রব্যাদির দামের পরিবর্তন। দ্রব্যের চাহিদা বা দ্রব্যের যোগান পরিবর্তিত না হইলে দ্রব্যের দাম পরিবর্তিত হইতে পারে না। টাকাকড়ির চাহিদা বা যোগানের যতই পরিবর্তন হোক, তাহার ফলে দেশের আয় ও ব্যয়ের পরিবর্তন না ঘটিলে দ্রব্যাদির দামের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। অর্থের পরিমাণতত্ত্বে অর্থের পরিমাণ পরিবর্তনের ফলে আয় ও ব্যয় কি করিয়া পরিবর্তিত হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় না। মূল্যস্তরের পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বাড়ে না।

মূল্যস্তর কিরূপে পরিবর্তিত হয় সে সম্বন্ধে এই তত্ত্ব নীরব

অর্থের পরিমাণ বাড়িলে গড়পড়তা দাম বাড়ে—অর্থের পরিমাণতত্ত্ব কেবলমাত্র এইটুকুই জানায়। বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিষপত্রের দামের গতি সম্বন্ধে কোন আলোকপাত এই তত্ত্ব করে না। টাকাকড়ির পরিমাণ বাড়ার ফলে যখন মূল্যস্তর বাড়িতে থাকে অথচ উৎপাদন বাড়ান যায় না, তখন অর্থের প্রচলনগতি আরও বাড়িয়া যায়। আগামীকাল দাম আরও বাড়িয়া যাইবে আশঙ্কায় লোক আজই জিনিষ

মুদ্রাস্ফীতির সময় এই সমীকরণটির প্রয়োগ সুস্পষ্ট

কিনিতে চায়। ফলে জিনিষের দাম বাড়ে। প্রচলনগতিও আরও বাড়ে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে দাম বাড়িয়া চলে। এই অবস্থায় পরিমাণতত্ত্বের সমীকরণটির প্রয়োগ স্পষ্টতই হয়। এই অবস্থার নাম মুদ্রাস্ফীতি।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)**:** জিনিষপত্রের দাম বাড়িলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে মনে করা হয়। কিন্তু ইহা সব সময় সত্য নয়। জিনিষের দাম কেন বাড়িল তাহা দেখা দরকার। মুদ্রাস্ফীতি ছাড়া অন্য কারণেও জিনিষের দাম বাড়িতে পারে। উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়া যাইবার ফলে দাম বাড়িতে পারে। ইহাকে অর্থশাস্ত্রে মুদ্রাস্ফীতি বলিয়া অভিহিত করা হয় না। **সরকার যদি বাজারে অস্বাভাবিক (abnormal) পরিমাণ অর্থ চালু করে তাহাকেই মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।** সরকার বেশী পরিমাণে অর্থসৃষ্টি করার ফলে যদি অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তবে অর্থের পরিমাণ অস্বাভাবিক হইয়াছে বলা যায় না। উৎপাদন বৃদ্ধি যদি অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলে, তবে দাম বাড়িবার কারণ থাকে না। অর্থ বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে, এক সময় পূর্ণনিয়োগের (full employment) অবস্থা আসিবে। ইহার পরও যদি সরকার অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া চলে, তবে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে এবং জিনিষের দাম ক্রমাগত বাড়িতে থাকিবে। নূতন কর্মসংস্থান এখন আর সম্ভব নয়। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধিও সম্ভব নয়। অথচ মুদ্রাস্ফীতির ফলে লোকের আর্থিক আয় ও চাহিদা বাড়িবে। আর্থিক আয় বাড়িলে আর্থিক ব্যয়ও বাড়িবে। অথচ জিনিষের যোগান বাড়ান সম্ভব নয়। সুতরাং জিনিষের দামও বাড়িয়া চলিবে। উৎপাদনের উপাদানগুলির চাহিদা বাড়িয়া চলিবে। উপাদানের যোগান উপাদানের চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারিবে না। ইহাদের দামও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিবে। বিনিময় কার্যের জন্য যতটা অর্থের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাকেই **অস্বাভাবিক অর্থসৃষ্টি** বলে। (নগদ ও ব্যাঙ্কসৃষ্ট) অর্থের যোগান যে হারে বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন বৃদ্ধি যদি তদপেক্ষা কম হারে হয় তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে বলা হয়। পূর্ণ-নিয়োগের আগেও এই অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। উৎপাদনের উপাদানগুলির গতিশীলতার অভাবে অথবা বিশেষ কোন উপাদানের অপ্রাচুর্যহেতু পূর্ণনিয়োগের আগেই কতক কতক জিনিষের দাম বাড়িতে পারে। ইহার ফলে অন্যান্য দ্রব্যের দামও বাড়িতে থাকে। ইহাকে অনেক সময় **আংশিক মুদ্রাস্ফীতি** (partial inflation) বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের উপায় (Measures for combating Inflation)**:** সরকার সৃষ্ট টাকাকড়ি জনসাধারণের আর্থিক চাহিদা ফাঁপাইয়া তুলে। জনসাধারণের

অতিরিক্ত ব্যয় কমাইতে পারিলে মূল্যস্তরের বৃদ্ধি নিরোধ করা যায়। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়।

(১) সরকার অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া এই ফাঁপাই ক্রয় ক্ষমতা বাজার হইতে সরাইতে পারে। অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা যাহাদের হাতে পড়িয়াছে তাহাদের উপর কর ধার্য করিতে হইবে।

(২) সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ সংগ্রহ করিলেও জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাইবে।

(৩) ধনী ব্যক্তিদের ব্যাঙ্কে উল্লেখযোগ্য আমানত থাকে। একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের বেশী টাকা আমানত হইতে উঠান আইন করিয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যাইতে পারে (freezing)।

(৪) যাহাদের হাতে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা পড়িয়াছে, তাহারা যদি কর ফাঁকি দিতে সক্ষম হয়—ব্যাঙ্কে আমানত না রাখিয়া উদ্বৃত্ত টাকাকড়ি যদি পাগড়ীর মধ্যে রাখিতে তাহারা অভ্যস্ত হয়—তবে পুরাতন মুদ্রা অচল ঘোষণা করা যাইতে পারে। অন্ততঃপক্ষে অধিক মানের নোটগুলি অচল ঘোষণা করা যায়।

(৫) মূল্য নিয়ন্ত্রণ (Price Control) ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার চেষ্টা করা যায়। লোকের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত দামে জিনিষ পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সেজন্য রেশনিং (Rationing) দরকার হইয়া পড়ে।

(৬) উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

দামের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল (Effects of changes in prices)**:** জিনিষ-পত্রের দাম কমাবাড়ার ফল সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের পক্ষে একরকম। কোন কোন শ্রেণী লাভবান হয়। আবার অন্য শ্রেণীর লোকসানও হয়। জিনিষের গড়পড়তা দাম বাড়া মানে অর্থের মূল্য কমা। আজকাল দেনাপাওনা অর্থের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়। যাহাদের পাওনা দীর্ঘকালের মেয়াদে নির্দিষ্ট (fixed money income) তাহারা অর্থমূল্য কমিলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অর্থমূল্য বাড়িলে (অর্থাৎ মূল্যস্তর হ্রাস পাইলে) তাহারা লাভবান হয়। সাধারণভাবে বলা যায় মূল্যস্তর বাড়িলে খাতক শ্রেণীর লাভ, আর মূল্যস্তর কমিলে পাওনাদার শ্রেণীর লাভ। আমি কাহারও নিকট হইতে আজ ১০০ টাকা ধার করিলাম। এক বৎসর পরে আমি যখন দেনা শোধ করিলাম তখন মূল্যস্তর ২৫% বাড়িয়া গিয়াছে। যখন টাকা ধার লইয়াছিলাম তখন ১০০ টাকায় গড়ে যে পরিমাণ দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত, টাকা শোধ দিবার সময় সেই পরিমাণ দ্রব্যাদি

খাতক ও পাওনাদার

ক্রয় করিতে ১২৫ টাকা লাগে। অর্থাৎ টাকার অঙ্কে সমান দিলেও ক্রয়ক্ষমতা বা দ্রব্যাদির হিসাবে আমি দিতেছি আসলের $\frac{4}{5}$ মাত্র। আমার পাওনাদারের লোকসান হইল। মূল্যস্তর কমিলে ইহার বিপরীত হইত। আমার অর্থাৎ দেনাদারের লোকসান হইত।

দাম বাড়িলে শিল্পপতিদের সুবিধা হয়। শ্রমিক ও ধনিকদের সম্পর্কে শিল্পপতি দেনাদার। শ্রমিকের মজুরী হিসাবে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়। দাম বাড়িবার কালে (changing prices) এই অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে। দেনাদার হিসাবে শিল্পপতির লাভ হয়। দাম বাড়িয়া মূল্যস্তর উচ্চগ্রামে স্থিতিলাভ করিলে (after prices have changed) এই অবস্থার কিছুটা প্রতিকার হইলেও সম্পূর্ণ সুরাহা হয় না। দাম বাড়িতে থাকিলে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে। শ্রমিকেরা মজুর বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করে। মজুরী বাড়েও। কিন্তু দামবৃদ্ধি ও মজুরী বৃদ্ধির মধ্যে রেসে মজুরী সব সময় এক পা পিছনে পড়িয়া থাকে। শিল্পপতি সুদ দিবার প্রতিশ্রুতিতে ধার লয় (loans or debentures)—সুদ ৫% নির্ধারিত থাকিলে দাম বাড়িলেও সুদ ৫ টাকাই থাকিবে, কিন্তু ইহার ক্রয়ক্ষমতা কমিয়া যাইবে। দেনাদার হিসাবে শিল্পপতির লাভ হইবে। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি হওয়াতেও শিল্পপতির লাভ হয়। কাঁচামাল কম দামে কেনা থাকে। মালের পড়তা খরচ কম থাকে। কাঁচামালের দাম বাড়িলে কিন্তু সে সুযোগ শিল্পপতি ছাড়িয়া দিবে না। কাঁচামালের বর্ধিত দাম হিসাব করিয়াই সে উৎপন্ন দ্রব্যের পড়তা কষিবে। মূল্যস্তর কমিলে সেইরূপ শিল্পপতিদের লোকসান হয়।

মূল্যস্তর বাড়িলে শিল্পপতির লাভ হয়

মূল্যস্তর বাড়িলে শ্রমিকদের কি করিয়া লোকসান হয় তাহা আমরা দেখিলাম। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে এই সময় তাহাদের কিছু লাভও আছে। দাম বাড়িলে শিল্পপতির লাভ হয়। মুনাফা বাড়িলে তাহারা উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে উৎসাহ পায়, ফলে কর্ম স্থানও বাড়ে—বেকারের সংখ্যা কমে। ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের প্রকৃত আয় কমে। শ্রেণী হিসাবে আর্থিক আয় ত বাড়েই—প্রকৃত আয়ও বাড়িতে পারে। বেতনভুক শ্রেণীর অবস্থা মজুরদের তুলনায় খারাপ। ইহারা শ্রমিকদের মত সংগঠিত নয়। দাম বাড়িলেও ইহাদের বেতন সহজে বাড়ে না। দাম কমিলে নিযুক্ত শ্রমিকের প্রকৃত আয় বাড়ে। দাম কমিলে মজুরী কমিতে সময় লাগে। শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকদের এই সময় ক্ষতি হয়। কেননা বেকারের সমস্যা বাড়ে।

মজুত ও বেতনভুক

দাম বাড়িলে সবচেয়ে অধিক ক্ষতি হয় পেন্সনভোগীদের। দাম যতই বৃদ্ধি পাইতে

থাকুক পেন্সন বাড়িবে না। পেন্সনভোগীদের জন্য মাগ্‌গীভাতার ব্যবস্থাও নাই। দাম বাড়িলে পেন্সনের ক্ষমতা কমিবে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, স্থায়ী আমানত ও সরকারী ঋণপত্রে লগ্নীকারীরা দাম বাড়িলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অন্যান্য

সমস্ত জিনিষের দাম এক সময়ে ও একহারে পরিবর্তিত হইলে, গোলযোগ অনেক কম হইত। মজুরী শ্রমের দাম। জিনিষপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি মজুরীর হার তখন সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে মজুরের আপত্তির কারণ থাকিত না। সমস্ত দাম এক সময়ে বাড়ে না বা কমে না। দামের হ্রাস বৃদ্ধিও এক হারে নাই। সেজন্য আয়বণ্টনের উপর দাম কমাবাড়ার প্রভাব অনিষ্টকর হয়। দাম বাড়িলে, শিল্পপতির লাভ হয়। অথচ এই বাড়তি লাভের জন্য তাহাকে খাটিতে হয় না। দাম বাড়িলে পেন্সনভোগীর কষ্ট হয়। এই কষ্ট পাইবার মত কোন অপরাধ সে করে নাই। মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধির ফলে যে লাভলোকসান হয় তাহার সঙ্গে লোকের দোষগুণের কোন সম্পর্ক নাই। ইহার ফলে কোন না কোন শ্রেণী ক্ষুব্ধ হইবেই। সেইজন্যই অর্থমূল্যের মোটামুটি স্থায়িত্বরক্ষা সরকারের অন্যতম অর্থনৈতিক কার্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধিজনিত লাভলোকসান ন্যায়-নীতির সঙ্গে সম্পর্ক রহিত

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. What is meant by the Value of Money? How can you measure changes in the Value of money?

   অর্থের মূল্য বলিতে কি বুঝায়? কিরূপে অর্থমূল্যের পরিমাপ করিবে? [পৃষ্ঠা ২২৪-২২৫]

2. What are Index Numbers? How would you construct them? What is their utility?

   সূচক সংখ্যা কাহাকে বলে? ইহা কিভাবে প্রস্তুত করা হয়? ইহার উপযোগিতা কি? [পৃষ্ঠা ২২৬-২২৮]

3. Explain carefully the relationship between changes in the quantity of money and changes in the general price level.

   অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন ও সাধারণ মূল্যস্তরের মধ্যে কি সম্পর্ক তাহা বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ২২৮-২৩১]

4. What exactly do you mean by Inflation of Currency? Examine the effects of Inflation upon the following classes of people in a country—businessmen, wage earners, pensioners and salaried people.

   মুদ্রাস্ফীতি বলিতে কি বুঝ? কোন দেশের নিম্নলিখিত বিবি শ্রেণীর লোকের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বুঝাইয়া লিখ—ব্যবসায়ী, মজুর, পেন্সনভোগী ও বেতনভুক সম্প্রদায়। [পৃষ্ঠা ২৩২, ২৩৪-২৩৫

একাদশ শ্রেণীর পাঠ্য

সপ্তদশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

(International Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ (International Trade and Territorial Division of Labour) : বাণিজ্য মানে বিনিময়। আর বিনিময়ের ভিত্তি হইল শ্রম-বিভাগ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূলে আছে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ। সকল ব্যক্তি সকল কাজে সমান দক্ষ নয়। সেইরকম উৎপাদনের সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে সকল অঞ্চল সমান ভাগ্যবান নয়। যে কাজে ব্যক্তির দক্ষতা অপেক্ষাকৃত বেশী, ব্যক্তি সেই কাজ বাছিয়া লইলে সংশ্লিষ্ট সকলেরই সুবিধা হয়। কারণ এই কর্মবিভাগের ফলে দক্ষতার অপচয় বন্ধ হয় ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। সেইরকম যে শিল্পে কোন অঞ্চলের বিশেষ সুযোগ সুবিধা থাকে সেই অঞ্চল ঐ বিশেষ শিল্পে মনোনিবেশ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে সেজন্য পাটকল দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে, কিন্তু কাপড়ের কল বেশীর ভাগ দেখা যায় বোম্বাইয়ে। রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য-যুক্ত অঞ্চলকে বলা হয় দেশ। তখন আঞ্চলিক বাণিজ্যের নামকরণ হয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। চট্টগ্রাম হইতে মাছ ও ডিম কলিকাতায় চালান আসিত—এখনও আসে। আবার কলিকাতা হইতে চট্টগ্রামে ঔষধপত্র চালান যাইত, এখনও যায়। দেশবিভাগের আগে এই দ্রব্য বিনিময়কে বলা হইত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। দেশবিভাগের পরে বাণিজ্যের প্রকৃতি বদলায় নাই। এখন কিন্তু এই বিনিময়কে বলা হইবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। এই নূতন নামকরণের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার বাণিজ্যের ভিত্তি হইল শ্রমবিভাগ। আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের বিশেষ একটি দৃষ্টান্ত হইল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনা প্রয়োজন কেন? (Why a separate theory of International Trade) : আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল প্রকৃতি অভিন্ন হইলেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র আলোচনার স্বপক্ষে বিভিন্ন কারণ দেখা যায়।

দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানগুলি মোটামুটি গতিশীল (mobile)। বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপাদানগুলি সে তুলনায় গতিবিহীন (immobile)। এক দেশের মধ্যে শ্রমিক উচ্চতর মজুরীর আশায় এক অঞ্চল বা এক শিল্প ছাড়িয়া

অন্য অঞ্চল বা অন্য শিল্পে যায়। অধিক লাভের অন্বেষণে আর্থিক মূলধন স্থানান্তরিত করা হয়। জমি এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে চালান দেওয়া যায় না বটে, তাহা হইলেও একই জমিতে গম উৎপাদন না করিয়া অন্য ফসল উৎপাদন করা যায়। অর্থাৎ জমিরও সীমাবদ্ধ শিল্পগত গতিশীলতা আছে। দেশের মধ্যে একই ধরণের শ্রমিকের বিভিন্ন অঞ্চলে বা শিল্পে বিভিন্ন মজুরির হার লক্ষ্য করা যায়। সুদের হারের অনুরূপ পার্থক্য আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় দেশের মধ্যে উপাদানগুলির গতিশীলতা নিখুঁত নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে গতিশীলতার অভাব অনেক বেশী প্রকট। মার্কিন মুল্লুকে মজুরী অনেক বেশী। তাই বলিয়া আমরা দল বাঁধিয়া চাকুরির অন্বেষণে সেখানে যাই না। আচার ব্যবহার রীতিনীতি ভাষা সবই সেখানে অন্যরকম। তা ছাড়া আজকাল সকল দেশেই বিদেশীদের আগমন (immigration) কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইচ্ছা থাকিলেও যাইবার উপায় নাই। বিদেশে ব্যবসার অবস্থা, সরকারের নীতি, আইনকানুন ভাল জানা থাকে না। কখন নূতন কর ধার্য হইবে, কখন লভ্যাংশ প্রেরণের ব্যাপারে বাধানিষেধ আরোপিত হইবে, কখন বাজেয়াপ্ত করা হইবে—এই ধরণের অনিশ্চয়তা থাকায় বিদেশে লগ্নী করিতে বিনিয়োগকারী ইতস্ততঃ করে। জমির ব্যাপারে স্থানান্তরের প্রশ্নই উঠে না। গতিবিহীনতার ফলে বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপাদানগুলির আয়ের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়।

(১)
উপাদানগুলি এক দেশের মধ্যে গতিশীল কিন্তু দুইদেশের মধ্যে গতিবিহীন।

এক দেশের সমস্ত অঞ্চলে একই মুদ্রা চালু থাকে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত। বৈদেশিক বাণিজ্যে দ্রব্য-বিনিময়ের পাশাপাশি মুদ্রা-বিনিময়ের সমস্যাও দেখা যায়। কলিকাতা হইতে ঢাকায় মাল পাঠাইয়া পাকিস্তানী টাকা পাওয়া যাইবে। লেনদেনের ব্যাপার নিষ্পত্তি করিতে হইলে পাকিস্তানী টাকাকে ভারতীয় টাকায় পরিবর্তিত করিতে হইবে। কলিকাতা হইতে পাটনায় মাল পাঠাইলে এ বিভ্রাট দেখা দিবে না। অবশ্য ভারতীয় ও পাকিস্তানী টাকার বিনিময়ের হার যদি স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট থাকিত এবং ঐ নির্দিষ্ট হারে পাকিস্তানী টাকার পরিবর্তে ভারতীয় টাকা পাইবার কোন অসুবিধা না থাকিত তাহা হইলে ভারতেও পাকিস্তানী টাকা গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তি হইত না। বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র মুদ্রামান ও বৈদেশিক বিনিময় হার সম্বন্ধে বিভিন্ন নীতি প্রচলিত। ইহাই হইল আসল সমস্যা। মূলধনের গতিবিহীনতার জন্যও এই সমস্যা আংশিকভাবে দায়ী।

(২)
বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র মুদ্রামান প্রচলিত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জাতীয় স্বার্থে বিনিময়হার নিয়ন্ত্রণ করায় এ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ অপেক্ষাকৃত বিরল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকার আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক ধার্য করিয়া, কোটা (quota) নির্ধারণ করিয়া ও অন্য প্রকারে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করে। কটক ও কলিকাতার মধ্যে বাণিজ্যে কটকের ঘাটতি (deficit) হইলে, সরকার কলিকাতা হইতে কটকে মাল প্রেরণ নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ করিয়া আইন জারী করিবে না।

(৩)
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সরকারী হস্তক্ষেপ অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়।

অবশ্য ইহার ফলে কটকের টাকা কলিকাতার লোকের সিন্দুকে জমিতে থাকিবে। দেশের মোট টাকাকড়ির কোনও পরিবর্তন হইবে না। কটকে টাকার পরিমাণ যতটা কমিবে কলিকাতায় টাকার পরিমাণ ঠিক ততটা বাড়িবে। কটকী জনসাধারণের আয় ও ব্যয় কমিবে। কলিকাতা হইতে প্রেরিত মালও কম পরিমাণে বিক্রয় হইবে। কটকে প্রস্তুত মালের দাম কমিবে। কটক হইতে কলিকাতায় আরও অধিক মাল চালান যাইবে। ইহার পরও যদি ঘাটতি থাকিয়া যায়, তবে কটকের লোক বোঁচকা কাঁধে লইয়া কলিকাতায় হাজির হইবে। কটক ও কলিকাতা স্বতন্ত্র দেশ হইলে, এইভাবে চলিয়া আসা সম্ভব হইত না। বৈদেশিক মুদ্রা বা সোনার তহবিল অধিক কমিবার আগেই কটকী সরকার কলিকতা হইতে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিত।

একশত বৎসর পূর্বে বিখ্যাত অর্থশাস্ত্রবিদ্ (List) বলিয়া গিয়াছেন—"আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য আমাদের নিজেদের মধ্যে; আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় আমাদের ও তাহাদের মধ্যে।" জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য যতদিন প্রবল থাকিবে, জাতির প্রতি আনুগত্য ততদিন লুপ্ত হইবে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পৃথক আলোচনা করিবার প্রয়োজন ততদিন স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

(৪)
জাতীয় স্বাতন্ত্র্য থাকিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র আলোচনা দরকার হইবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি বা আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের তত্ত্ব (Basis of International Trade or Law of Comparative Advantage or Costs): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা বুঝিতে হইলে, ইহার প্রকৃতি (অর্থাৎ একটি দেশ কোন্ পণ্য রপ্তানী করিবে এবং কোন্ পণ্য আমদানী করিবে) নির্ণয় করিতে হইবে। আলোচনা যাহাতে জটিল না হইয়া পড়ে. সেজন্য আমরা ক ও খ দুইটি দেশের কথা আলোচনা করিব। দুইটি মাত্র দ্রব্য পাট ও গম আছে, ক ও খ এই উভয়বিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে এবং প্রত্যেক দেশে ১০ একক উৎপাদনের উপাদান আছে ধরিয়া লইব। ১ একক উৎপাদন বলিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম, জমি ও মূলধন বুঝাইবে। সংক্ষেপে ইহাকে ১ দিন বলা হইবে।

২টি দেশ, ২টি দ্রব্য ও নির্দিষ্ট উপাদানের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা

অনাপেক্ষিক সুবিধার (Absolute Advantage) উদাহরণ :

		পাট	গম
ক	১০ দিনে উৎপন্ন করিতে পারে	২০ মণ বা	১০ মণ
খ	" " "	১০ " বা	২০ "

এখানে 'ক' দেশের সুবিধা হইল পাটশিল্পে, গম উৎপাদনে কিন্তু খ দেশের সুবিধা। এই অবস্থায় যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে দক্ষ, সেই দ্রব্য বিশেষীকরণ করিলে, উভয় পক্ষেই লাভ হইবে তাহা না বুঝাইলেও চলে। খ দেশ যদি আদৌ পাট তৈয়ার না করিতে পারে, তাহা হইলে খ দেশে পাট উৎপাদনের ব্যয় অসীম ধরিতে হইবে বা ১০ দিনে '০' পাট উৎপন্ন করিতে পারে ধরিলেই চলিবে। ক দেশের দক্ষতা এক ব্যাপারে, খ দেশের দক্ষতা অন্য ব্যাপারে, সুতরাং বিশেষীকরণ ও বাণিজ্য সুবিধাজনক হইবে। ক দেশ পাট রপ্তানী করিয়া বিনিময়ে গম আমদানী করিবে।

আপেক্ষিক সুবিধার উদাহরণ :

		পাট	গম
ক	১০ দিনে উৎপন্ন করিতে পারে	৪০ মণ	৭০ মণ
খ	" " "	২০ "	৩০ "

এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ক দেশের দক্ষতা উভয় ব্যাপারেই খ দেশ অপেক্ষা বেশী। এখানে মনে হইতে পারে ক দেশ উভয়বিধ দ্রব্য নিজেই উৎপন্ন করিবে। বাণিজ্যের কোন প্রয়োজন হইবে না। ক দেশের সুবিধা উভয় ক্ষেত্রেই খ দেশের তুলনায় বেশী। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে পাট উৎপাদনে সুবিধা যতটা বেশী (২ গুণ), গম উৎপাদনে সুবিধা থাকিলেও ততটা বেশী নয় (১$\frac{১}{৩}$ গুণ)। পাট এবং গম উভয় দ্রব্যের মধ্যে পাট উৎপাদনে ক দেশের সুবিধা অপেক্ষাকৃত বেশী। সেইরকম খ দেশের উভয় ক্ষেত্রে অসুবিধা থাকিলেও, গম উৎপাদনে অসুবিধা অপেক্ষাকৃত কম। আপেক্ষিক সুবিধা যে শিল্পে সবচেয়ে বেশী অথবা আপেক্ষিক অসুবিধা যে শিল্পে সবচেয়ে কম, সেই শিল্পে বিশেষীকরণ হইলে, মোট উৎপাদন বেশী হইবে।*

আপেক্ষিক সুবিধা ও অসুবিধা কাহাকে বলে

* ক ও খ যদি একদেশের অন্তর্গত দুইটি অঞ্চল হইত, তাহা হইলে আপেক্ষিক সুবিধার প্রশ্ন উঠিত না। ক অঞ্চলে উপাদানগুলির দক্ষতা বেশী—তাহাদের আয়ও ক অঞ্চলে বেশী হইবে। উপাদানগুলি খ অঞ্চল হইতে সরিয়া ক অঞ্চলে আসিবে। উপাদানগুলির আয় সমান হইবে। ক ও খ বিভিন্ন দেশ হইলে, উপাদানগুলি এইভাবে স্থানান্তরিত হইতে পারে না। উপাদানগুলির আয়ের বৈষম্যও দূর হইতে পারে না। খ দেশ কোন জিনিষ উৎপন্ন করিবে না—ইহা সম্ভব নয়। তাহা হইলে না খাইয়া মরিতে হইবে। উপাদানগুলি স্থানান্তরিত করিতে পারিলে সবচেয়ে ভাল হইত। মন্দের ভাল হিসাবে উপাদানজাত পণ্য স্থানান্তরিত হয়। উপাদানের গতিবিহীনতার জন্য আপেক্ষিক সুবিধা তত্ত্বের দোহাই দিতে হয়।

ধরা যাক পাটের উভয়দেশের সম্মিলিত চাহিদা ৪০ মণ। ক দেশ একাই ৪০ মণ পাট উৎপাদন করিতে পারে। এক্ষেত্রে খ দেশকে পাট উৎপাদন করিতে হইবে না। খ দেশ কেবলমাত্র গম উৎপাদন করিবে। মোট উৎপাদন হইবে ৪০ মণ পাট ও ৩০ মণ গম। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিশেষীকরণ হইয়াছে। ক দেশ ৩৯ মণ পাট উৎপাদন করিলে, খ দেশ ১ মণ পাট উৎপাদন করিবে। ক দেশে ৩৮ মণ, ৩৭ মণ…এইরকম নানাভাবে ৪০ মণ পাট উৎপাদন করা যায়। বিশেষীকরণের মাত্রা ক্রমশঃই কমিতেছে। প্রত্যেক দেশ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী উভয়বিধ দ্রব্য উৎপাদন করিলে, কিছুই বিশেষীকরণ হইল না। খ দেশ যদি ক দেশের জন্য পাট উৎপাদন করে, তবে বিপরীত (perverse) বিশেষীকরণ হইয়াছে বলা যায়। সম্পূর্ণ বিশেষীকরণ হইলে মোট উৎপাদন সর্বাধিক হয়। ধরা যাক ক দেশ ২০ মণ পাট উৎপাদন করে—সেক্ষেত্রে বাকী ২০ মণ পাট খ দেশ উৎপাদন করিবে। মোট উৎপাদন হইবে

বিশেষীকরণের সুবিধা বুঝাইতে হইলে পাট ও গমের সম্মিলিত চাহিদা যা হোক একটা ধরিতে হইবে।

ক দেশ ২০ মণ পাট (৫ দিনে)+২০ মণ গম (বাকী ৫ দিনে)

খ দেশ ২০ „ „ (১০ দিনে)+ ০ গম

মোট উৎপাদন হইবে ৪০ মণ পাট ও ২০ মণ গম। মোট উৎপাদন কমিয়া গেল—৩০ মণ গমের স্থলে ২০ মণ গম পাওয়া গেল। বিশেষীকরণ যত কম হইবে, (অর্থাৎ ক দেশ যত কম পাট উৎপাদন করিবে), মোট উৎপাদন ততই কম হইবে।* আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে যে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

উভয় দেশের মিলিত উৎপাদন বাড়িল। ক দেশ বা খ দেশের তাহার ফলে কোন সুবিধা হইল কিনা তাহা দেখা দরকার। জাতির পৃথক সত্তা যতদিন থাকিবে, ততদিন জাতীয় স্বার্থের কষ্টিপাথরে সুবিধা পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি আন্তর্জাতিক বিনিময় না থাকে, তবে ক দেশে ২০ মণ পাটের বিনিময়ে ২০ মণ গম পাওয়া যাইবে—কেন না উভয়ের উৎপাদন ব্যয় সমান (৫ দিন)। সেইরকম বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খ দেশে বিনিময়ের হার হইবে ২০ মণ পাট = ৩০ মণ গম। বাণিজ্য করিয়া যদি ইহার চেয়ে সুবিধাজনক বিনিময়ের হার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কোন দেশই বাণিজ্য করিবে না।

বিনিময়ের হারের উভয় সীমা

* উভয় দেশের মিলিত চাহিদা যদি ৩০ মণ গম হয় বা ৩০ মণ পাট, তাহা হইলে বিশেষীকরণের মাত্রা বাড়িলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কি না দেখা যাইতে পারে। নানাভাবে পরখ করিয়া এই নীতিটির সত্যতা যাচাই করিয়া লইতে হইবে।

সুতরাং বাণিজ্য হইলে, বুঝিতে হইবে প্রত্যেক দেশেরই কিছু সুবিধা হইতেছে। ২০ মণ পাটের বিনিময়ে অন্ততঃ ২১ মণ গম (ভগ্নাংশ ছাড়িয়া দিলে) পাওয়া না গেলে ক দেশ বাণিজ্য করিবে না। সেইরকম খ দেশ ২০ মণ পাটের জন্য অধিক পক্ষে ২৯ মণ গম (আবার ভগ্নাংশ ছাড়িয়া দিলে) দিতে পারে। ২৯ মণের অধিক গম দিতে হইলে খ দেশের বাণিজ্য করিয়া লাভ হইবে না। ২০ মণ পাট কম পক্ষে ২১ মণ গম, উর্ধ্বপক্ষে ২৯ মণ গমের সহিত বিনিময় হইবে। বাণিজ্য হইলে বুঝিতে হইবে প্রত্যেক দেশ কিছু লাভবান হইতেছে।

লাভের বখরা বিনিময়ের হারের উপর নির্ভর করে

আমরা যে বিশেষ দৃষ্টান্ত লইয়াছিলাম তাহাতে দেখা গিয়াছিল বিশেষীকরণের ফলে ১০ মণ গম অধিক উৎপন্ন হয়। শ্রমবিভাগের এই লাভ কি ভাবে দুই দেশের মধ্যে ভাগ হইবে তাহা নির্ভর করে বিনিময়ের হারের উপর। ২০ মণ পাটের বদলে ২০ মণের কাছাকাছি গম পাওয়া গেলে খ-দেশের সুবিধা হইবে বেশী। ২০ মণ পাটের বদলে ৩০ মণের কাছাকাছি গম পাওয়া গেলে ক-দেশের সুবিধা হইবে বেশী। খ-দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ক দেশের গরজ যত বেশী হইবে, বিনিময়ের হার ক-দেশের পক্ষে তত অসুবিধাজনক হইবে।

বিনিময়ের ফলে উভয় পক্ষের লাভের খতিয়ান

ক দেশে গমের চাহিদা ২০ মণ ধরা যাক। বাণিজ্য না থাকিলে এই ২০ মণ গম ক দেশ উৎপাদন করিবে ৫ দিনে। বংকী ৫ দিনে ২০ মণ পাট উৎপন্ন হইবে। ক দেশের মোট উৎপাদন হইবে ২০ মণ পাট+২০ মণ গম। মোট পাটের চাহিদা ধরা হইয়াছিল ৪০ মণ। সুতরাং খ দেশের পাটের চাহিদা হইল ২০ মণ। ২০ মণ পাট উৎপন্ন করিতে ১০ দিন লাগিয়া যাইবে। গম উৎপাদন হইবে না। খ দেশের মোট উৎপাদন হইবে ২০ মণ পাট। বিশেষীকরণ হইলে ক দেশ উৎপাদন করিবে ৪০ মণ পাট ও খ দেশ উৎপাদন করিবে ৩০ মণ গম। বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা দিবে। বিনিময়ের হার ধরা যাক ২০ মণ পাট=২৫ মণ গম। ক দেশ ২০ মণ পাট নিজ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রাখিয়া বাকী ২০ মণ পাট খ দেশের সঙ্গে বিনিময় করিয়া পাইবে ২৫ মণ গম। বাণিজ্যের ফলে ক দেশের অতিরিক্ত ৫ মণ গম লাভ হইল। খ দেশও ৩০ মণ গম হইতে ৫ মণ গম রাখিয়া, বাকী ২৫ মণের বিনিময়ে ক দেশ হইতে ২০ মণ পাট পাইল। খ দেশেরও অতিরিক্ত ৫ মণ গম লাভ হইল। বিনিময়ের হার অন্যরূপ ধরিলে লাভের বখরাও অন্যরূপ হইত। কিন্তু কিছু লাভ প্রত্যেক দেশেরই হইবে। নতুবা স্বেচ্ছায় কেহ বিনিময় করিবে না।

আপেক্ষিক সুবিধা বা ব্যয়ের ভিত্তিতে বিশেষীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইলে শুধু মোট উৎপাদন বাড়িবে না—সংশ্লিষ্ট দেশগুলিরও কমবেশী আয় বাড়িবে। আপেক্ষিক সুবিধা যে শিল্পে অধিক কিংবা কোন শিল্পেই সুবিধা না থাকিলে আপেক্ষিক অসুবিধা যে শিল্পে সবচেয়ে কম সেই শিল্পে বিশেষীকরণ করিতে হইবে। তাহাই হইবে রপ্তানী পণ্য। যে শিল্পে আপেক্ষিক সুবিধা কম বা আপেক্ষিক অসুবিধা বেশী সেই শিল্পজাত দ্রব্য হইবে আমদানী পণ্য।*

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা (Advantages of International Trade): আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকিলে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ সম্ভব হইত না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করে। তাহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়—অভাব পূরণের সম্ভাবনা অনেক গুণ বাড়িয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই মূল সুবিধাটি বহুভাবে বুঝান যায়।

(১) পরোক্ষ উৎপাদনে ভোগের ক্ষমতা বাড়ে।

কোন দেশেই যাবতীয় দ্রব্য উৎপাদনের সমান সুবিধা নাই। শীতের দেশে সুইজারল্যাণ্ডে হয়ত আঙ্গুর উৎপন্ন করা যায়। কিন্তু সে জন্য উপাদান খরচ হইবে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে, সেই উপাদান ঘড়ি প্রস্তুতের কাজে খরচ করিলে, ঘড়ি যে সংখ্যায় উৎপন্ন হইবে, তাহা ইটালীতে অথবা গ্রীসে রপ্তানী করিয়া অনেক বেশী পরিমাণ আঙ্গুর পাওয়া যাইবে। দেশের লোকের ভোগের ক্ষমতা বাড়িবে। কোন কোন জিনিষ আবার কোন ক্রমেই উৎপন্ন করা যায় না। জার্মানীতে পেট্রল পাওয়া যায় না। বৈদেশিক বাণিজ্য না থাকিলে জার্মানীর পক্ষে পেট্রল পাওয়া সম্ভব হইত না। (পেট্রল উৎপাদনের ব্যয় এখানে অসীম ধরা যায়, এবং তাহা হইলে পূর্ববর্তী উদাহরণের সঙ্গে কোন পার্থক্য থাকিবে না।)

আমরা আপেক্ষিক সুবিধার কথা আলোচনা করিয়াছি। আপেক্ষিক সুবিধা আপেক্ষিক ব্যয়ের বিপরীত (inverse)। আমাদের দৃষ্টান্তটি ব্যয়ের ভিত্তিতে সাজাইলে এইরূপ হইবে—

উৎপাদন ব্যয়

	পাট	গম
ক	$\frac{১}{৪০}$ দিন	$\frac{১}{৪০}$ দিন
খ	$\frac{১}{২০}$ দিন	$\frac{১}{৩০}$ দিন

ক-দেশের দিক হইতে বিবেচনা করিলে পাটের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত হইল $\frac{১}{৪০}/\frac{১}{২০}=\frac{১}{২}$, গমের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত হইল $\frac{১}{৪০}/\frac{১}{৩০}=\frac{৩}{৪}$। আপেক্ষিক ব্যয় পাট উৎপাদনে কম $\frac{১}{২}<\frac{৩}{৪}$। সুতরাং ক-দেশ পাট রপ্তানী করিবে। সেইরকম খ-দেশ গম রপ্তানী করিবে, কেননা $\frac{৪}{৩}<\frac{২}{১}$।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য না থাকিলে প্রত্যেক দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে হইত। রপ্তানী করিবার সুযোগ মিলিত না। এই সব শিল্পের বিক্রয় বাজার সঙ্কুচিত হইত। সকল দেশেই এই ব্যাপার ঘটিত। বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যাইত না। আমদানী না থাকায় এই সমস্ত জিনিষ দেশে উৎপন্ন করিতে হইত। উৎপাদন ব্যয় বেশী পড়িত বলিয়াই এই সমস্ত জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী হইত। এইগুলি উৎপাদন করিতে গেলে উপাদানগুলির অসদ্ব্যবহার হইবে। সমস্ত দেশেই উৎপাদন কমিবে।

(২) বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে

একচেটিয়া কারবারীর দাম বাড়াইবার কিছুটা ক্ষমতা আছে। দাম বাড়াইলে যদি লাভ বেশী হয়, নিঃসন্দেহে সে দাম বাড়াইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকিলে একচেটিয়া কারবারী দাম বাড়াইবার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ প্রয়োগ করিতে দ্বিধা করিবে। বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ক্রেতা জনসাধারণের রক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে।

(৩) একচেটিয়া কারবারী সংযত হয়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুফল আর্থিক জীবনে সীমাবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি পরস্পারের সংস্পর্শে আসে। একে অপরের সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায়। বাণিজ্যের ফলে পরস্পর নির্ভরশীলতা বাড়ে। বাজার নষ্ট হইবার আশঙ্কায় কোন দেশ সহজে সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে চায় না। যুদ্ধবিগ্রহ বাদ দিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার আগ্রহ বাড়ে।

(৪) অন্যান্য সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধা (Disadvantages of International Trade) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধা হিসাবে কোন্ কোন্ বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। এই অসুবিধাগুলির অধিকাংশের জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দায়ী নয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা অর্থব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ত্রুটি এর অনেকগুলির জন্য দায়ী।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেশের পরনির্ভরশীলতা বাড়ে। ব্রিটেনকে খাদ্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। যুদ্ধের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে অথবা যে দেশ হইতে খাদ্য আমদানী হয় সেই দেশের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ হইতে পারে। খাদ্যের অভাবে ব্রিটেনকে তখন চরম অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ইহার উত্তরে বলা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেলে যুদ্ধের আশঙ্কা অনেক গুণ বাড়িয়া যাইবে। খাদ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা কম বলিয়াই ব্রিটেন খাদ্য উৎপাদন করে না। খাদ্য উৎপাদন

(১) অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ব্যাপারে পরনির্ভরশীলতা বিপদের কারণ হইতে পারে

করিতে গেলে বর্তমানে আর্থিক লোকসান সুনিশ্চিত। যুদ্ধ হইবেই এইরূপ নিশ্চয়তা নাই। ভবিষ্যতের অধ্রুব লোকসান এড়াইবার জন্য বর্তমানে ধ্রুব লোকসান স্বীকার করা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেশে সুষম শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতে পারে। সুষম শিল্পোন্নতি বলিতে যদি সর্ববিধ কৃষিপণ্য ও শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদন করিতে হইবে বুঝায়, তাহা হইলে এই যুক্তি পরিপূর্ণ স্বয়ং-সম্পূর্ণতার (autarchy) মুখোস লইয়া দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুবিধা বিসর্জন দিতে হইবে। যুদ্ধের আশঙ্কায় যদি সুষম শিল্পোন্নতির ওকালতি করা হয়, তাহা হইলে আমরা আবার পূর্বেকার যুক্তিতে ফিরিয়া আসিলাম।

(২)
সুষম শিল্পোন্নতি ব্যাহত হইতে পারে।

বিদেশ হইতে আমদানী হইবার ফলে দেশীয় শিল্পের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে। কোন দেশ যদি অপেক্ষাকৃত বিলম্বে শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হয়, সেই দেশের পক্ষে শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা কঠিন হইতে পারে। আমদানী বন্ধ করিলে সেই ফুরসতে শিশু শিল্প ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে। এই শিল্প যদি আবহমান কাল শিশুই থাকিয়া যায়—কোন কালেই যদি সে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া প্রতিযোগিতায় না দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিবার কারণ নাই। অপর পক্ষে এই শিল্প যদি ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, তবে বলিতে হইবে দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের খাতিরে আমদানী বন্ধ করিয়া সঙ্গত কার্যই করা হইয়াছে। সুষম শিল্পোন্নতি মানে যদি এই হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ইহার খাতিরে সময়ে সময়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বল্পকালের জন্য সঙ্কুচিত করার প্রয়োজন হইতে পারে।

(৩)
শিল্পের শৈশব অবস্থায় বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে সংরক্ষণ দরকার

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় রপ্তানীকারক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। বর্তমান মুনাফা বাড়াইতে যাইয়া ভবিষ্যৎ স্বার্থের ক্ষতি হইতে পারে। মুনাফার আশায় কয়লা, লৌহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ অবাধে রপ্তানী করিবার ফলে, এগুলি নিঃশেষিত প্রায় হইয়া যাইতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দুর্বল হইয়া যাইবে। ভবিষ্যতে দেশের প্রয়োজনের সময় অসুবিধায় পড়িতে হইবে। এই আশঙ্কা অমূলক নয়। এই অবস্থার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আপাতদৃষ্টিতে দায়ী মনে হইলেও, মূলতঃ ইহার জন্য দায়ী মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থা।

(৪)
প্রাথমিক লাভের আখেরে লোকসান হইতে পারে।

ভারত কয়লা রপ্তানী করে না বলিলেই হয়। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনেই ভারতের কয়লা ব্যবহৃত হয়। প্রাথমিক মুনাফার জন্য যে রকম সে রকম ভাবে কয়লা কাটিয়া এই অমূল্য সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণে অবহেলা করিয়াছি। বনজ সম্পদের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এখনকার লাভের জন্য আমরা সমানে গাছ কাটিয়া চলিয়াছি। অরণ্য সম্পদ সংরক্ষিত না হওয়ায় বৃষ্টিপাত পর্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। আমাদের এখনও চৈতন্যোদয় হয় নাই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে এজন্য গালি দিয়া লাভ নাই।

(৫) অন্যান্য বিদেশী প্রতি-যোগিতার ফলে শিল্পের কাঠামো বিপর্যস্ত হইতে পারে।

অনেক সময় বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠান সস্তায় মাল বিক্রয় করিয়া অন্য দেশের শিল্প ধ্বংস করিতে চায়। অন্য দেশের শিল্প নষ্ট হইয়া গেলে দাম আবার বাড়াইয়া দেওয়া হয় (dumping)। চিরস্থায়ী ভাবে যদি দাম কমান হয়, তবে আমদানী-কারক দেশের কোন আপত্তির কারণ নাই। দাম বাড়াইবার আশায় যদি বর্তমানে দাম কমান হয়, তবে অবশ্যই আপত্তির কারণ আছে।

(৬) যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

শিল্পোন্নত দেশগুলি কাঁচামাল ক্রয় করিবার ঘাঁটিগুলি দখল করিতে চায়। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্যও ইহারা বাজার অন্বেষণ করে। এই লইয়া ইহাদের মধ্যে তীব্র রেষারেষি হয়। অনেক সময়ে যুদ্ধের সাহায্যে বিরোধ মীমাংসা করিতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দেনাপাওনার সৃষ্টি হয়। পাওনাদার দেশ তার স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক সময় দেনাদার দেশ গায়ের জোরে দখল করিতে কুন্ঠিত হয় না (Flag follows Trade)।

ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানী ও আমদানী পণ্য (Chief Articles of India's Exports and Imports) :

১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতের মোট রপ্তানী মূল্য ছিল ৫৭০ কোটি টাকা—আর মোট আমদানী মূল্য ছিল ৮৫৬ কোটি টাকার মত। প্রধান পণ্যগুলির হিসাব পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হইল—

রপ্তানী	কোটি টাকা	আমদানী	কোটি টাকা
১। চা	১২৯	১। খাদ্যশস্য	১৫৯
২। পাটজাত দ্রব্য	১০০	২। যন্ত্রপাতি	১৩০
৩। তুলাজাত দ্রব্য	৪৬	৩। কাঁচা পাট	১২৯
৪। খনিজ দ্রব্য—ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ ও অভ্র আকর	৩৪	৪। লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত দ্রব্য	৯২
৫। কাঁচা তুলা	২৩	৫। খনিজ তৈল	৭১
৬। চামড়া	১৯	৬। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৪৭
৭। ক্যাসু (Cashew Kernels)	১৬	৭। লৌহ বাদে অন্যান্য ধাতু	৩২
৮। তামাক	১৫	৮। রাসায়নিক দ্রব্য	৩১
৯। পশম	১০	৯। রেলওয়ের সরঞ্জাম	৩০
১০। নারিকেল রশি	৮	১০। কাঁচা তূলা	২৮

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য (Features of India's Foreign Trade): দেশবিভাগ, উন্নয়ন পরিকল্পনা, ষ্টার্লিং তহবিল সৃষ্টি প্রভৃতি নানা কারণে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতির প্রভূত পরিবর্তন হইয়াছে। আমাদের বহির্বাণিজ্যের মোট দাম আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই বাড়িয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের মোট দাম ছিল ৩২১ কোটি টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই অঙ্ক ১,৬২২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অবশ্য ইতিমধ্যে মূল্যস্তর অনেকগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। দাম যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, বাহির্বাণিজ্যের বস্তুগত পরিমাণ তাহার অপেক্ষা অনেক কম বাড়িয়াছে।

(১) মোট দাম বাড়িয়াছে

স্বাধীনতার আগে আমাদের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রায়ই অনুকূল হইত। স্বাধীনতার পর হইতে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নিয়মিতভাবে প্রতিকূল হইতেছে। প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিকল্পনার প্রয়োজনে অনেক যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে হইতেছে। ইহার উপর প্রায় বৎসরই খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। দেশবিভাগের জের হিসাবে কাঁচা পাট ও তূলাও আমদানী করিতে হয়। মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের রপ্তানী পণ্যের বৈদেশিক চাহিদা কমিয়াছে। এই সমস্ত কারণে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইতেছে।

(২) প্রতিকূল বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত

আগে আমরা প্রধানতঃ কাঁচামাল রপ্তানী ও কারখানাজাত দ্রব্য আমদানী করিতাম। ১৯২০-২১ সালে আমাদের মোট আমদানীর (দামের দিক দিয়া) ৮৪% ছিল কারখানাজাত দ্রব্য। মোট রপ্তানীর প্রায় ৭০% ছিল খাদ্যদ্রব্য ও কাঁচামাল। বর্তমানে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিল্পজাত রপ্তানীর পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভোগ্য দ্রব্যের আমদানী আনুপাতিকভাবে কমিয়াছে। কাঁচাপাট ও কাঁচাতুলা আমরা এখন আমদানী করি। খাদ্যশস্যও আমরা এখন রপ্তানী করি না—বরং আমদানী করি। শেষোক্ত ব্যাপার দুইটিতে অবশ্য খুসী হইবার কিছু নাই। দেশবিভাগের ফলে এইরূপ ঘটিয়াছে। ইহা আর্থিক উন্নতির কিংবা শিল্পোন্নতির পরিচয় নয়। অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য শিল্পোন্নতির পরিচয় কিছুটা মিলে। ১৯৪৯-৫০ সালে তৈলবীজ ও তৈলের রপ্তানী ছিল যথাক্রমে ১৫ ও ৯ কোটি টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই অঙ্ক দুইটি ছিল যথাক্রমে ৩৪ ও ৮·২৪ কোটি টাকা। বনস্পতি তৈল শিল্পের প্রসারের ফলেই এই পরিবর্তন হইয়াছে।

(৩)
শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি ও ভোগ্য দ্রব্যের আমদানী হ্রাস

যুদ্ধপূর্বকালে আমাদের রপ্তানীর বেশীর ভাগ যাইত যুক্তরাজ্যে—আমদানীর বেশীর ভাগ আসিত যুক্তরাজ্য হইতে। যুক্তরাজ্যের এই প্রাধান্য অনেকটা খর্ব হইয়াছে। আমাদের বহির্বাণিজ্যের দেশানুযায়ী খতিয়ানে যুক্তরাজ্য এখনও শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাড়িয়া চলিয়াছে। এখনও আমাদের মোট রপ্তানীর প্রায় ২৫% যুক্তরাজ্যে যায় এবং মোট আমদানীর প্রায় ২৫% যুক্তরাজ্য হইতে আসে। যুদ্ধের আগে আমাদের বহির্বাণিজ্যের মাত্র ১০% ছিল ডলার দেশগুলির সঙ্গে। যুদ্ধের পরে এই অঙ্ক বাড়িয়া ২৫% হইয়াছে। যুদ্ধের আগে ডলার দেশের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ছিল অনুকূল—এখন এই উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইয়াছে দাঁড়াইয়াছে।

(৪)
দেশানুযায়ী পরিবর্তন

বৈদেশিক মুদ্রা—কি ভাবে পাওয়া যায় ও কি ভাবে খরচ করা হয়— (Foreign Exchange—how it is received and used up): নানা সূত্রে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে পারি। আমরা বিদেশে নানাবিধ পণ্য-বস্তু (merchandise) পাঠাইয়া তাহার দাম বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে পারি। এই সব পণ্য-বস্তুকে দৃশ্য-রপ্তানী (visible exports) বলা হয়। চা, পাটজাত দ্রব্য, তুলাজাত দ্রব্য, খনিজ দ্রব্য প্রভৃতি ভারতের দৃশ্য-রপ্তানী। ইহাদের দাম বাবদ ভারত

দৃশ্য-রপ্তানী ও দৃশ্য-আমদানীর মোট দামের পার্থক্যকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। সেইরকম নানাপ্রকার পণ্য-বস্তু আমরা আমদানী করিতে পারি। ইহাদের দৃশ্য-আমদানী (visible imports) বলা হয়। ইহাদের দাম বাবদ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, কাঁচা পাট, খনিজ তৈল প্রভৃতি ভারতের দৃশ্য আমদানী। ইহাদের দাম বাবদ ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাধারণতঃ ১ বৎসরের মধ্যে দৃশ্য-রপ্তানীর মোট দাম এবং দৃশ্য-আমদানীর মোট দামের পার্থক্যকে 'বাণিজ্য উদ্বৃত্ত' (Balance of Trade) বলা হয়। দৃশ্য-রপ্তানীর মোট দাম দৃশ্য-আমদানীর মোট দাম অপেক্ষা অধিক হইলে এই উদ্বৃত্তকে বলা হয় 'অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত' (Favourable Balance of Trade), আর দৃশ্য-আমদানীর মোট দাম দৃশ্য-রপ্তানীর মোট দাম অপেক্ষা অধিক হইলে এই উদ্বৃত্তকে বলা হয় 'প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত' (Unfavourable Balance of Trade)।

বাণিজ্য উদ্বৃত্তকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া ভুল। দৃশ্য পণ্য বাদে অন্যান্য খাতেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত বা ব্যয়িত হইতে পারে।

বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ধারণাটি অনেক সময় কাজে লাগিলেও সব সময় ইহার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিলে ভুল হইবে। স্বাধীনতার পূর্বে বেশীর ভাগ সময় ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অনুকূল ছিল। ইহার দরুণ কিন্তু আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ফাঁপিয়া উঠে নাই। দৃশ্য-রপ্তানী ও দৃশ্য-আমদানী বাদেও অন্যান্য খাতে বৈদেশিক মুদ্রার আয় ও ব্যয় হইতে পারে। অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের দরুণ আমাদের হাতে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা জমা হইত, ব্রিটিশ মূলধনের সুদ ও লাভ, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসারদের পেন্সন, ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানীর ভাড়া প্রভৃতি মিটাইতেই তাহা খরচ হইয়া যাইত। এই খরচ পুরোপুরি মিটাইবার জন্য আরও বৈদেশিক মুদ্রা ধার করিতে হইত বা সোনা চালান দিতে হইত। ১৯৫৫ সালে নরওয়ের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ভীষণভাবে প্রতিকূল ছিল। কিন্তু জাহাজ ভাড়া বাবদ নরওয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছিল। হিসাবের মধ্যে জাহাজ ভাড়া ধরিলে, নরওয়ের আর্থিক অবস্থা আর অত খারাপ মনে হইত না।

বিভিন্ন সেবামূলক কার্যের বিনিময়ের ফলেও দেনাপাওনা হইতে পারে।

আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার ব্যাপারে দেশের অবস্থা কোন্ দিকে যাইতেছে সম্যকভাবে বুঝিতে হইলে, অন্যান্য সূত্রে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ব্যয়ের কথাও আলোচনা করিতে হইবে। বিদেশীদের নিকট সেবামূলক কার্যাদি বিক্রয় করিয়াও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। এই সেবামূলক কার্য নানারকম হইতে পারে—(১) বিদেশীরা আমাদের জাহাজে মাল পাঠাইলে, আমরা সেজন্য বিদেশীদের নিকট হইতে ভাড়া

পাইব; (২) বিদেশীরা যদি আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক বা বীমা কোম্পানীর মারফৎ কাজ করে তবে সেই বাবদ আমরা কমিশন ও প্রিমিয়াম পাইব; (৩) বিদেশী ভ্রমণকারী ছাত্র, ব্যবসায়ী ও রোগী আমাদের দেশে খরচ করিলে সেই সূত্রেও আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইব—সেই রকম বৈদেশিক দূতাবাস আমাদের দেশে যে ব্যয় করিবে সেইজন্যও আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইব; (৪) আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্র অন্যদেশ ভাড়া লইলে, সেই খাতেও আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইব। বিদেশী ব্যক্তি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সরকার আমাদের নিকট হইতে অতীতে ধার করিয়া থাকিলে এখন তাহার জন্য আমরা সুদ পাইব। মূলধন ধীরে ধীরে সেবা দেয়। এই সেবার দরুণ আমরা সুদ পাইতেছি ধরা হয়। বিদেশে আমাদের সম্পত্তি থাকিতে পারে। তাহার লভ্যাংশ বাবদ আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে পারি। সংগঠন যোগান দিবার বিনিময়ে এই মুনাফা পাইতেছি ধরা হয়। এই ধরণের সেবাকার্য বিদেশীদের নিকট হইতে ক্রয় করিলে আমাদের নিকট হইতে তাহাদের পাওনা হইবে।

অদৃশ্য রপ্তানী ও আমদানী

বিভিন্ন সেবামূলক কার্যের দরুণ আমাদের পাওনা হইলে ইহাদিগকে অদৃশ্য রপ্তানী (invisible exports) বলা হয়। ইহাদের বাবদ আমাদের দেনা হইলে উহাদিগকে অদৃশ্য আমদানী (invisible imports) বলা হয়।

এখন পর্যন্ত আমরা যে ধরণের দেনাপাওনার কথা আলোচনা করিলাম, সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যেক পক্ষই কিছু দেয় এবং বিনিময়ে কিছু পায়। অনেক সময় কিছু

অনেক সময় প্রতিদানে কিছু না দিয়াও বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়।

না দিয়াও বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। অনেক ভারতীয় ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব-আফ্রিকায় বাস করে। ভারতে আত্মীয়স্বজনকে ইহারা মাঝে মাঝে সাহায্য করে। এই সূত্রে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে পারি। অন্য দেশের সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান আমাদিগকে দান করিলে, আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইতে পারি। বিনিময়ে ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছু দিতে হয় না। এইভাবে আমাদের নিকট বিদেশীদের পাওনা হইতে পারে। এই ধরণের এক তরফা দেনা ও পাওনাকে হস্তান্তর দেনাপাওনা (Unrequited transfers) বলা হয়।

বিদেশীদের নিকট ঋণ করিলেও বৈদেশিক মুদ্রা তখনকার মত প্রাপ্য হয়। হস্তান্তর পাওনার জন্য কোন প্রতিদান দিতে হয় না। ঋণ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা পাইলে বর্তমানে কোন প্রতিদান দিতে হয় না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার জন্য দাম দিতে হইবে। বিদেশে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা বিক্রয় করিয়াও বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। ইহার ফলে অবশ্য বিদেশীদের উপর আমাদের দাবী

(claim) কমিবে। আমাদের পাওনা পুরাতন ঋণ যদি বিদেশীরা পরিশোধ করে তাহা হইলেও আমরা বৈদেশিক মুদ্রা পাইব। কিন্তু আমাদের দাবী কমিবে। অনুরূপভাবে আমরা যদি ঋণ দিই অথবা আমাদের পুরাতন দেনা শোধ করি অথবা বিদেশীদের সম্পত্তি, শেয়ার ইত্যাদি কিনি, তাহা হইলে আমাদের নিকট বিদেশীদের প্রাপ্য হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দাবী বাড়িবে অর্থাৎ তাহাদের দাবী কমিবে। এই ধরণে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া ও দেওয়ার হিসাবকে 'ঋণের হিসাবের খাত' (Balance of Capital Transfers) বলে। ঋণের হিসাবের খাতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া মানে বিদেশীদের উপর আমাদের দাবী কমা অর্থাৎ আমাদের নিকট বিদেশীদের ঋণের বোঝা (indebtedness) কমা। এই খাতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়া মানে বিদেশীদের উপর আমাদের দাবী বৃদ্ধি পাওয়া অর্থাৎ আমাদের নিকট বিদেশীদের ঋণের বোঝা গুরুতর হওয়া।

ঋণের হিসাবের খাতে পাওনা মানে দাবী হ্রাস, আর দেনা মানে দাবী বৃদ্ধি।

দৃশ্য ও অদৃশ্য উভয়বিধ রপ্তানী ও আমদানী এবং হস্তান্তর দেনা-পাওনা—এই সমস্ত খাতে বৈদেশিক মুদ্রা দেওয়া ও পাওয়ার হিসাবকে 'চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত' (Balance of Payments on Current Account) বলা হয়। কোন নির্দিষ্ট সময়, সাধারণতঃ এক বৎসরের মধ্যে, এই সমস্ত সূত্রে পাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ যদি এই সমস্ত সূত্রে দেয় বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়, তবে বলা হয় চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত অনুকূল হইয়াছে। বিপরীত অবস্থায় এই উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইয়াছে বলা হয়।

চলিত হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত

চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হওয়া মানে আমরা যে পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা চলতি খাতে রোজগার করিয়াছি, চলতি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করিয়াছি তাহা হইতে বেশী। এই ঘাটতি তাহা হইলে কি ভাবে পূরণ হইবে? প্রথমতঃ আমরা সোনা পাঠাইয়া বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ভরাইতে পারি। সোনা দেশে থাকিলেও তাহার মালিকানা বর্তাইবে বিদেশীদের উপর। এই সোনা দিয়া তাহারা ভবিষ্যতে যে কোন সময় আমাদের জাতীয় আয়ের এক অংশ দাবী করিতে পারে অর্থাৎ আমাদের ঋণের বোঝা বাড়িল। দ্বিতীয়তঃ আমরা স্বল্পমেয়াদী ঋণ পাইতে পারি। তৃতীয়তঃ যদি আমরা সঙ্গে সঙ্গে বা আগেই এই পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাইয়া থাকি, তাহা হইলে এই সূত্রে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া এই ঘাটতি পূরণ হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রে আমাদের ঋণের বোঝা বাড়িবে। চতুর্থতঃ আমরা

চলিত হিসাবের খাতে দেনা কিরূপে শোধ হয়

সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ভাঙ্গিয়া এই ঘাটতি পূরণ করিতে পারি। এক্ষেত্রেও আমাদের দাবী কমিল। পঞ্চমতঃ আমরা আমাদের মালিকানায় বিদেশীদের যে সম্পত্তি (assets) আছে তাহা বিক্রয় করিয়াও আমাদের ঘাটতি পূরণ করিতে পারি। এখানেও কিন্তু বিদেশীদের ঋণ কমিল। সোজা কথায় চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত এবং ঋণের হিসাবের খাতে উদ্বৃত্ত পরস্পর সমান হইতে বাধ্য। চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলে, ঋণের হিসাবের খাতে সেই পরিমাণ পাওনা হইতে বাধ্য। হিসাবনিকাশ নিখুঁত হইলে মোট দেয় বৈদেশিক মুদ্রা মোট প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রার সমান হইবেই। আমরা 'ডলার' যতই খরচ করি না কেন, খরচ করিতে হইলে কোন না কোন ভাবে প্রত্যেকটি ডলার আমাদের হাতে আসা চাই। অন্যদিক হইতে ডলার যে পরিমাণই আমাদের হাতে আসুক না কেন, প্রত্যেকটি ডলারের একটা হিল্লা হইতেই হইবে। জিনিষ বা শেয়ার কিনিয়া যদি খরচ না করি, বালিশের তলায় অন্ততঃ রাখিতে হইবে। তার মানে ডলারের দেশের উপর আমাদের দাবী বৃদ্ধি পাইল। অর্থাৎ আমাদের নিকট 'ডলার দেশ' স্বল্পমেয়াদী ঋণ পাইল। সেইজন্য বলা হয় দেনা এবং পাওনা সমান হইতে বাধ্য (A Balance of Payments must always balance)।

রপ্তানী হইল আমদানীর মূল্য, অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক দ্রব্যবিনিময়ে পর্যবসিত হয় (Our exports pay for our imports or International Trade is ultimately barter) :

বিদেশ হইতে দৃশ্য পণ্য বা অদৃশ্য সেবা যাহাই ক্রয় করি, তাহার জন্য বিদেশীদের দাম দিতে হইবে। আমাদের মুদ্রা দিয়া আমরা দাম দিতে পারি—যদি বিদেশীরা ইহা গ্রহণ করিতে রাজী থাকে। বিদেশীদের দেশে কিন্তু এই মুদ্রা অচল। আমাদের মুদ্রা তাহারা কিছুদিনের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই মুদ্রা দিয়া আমাদের দেশে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা না কিনিলে এই মুদ্রার কোন সার্থকতা থাকিবে না। এখন না হইলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের রপ্তানী করিতে হইবে এবং দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় হইবে। তাহাদের যদি আমাদের মুদ্রা লইতে আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আমরা সোনা দিয়া তাহাদের দেনা শোধ করিতে পারি। কিন্তু সোনা কোন দেশে অঢেল পরিমাণে পাওয়া যায় না। এইভাবে আমদানীর দাম শোধ করিতে গেলে অচিরেই সোনা ফুরাইয়া যাইবে। তখন রপ্তানী করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা যোগাড় না করিতে পারিলে, আমদানী বন্ধ করিতে হইবে। সকল দেশই এই আশঙ্কায় সোনা চালান হইতেছে দেখিলেই তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করে।

রপ্তানী পণ্য ও সেবার দাম কমাইয়াও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে। নতুবা আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। ঋণ করিয়া সাময়িকভাবে আমদানীর দাম পরিশোধ করা যায়। কোন দেশ খয়রাতি দানছত্র খুলিয়া বসে নাই। চিরকাল ঋণ করিয়া চালান সম্ভব নয়। আমাদের মালিকানায় যে বিদেশী সম্পত্তি আছে তাহা বিক্রয় করিয়াও কাজ কিছুদিন চালান যায়। কিন্তু বসিয়া খাইলে রাজার ধনও নিঃশেষ হইয়া যায়। যে ভাবেই দেখা যাক রপ্তানী না করিয়া আমদানী বজায় রাখা সম্ভব নয়। বৈদেশিক মুদ্রা আয় করিবার পথ হইল রপ্তানী। আমরা আমদানী করিয়া এই মুদ্রা ব্যয় করি। আয় বুঝিয়া ব্যয় করা ছাড়া কোন উপায় নাই।

ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্ত (India's Balance of Payments): স্বাধীনতা লাভের আগে ভারতে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত সাধারণতঃ অনুকূল হইত। এইসূত্রে যে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্য হইত তাহার সাহায্যে ব্রিটিশ মূলধনের সুদ ও লাভ, অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিসারদের পেন্সন ইত্যাদি বাবদ পাওনা মিটান হইত। এই দেনা মিটাইতে যাইয়া চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত আর অনুকূল থাকিত না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলে আমদানী বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে দৃশ্য ও অদৃশ্য রপ্তানী বাড়িয়া যায়। উদ্বৃত্ত এত বেশী অনুকূল হয় যে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত অনুকূল হইয়া পড়ে। এই উদ্বৃত্ত ভারতের পাওনা হিসাবে ষ্টার্লিংএ জমা হইতে থাকে।

যুদ্ধের অবসানে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। যুদ্ধের পর আসে দেশবিভাগ। কাঁচা তুলা ও কাঁচা পাট রপ্তানী করা দূরে থাক, ভারতীয় শিল্পের প্রয়োজনে এই কাঁচামাল আমদানী করা দরকার হইয়া পড়ে। খাদ্যে ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ইহার ফলে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। পরিকল্পনার আমলে যন্ত্রপাতি আমদানী অনিবার্য হইয়া পড়ে। খাদ্যের ব্যাপারেও স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভব হয় নাই। বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আরও প্রতিকূল হয়। বৈদেশিক সাহায্য দান হিসাবে পাওয়ায় প্রথম পরিকল্পনার আমলে চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত মোটামুটি অনুকূল হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনা হইতে অনেক বৃহৎ। প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইবার যে আশা করা হইয়াছিল তাহাও সফল হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য নানা রকম যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম এবং খাদ্য শস্যের আমদানী করিতে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই (১৯৫৬-৫৭) চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত ৩১২ কোটি টাকার মত প্রতিকূল হইয়া পড়ে। পরবর্তী বৎসর এই অঙ্ক আরও

বাড়িয়া ৪৭৬ কোটি টাকা হয়। বৈদেশিক ঋণের সাহায্যে এই ঘাটতির কিছু অংশ পূরণ করা হয়। ঘাটতির বাকি অংশ ভারতের হিসাবে সঞ্চিত ষ্টার্লিং (sterling balance) খরচ করিয়া মিটাইতে হয়।

সঞ্চিত ষ্টার্লিং আর সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বৈদেশিক ঋণ বরাবর আশানুরূপ পাওয়া যাইবে এরূপ মনে করা ভুল। যন্ত্রপাতি আমদানী যদি বজায় রাখিতে হয় তবে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ, দরকার হইলে একেবারে নিষিদ্ধ করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সরকার এই দিকে নজর দেওয়ায় অবস্থার সামান্য উন্নতি হইয়াছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্ত ৪৭৬ কোটি টাকা হইতে কমিয়া ৩৩৯ কোটি টাকায় পরিণত হয়। ১৯৫৯-৬০ সালে এই অঙ্ক ১৪০ কোটি টাকার কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। অবস্থার পরিবর্তন আশানুরূপ হয় নাই স্বীকার করিতে হইবে।

অবাধ বাণিজ্য এবং সংরক্ষণ (Free Trade and Protection): বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুই রকম নীতি অনুসরণ করা যায়—অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ। অবাধ বাণিজ্যের মূলনীতি হইল দেশী ও বিদেশী পণ্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য না করা। এক দেশ হইতে অন্য দেশে আমদানী ও রপ্তানীর উপর কোন বাধানিষেধ আরোপ করা হয় না। দেশী শিল্পকে কোন বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় না। বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করিলেই অবাধ বাণিজ্য নীতি লঙ্ঘিত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে যদি অনুরূপ স্বদেশী পণ্যের উপর সমপরিমাণ উৎপাদন শুল্ক (Excise duty) বসান হয়, তাহা হইলে দেশী ও বিদেশী শিল্পের মধ্যে কোন বিভেদ করা হইল না। সুতরাং অবাধ বাণিজ্য নীতিও ভঙ্গ হইল না। এই ধরণের শুল্কের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল রাজস্ব সংগ্রহ। এই ধরণের শুল্ককে রাজস্ব শুল্ক (Revenue duty) বলা হয়।

বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময় দেশীয় শিল্পকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে আমদানী ও রপ্তানীর উপর নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। ইহাকে **সংরক্ষণনীতি** বলা হয়।

সংরক্ষণ নীতি নানাভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে—

(১) আমদানী শুল্ক এই উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক ধার্য করা যাইতে পারে। ইহার ফলে বিদেশী পণ্যের দাম বাড়িয়া যাইবে। জনসাধারণ স্বদেশী পণ্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে।

বিদেশী শিল্পের তুলনায় দেশীয় শিল্পের উৎপাদন খরচ অধিক হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়। কাঁচামালের দাম কমাইতে পারিলে উৎপাদন

খরচ কমিবে। সেইজন্য অনেক সময় কাঁচামাল রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। ইহার ফলে বিদেশের বাজারে কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পায়। বিদেশীদের চাহিদা হ্রাস পায়। দেশে কাঁচামালের যোগান বাড়ে · ফলে দাম কমে। স্বদেশী শিল্পের উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকার ক্ষমতা বাড়ে।

(২) কাঁচামালের উপর রপ্তানীশুল্ক

শুল্ক বসাইয়া আশানুরূপ ফল না পাইলে সরকার আরও প্রত্যক্ষভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সরকার এই উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করিতে পারে অথবা আমদানীর পরিমাণ (quota) নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। প্রয়োজন হইলে কোন বিশেষ দ্রব্যের আমদানী সাময়িক বা চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করাও চলে।

(৩) প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ

আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য করিলে আমদানী পণ্য ও অনুরূপ স্বদেশী পণ্যের দাম বাড়িয়া যায়। দাম বাড়িবার ফলে জনসাধারণের অসুবিধা হয়। সেজন্য অনেক সময় শুল্ক না বসাইয়া সরাসরি সংশ্লিষ্ট দেশীয় শিল্পকে অর্থ সাহায্য (Bounties or Subsidies) করা হয়। ইহার ফলে দেশীয় উৎপাদকেরা দাম কমাইতে সমর্থ হয়। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সম্ভব হয়।

(৪) অর্থ সাহায্য

সংরক্ষণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমদানী শুল্কই সর্বাধিক প্রচলিত ছিল। বর্তমান প্রত্যেক নিয়ন্ত্রণের দিকে ঝোঁক বাড়িতেছে।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যুক্তি (Arguments for free Trade): আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি আলোচনা যখন করা হইয়াছে, তখনই অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর যত বাধানিষেধ আরোপিত হইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ তত সঙ্কুচিত হইবে। অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করিলে শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করিবে। উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়িবে। বাণিজ্যের সুবিধা (gains from trade) বিনিময়কারী দেশগুলির মধ্যে কিভাবে বাঁটোয়ারা হইবে, তাহা অবশ্য বিনিময় হারের (terms of trade) উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু কাহারও ভাগে কম, কাহারও ভাগে সুবিধা বেশী হইতে পারে। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে বাণিজ্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইলে, কোন পক্ষের লোকসান হইতে পারে না। অবাধ বাণিজ্য থাকিলে, ক্রেতা সর্বাধিক কম দামে জিনিষ কিনিবার সুযোগ পায়।

শ্রম বিভাগের সুবিধাই হইল অবাধ বাণিজ্যের সুফল

বিক্রেতা সর্বাধিক দামে বিক্রয় করিতে পারে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন ব্যয় কমে। ক্রেতা লাভবান হয়।

অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে অর্থ নৈতিক যুক্তির সারবত্তা অনস্বীকার্য। তাহা হইলেও সংরক্ষণ নীতি ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। অবাধ বাণিজ্যের প্রবলতম সমর্থন ছিল ব্রিটেনে। সে দেশেও ১৯৩১ সালে অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যক্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মাণী প্রভৃতি দেশ সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়াই শিল্পোন্নতি করিয়াছে। ভারতের মত অনুন্নত দেশ সংরক্ষণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। তাই বলিয়া সংরক্ষণের পক্ষে সকল যুক্তি ঢালাওভাবে মানিয়া লওয়া যায় না। সংরক্ষণের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে লোকসান হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। স্বদেশী শিল্পের সুবিধা করার জন্য অযথা নিবার্য লোকসান স্বীকার করা ঠিক হইবে না। সেজন্য সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিগুলি বিশেষভাবে যাচাই করা দরকার।

ইহা সত্ত্বেও সংরক্ষণের প্রতি আনুগত্য বাড়িয়া চলিয়াছে

সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি (Arguments for Protection): সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তির সংখ্যা অগুণতি। এক যুক্তিই আবার বিভিন্ন রূপে উত্থাপন করা হয়। কোন কোন যুক্তি অর্থনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ বিবর্জিত। বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র যুক্তির আলোচনা করা হইল—

জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার যুক্তি (Arguments for National Self-sufficiency:

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে আমদানী পণ্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। স্বাবলম্বী হইবার উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ নীতির সাহায্য লইতে হয়। সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইতে গেলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পুরাপুরি নিষিদ্ধ করিতে হয়। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের সুফল একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। এতদূর যাইতে গোঁড়া সংরক্ষণ সমর্থকেরও আপত্তি হয়। তাহারাও সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে কতকগুলি মূল (Key) শিল্প গড়িয়া তুলিবার পক্ষপাতী। তাহা না হইলে যুদ্ধবিগ্রহের সময় অসুবিধায় পড়িতে হয়। এই যুক্তি খুব সাবধানে প্রয়োগ করা দরকার। যুদ্ধ হইবেই এই সম্ভাবনা নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লওয়া যুক্তিযুক্ত নাও হইতে পারে।

(১) পরনির্ভরতা বিপদের কারণ হইতে পারে।

প্রতিরক্ষামূলক শিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Defence Industries Argument): যুদ্ধের আশঙ্কা কোন সময়েই একেবারে দূর হয় না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শিল্প একান্তভাবে দরকার। এই যুক্তির সারবত্তা

অস্বীকার করা যায় না। তবে মনে রাখা দরকার ইহা ঠিক আর্থিক যুক্তি নয়। তা ছাড়া এই যুক্তির অপপ্রয়োগ খুব সহজেই হইতে পারে। বর্তমান যুগে যুদ্ধের জন্য প্রায় সমস্ত শিল্পকেই দরকারী প্রতিপন্ন করা যায়। সকল শিল্পকে যদি সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে বাঁচাইতে হয়—তবে প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত হইবে। সমস্ত পণ্যের ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। তা ছাড়া আজকার দিনে এককভাবে নিরাপত্তা রক্ষা অসম্ভব। যৌথ নিরাপত্তার ভিত্তি সুদৃঢ় করাই সঙ্গত। তবে অনিশ্চয়তা যতদিন থাকিবে, ততদিন কিছু কিছু প্রতিরক্ষামূলক শিল্প দেশে গড়িয়া তুলিতেই হইবে।

(২) ঐশ্বর্য অপেক্ষা জাতীয় নিরাপত্তা অনেক বেশী মূল্যবান।

বিভিন্ন প্রকারের শিল্প গঠনের যুক্তি (Diversification of Industries Argument) : মনে রাখা দরকার, শিল্প গঠন আর্থিক প্রচেষ্টার মূল্য লক্ষ্য নয়। আয় বৃদ্ধি হইল আর্থিক নীতির আসল উদ্দেশ্য। যে শিল্পে আমাদের আপেক্ষিক সুবিধা নাই, সেই শিল্প জোর করিয়া গড়িয়া তুলিলে আয় কমিবে বই বাড়িবে না। যদি বলা হয় শিল্পটি বিশেষ জরুরী, তাহা হইলে পূর্ববর্তী দুইটি যুক্তির সঙ্গে এই যুক্তির কোন পার্থক্য থাকে না। অনেক সময় কতকগুলি শিল্প একই সঙ্গে গড়িয়া উঠিলে সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি ও অন্যান্য শিল্প কিছু কিছু বাহ্যিক সুবিধা (External Economies) পায়—যথা, অনেক শিল্প একসঙ্গে গঠনের ফলে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে। প্রত্যেক শিল্পের উৎপাদন ব্যয় কমিবে। অনেক শিল্প এখন বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। উন্নত দেশগুলিতে অতিরিক্ত বাহ্যিক সুবিধার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। একমাত্র অনুন্নত দেশগুলিতে এই যুক্তির সীমাবদ্ধ প্রয়োগ চলিতে পারে।

(৩) বাহ্যিক সুবিধার সুফল পাওয়া যাইতে পারে

অসাধু প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণের যুক্তি (Argument for Protection against Unfair Competition) : অনেক সময় কোন দেশ আমাদের দেশের শিল্পকে অসাধু উপায়ে ধ্বংস করিবার জন্য অস্বাভাবিক কম মূল্যে আমাদের দেশের বাজারে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। মূল্য কতটা কম হইলে অস্বাভাবিক কম বলা যায় ও এই কম মূল্যের জন্য তাহারা বাস্তবিক অসাধু উপায় গ্রহণ করিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে। তা ছাড়া পণ্যমূল্য কেন কম হইতেছে তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। আমরা অনায়াসে ধরিয়া লইতে পারি সেই শিল্পে সংশ্লিষ্ট দেশের আপেক্ষিক সুবিধা আছে। আমাদের শিল্প ধ্বংস হওয়ার পর

(৪) অন্যায় প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা করে।

বিদেশী উৎপাদক যদি আবার দাম বাড়ায়, তবেই আমাদের আপত্তি করিবার সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে।

শিশুশিল্প সংরক্ষণ যুক্তি (Infant Industries Argument) : শিল্পোন্নয়নের পথে সকল দেশ একই সময়ে একই তালে অগ্রসর হয় নাই। কোন দেশ শিল্পে অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। অনেক দেশে শিল্পায়ন সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। শিল্পোন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শিল্পে অনগ্রসর দেশগুলি সরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। শেষোক্ত দেশগুলিতে একটি বিশেষ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও, ইহারা প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়। শিল্প গঠনের প্রথমদিকে সংরক্ষণ নীতির সাহায্য পাইলে ধীরে ধীরে প্রয়োজনীয় মূলধন ও কারিগরি দক্ষতা সৃষ্টি করিতে পারে। তখন আর সংরক্ষণের প্রয়োজন হইবে না। বিদেশী শিল্পের সঙ্গে এই শিল্প তখন সমানতালে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে। এই নীতির মূলকথা হইল "শৈশবে পরিচর্যা কর, বাল্যে রক্ষণাবেক্ষণ কর এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, মুক্ত কর" (Nurse the baby, protect the child and free the adult)। এই যুক্তির বলে সাময়িকভাবে সংরক্ষণ সমর্থন করা যায়। সাবালক অবস্থায় যদি সংরক্ষণের প্রয়োজন না থাকে, তবে বলিতে হয় এই শিল্পে সংশ্লিষ্ট দেশের দীর্ঘমেয়াদী আপেক্ষিক সুবিধা ছিল। অবাধ বাণিজ্য নীতির সঙ্গে এই জাতীয় সংরক্ষণের কোন বিরোধ নাই। কার্যক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ অত্যন্ত সাবধানে করা দরকার। এই নীতির দোহাই দিয়া সকল শিল্পকে নির্বিচারে সংরক্ষণের সুবিধা দিলে, ক্রেতার ক্ষতি হইবে। অনেক শিল্প একবার এই সুবিধা পাইলে, কোন না কোন অজুহাতে এই সুবিধা আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। উৎপাদকেরা ক্রেতাদের অপেক্ষা অনেক সঙ্ঘবদ্ধ। তাহাদের রাজনৈতিক চাপে, এই নীতির অপপ্রয়োগ অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার।

(৫)
প্রথমাবস্থায় সংরক্ষণ পাইলে শেষ পর্যন্ত শিল্প নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে।

কর্মসংস্থান যুক্তি (Employment Argument) : সংরক্ষিত শিল্পে নিয়োগ বাড়িতে পারে। কিন্তু আমাদের আমদানী কমা মানে অন্য দেশের রপ্তানী কমা। অন্য দেশের জাতীয় আয় কমিবে। ফলে তাহারা আমাদের পণ্য কম পরিমাণে কিনিবে। অর্থাৎ আমাদের রপ্তানী কমিবে। রপ্তানী শিল্পে নিয়োগ কমিবে। মোট কর্মসংস্থান বাড়িবে না। লাভের মধ্যে রপ্তানী শিল্প—যেখানে আমাদের আপেক্ষিক সুবিধা বেশী, সেখান হইতে উপাদানগুলি সরিয়া আমাদের যে সকল শিল্পে আপেক্ষিক সুবিধা কম সেই সব শিল্পে নিযুক্ত হইবে। ফলে জাতীয় আয় কমিবে। কর্মসংস্থান

(৬)
সংরক্ষিত শিল্পে নিয়োগ বাড়িবে।

বাড়াইতে হইলে দেশের মধ্যে বিনিয়োগ বাড়াইতে হইবে। সকল দেশ যদি আভ্যন্তরীণ (বেকার) সমস্যার সমাধানের জন্য আভ্যন্তরীণ প্রতিবিধান গ্রহণ করে, তবে সংশ্লিষ্ট সকল দেশেরই মঙ্গল। আমদানী কমাইয়া সমস্যা সমাধান করিতে গেলে খাল কাটিয়া কুমীর ডাকা হইবে। আমাদের আমদানী কমিলে, অন্য দেশের রপ্তানী কমিবে। আত্মরক্ষার তাগিদে তাহারাও আমদানী কমাইবে।

মজুরি বৃদ্ধির যুক্তি (Wages Argument): সংরক্ষণের সাহায্যে শিল্প গড়িয়া উঠিলে শ্রমের চাহিদা বাড়িবে। ফলে মজুরি বাড়িবে। যে নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিল তাহাতে যদি মূলধনের তুলনায় শ্রম অধিক পরিমাণে লাগে, এবং রপ্তানী কমার ফলে যে শিল্প সঙ্কুচিত হইল সেখানে যদি শ্রম নূতন শিল্পের তুলনায় কম দরকার হয়, তাহা হইলেই ইহা সম্ভব। রপ্তানী শিল্পে যে সংখ্যক শ্রমিক বেকার হইবে, নূতন শিল্পে শ্রমিকের চাহিদা তাহা অপেক্ষা অধিক হইবে। শ্রমের মোট চাহিদা বাড়িবে, মজুরিও বাড়িবে। কিন্তু এই মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধির সম্পর্ক নাই। ইহার ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়িবে। জনসাধারণ ক্রেতা হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

(৭)
সংরক্ষিত শিল্পে শ্রমের চাহিদা বাড়িবে।

সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Protection): অবাধ বাণিজ্যের সপক্ষে যুক্তি ও সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তির বিশ্লেষণ করিবার কালেই সংরক্ষণের ত্রুটিগুলি আলোচনা করা হইয়াছে। সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করিলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। এই লোকসান অবধারিত। ইহার বিনিময়ে কি পাইতেছি তাহা বিশেষ বিবেচনা করা দরকার। সংরক্ষণের আওতায় একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব অনেক সহজ। বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয় না থাকিলে সংরক্ষিত শিল্পে সংগঠনে শিথিলতা দেখা দেয়। উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করিবার গরজ কমিয়া যায়। সংরক্ষণ একবার মঞ্জুর করিলে পরে প্রত্যাহার করা অত্যন্ত কঠিন। উৎপাদকেরা সংখ্যায় কম। সংগঠিত হইবার সুযোগ তাহাদের অনেক বেশী। সংরক্ষণ মঞ্জুর হইলে তাহাদের লাভ একথা তাহারা বেশ ভালভাবেই জানে। রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহারা সহজেই সংরক্ষণ আদায় করিয়া লইতে পারে। ভোগকারী জনসাধারণ সংগঠিত নয়। তা ছাড়া পরোক্ষ কর ও যে কোনও কর— ইহার ভার যে শেষ পর্যন্ত তাহাদের উপরেই পড়ে একথা খেয়াল থাকে না। সংরক্ষণ যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে আমদানী শুল্ক ধার্য না করিয়া সোজাসুজি অর্থ সাহায্য করিয়া সংরক্ষণ দেওয়াই ভাল। কোন্ শিল্পকে কত অর্থ সাহায্য করা হইতেছে তাহা আর করদাতার চোখ এড়াইবে না। সংরক্ষিত শিল্প এই অর্থ সাহায্যের সদ্ব্যবহার করিল কি না সে বিষয়ে অনেকের তীক্ষ্ণ নজর থাকিবে।

উৎপাদনে গাফিলতি হইলে বা উৎপাদনব্যয় না কমিলে সংশ্লিষ্ট শিল্পকে এজন্য জবাবদিহি করিতে হইবে। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে অর্থ সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কায় উৎপাদক সংরক্ষণের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিতে পারে।

সাম্যের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যতদিন না হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে কার্যকর রাজনৈতিক সংগঠন যতদিন গঠিত না হইবে ততদিন সংরক্ষণের আকর্ষণ থাকিয়াই যাইবে। যুদ্ধের আশঙ্কা সম্পূর্ণভাবে নিবারিত না হইলে প্রতিরক্ষামূলক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। শিল্পায়নের ব্যাপারে সকল দেশ এক পর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত উন্নত ও অনুন্নত দেশের পার্থক্য থাকিবে। অনুন্নত দেশগুলির সাহায্যে উন্নতদেশগুলির অকপট আগ্রহের পরিচয় যতদিন না পাওয়া যাইবে. ততদিন অনুন্নত দেশগুলির সংরক্ষণের সাহায্যে শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিবেই।

ভারত সরকারের বাণিজ্য-নীতি (Fiscal Policy of Government of India) : ব্রিটিশ শাসনে ভারতের স্বার্থ অপেক্ষা বৃটেনের স্বার্থকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত। ব্রিটিশ শিল্পের স্বার্থে ভারতে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত অবাধ বাণিজ্যনীতি চালু ছিল। রাজস্বের প্রয়োজনে শুল্ক ধার্য করিলেও ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প প্রতিবাদ জানাইত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেল উপনিবেশ রক্ষার জন্যও কিছু শিল্প উপনিবেশ থাকা দরকার। ভারতীয় জনমত সংরক্ষণের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অবস্থায় ১৯২১ সালে ফিসক্যাল কমিশন (Fiscal Commission) নিযুক্ত হইল।

ভারতের মত কৃষিপ্রধান দেশে শিল্পোন্নতির জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারিল না। পুরাপুরি সংরক্ষণ দিলে অনেক জিনিষের দাম বাড়িয়া যাইবে। দেশীয় ক্রেতাসাধারণের উপর বিষম করভার চাপিবে। এই যুক্তিতে কমিশন নির্বিচারে সংরক্ষণ দিবার পরামর্শ দিল না। বিশেষ বিশেষ শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার পক্ষে কমিশন সুপারিশ করিল। কমিশন কতকগুলি বিশেষ শর্ত নির্দেশ করিল। যে সকল শিল্প এই এই শর্তগুলি পূরণ করিতে পারিবে, কেবলমাত্র সেই সকল শিল্প সংরক্ষণ পাইবার অধিকারী হইবে। সংরক্ষণের সারবত্তা সাধারণভাবে স্বীকার করিলেও কমিশন নির্বিচারে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ সমর্থন করে নাই। কমিশন নির্ধারিত নীতিকে সেজন্য **বিচারমূলক সংরক্ষণনীতি** (Discriminating Protection) বলা হয়। কমিশন নির্দেশিত সর্তগুলি এইরূপ—(১) সংরক্ষণের জন্য দাবিদার শিল্পটির

বিচারমূলক সংরক্ষণনীতি

যথেষ্ট স্বাভাবিক সুবিধা থাকিতে হইবে—যথা, প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল, প্রয়োজনীয় দক্ষ শ্রমিক ও সুলভ শক্তির যোগান, শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিস্তৃত আভ্যন্তরীণ বাজার ইত্যাদি। (২) শিল্পটিকে এরূপ হইতে হইবে যেন সংরক্ষণ ব্যতীত ইহার উন্নতি সম্ভব নয়—অথবা জাতীয় স্বার্থের খাতিরে যে হারে উন্নয়ন কাম্য সংরক্ষণ ব্যতীত সেই হারে উন্নয়ন সম্ভব নয়। (৩) শিল্পটি এরূপ হইবে যেন শেষ পর্যন্ত বিনা সংরক্ষণেই বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে।

এই সর্তগুলি অনাবশ্যক কঠোর। কোন শিল্পই এই তিনটি শর্ত পূরণ করে না। প্রথম শর্তটি পূরণ করিলে, সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না। কোন শিল্প সংরক্ষণ দাবী করিলে তিনজন সদস্য বিশিষ্ট শুল্ক বোর্ড (Tariff Board) গঠন করিয়া সেই বোর্ডের উপর এই শিল্প সংরক্ষণ পাইতে পারে কিনা তাহা বিচারের ভার দেওয়া হইত। কার্যতঃ বহু শিল্পকে—যেমন কয়লা, কাচ, সিমেন্ট, খনিজ তৈল ইত্যাদি—সংরক্ষণ দেওয়া হয় নাই। এই ধরণের সংরক্ষণের আওতায় ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন সম্ভব নয়। এখানে ওখানে কিছু সংখ্যক শিল্প এই নীতির ফলে লাভবান হয়। ইহাদের মধ্যে শর্করা, লৌহ ও ইস্পাত, দিয়াশলাই, কাগজ ইত্যাদি শিল্পের উল্লেখ করা যায়।

ইহার দ্বারা ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয় নাই

নূতন বাণিজ্যনীতি (New Fiscal Policy): ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের জন্য বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির আমূল সংস্কারের প্রয়োজন অনেকদিন হইতে অনুভূত হইতেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমদানী ভীষণভাবে কমিয়া যাওয়ায় ভারতীয় শিল্পগুলি এমনিতেই সংরক্ষণের সুবিধা পাইয়াছিল। যুদ্ধের পর সংরক্ষণের প্রয়োজন আবার দেখা দিল। ১৯৪৯ সালে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য একটি নূতন ফিসক্যাল কমিশন (Krishnamachari Commission) নিয়োগ করা হয়। ভারতের বর্তমান বাণিজ্য নীতি এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতির আমলে এক একটি শিল্পের কথা পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হইত। নূতন বাণিজ্য নীতি অনুসারে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের পটভূমিকায় সংরক্ষণের দাবী বিচার করা হইবে।

উন্নয়নমূলক সংরক্ষণ

নূতন ফিসক্যাল কমিশন শিল্পগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া সংরক্ষণের সুপারিশ করিয়াছে। (১) প্রতিরক্ষামূলক ও যুদ্ধোপকরণ নির্মাণকারী শিল্প—ইহাদের যথোপযুক্ত সংরক্ষণ দিতেই হইবে। সংরক্ষণের জন্য যত বেশী মূল্য দিতে হোক তাহা দেখিবার দরকার নাই। (২) বুনিয়াদী ও মূল শিল্প—ইহাদের প্রয়োজনমত সংরক্ষণ

দিতে হইবে। সংরক্ষণের মাত্রা ও পদ্ধতি শুল্ক-কমিশন নির্ধারণ করিবে। (৩) অন্যান্য শিল্প—ইহারাও সংরক্ষণের দাবী করিতে পারে। স্বাভাবিক সুবিধা, উৎপাদন ব্যয় শেষ পর্য্যন্ত বিনা সংরক্ষণে চলিতে পারিবে কি না, সংরক্ষণের ব্যয়ভার, সর্বোপরি জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সংরক্ষণ প্রয়োজন কিনা—এই সমস্ত বিচার করিয়া সংরক্ষণ দিতে হইবে। সংরক্ষণ দানের সিদ্ধান্ত করিবে একটি স্থায়ী শুল্ক-কমিশন। সংরক্ষণের ব্যাপারে জাতীয় স্বার্থ বাদে অন্য কোন শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে এরূপ কথা কমিশন বলে নাই।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. What is the justification for a separate theory of International Trade?
   আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বতন্ত্র আলোচনার সার্থকতা কি? [পৃষ্ঠা ২৩৭-২৩৯]

2. Give some reasons why nations find it advantageous to trade with one another.
   বিভিন্ন দেশ যে যে কারণে অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য করা সুবিধাজনক মনে করে তাহাদের কতকগুলি ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ২৩৯-২৪৪]

3. What are the advantages and disadvantages of Foreign Trade?
   বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা অসুবিধাগুলি বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২৪৩-২৪৬]

4. Write notes on:
   (a) Balance of Trade. (b) Balance of Payments on current account and (c) Balance of payments.
   টীকা রচনা কর—
   (ক) বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (খ) চলতি হিসাবের খাতে লেনদেন উদ্বৃত্ত এবং (গ) লেনদেন উদ্বৃত্ত। [পৃষ্ঠা ২৪৮-২৫২]

5. Enumerate the chief articles of India's export and import. Indicate the causes of unfavourable balance of trade in India in the last few years.
   ভারতের প্রধান প্রধান রপ্তানী ও আমদানী দ্রব্য বর্ণনা কর। গত কয়েক বৎসরে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইবার কারণ বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৮, ২৫৩-২৫৪]

6. "International Trade in the last analysis is a kind of barter"—Elucidate.
   "বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রত্যক্ষ বিনিময় ছাড়া আর কিছু নয়।" —উক্তিটি বিশদভাবে বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ২৫২-২৫৩]

7. Do you advocate Free Trade or Protection? Give reasons for your answer.
   অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ—এই দুই বাণিজ্য নীতির মধ্যে কোনটি তুমি সমর্থন কর? কেন সমর্থন কর কারণ সহ বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ২৫৫-২৬০]

8. Describe India's present policy of Protection.
   ভারতের বর্তমান সংরক্ষণ নীতি বর্ণনা কর। [পৃষ্ঠা ২৬০-২৬২]

অষ্টাদশ অধ্যায়

বাজার

(Markets)

বাজারের ক্রমবিকাশ (Evolution of the Market) : স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রায় বিনিময়ের স্থান ছিল না। শ্রমবিভাগের ফলে বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা দিল। যোগাযোগের সুবিধার জন্য সকলে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হইত। এইভাবে বাজারের (market place) উৎপত্তি হইল। ইহা ছিল স্থানীয় বাজার। আশেপাশের লোকজন যে যার উৎপন্ন সামগ্রী বাজারে লইয়া আসিত। যাবতীয় জিনিষের লেনদেন একই জায়গায় হইত। কালে কালে বাজারের বিশেষীকরণ হইল। এক একটি দ্রব্যের লেনদেনের জন্য পৃথক পৃথক বাজার গড়িয়া উঠিল। সামান্য পরিমাণ লেনদেনের জন্য আলাদা বাজার করা কখনই সম্ভব হইত না। বাজারের পরিধি বিস্তারলাভ করায় এই বিশেষীকরণ সম্ভব হইয়াছিল। বিস্তৃত বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অনেক সময় সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটিয়া উঠিত না। পরোক্ষ সংযোগের ভিত্তিতেই লেনদেন হইত।

ভৌগোলিক অর্থে বাজার বলিতে একটি বিশেষ স্থানকে বুঝায়। অর্থশাস্ত্রে বাজার কথাটি ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বিশেষ দ্রব্যকে কেন্দ্র করিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ক—যার ফলে তাহাদের মধ্যে লেনদেন সম্ভব হয়—ইহাকেই অর্থশাস্ত্রে বাজার বলা হয়। বিভিন্ন ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইহার ফলে দামের উৎপত্তি হয়। দাম নিয়ামক শক্তির নামই হইল **অর্থনৈতিক বাজার**।

বাজার বলিতে কোন দ্রব্যের বাজার বুঝিতে হইবে। ভোগ্যপণ্যের মত মূলধন দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানগুলিরও বাজার আছে। পৃথক পৃথক দ্রব্যের পৃথক পৃথক বাজার। ফুলের বাজার আর ফলের বাজার এক নয়। ফলের আবার খুচরা ও পাইকারী—দুইটি আলাদা বাজার আছে। কোন জিনিষ বাজার হইতে উধাও হইবার কথা আমরা বলি। অর্থাৎ ক্রেতা যে দাম দিতে চায়—সেই দামে কেহ বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নয়। ব্যবসায়ীরা আবার বলে—বাজার খারাপ যাইতেছে। অর্থাৎ তাহারা যে দাম চায় সেই দামে কিনিবার লোকের অভাব হইয়াছে। বাজার

বাজার হইতে হইলে
১। দ্রব্য ও
২। দ্রব্যকে কেন্দ্র করিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক অর্থাৎ দাম থাকা চাই।

হইতে গেলে দ্রব্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা দুই-ই দরকার। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ থাকিতে হইবে। নতুবা লেনদেন বা ক্রয়-বিক্রয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। তবে সাক্ষাৎ সম্পর্ক না হইলেও ক্ষতি নাই। দালাল বা চিঠিপত্র বা টেলিফোন মারফৎ পরোক্ষ সংযোগ হইলেও চলিবে। মোট কথা ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্ক অর্থাৎ দামের উৎপত্তি হওয়া চাই।

বাজারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Markets): বাজারের পরিধি (Extent) হিসাবে বাজার তিন রকম হইতে পারে—স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। কাঁচা দুধ, তরিতরকারী ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া হইতে পারে না। ইহাদের ক্রয়-বিক্রয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সেজন্য ইহাদের বাজারকে স্থানীয় বাজার বলে। অনেক জিনিষের লেন-দেন সমস্ত দেশ জুড়িয়া হয়—যেমন আমাদের দেশের সরকারী ঋণপত্র। ইহা সচরাচর বিদেশে বিক্রয় হয় না। ইহাদের বাজারকে জাতীয় বাজার বলা যায়। পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আজকাল অনেক জিনিষের ক্রয়-বিক্রয় বহু দেশ জুড়িয়া হয়—যেমন সোনা, পাট ইত্যাদি। ইহাদের বাজারকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে।

(ক) পরিধি অনুসারে
১। স্থানীয়
২। জাতীয়
৩। আন্তর্জাতিক

বাজারের বিস্তার: সকল দ্রব্যের বাজার সমান বিস্তৃত নয়। বাজারের বিস্তার কতকগুলি ব্যাপার বা শর্তের উপর নির্ভর করে।

স্থায়ী ও ব্যাপক চাহিদা না থাকিলে বাজার কোনদিন বিস্তৃত হইতে পারে না। গমের চাহিদা জগদ্ব্যাপী; উল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিশেষ দরকার হয় না। গমের বাজার সেজন্য উলের বাজার অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। উলের চাহিদা আবার শীতকালে বেশী হয়। উলের শীতকালের বাজার সেজন্য গ্রীষ্মকালের বাজার অপেক্ষা বিস্তৃত। উটপাখীর পালক পরিধান করা একসময় খুব ফ্যাসন হইয়াছিল। তখন ইহার চাহিদা ব্যাপক ছিল—বাজারও বিস্তৃত ছিল। কিছুদিন বাদে ফ্যাসান বদলাইল—ইহার চাহিদা কমিল—বাজারও সঙ্কুচিত হইল।

(১) ব্যাপক চাহিদা

কোন দ্রব্যের পর্যাপ্ত যোগান না থাকিলে তাহার বাজার বিস্তৃত হইতে পারে না। প্রাচীন যুগের ভাস্কর্য কলাবিদ্যা প্রভৃতির নিদর্শন অত্যন্ত পরিমিত সংখ্যায় পাওয়া যায়। সেজন্য ইহাদের বাজার বিস্তৃত হইতে পারে না।

(২) পর্যাপ্ত পরিমাণ

চাহিদা ও যোগান যতই সুপরিসর হোক, স্থায়িত্ব না থাকিলে দ্রব্যের বাজার বিস্তারলাভ করিতে পারে না। কাঁচা দুধের চেয়ে গুঁড়া দুধের স্থায়িত্ব বেশী। অনেক দূরে চালান করিলেও ইহা নষ্ট হইবার ভয় নাই। সেজন্য ইহার বাজার অধিকতর ব্যাপক।

(৩) স্থায়িত্ব

ইটের চাহিদা ব্যাপক, যোগান পর্যাপ্ত এবং ইহার স্থায়িত্বও উল্লেখযোগ্য। তবুও ইহার বাজার বিস্তৃত নয়। কেননা ইহার পরিবহন-যোগ্যতা নাই। আয়তনের তুলনায় ইহার মূল্য কম। মূল্যের তুলনায় পরিবহন খরচ পড়ে বেশী। পড়তা বেশী হইয়া যায়। সেজন্য বেশী দূর চালান দিয়া সুবিধা করা যায় না। মরসুমের সময় জিনিষের দাম কম থাকে। মরসুম ফুরাইয়া গেলে দাম বাড়ে। আগেকার তুলনায় পরিবহন খরচ কম লাগে। বাজার তখন বিস্তারলাভ করে।

(৪) পরিবহন যোগ্যতা

পণ্যদ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা না করিয়া ক্রেতা কিনিতে রাজী হইবে না। পরীক্ষার ফল অনিশ্চিত। ক্রেতা খরচ করিয়া বিক্রেতার নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিবে। বিক্রেতারও একই অবস্থা। নমুনাদৃষ্টে গুণবিচার সম্ভব হইলে, ক্রেতা ও বিক্রেতারও দূরত্ব যত বেশী হোক, কিছু আসে যায় না। কেননা নমুনা পাঠাইবার খরচ যৎসামান্য। যে সকল দ্রব্যের গ্রেড (grade) করা যায়, সেই সব দ্রব্যের নমুনাও পাঠাইবার দরকার হয় না। গ্রেড উল্লেখ করিয়া চিঠিপত্র মারফৎ পাকা কথা হইতে পারে। আমাদের দেশে কয়লার গ্রেড করা আছে। বিক্রেতা জানে কোন গ্রেড মানে কি ধরণের কয়লা। জাপানে বসিয়াও সে নিশ্চিন্ত-মনে তার প্রয়োজনমত গ্রেডের কয়লা অর্ডার দিতে পারে। তূলা, পাট, চা ইত্যাদি দ্রব্যের নমুনা বা গ্রেড করা সম্ভব। সেজন্যই ইহাদের দুনিয়াজোড়া বাজার।

(৫) নমুনার সাহায্যে চেনার যোগ্যতা

(খ) ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তার ফলে উৎপত্তি হয় দামের। দামের উপর ক্রেতা (চাহিদা) অথবা বিক্রেতা (যোগান)—কাহার প্রভাব অধিক হইবে তাহা নির্ভর করে সময়ের তারতম্যের উপর। সময় যত বেশী হইবে, যোগানের পরিবর্তন তত বেশী সহজসাধ্য হইবে—দামের উপর যোগানের প্রভাব তত বেশী হইবে। সময়ের দিক হইতে মার্শাল বাজারকে চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন। মার্শালের উদাহরণের সাহায্যে আমরা এই চার রকম বাজারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিব।

সময়ের ভিত্তিতে বাজার চারি প্রকার হয়

এক দিনের বা কয়েকদিনের বাজারকে মার্শাল অত্যল্পকালীন (very short-period) বাজার আখ্যা দিয়াছেন। এত অল্প সময়ে যোগানের বিশেষ পরিবর্তন করা যায় না। ফলে চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়িয়া যায়—চাহিদা কমিলে দাম কমিয়া যায়। দামের উপর চাহিদার প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশী। উদাহরণ হিসাবে কোন একটি দিনের মাছের বাজারের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। মাছের চাহিদা হঠাৎ বাড়িয়া গেলেও, যোগান তৎক্ষণাৎ বাড়িতে পারে না। ফলে দাম বাড়ে। আবার মাছের চাহিদা হঠাৎ কমিয়া গেলেও, যোগান কমান সম্ভব নয়। কেননা মাছ বেশীক্ষণ থাকিলে পচিয়া যাইবে। ফলে দাম কমিবে। মার্শাল যখন লিখিয়াছিলেন তখন মাছের মতন পচনশীল দ্রব্যকে কিছু সময় সংরক্ষিত করিতে পারে এমন কোন বৈজ্ঞানিক বস্তু আবিষ্কৃত হয় নাই। তাছাড়া সকল দ্রব্য মাছের মতন পচনশীল নয়। দাম অত্যন্ত কম মনে হইলে বিক্রেতা তখন বিক্রয় না করিয়া গুদামজাত করিয়া অপেক্ষা করিতে পারে। নিকট ভবিষ্যতে দাম বাড়িতে পারে মনে করিলে, তবেই বিক্রেতা অপেক্ষা করিতে পারে। তবে এইভাবে যোগানের পরিবর্তন সম্ভব হইলেও তাহা উল্লেখযোগ্য নয়।

(১) অত্যল্পকালীন বাজারে যোগান প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারবার একই দ্রব্য প্রস্তুত করে তাহারা একই শিল্পের অন্তর্গত। কারবার চালাইতে হইলে বিভিন্ন উপাদান প্রয়োজন হয়। ইহাদের কতগুলি স্থায়ী—অন্যগুলি পরিবর্তনশীল। স্থায়ী উপাদান বাড়াইতে সময় লাগে। চাহিদা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা না বুঝা পর্যন্ত কারবারী স্থায়ী উপাদান বাড়াইবার ঝুঁকি লইবে না। কেননা স্থায়ী উপাদান অবিভাজ্য। একসঙ্গে অনেকটা খরচ করিতে হইবে। পরিবর্তনশীল উপাদান ইচ্ছামত বাড়ান কমান যায়। কারবারী প্রথমদিকে স্থায়ী উপাদান ঠিক রাখিয়া পরিবর্তনশীল উপাদান বাড়াইয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। অল্পকালীন (Short-period) বাজারে এইভাবে যোগান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিক্রেতা এখানে একেবারে অসহায় নয়। মাছ ধরার ব্যাপারে নৌকা ও জাল হইল স্থায়ী উপাদান—জেলের শ্রম হইল পরিবর্তনশীল উপাদান। চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়িবে। দাম বাড়িলে তৎক্ষণাৎ নৌকা ও জালের সংখ্যা বাড়ান সম্ভব নয়। নৌকা, জাল তৈয়ার করিতে সময় লাগে। তাছাড়া নৌকা ও জাল এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ তৈয়ার করা সম্ভব

(২) অল্পকালীন বাজারে পরিবর্তনশীল উৎপাদন কমাইয়া বাড়াইয়া যোগান কমান বা বাড়ান সম্ভব। স্থায়ী উৎপাদন বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

নয়। চাহিদা স্থায়ীভাবে বাড়িয়াছে ইহা না বুঝিয়া জেলে এই বাবদ একসঙ্গে খরচ করিয়া নৌকা ও জাল তৈয়ার করিবে না। একই নৌকা ও জাল বেশী বার ব্যবহার করিয়া—নদীবক্ষে অধিক সময় অবস্থান করিয়া যোগান বাড়াইবার চেষ্টা করিবে।

(৩) দীর্ঘকালীন

দীর্ঘকালীন (Long-period) বাজারে স্থায়ী উপাদান বাড়াইয়া, ইহার আকার বৃহত্তর করিয়া বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িয়া যোগান বাড়িতে পারে। চাহিদা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিতে পারিলে জেলেরা অধিক সংখ্যায় নৌকা ও জাল তৈয়ার করিবে। বৃহত্তর ও উন্নততর নৌকা ও জাল প্রস্তুত হইবে। অনেক জেলে যাহারা এই ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা পুরাতন ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসিবে।

(২) অতিদীর্ঘকালীন

মার্শাল অতিদীর্ঘকালীন (Secular or very long-period) বাজারেরও উল্লেখ করিয়াছেন। যোগানের পরিবর্তনের সম্ভাবনা এখানে আরও অনেক ব্যাপক। জনসংখ্যার আয়তন, উৎপাদনের কলাকৌশল, মূলধনের যোগান—ইত্যাদি পরিবর্তিত হইবার ফলে যোগান ও দামের পরিবর্তন হইতে পারে।

বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার প্রধানতঃ তিন রকম হয়

(গ) কোন দ্রব্যকে কেন্দ্র করিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ককে বাজার বলে। চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার সম্পর্ক। প্রতিযোগিতার মাত্রা কিন্তু সকল বাজারে একরকম নয়। প্রতিযোগিতার তারতম্য হইলে দাম নির্ধারণের ব্যাপারেও তারতম্য লক্ষিত হয়। প্রতিযোগিতার মাত্রা তিনটি জিনিষের উপর নির্ভর করে—ক্রেতার সংখ্যা, বিক্রেতার সংখ্যা ও বিক্রেতার উৎপন্ন দ্রব্যের গুণগত তারতম্য। কোন কোন বাজারে—বিশেষ করিয়া উপাদানের বাজারে—ক্রেতার সংখ্যা খুব কম হওয়ায় তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অভাব দেখা যায়। ভোগ্যপণ্যের বাজারে ক্রেতার সংখ্যা সাধারণতঃ অনেক হয়। ক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইব। প্রতিযোগিতা বলিতে বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বুঝিব। সেই হিসাবেই আমরা বাজারের শ্রেণী বিভাগ করিব।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা

১। **পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা** (Perfect Competition): প্রতিযোগিতা পূর্ণাঙ্গ হইতে গেলে নিম্নলিখিত শর্তগুলির পূরণ হইবে—

অনেক বিক্রেতা (Many Sellers): বাজার দাম মোট চাহিদা ও মোট যোগানের উপর নির্ভর করে। মোট চাহিদা ও মোট যোগানের পরিবর্তন হইলে বাজার দামেরও পরিবর্তন হইবে। মোট যোগান হইল কোন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত যোগান। কোন প্রতিষ্ঠানের যোগান (individual firm's output) পরিবর্তিত হইলে, মোট যোগানও পরিবর্তিত হইবে। মোট যোগানের তুলনায় প্রতিষ্ঠানের যোগান যদি সমান হয়, তবে প্রতিষ্ঠানের যোগান পরিবর্তিত হইলে, মোট যোগানের কোন উল্লেখযোগ্য (perceptible) পরিবর্তন হইবে না। বাজার দামের কোন ইতরবিশেষ হইবে না। 'বিক্রেতার সংখ্যা 'অনেক' পদবাচ্য হইবে কি না তাহা মাথাগুণতি করিয়া ঠিক হয় না। কোন বিক্রেতা এককভাবে বাজারদামের উপর প্রভাব বিস্তার না করিতে পারিলে তবেই অনেক বিক্রেতা আছে ধরিতে হইবে। কোন শিল্পে ১০০টি প্রতিষ্ঠান আছে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যোগান ১০ হইলে মোট যোগান ১০০০ হইবে। কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার যোগান ১০ হইতে বাড়াইয়া ১১ করিল—অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের যোগান ১০% বৃদ্ধি পাইল। মোট যোগান কিন্তু বাড়িল মোট ·১%। ইহার ফলে দাম কমিবার আশঙ্কা নাই ধরা যায়। অন্য একটি শিল্পে প্রতিষ্ঠান সংখ্যা ১৬১—ধরা যাক ইহার মধ্যে ১টি প্রতিষ্ঠানের যোগান ২০০ এবং বাকী ১৬০টি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকে ৫টি করিয়া যোগান দেয়। মোট যোগান এখানেও ১০০০। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি যোগান ১০ বাড়াইলে মোট যোগান ২% বাড়িবে—বাজার দাম কিছু কমিবে। মাথাগুণতিতে প্রথম শিল্প অপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান থাকিলেও, বলিতে হইবে এখানে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক নহে।' অনুরূপভাবে অনেক ক্রেতা বলিলে বুঝিতে হইবে কোন ক্রেতা এককভাবে বাজারদাম প্রভাবান্বিত করিতে পারে না।'

(১)
কোন বিক্রেতা এককভাবে বাজার দামের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য অভিন্ন (identity of product) হইতে হইবে। বস্তুগত অভিন্নতাই এজন্য যথেষ্ট নয়। দুইটি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও, ক্রেতা যদি একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়, তবে আমাদের বলিতে হইবে, দ্রব্য দুইটি অভিন্ন নয়। বস্তুতঃ ক্রেতা যে কোন কারণেই হোক, কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যকে অধিকতর গুণসম্পন্ন মনে করিলে, সেই প্রতিষ্ঠানের দাম বাড়ান কমানর কিছুটা ক্ষমতা থাকিয়া যায়। ফলে প্রথম শর্তটি ভঙ্গ হয়।

(২)
কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য অপর যে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত নিখুঁতভাবে অভিন্ন হইবে

এই শিল্পে নূতন প্রতিষ্ঠানের অবাধ প্রবেশের স্বাধীনতা (freedom or ease of entry) থাকা চাই। বাজার দাম বাড়াইবার ক্ষমতা একেবারে না থাকিলে বিক্রেতা অস্বস্তি বোধ করে। বিক্রেতা লাভ বাড়াইতে চায়। দাম বাড়াইয়া বা খরচ কমাইয়া লাভ বাড়াইবার চেষ্টা করা চলে। খরচ কমাইয়া লাভ বাড়ান একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেক বিক্রেতা থাকিলে, দাম বাড়াইবার সহজ উপায়টি বন্ধ হইয়া যায়। বিক্রেতারা সেজন্য জোট পাকাইয়া (association) দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চায়। তাহা হইলে প্রথম শর্তটি ভঙ্গ হইবে। দাম নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য অতিরিক্ত লাভ করা। যদি এই শিল্পে অবাধ প্রবেশের স্বাধীনতা থাকে, তবে এই অতিরিক্ত লাভের লোভে উৎপাদনের উপাদানগুলি অন্য শিল্প হইতে সরিয়া এই শিল্পে ঢুকিবে। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হইবে, আবার অনেক বিক্রেতা হইয়া দাঁড়াইবে। দীর্ঘমেয়াদী কালে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক থাকিতে হইলে, অবাধপ্রবেশের স্বাধীনতা একান্ত দরকার।

(৩)
উৎপাদনের উপাদানগুলির এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পে স্থানান্তরের কোনও অন্তরায় থাকিবে না।

উপরি-উক্ত তিনটি শর্ত ছাড়াও বাজারের সংগঠনের দিক হইতে আরও একটি শর্তের উল্লেখ করা হয়—

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা থাকিতে হইবে। বাজারের বিভিন্ন অংশে বিনিময়ের হার সম্বন্ধে প্রত্যেক ক্রেতা ও প্রত্যেক বিক্রেতাকে অবহিত থাকিতে হইবে। তাহা হইলে কোন বিক্রেতার পক্ষে অপর কোন বিক্রেতা অপেক্ষা অধিক দাম আদায় করা সম্ভব হইবে না। ক্রেতা কম দামে পাইলে বেশী দাম দিয়া কিনিবে না। ফলে যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে বাজারে একটিমাত্র দামে কেনাবেচা হইবে।

২। **একচেটিয়া বাজার** (Monopoly) : পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা হইল একচেটিয়া কারবার। এখানে প্রতিযোগিতার একান্ত অভাব। একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান এখানে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করে। প্রতিষ্ঠানের যোগান ও মোট যোগান এখানে সমার্থক। নিখুঁত একচেটিয়া কারবারে (pure monopoly) সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের কোন বিকল্প সামগ্রী (substitute) থাকে না। প্রত্যেক ক্রেতার পক্ষে ইহা অপরিহার্য। একচেটিয়া কারবারী প্রত্যেক ক্রেতার নিকট হইতে তাহার শেষ কপর্দক পর্যন্ত আদায় করিয়া লইতে পারে। প্রত্যেকের আয়ের সবটুকু একচেটিয়া কারবারীর কুক্ষিগত হইবে। বলা বাহুল্য বাস্তব জীবনে এই ধরণের নিখুঁত একচেটিয়া কারবারের দর্শন মিলে না। কারণ, সকল দ্রব্যেরই কিছু না কিছু বিকল্প দ্রব্য আছে। কোন কোন দ্রব্য আছে যাহাদের বদলী অপর দ্রব্য ব্যবহার

করিলে অভাব পরিতৃপ্তির বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না—যেমন কফি ও কোকো। ইহাদিগকে নিকটবর্তী বা ঘনিষ্ট (close) বিকল্প দ্রব্য বলা হয়। আবার অনেক দ্রব্য আছে যাহাদের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করিলে দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার অবস্থা হয়। ইহাদিগকে দূরবর্তী (distant) বিকল্প দ্রব্য বলা হয়। ব্যবহারিক জীবনে একচেটিয়া কারবার বলিতে বুঝায়—(১) একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের যোগান দেয় এবং (২) এই দ্রব্যের কোন ঘনিষ্ঠ বিকল্প সামগ্রী নাই। ঘনিষ্ঠ বিকল্প সামগ্রী থাকিলে স্বাধীনভাবে মূল্যনীতি নির্ধারণ করা চলে না। 'চা'এর দামের হেরফের করিলে কোকোর চাহিদা, যোগান ও দাম পরিবর্তিত হইবে। ফলে চায়ের চাহিদাও প্রভাবান্বিত হইবে। সুতরাং একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানও যদি চা উৎপাদন করে, সেই প্রতিষ্ঠানকে কোকো শিল্পের সম্ভাব্য পরিবর্তনের দিকে নজর রাখিয়া মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে হইবে। একচেটিয়া কারবারী যে মূল্যনীতিই অবলম্বন করুক না কেন, ঘনিষ্ঠ বিকল্প না থাকায় অন্যান্য শিল্পের উপর ইহা কোন প্রভাব বিস্তার করিবে না। একচেটিয়া কারবারী স্বাধীনভাবে মূল্যনীতি নির্ধারণের সুযোগ পাইবে।

একচেটিয়া কারবারী বাজার দাম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে

৩। **অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা** (Imperfect Competition) : বাস্তব জীবনে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবার—উভয়েই বিরল। অধিকাংশ বাজারের অবস্থা এই দুইয়ের মাঝামাঝি। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার মূল্যনীতি (price policy) থাকিতে পারে না। কারণ, বাজার দামের উপর তাহার হাত নাই। অধিকাংশ বাজারে বিক্রেতার মূল্য নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে থাকে। বিক্রেতা দাম কিছুটা বাড়াইতে কমাইতে পারে। তাই বলিয়া একচেটিয়া কারবারীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও তাহার নাই। অন্যান্য শিল্পের পরোয়া না রাখিয়াই একচেটিয়া কারবারী স্বীয় মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। এখানে বিক্রেতার এতদূর স্বাধীনতা নাই। এই ধরণের বাজারকে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজার বলা হয়।

অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার উদ্ভব দুই কারণে হইতে পারে। বিক্রেতার সংখ্যা একের অধিক হইলেও অনেক না হইতে পারে। বিক্রেতার সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলে একজন বিক্রেতার যোগান আর মোট যোগানের সামান্য অংশ থাকিবে না। তাহার যোগানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোট যোগান বেশ খানিকটা পরিবর্তিত হইবে। ফলে বাজার দামের পরিবর্তন হইবে। সুতরাং মূল্যনীতি নিরূপণের কথা উঠে। বাজার দামের পরিবর্তন হইলে অন্যান্য বিক্রেতা প্রভাবান্বিত হইবে। সেই বুঝিয়া মূল্যনিতি নির্ধারণ করিতে হইবে।

স্বল্পসংখ্যক বিক্রেতা

এই ধরণের বাজারকে অর্থশাস্ত্রে অলিগোপলি (oligoploy) বলে। অলিগোপলির একটি বিশেষ রূপ হইল ডুয়োপলি (duopoly)। ডুয়োপলিতে বিক্রেতার সংখ্যা দুই।

বিক্রেতার সংখ্যা অনেক হইলেও তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য যদি অভিন্ন না হয়, তাহা হইলেও প্রতিযোগিতা অসম্পূর্ণ হইতে পারে। বিভিন্ন উৎপাদকের উৎপন্ন দ্রব্য যদি পৃথকীভূত (differentiated) হয়, তবে বাজারে এক দাম চালু না থাকিতে পারে।

উৎপন্ন দ্রব্য পৃথিকীভূত হইতে পারে।

কিছু সংখ্যক ক্রেতার বিশেষ ধরণের (brand) দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ থাকিবে। দাম সামান্য বেশী হইলেও তাহারা ইহাই কিনিয়া যাইবে। এখানে বিক্রেতার মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কিছুটা আছে। সে জানে দাম সামান্য বাড়াইলেও তাহার ক্রেতারা একযোগে তাহাকে ছাড়িবে না। এই ধরণের বাজারকে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা (monopolistic competition) বলা হয়। একচেটিয়া কারবারীর মত এখানেও বিক্রেতা স্বীয় মূল্যনীতি নির্ধারণ করিতে পারে। বাজার দামে বিক্রয় করিতে সে বাধ্য নয়। তবে তাহার ক্ষমতা একচেটিয়া কারবারীর মত নিরঙ্কুশ নয়। তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের অনেক ঘনিষ্ঠ বিকল্প সামগ্রী আছে। সুতরাং তাহাকে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়।

॥ আদর্শ প্রশ্নাবলী ॥

1. **What is meant by 'Market' in Economics? What are the conditions that govern the extent of a market?**
   অর্থশাস্ত্রে বাজার ব'লিতে কি বুঝায়? বাজারেব পবিধি কি কি বিষয় দ্বারা নিরূপিত হয়?
   [পৃষ্ঠা ২৬৩-২৬৫]

2. **How would you classify markets according to time?**
   সময় হিসাবে বাজারেব শ্রেণীবিভাগ কিরূপে করিবে? [পৃষ্ঠা ২৬৫-২৬৭]

3. **What is Perfect Competition?**
   পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে? [পৃষ্ঠা ২৬৭-২৬৯]

4. **What is Monopoly? Explain how competition becomes imperfect.**
   একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে? প্রতিযোগিতা কি করিয়া অপূর্ণাঙ্গ হয় বুঝাইয়া দাও।
   [পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭১]

ঊনবিংশ অধ্যায়

চাহিদা ও যোগান

(Demand and Supply)

দাম নিয়ামক শক্তিকে আমরা বাজার আখ্যা দিয়াছি। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। ইহার ফলে দামের সৃষ্টি হয়। দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় জানিতে হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মনোভাব (attitude) বুঝিতে হইবে। ক্রেতার মনোভাব প্রতিফলিত হয় তাহার চাহিদার মাধ্যমে। বিক্রেতা যোগানের মাধ্যমে তাহার মনোভাব প্রকাশ করে। চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি নির্ণয় হইল দাম নির্ধারণ সমস্যা সমাধানের প্রথম সোপান।

চাহিদা (Demand)**:** অভাববোধ অভাব পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগায়। আকাঙ্ক্ষা হইতে চাহিদার উৎপত্তি হয়। অর্থশাস্ত্রে কিন্তু চাহিদা হইতে গেলে কেবলমাত্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই চলিবে না। আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ক্ষমতাও থাকা চাই। আদার ব্যাপারী জাহাজের খোঁজ করিয়া লাভ নাই। কেন না জাহাজ ভাড়া দিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তাহার আকাঙ্ক্ষা কোনদিন চাহিদারূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া জাহাজ ভাড়ার (অর্থাৎ বাজার দামের) উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। **চাহিদা হইতে গেলে ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ক্রয় করিবার ক্ষমতাও থাকিতে হইবে।**

ক্রয়ের সামর্থ্যযুক্ত ইচ্ছাই চাহিদা।

আয় সীমাবদ্ধ। অথচ অভাব অসংখ্য। অভাব পূরণ হয় দ্রব্যের সাহায্যে। কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের জন্য যত অধিক দাম দিতে হয়, অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়ের সামর্থ্য তত কমিয়া যায়। অন্যান্য অভাবের তীব্রতা বাড়িয়া যায়। এই বিশেষ দ্রব্যটির আকর্ষণ তত কমিয়া যায়। ইহা কিনিবার ইচ্ছা তত ক্ষীণ হইয়া আসে। দাম বাড়ার ফলে ক্রয়ের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। দামের পরিবর্তন হইলে চাহিদারও পরিবর্তন হয়। বস্তুতঃ দাম নিরপেক্ষ চাহিদার কোন অর্থ করা যায় না। টাকায় ১২টি কমলালেবু পাওয়া গেলে কমলালেবুর চাহিদা যে পরিমাণ হইবে, টাকায় ১৬টি করিয়া দর হইলে চাহিদার পরিমাণ নিশ্চয় অনুরূপ হইবে। অর্থশাস্ত্রে চাহিদা বলিতে সব সময় কোন নির্দিষ্ট দামে চাহিদা (demand at a particular price) বুঝায়। বিভিন্ন দামে

চাহিদা মানে কোন বিশেষ দামে চাহিদা

(alternating prices) ক্রেতার চাহিদার পরিমাণও বিভিন্ন হয়। আবার একটি বিশেষ দামে ক্রেতা একটি বিশেষ পরিমাণে চাহিদা করে। ইহাকে ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা দাম (individual demand price) বলা হয়। বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার জন্য বিভিন্ন চাহিদা দাম থাকে। ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদার তালিকা (individual demand schedule) বলা হয়। মোট চাহিদা ব্যক্তিগত চাহিদার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। মোট চাহিদার স্বরূপ বুঝিতে হইলে ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা কি করিয়া ঠিক হয় বুঝিতে হইবে। কোন একটি বিশেষ দামে ব্যক্তি কেন একটিমাত্র বিশেষ পরিমাণ—তাহার চেয়ে কম বা বেশী নয়—চাহিদা করে, তাহা জানিতে হইবে।

ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা (Individual Demand Schedule): দ্রব্য অসংখ্য। ক্রেতা যে কোন দ্রব্য কিনিতে পারে। অবশ্য ইহার ক্রেতাকে দাম দিতে হইবে। ব্যক্তির আয় সীমাবদ্ধ। ব্যক্তির উদ্দেশ্য সর্বাধিক সন্তোষ লাভ করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে বুঝিয়া খরচ করিতে হইবে। জিনিষ যত অধিক পরিমাণে কেনা হইবে, মোট উপযোগ তত বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু জিনিষের জন্য যে দাম দিতে হইবে তাহা দিয়া অন্যান্য জিনিষ কেনা যাইত। সেদিক দিয়া লোকসান হইবে। জিনিষ কি পরিমাণে কেনা হইবে তাহা এই লাভ লোকসানের খতিয়ানের উপর নির্ভর করে।

সাধারণভাবে অভাবের কোন শেষ নাই। একটি বিশেষ অভাব কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করা যায় (satiable)। কোন একটী দ্রব্য ক্রমান্বয়ে পাইতে থাকিলে সেই দ্রব্য দিয়া যে অভাবের তৃপ্তি হয়, সেই অভাব ক্রমশঃ তৃপ্ত হইয়া আসিবে। দ্রব্যটির অতিরিক্ত এক একক পাইবার আগ্রহ ক্রমেই কমিয়া আসিবে। কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক হইতে যে পরিমাণ উপযোগ আশা করা যায়, তাহাকে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ বলে। কোন দ্রব্যের পরিমাণ যত বাড়ে, সেই দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ তত কমিয়া যায়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ

কোন ব্যক্তির নিকট কমলালেবুর প্রান্তিক উপযোগ এইভাবে কমিতে পারে—

কমলালেবুর পরিমাণ	প্রান্তিক উপযোগ (টাকাকড়ির হিসাব)
১	২৫ ন প.
২	২০ "
৩	১৪ "
৪	১০ "

প্রথম কমলালেবুটি পাইবার আগ্রহ বেশী। ইহার জন্য ক্রেতা ২৫ ন. প. পর্যন্ত দিতে রাজী আছে। একটি কমলালেবুর জন্য তাহার চাহিদা দাম ২৫ ন. প. হইবে। প্রথমটি পাইলে আরও একটি অর্থাৎ দ্বিতীয়টি পাইবার আগ্রহ আগের চেয়ে কমিয়া যাইবে। ইহার জন্য সে ২০ ন. প. দিতে প্রস্তুত আছে। দাম ২৫ ন. প. হইলে সে দ্বিতীয় কমলালেবুটি কিনিবে না। কিনিলে তাহার লাভের চেয়ে লোকসান হইবে। সুতরাং দুইটি কমলালেবুর জন্য তাহার চাহিদা দাম হইল ২০ ন. প.। ২০ ন. প. দাম হইলে সে তিনটি কিনিবে না—১টি কিনিবে না—কিনিবে ঠিক দুইটি। অর্থাৎ উপরের ছকে আমরা প্রান্তিক উপযোগের পরিবর্তে চাহিদা দাম লিখিতে পারি।

পরিমাণ বাড়িলে প্রান্তিক উপযোগ কমে। সুতরাং চাহিদা দামও কমে।

ব্যক্তি কমলালেবু কতটা কিনিবে তাহা নির্ভর করে—(১) তাহার চাহিদা দামের ছক (individual demand price schedule) এবং (২) বাজার দামের উপর। বাজার দামের উপর ক্রেতার ব্যক্তিগতভাবে কোন হাত নাই। ক্রেতা যত এককই কিনুক, প্রতি এককের জন্য বাজার দাম দিতে হইবে।' প্রান্তিক উপযোগ যতক্ষণ বাজার দাম হইতে অধিক হইবে সে দ্রব্যটি কিনিয়া চলিবে। দ্রব্যের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া চলিবে। দ্রব্যটি বাজার দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হইবার পর সে দ্রব্যটি কেনা বন্ধ করিবে। কেন না ইহার পরও যদি সে ক্রয় করে, তবে প্রান্তিক উপযোগ বাজার দাম অপেক্ষা কম হইয়া দাঁড়াইবে। অর্থাৎ এই অর্থ দিয়া অন্য জিনিষ কিনিলে তাহার অধিক উপযোগ বৃদ্ধি ঘটিবে। ক্রেতা যে কোন দ্রব্য এরূপ পরিমাণে কিনিবে যাহাতে দ্রব্যটির বাজার দাম ও দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। বাজার দাম ১৪ ন. প. হইলে এই ব্যক্তির চাহিদা হইবে ৩; বাজার দাম ১৪ ন. প. না হইয়া ১০ ন. প. হইলে এই ব্যক্তির চাহিদা হইবে ৪; ইত্যাদি। উপরের ছকটি তাহা হইলে এইভাবেও সাজান যায়—

বাজার দাম	কমলালেবুর চাহিদা
২৫ ন. প.	১
২০ ,,	২
১৪ ,,	৩
১০ ,,	৪

ইহাই হইল এই ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা। সকল ব্যক্তির প্রান্তিক উপযোগের ছক এক নয়। সুতরাং সকল ব্যক্তির চাহিদা তালিকাও এক হইবে না।

কিন্তু প্রত্যেকের চাহিদা তালিকায় দেখা যাইবে দাম বাড়িলে চাহিদা কমে। কেন না প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিমাণ বাড়িলে প্রান্তিক উপযোগ কমে।

ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus) : ক্রেতার বাজার দামের উপর কোন হাত নাই। সে যত এককই কিনুক প্রতি এককের জন্য তাহাকে একই দাম দিতে হইবে। বাজার দাম অনুসারে সে নিজের ক্রয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। সে ততক্ষণ কিনিয়া চলিবে, যতক্ষণ জিনিষটির (তাহার নিকট) প্রান্তিক উপযোগ বাজার দামের সমান না হয়। কতটা কিনিলে সে এই অবস্থায় আসিবে, তাহা ব্যক্তির প্রান্তিক উপযোগের ছকের উপর নির্ভর করে। শেষ ক্রীত এককের উপযোগ আর বাজার দাম সমান হইলে সে কেনা বন্ধ করে। ইহার আগের এককগুলির জন্য তাহার চাহিদা দাম বেশী। তাই বলিয়া তাহাকে ইহাদের জন্য অধিক দাম দিতে হয় না। বাজারে সমস্ত একক একসঙ্গে আছে। সকল এককই একই বাজার দামে বিক্রয় হয়। শেষ ক্রীত এককের উপযোগ বাজার দামের সমান। ক্রেতার ইহা কিনিয়া লাভ বা লোকসান কিছুই হয় না। পূর্ববর্তী এককগুলির বেলায় কিন্তু তাহার লাভ হয়। সে বাজার দাম দেয়। কিন্তু প্রয়োজন হইলে সে আরও বেশী দিতে রাজী হইত। ব্যক্তিগত চাহিদা দাম ও বাজার দামের পার্থক্যকে **ভোগোদ্বৃত্ত** বলে। প্রথম কমলালেবুটির জন্য আমাদের ক্রেতা ২৫ ন. প. পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাহাকে দিতে হইতেছে বাজার দাম—ধরা যাক ১৪ ন. প.। সুতরাং এই এককের উপর তাহার ভোগোদ্বৃত্ত ১১ ন. প.।

মোট উপযোগ হইতে বাজার দাম এবং ক্রীত এককের সংখ্যার গুণফল বাদ দিলে ভোগোদ্বৃত্ত বাহির হইবে। আমরা অনেক সময় জিনিষ কিনিয়া জিতিয়া গিয়াছি মনে করি। অর্থাৎ আমরা যে দামে কিনিয়াছি, দরকার হইলে আরও বেশী দাম দিয়াও কিনিতাম। বাস্তবিক দরকার হইলে কত বেশী দাম দিতাম, তাহা অনুমান মাত্র করা যায়--সঠিক বলা সম্ভব নয়। ভোগোদ্বৃত্তের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও মনে রাখা দরকার ইহা মাপিবার কোনও উপায় নেই।

চাহিদার সূত্র (Law of Demand) : কোন জিনিষের চাহিদা সেই জিনিষের দাম ও আরও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য বিষয় বলিতে জাতীয় আয়, ও তাহার বণ্টন, লোকের রুচি, বিকল্প সামগ্রীর দাম ইত্যাদি বুঝায়। **অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন না হইলে দাম বাড়িলে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে।** ইহাই হইল চাহিদার সূত্র। অন্যান্য বিষয়ের—যেমন রুচির—পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে (at any moment of time) এই

সমস্ত বিষয় অপরিবর্তিত ধরিয়া লওয়া যায়। সুতরাং অন্যভাবে বলা যায়—যে কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে দাম বাড়িলে চাহিদা কমে এবং দাম কমিলে চাহিদা বাড়ে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সূত্র কেন প্রযোজ্য তাহা আমরা আগেই আলোচনা করিয়াছি। মোট চাহিদা বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং মোট চাহিদার ক্ষেত্রেও যে এই সূত্র প্রযুক্ত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। দাম কমিলে চাহিদা দুইভাবে বাড়ে। যাহারা আগে হইতে কিনিতে ইচ্ছুক ছিল তাহারা আরও বেশী পরিমাণে কিনিতে ইচ্ছুক হইবে। যাহারা পূর্বেকার দামে কিনিতে সক্ষম ছিল না, তাহারা এখন কিনিতে সক্ষম হইবে।

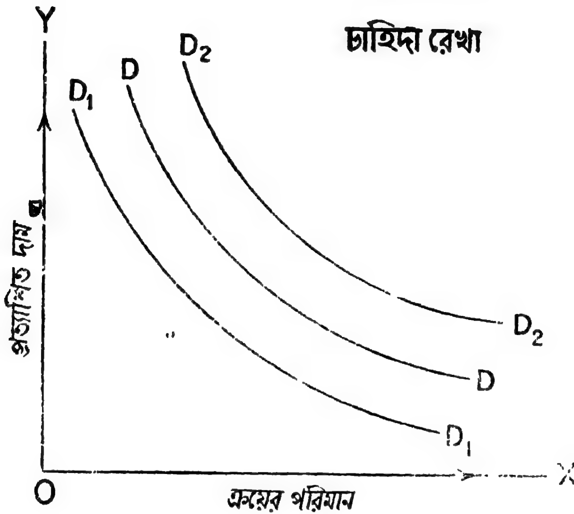
কোন বাজারে ক, খ ও গ তিনজন ক্রেতা আছে ধরা যাক। তাহাদের চাহিদা তালিকা হইতে কি ভাবে মোট চাহিদা তালিকা প্রস্তুত করা যায় দেখান হইল—

দাম	ক এর চাহিদা	খ এর চাহিদা	গ এর চাহিদা	মোট চাহিদা
৫৲	১০	×	২০	৩০
৪৲	১০	৮	২২	৪০
৩৲	১০	১০	৩০	৫০
২৲	১০	১৪	৩৬	৬০

এই তালিকায় বলা হইতেছে——দাম ৭৲ টাকা হইলে ক্রেতারা ৩০ একক ক্রয় করিতে রাজী। সেই মুহূর্তে দাম ৫৲ না হইয়া ৪৲ হইলে ক্রেতারা ৪০ একক ক্রয় করিতে রাজী—ইত্যাদি। চাহিদার তালিকায় ক্রেতাদের একটি মুহূর্তের মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতেছে। 'দাম ৫৲ হইতে কমিয়া ৪৲ হইলে' এরূপভাবে পাঠ করা সঙ্গত হইবে না। দাম কমিতে কমিতে অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন হইতে পারে। চাহিদার তালিকা বাজার দামের উপর নির্ভর করে না। বাজার দামই চাহিদার তালিকার উপর নির্ভর করে। অন্যান্য বিষয়ের পরিবর্তন হইলে চাহিদার তালিকাও অন্যরূপ হইবে।

চাহিদার পরিবর্তন (Changes in Demand): চাহিদার সূত্র হইতে আমরা জানি, জিনিষের চাহিদা দুইটি কারণে পরিবর্তিত হইতে পারে—(১) জিনিষের দাম পরিবর্তিত হইলে অথবা (২) অন্যান্য বিষয় যথা আয়, ইত্যাদি পরিবর্তিত হইলে। জিনিষের দাম কমিলে তাহার ফলে চাহিদা বাড়ে। এখানে দাম কমা হইল কারণ—আর চাহিদাবৃদ্ধি হইল তাহার ফল। রেখাচিত্রের ভাষায়, আমরা একই রেখার উপর আছি—শুধু আরও ডাইনে নীচের দিকে নামিয়া আসিয়াছি। সেইরকম দাম বাড়িলে আমরা একই রেখার উপর আরও বামে উপরের দিকে

উঠিয়া আসিয়াছি। অন্যান্য কারণে যেমন মন্দার সময় আয় কমার ফলে চাহিদা কমিতে পারে। দাম ঠিক থাকা সত্ত্বেও চাহিদা কমে। প্রতিটি দামে ক্রেতারা এখন আগেকার তুলনায় কম কিনিতে ইচ্ছুক। রেখাচিত্রের ভাষায়, গোটা চাহিদা রেখাই বামে নীচে সরিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ নূতন চাহিদারেখার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই রকম, চাহিদা বাড়া মানে, গোটা চাহিদারেখা ডাহিনে উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে।



চাহিদার পরিবর্তন বলিতে কোন্ ধরণের পরিবর্তনের কথা বলা হইতেছে সে সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা থাকিলে চলিবে না। দাম কমার ফলে চাহিদা বাড়িলে, দাম কমা হইল তাহার কারণ—চাহিদা বৃদ্ধি হইল তাহার ফল। চাহিদা বাড়ার ফলে আবার দাম বাড়িবে—এ কথা বলার উপায় নাই। তাহা হইলে দাম ও চাহিদার পরিবর্তন গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিবে। অন্যান্য কারণে যদি চাহিদা কমে —যেমন মন্দার সময় আয় কমার ফলে—তাহা হইলে নিশ্চয়ই দাম কমিবে। চাহিদার পরিবর্তন এখানে কারণ—দামের পরিবর্তন ইহার ফল।

লোকের রুচির পরিবর্তন হইলে, চাহিদার পরিবর্তন হয়। আমরা যদি নিরামিষাশী হইয়া পড়ি, তাহা হইলে মাছের চাহিদা প্রতিটি দামে এখনকার তুলনায় কম হইবে। আবার নিরামিষাশী ব্যক্তিরা যদি প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজনে মাছ খাওয়া সুরু করে তবে মাছের চাহিদারেখা ডাহিনে উঁচুতে উঠিয়া যাইবে। ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা হইলে লোকের আয় কমিয়া যাইবে। জিনিষপত্রের চাহিদারেখাও কমবেশী নীচুতে নামিয়া আসিবে। আয় বণ্টনে অধিকতর সাম্য হইলে দরিদ্র

ব্যক্তিদের ব্যবহার্য জিনিষপত্রের চাহিদারেখা উপরে উঠিয়া যাইবে, বিলাসদ্রব্যের চাহিদারেখা নীচুতে নামিয়া আসিবে। কোনও জিনিষের বিকল্প বস্তু আবিষ্কৃত হইলে বা বিকল্পের দাম কমিলে, সেই জিনিষের চাহিদারেখা নীচে নামিয়া আসিবে। সিনেমা বন্ধ থাকিলে থিয়েটারে যত ভীড় হইবে, সিনেমা খোলা থাকিলে ভীড় হইবে তাহা অপেক্ষা কম।

আয়ানুগ-স্থিতিস্থাপকতা (Income Elasticity of Demand): আয় বাড়িলে কমিলে চাহিদা বাড়ে কমে। কিন্তু আয় বাড়া কমার ফলে সকল জিনিষের চাহিদার সমান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। আয় দ্বিগুণ হইলে, চাল ডালের চাহিদা সাধারণতঃ দ্বিগুণ হইবে না। সিনেমা বা খেলা দেখার চাহিদা দ্বিগুণ হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাণগত সম্পর্ককে আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা বলে। সাধারণতঃ আয়ের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন অধিক হইলে, সেই সকল জিনিষকে বিলাস-সামগ্রী বলা চলে। আর আয়ের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন কম হইলে, সেই সকল জিনিষকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বলা যায়।

মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা (Price Elasticity of Demand): চাহিদার সূত্র হইতে আমরা জানি, দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন হয়। প্রায় সকল জিনিষের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য। দাম নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়িলে কমিলে সকল জিনিষের চাহিদার সমান হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। দামের নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিবর্তন ঘটিলে বিভিন্ন জিনিসের চাহিদা বিভিন্ন পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। দামের পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তনের এই পরিমাণগত (quantitative) সম্বন্ধকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিলে এই মূল্যানুগ স্থিতিস্থাপকতা বুঝায়।

কোন জিনিষের দাম পরিবর্তিত হইলে তাহার চাহিদা দুইটি সূত্রে পরিবর্তিত হয়। কোন জিনিষের দাম কমিলে, ধরিতে হয় ব্যক্তির প্রকৃত আয় বাড়িয়াছে। আয় বাড়ার ফলে ব্যক্তি অন্য জিনিষের সঙ্গে এই জিনিষও অধিক পরিমাণে ক্রয় করিবে। এই জিনিষ ক্রয়ের পরিমাণ কতটা বাড়িবে তাহা জিনিষটির আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ দাম কমিবার ফলে জিনিষটির বাজার দাম ও প্রান্তিক উপযোগের সমতা ক্ষুন্ন হইবে। প্রান্তিক উপযোগ বাজার দাম অপেক্ষা অধিক হইবে। সর্বাধিক সন্তোষলাভের জন্য উভয়ের সমতা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগ যদি পরিমাণ বাড়ানর ফলে তাড়াতাড়ি কমিয়া আসে, তাহা হইলে ক্রয়ের পরিমাণ সামান্য বাড়াইলেই, প্রান্তিক

উপযোগ কমিয়া বাজার দামের সমান হইবে। আর প্রান্তিক উপযোগ যদি ধীরে ধীরে কমে, তাহা হইলে জিনিষটির ক্রয়ের পরিমাণ অনেকখানি বাড়াইলে প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া বাজার দামের সমান হইবে। দ্বিতীয় সূত্রে দাম কমিবার ফলে চাহিদা কতখানি বাড়িবে তাহা নির্ভর করে জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগ কতটা তাড়াতাড়ি বা ধীরে কমে তাহার উপর। জিনিষটির প্রকৃতি যদি এইরূপ হয় যে ইহা সহজেই অন্যান্য অনেক বেশী জিনিষের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে, তবে প্রান্তিক উপযোগ ধীরে ধীরে কমিবে। যত কম সংখ্যক জিনিষের পরিবর্তে ইহা ব্যবহার করা চলিবে, তত তাড়াতাড়ি ইহার প্রান্তিক উপযোগ কমিয়া আসিবে।

দামের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন অধিক হইলে তাহাকে **স্থিতিস্থাপক** (elastic) **চাহিদা** বলে। দামের পরিবর্তনের তুলনায় চাহিদার পরিবর্তন সামান্য হইলে তাহাকে **অস্থিতিস্থাপক** (inelastic) **চাহিদা** বলে।

'অধিক' ও 'সামান্য' কথা দুইটির সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। একই পরিমাণ পরিবর্তনকে কেহ সামান্য এবং অপর কেহ অধিক বলিতে পারে। সেইজন্য মার্শাল স্থিতিস্থাপকতার মাপকাঠি হিসাবে মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের দিকে নজর রাখার কথা বলিয়াছেন। দাম কমাবাড়ার ফলে চাহিদা যদি এমনভাবে বাড়ে কমে যাহাতে মোট ব্যয় ঠিকই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে স্থিতিস্থাপকতা হইবে এক (=১)। দাম কমিলে চাহিদা যদি এত বেশী বাড়িয়া যায় যে ইহার ফলে মোট ব্যয়ও বাড়িয়া যায়, তবে স্থিতিস্থাপকতা হইবে একের অধিক (>১)। এই ধরণের চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক বলা হইবে। দাম কমিলে চাহিদা যদি অতি সামান্য বাড়ে যাহার ফলে মোট ব্যয়ও কমিয়া যায়, তবে স্থিতিস্থাপকতা হইবে এক অপেক্ষা কম (<১)। সাধারণ ভাষায় ইহাকে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হইবে। নীচে তিনটি উদাহরণ দেওয়া হইল :—

	(১)		(২)		(৩)	
দাম	চাহিদা	মোট ব্যয়	চাহিদা	মোট ব্যয়	চাহিদা	মোট ব্যয়
৫৲	৬০	৩০০৲	৬০	৩০০৲	৬০	৩০০৲
৪৲	৭৫	৩০০৲	৭০	২৮০৲	৮০	৩২০৲
৩৲	১০০	৩০০৲	৮০	২৪০৲	১২০	৩৬০৲

১নং তালিকায় দাম যাহাই হোক মোট ব্যয় সব সময় ৩০০৲—এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা=১। ৩নং তালিকার দাম কমার ফলে মোট ব্যয় বাড়িয়া চলিয়াছে

—এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর অধিক—অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক চাহিদা। ২নং তালিকার দাম কমার ফলে ব্যয় কমিতেছে—এখানে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ১-এর কম—অর্থাৎ চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি প্রয়োগ করিবার সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। একই জিনিষের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা স্থান-কাল-শ্রেণী-ভেদ বিভিন্ন রূপ হইতে পারে। আবার চাহিদা এক দামে স্থিতিস্থাপক এবং অন্য দামে অস্থিতিস্থাপক হইতে পারে।

বিলাসদ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা অস্থিতি-স্থাপক হয়। কোন কোন বিলাসদ্রব্য কোন কোন শ্রেণীর নিকট প্রয়োজনীয় মনে হয় (conventional necessaries)—যেমন মোটরগাড়ী। মোটরগাড়ীর দাম অনেকখানি বাড়িলেও ইহারা মোটরগাড়ী কিনিবেই। হীরক সাধারণ লোক কিনিতে পারে না। যে হীরক ব্যবহার করে লোকে তাহাকে ধনী মনে করে। হীরকের দাম কমিয়া গেলে সকলেই ইহা ব্যবহার করিতে সুরু করিবে। পদমর্যাদার স্মারক হিসাবে ইহার মূল্য থাকিবে না। ফলে যে সমস্ত ধনী লোক পূর্বে ইহা ব্যবহার করিত, তাহারা আর হীরক ক্রয় করিবে না। তাহাদের দেখাদেখি সাধারণ লোকও আর হীরক ক্রয় করিতে ইচ্ছুক থাকিবে না। ইহার চাহিদা কমিয়া যাইবে। সুতরাং বিলাসদ্রব্য হইলেই যে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে তাহা নহে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও আবার শ্রেণীভেদ আছে। লবণ বা দিয়াশলাই এর দাম অত্যন্ত কম। আমাদের আয়ের অতি সামান্য অংশ আমরা ইহাদের পিছনে খরচ করি। ইহাদের দাম দ্বিগুণ হইলেও প্রকৃত আয় সামান্যই কমিবে। ফলে ইহাদের চাহিদা বিশেষ কমিবে না। পোষাক পরিচ্ছদের দাম দ্বিগুণ হইলে তাহাদের চাহিদা কিন্তু বেশ খানিকটা কমিবে। কেননা আমাদের আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এই খাতে আমরা খরচ করি। ইহাদের দাম দ্বিগুণ হইলে, প্রকৃত আয় অনেকটা কমিবে। ফলে পোষাক-পরিচ্ছদ আমরা কম কিনিব।

যে সকল দ্রব্য বহু কাজে ব্যবহার করা চলে তাহাদের চাহিদা সাধারণতঃ স্থিতি-স্থাপক হয়—যেমন অ্যালুমিনিয়ম বা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা। ইহাদের দাম কমিলে একসঙ্গে অনেক শিল্পে ইহাদের চাহিদা বাড়ে। ফলে মোট চাহিদা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ে।

যে দ্রব্যের যত বেশী বিকল্প দ্রব্য থাকিবে, তাহার চাহিদা তত বেশী স্থিতিস্থাপক হইবে। চায়ের দাম বাড়িলে, অনেকে চায়ের পরিবর্তে কফি ব্যবহার করিবে। ফলে চায়ের চাহিদা অনেকখানি কমিবে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের সূত্রটির ব্যাখ্যা কর। চাহিদার সূত্রটি ইহা হইতে কিরূপে পাওয়া যায় দেখাও। [পৃষ্ঠা ২৭৩-২৭৫]

3. **Distinguish between Total Utility and Marginal Utility.**
সামগ্রিক উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ২৭৩-২৭৫]

4. **What is Consumer's Surplus ?**
ভোগোদ্বৃত্ত কাহাকে বলে ? [পৃষ্ঠা ২৭৫]

5. **What is Elasticity of Demand ? Distinguish between—Elastic and Inelastic Demand.**
চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কি ? স্থিতিস্থাপক ও অ-স্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। [পৃষ্ঠা ২৭৮-২৮১]

6. The Reserve Bank of India offers to purchase gold in any amount at Rs. 100 per tola. Draw the appropriate demand curve.
ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন পরিমাণে সোনা ১০০্ তোলা দরে কিনিতে ইচ্ছুক। এই অবস্থা দেখাইয়া চাহিদারেখা অঙ্কন কর।

7. Calcutta Corporation invites tenders for 50 lorries. Draw the appropriate demand curve.
কলিকাতা পৌরনিগম ৫০টি লরীর জন্য টেণ্ডার ডাকিয়াছে। উপযুক্ত চাহিদারেখা অঙ্কন কর।

8. What is Supply ? What are the factors determining Supply ?
যোগান কাহাকে বলে ? কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর যোগান নির্ভর করে ? [পৃষ্ঠা ২৮১-২৮৩]

9. Draw a Demand Schedule and Supply Schedule and explain their meaning.
একটি চাহিদার তালিকা ও একটি যোগানের তালিকা লেখ এবং অর্থ বুঝাইয়া দাও।

বিংশ অধ্যায়

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম নির্ধারণ

(Price Determination in Markets of Perfect Competition)

অতি অল্প সময়ের দাম (Very Short-period price) :

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে দাম নির্ধারিত হয়। কেবলমাত্র চাহিদা বা কেবলমাত্র যোগানদ্বারা দাম নিরূপিত হয় না। দাম ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তবে উভয়ের প্রভাব সমান নাও হইতে পারে। দামের উপর কাহার প্রভাব অধিক হইবে তাহা নির্ভর করে সময়ের ব্যবধানের উপর। অতি অল্প সময়ে যোগানের পরিবর্তন করা কঠিন। এক্ষেত্রে দাম চাহিদার উপর নির্ভর করে বেশী মাত্রায়। চাহিদার তীব্রতা যত বেশী হইবে দামও তত অধিক হইবে। কোন কারণে মাছের চাহিদা বাড়িয়া গেলে সেইদিনের মত বাজার দাম বাড়িয়া যাইবে। সেইদিনই মাছের চালান বাড়ান সম্ভব নয়। যোগান যাহা আছে তাহাই থাকিবে। এই নির্দিষ্ট যোগান কত দামে বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদার অবস্থার উপর। ক্রেতারা প্রত্যেকে দ্রব্যটি সেই পরিমাণে ক্রয় করিবে যাহাতে প্রত্যেক ক্রেতার নিকট জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগ জিনিষটির বাজারদামের সমান হয়। প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষা অধিক হইলে জিনিষটির যোগানের কিয়দংশ অবিক্রীত থাকিবে। বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে দাম কমিবে। প্রান্তিক উপযোগ চাহিদার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। সেইজন্য বলা হইয়াছে অতি অল্পকালের বাজারে দাম চাহিদার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। দামের সঙ্গে উৎপাদন ব্যয়ের সম্পর্ক এখানে নাই। চাহিদা কম হইলে দাম না কমিয়া উপায় নাই। লোকসান হইলেও উৎপাদক এখানে নাচার। লোকসান এড়াইতে হইলে দাম বাড়া প্রয়োজন। দাম বাড়িতে হইলে যোগান কমান দরকার। কিন্তু অতি অল্প সময়ে যোগান কমান বাড়ান যায় না। সুতরাং উৎপাদন ব্যয় সঙ্কুলান হইবার নিশ্চয়তা এখানে নাই।

অতি অল্প সময়ে দাম প্রান্তিক উপযোগের সমান হইলেও প্রান্তিক বা গড় ব্যয় অপেক্ষা কম বেশী হইতে পারে।

ক খ হইল নির্দিষ্ট যোগান। দাম যাহাই হউক যোগান ক খ। অর্থাৎ য য' হইল যোগান রেখা। চ ছ' হইল চাহিদা রেখা। তাহা হইলে দাম হইল খ প।

দাম যদি য প অপেক্ষা অধিক যেমন য ফ হয়, তবে চাহিদা ও যোগানরেখার মধ্যবর্তী ......চিহ্নিত অংশ অবিক্রীত রহিয়া যাইবে এবং বিক্রেতাদের প্রতিযোগিতার ফলে দাম কমিবে। আবার দাম য প অপেক্ষা কম যেমন য ব হইলে চাহিদার - - - চিহ্নিত অংশ মিটান সম্ভব হইবে না এবং ক্রেতাদের প্রতিযোগিতার ফলে দাম বাড়িবে। একমাত্র দাম য প হইলে চাহিদা ও যোগান সমান হয়। এই দামে ক্রেতাদের মোট চাহিদা নির্দিষ্ট যোগানের সমান হয়। সুতরাং এই দামই অতি অল্প সময়ে টিকিবে। চাহিদার তীব্রতা অধিক হইলে চাহিদারেখা আরও উর্ধ্বে উঠিত এবং বাজার দামও তদনুযায়ী অধিক হইত।

যোগানের প্রভাব একেবারে নাই মনে করিলে ভুল হইবে। যোগান অর্থাৎ বিক্রেতা না থাকিলে কেবলমাত্র চাহিদা বা ক্রেতার দ্বারা দাম নির্ধারিত হইতে পারে না। তা ছাড়া যোগান কোন ক্ষেত্রেই একেবারে অনড থাকে না। অপরিবর্তনীয় যোগানের উদাহরণ হিসাবে অতি সহজে পচনশীল বা পুনরুৎপাদন করা যায় না এইরূপ সামগ্রীর উল্লেখ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্রের সংখ্যা আর বাড়ান যাইবে না সত্য, কিন্তু দাম পছন্দসই না হইলে বিক্রেতা নিজ ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিতে পারে। যোগান বিক্রেতার বিক্রয় করিবার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। দাম যত বাড়িবে বিক্রেতার বিক্রয় করিবার ইচ্ছা অর্থাৎ যোগানও তত বাড়িবে। ভবিষ্যতে দামের গতি কিরূপ হইবে এ সম্বন্ধে বিক্রেতার অনুমোদনের উপর যোগান নির্ভর করিবে। ভবিষ্যতে দাম বাড়িবে মনে হইলে বর্তমানে বিক্রয় করিবার ইচ্ছা কমিবে। দুধ-মাছ বা কাঁচা তরকারি সংরক্ষণ কিছুটা কঠিন। তাহা হইলেও ইহাদের বিকল্প ব্যবহারের সম্ভাবনা মনে রাখা দরকার। দুধ ক্ষীর করিয়া বিক্রয় করা যায়। মাছ শুকাইয়া রাখা যায়। কোল্ড ষ্টোরেজের (cold storage) সাহায্যে কিছুটা সংরক্ষণও করা যায়। ভবিষ্যতে দামের গতি সম্বন্ধে ধারণা বর্তমানের যোগানকে প্রভাবান্বিত করিবে। অর্থাৎ অতি অল্প সময়ের দাম বুঝিতে হইলে স্বল্প সময়ের বাজারদাম সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

স্বল্প সময়ের দাম (Short-period Price): কতকগুলি উপাদান

অপরিবর্তনীয় ও অন্যান্য কতকগুলি উপাদান পরিবর্তনীয়—স্বল্প সময় বলিতে ইহাই বুঝায়। স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বাড়িয়া বা প্রতিষ্ঠানের স্থির উপাদানের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যোগান বাড়িতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তনীয় উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় উপাদানের ব্যবহারের মাত্রা বাড়াইয়া যোগান বাড়ান যায়।

স্বল্প সময় কাহাকে বলে

প্রথমে প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা করা যাক। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক, অর্থাৎ দামের উপর প্রতিষ্ঠানের এককভাবে কোন হাত নাই। তাই বলিয়া প্রতিষ্ঠান একেবারে অসহায় নয়। বিক্রয় করিলে তাহাকে বাজার দামে বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু সেই দামে সে কতটা যোগান দিবে তাহা নির্ধারণ করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা তাহার আছে। সেই দামে যে পরিমাণ যোগান দিলে সর্বাধিক মুনাফা অর্জিত হইবে, যোগানের পরিমাণ সেই হিসাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে। বাজার দাম অত্যন্ত কম হইলে অবশ্য লোকসানও হইতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও লোকসান যথাসম্ভব কম করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ যোগান দিলে সর্বাধিক মুনাফা সর্বনিম্ন লোকসান হয় প্রতিষ্ঠান সেই পরিমাণ যোগান দিবে।

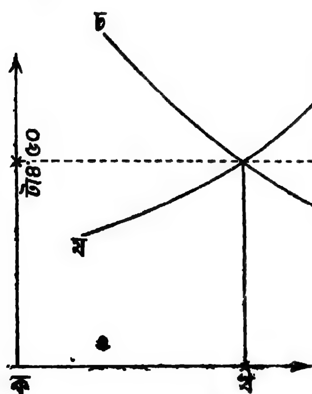
প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা কতখানি

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক আয় সমান হইলে মুনাফা সর্বাধিক হয়। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় আর বাজারদাম সমান অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় ও বাজারদাম সমান হইলে মুনাফা সর্বাধিক হয়। প্রতিষ্ঠানের যোগান এইরূপ হইলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এবং প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যের (equilibrium) অবস্থায় আসিবে। কিন্তু এই দামে মোট যোগান ও মোট চাহিদা সমান না হইলে ঐ দাম ঠিক থাকিবে না। সুতরাং স্বল্পকালীন মেয়াদে ভারসাম্য হইতে হইলে অর্থাৎ কোন দাম টিকিয়া থাকিতে হইলে দুইটি শর্ত যুগপৎ পূর্ণ হইতে হইবে। (১) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান এরূপ যোগান দিবে যাহাতে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রদত্ত দাম সমান হয়। এবং (২) এইভাবে শিল্পের যোগান যাহা হইবে তাহা প্রদত্ত দামে মোট চাহিদার সমান হওয়া চাই। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হইবে।

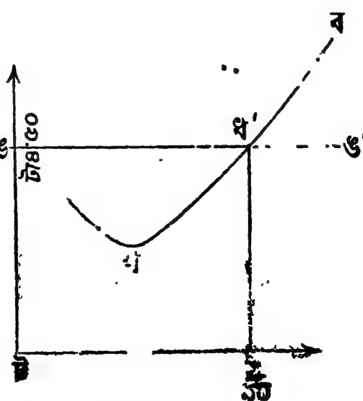
ধরা যাক ৫৲ বাজারদাম এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের যোগান ১০০ হইলে প্রান্তিক ব্যয় ৫৲ হয়। প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যদি ২০০ হয় তবে ৫৲ দামে মোট যোগান হইবে ২০,০০০। ৫৲ দামে মোট চাহিদা যদি ১৭,০০০ হয়, তাহা হইলে দাম ৫৲ থাকিতে পারে না। ধরা যাক দাম কমিয়া টা. ৪.৫০ হইল। প্রতিষ্ঠানগুলির

যোগান বদলাইতে হইবে। বাজারদাম টা ৪·৫০ হওয়ায় যোগান এরূপ করিতে হইবে যাহাতে প্রান্তিক ব্যয়ও টা. ৪·৫০ হয়। ধরা যাক ৯০ যোগান দিলে প্রান্তিক ব্যয় টা. ৪ ৫০ হয়। তাহা হইলে এই দামে মোট যোগান দাঁড়াইবে ১৮,০০০। এই দামে যদি মোট চাহিদাও ১৮,০০০ (চাহিদার নিয়ম অনুসারে দাম বাড়িলে চাহিদা বাড়ে) হয়, তাহা হইলে ইহাই হইবে ভারসাম্য দাম (equilibrium price)।

কোন সংগঠক অন্য ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ মুনাফা যে পরিমাণ করিতে পারে, তাহাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলে। নির্দিষ্ঠ শিল্পে যদি দীর্ঘকাল স্বাভাবিক মুনাফা হইতে কম মুনাফা হয়, তাহা হইলে সে অন্য শিল্পে সরিয়া যাইবে। প্রতিষ্ঠান সংখ্যা কমিয়া দাম বাড়িবে। আবার স্বাভাবিক মুনাফা হইতে অধিক মুনাফা হইলে অন্য শিল্প হইতে সংগঠকরা এই শিল্পে আসিবে। প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বাড়িয়া যোগান বাড়িবে। ফলে দাম কমিবে। সেইজন্য বারংবার বলা হইয়াছে **দীর্ঘকালীন মেয়াদে লোকসান স্বীকার করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হইতে হইবে—ইহার বেশীও নয় আবার ইহার কমও নয়।** উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা ধরা আছে। সুতরাং দীর্ঘকালীন মেয়াদে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দাম ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হইলে চলিবে না—মোট যোগান ও মোট চাহিদা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সমান হইতে হইলে দাম ও গড ব্যয়ও সমান হওয়া চাই। প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় সমান হইলে গড় ব্যয় নিম্নতম মানে পৌছায় তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যয়রেখা একজাতীয় হইলে সকল প্রতিষ্ঠানই নিম্নতম গড় ব্যয় উৎপাদন করিবে। ইহাই হইল পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ।



নং চিত্র



২নং চিত্র

পূর্ব পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে স্বল্পকালীন দাম নির্ধারণ দেখান হইয়াছে। ২নং চিত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়রেখা বা যোগানরেখা প ব। ঙ ঙ´ প্রান্তিক আয়রেখা। প্রতিষ্ঠানের যোগান ট ঠ (=৯০) হইলে প্রান্তিক ব্যয় ঠ ধ´ ও প্রান্তিক আয় ট ঙ সমান হয়। এই ধরণের ২০০ প্রতিষ্ঠান আছে। সকলের প্রান্তিক ব্যয়রেখা অভিন্ন ধরা হইয়াছে। এই ভিত্তিতে টা. ৪·৫০ দামে মোট যোগান দাঁড়ায় ৯০ × ২০০ = ১৮,০০০। ১নং চিত্রে মোট চাহিদারেখা ও মোট যোগানরেখা অঙ্কিত হইয়াছে। এখানে দেখা যাইতেছে টা. ৪·৫০ দামে মোট চাহিদাও ১৮,০০০। সুতরাং চাহিদা ও যোগানের এই অবস্থায় স্বল্পকালীন মেয়াদে বাজারদাম দাঁড়াইবে টা. ৪·৫০।

বাজারদাম ও স্বাভাবিক দাম (Market price and Normal price): দাম চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। দাম নির্ধারণের তত্ত্বে চাহিদা ও যোগানের একটি বিশেষ অবস্থা কল্পনা করিয়া আলোচনা করা হয়। চাহিদা ও যোগানের অবস্থা ভিন্নরূপ ধরিলে দামও শেষ পর্যন্ত অন্যরূপ দাঁড়াইবে। একটি বিশেষ অবস্থায় যাহা স্বাভাবিক অন্য অবস্থায় তাহাই নিতান্ত অস্বাভাবিক হইবে। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে ইহা মোটেই স্বাভাবিক নয়। সেখানে দাম প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশী হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক দাম ও ন্যায্য (Ideal) দাম এক নয়। ধানের বাজারে প্রতিযোগিতা আছে। চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী স্বাভাবিক দামও থাকিবে। যোগান কম হইলে স্বাভাবিক দাম স্বভাবতঃই অধিক হইবে। এই দামে অনেকে হয়ত ধান কিনিতে পারিবে না। সুতরাং এই দামকে আমরা ন্যায্য দাম না বলিতে পারি। কিন্তু ইহাকে সেইজন্য স্বাভাবিক দাম না বলা ভুল হইবে।

আমরা চাহিদা ও যোগানের একটি নির্দিষ্ট অবস্থা কল্পনা করিয়া লই। চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হয়। স্বল্প সময়ে চাহিদার পরিবর্তনের ফলে দাম যথেষ্ট উঠানামা করিতে পারে। দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিবর্তন হইবে কিন্তু যোগানের পরিবর্তন হইতে সময় লাগে। দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া যোগানের পরিবর্তন ঘটে। ইহার ফলে চাহিদার পরিবর্তনজনিত দামের পরিবর্তন পুনরায় পরিবর্তিত হইতে থাকে। দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা কমে বাড়ে এবং যোগানও পরিবর্তিত হয়। শেষ পর্যন্ত যে ভারসাম্য দাম দাঁড়ায় তাহাকেই সাধারণতঃ স্বাভাবিক দাম বলা হয়। অবশ্য এই স্বাভাবিক দাম কোন সময়েই বাস্তবে পরিণত হয় না। কারণ আমরা চাহিদা ও যোগানের যে অবস্থা কল্পনা করিয়া আলোচনা সুরু করিয়াছিলাম, ইত্যবসরে তাহার কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটিবেই। পরিবর্তন জগতের সনাতন অ-পরিবর্তনীয় ধর্ম।

বাজারদাম হইল স্বল্পকালীন বা অতি অল্পকালীন দাম। অতি অল্পকালীন দাম চাহিদার অবস্থার উপর নির্ভর করে তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহা প্রান্তিক উপযোগের সমান, কিন্তু গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সঙ্গে সংস্রব বর্জিত।

স্বল্পকালীন দাম স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। ইহা প্রান্তিক উপযোগেরও সমান। কিন্তু গড় ব্যয়ের সমান হইবে এরূপ নিশ্চয়তা নাই। স্বল্পকালীন দাম গড় ব্যয় অপেক্ষা কম বা অধিক হইতে পারে। অর্থাৎ স্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা কম বা অধিক মুনাফা হইতে পারে। ইহাকে অনেক সময় স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম বলা হয়।

দীর্ঘকালীন দাম দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের সমান হইবে। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের সর্ত মিটাইতে হইলে দাম ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা প্রয়োজন। স্বাভাবিক মুনাফার কম বেশী অর্জিত হইতে পারিবে না—এই সর্ত মিটাইতে হইলে দাম ও গড়ব্যয়ের সমতা প্রয়োজন। সকল প্রতিষ্ঠান যদি সমজাতীয় (homogeneous factors) হয়, তাহাদের ব্যয়রেখা অভিন্ন হইবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় সমান হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিম্নতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিবে।

সকল প্রতিষ্ঠান সমজাতীয় না হইলে তাহাদের ব্যয় রেখাও ভিন্ন হইবে। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠিবে দীর্ঘকালীন দাম কোন্ প্রতিষ্ঠানের গড়ব্যয়ের সমান হইবে। এক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করা হয়। কোন প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত মুনাফা করে—কোন প্রতিষ্ঠান লোকসান দেয়—প্রান্তিক প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা মাত্র অর্জন করে। দীর্ঘকালীন দাম প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের গডব্যয়ের সমান হইবে।

যোগান যত সহজে বাড়ান কমান যাইবে, স্বাভাবিক দাম ও বাজারদামের পার্থক্য তত কমিয়া আসিবে। চাহিদা বাড়িলে দাম বাড়িবে। দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিবর্তন ঘটিবে। যোগানের পরিবর্তন যদি দীর্ঘকাল বিলম্বে ঘটে, তাহা তত দীর্ঘ সময় বাজারদাম উৎপাদন ব্যয় অর্থাৎ স্বাভাবিক দাম অপেক্ষা বেশী থাকার সুযোগ পাইবে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Show how price is determined by the interaction of the forces of Demand and Supply,**

   চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় বুঝাইয়া দাও।

   [পৃষ্ঠা ২৯০-২৯৪]

2. Distinguish between Market Price and Normal Price. Explain how Market Price of a commodity is determined.
বাজারদাম ও স্বাভাবিক দামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। বাজার দাম কি করিয়া নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর। [পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৫, ২৯০-২৯৪]

3. The Normal Price of a commodity, under condititions of competition, tends to be equal to its marginal cost of production—Discuss.
প্রতিযোগিতার বাজারে স্বাভাবিক দামের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হইবার প্রবণতা দেখা যায় কেন বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ২৯৪-২৯৫]

একবিংশ অধ্যায়

একচেটিয়া বাজারে দাম নির্ধারণ

(How Monopoly Price is Determined)

কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান একটি সামগ্রীর মোট যোগান সম্পূর্ণ এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করিলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়। এই প্রতিষ্ঠান একমালিকানা অংশীদারী বা যৌথ মূলধনী ভিত্তিতে গঠিত হইতে পারে। অনেক সময় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া একচেটিয়া সংগঠন সৃষ্টি করে। আবার ক্ষুদ্রতর প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে গ্রাস করিয়া কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করে ইহাও দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার আইন করিয়া একচেটিয়া ব্যবসা করিবার অধিকার মঞ্জুর করে। চাহিদা সীমাবদ্ধ হইলে ক্রমহ্রাসমান ব্যয়বিধির সুবিধা পাইবার জন্যও একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। যে কারণে এবং যে প্রকারে একচেটিয়া কারবারের উৎপত্তি হউক না কেন, ইহার মূল বৈশিষ্ট্য হইল মোট যোগানের উপর একক কর্তৃক (single control)। কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। একই সহরে একাধিক বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থাকিলে খুঁটি, বৈদ্যুতিক তার প্রভৃতি সরঞ্জাম নিরর্থক বেশী খরচ হইবে। জায়গার অপব্যয় হইবে। রাস্তাঘাট অধিকবার খোড়াখুড়ি করিতে হইবে। সেজন্য সামাজিক স্বার্থের খাতিরে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ সরবরাহের অধিকার দান করা হইয়াছে। কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এইভাবে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছে।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক। প্রতিষ্ঠানের যোগান

মোট যোগানের তুলনায় অতি নগণ্য। প্রতিষ্ঠানের যোগানের পরিবর্তন হইলে মোট যোগান অতি সামান্যই পরিবর্তিত হয়। ফলে প্রতিষ্ঠানের যোগান কমা-বাড়ার ফলে বাজারদাম বাড়া-কমার সম্ভাবনা নাই ধরা চলে। বাজারদাম প্রতিষ্ঠানের আওতার বাহিরে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মূল্যনীতি (Price policy) নির্ধারণের সমস্যা নাই। একচেটিয়া বাজারে প্রতিষ্ঠানগত যোগান ও শিল্পগত যোগান অভিন্ন। প্রতিষ্ঠানের যোগান যে হারে পরিবর্তন হইবে মোট যোগানও ঠিক সেই হারে পরিবর্তিত হইবে। প্রতিষ্ঠানগত যোগান পরিবর্তিত হইলে এক্ষেত্রে বাজারদামেরও পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য। একচেটিয়া কারবারী যোগান কমাইয়া বাড়াইয়া বাজারদাম বাড়াইতে কমাইতে পারে। সুতরাং মূল্যনীতি নির্ধারণের সমস্যা তাহার পক্ষে রীতিমত বাস্তব।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় শুধু প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাই অনেক নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন সামগ্রী অবিকল একরকম। ফলে যে কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের বহু নিখুঁত পরিবর্তন (perfect substitutes) থাকে। কোন প্রতিষ্ঠান তাহার নিজস্ব উৎপাদন কমাইয়া বাজারদাম বাড়াইতে পারে না কারণ, ক্রেতারা পরিবর্ত সামগ্রী দ্বারা তাহাদের চাহিদা মিটাইবে। পরিবর্ত বা বিকল্প সামগ্রী যত কম হইবে, বাজারদামের উপর বিক্রেতার প্রভাব তত বেশী হইবে। কোন দ্রব্যের যদি আদৌ কোন পরিবর্ত সামগ্রী না থাকে এবং তাহার যোগান যদি কোন প্রতিষ্ঠান এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে তাহাকে **নিখুঁত (absolute) একচেটিয়া কারবার** বলা যাইতে পারে। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী যতই দাম বৃদ্ধি করুক আমরা নিরুপায়। কারণ ইহার কোন পরিবর্ত নাই। একচেটিয়া কারবারী দাম চড়াইয়া আমাদের শেষ কপর্দক আদায় করিয়া লইতে পারে। আমাদের সৌভাগ্য বাস্তবজগতে এই ধরণের একচেটিয়া কারবার দেখা যায় না। আমাদের অভাব বহুবিধ ও আয় সীমাবদ্ধ হওয়ায় সকল অভাবের মধ্যে সাধারণভাবে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। অর্থাৎ সকল দ্রব্যেরই কিছু না কিছু পারবর্ত আছে। তবে পরিবর্ত সম্বন্ধ কোথাও ঘনিষ্ঠ (close), কোথাও দূরের (distant)। বাস্তব জগতে একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্ন দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত না থাকিলেই চলিবে। ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত না থাকায় একচেটিয়া কারবারী দাম বৃদ্ধি করিতে পারে। চাহিদা কিছু কমিবে কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত না থাকায় চাহিদা শূন্য হইবে না। অবশ্য দাম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করিতে থাকিলে এরূপ অবস্থা দেখা দিবে যখন ইহার পরিবর্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করিতে আর আপত্তি থাকিবে না।

একচেটিয়া কারবারী যোগান অথবা দাম নিয়ন্ত্রণ করিবে। যোগান এবং দাম যুগপৎ নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে যদি যোগান নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা

হইলে সেই যোগান কি দামে বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করিবে চাহিদার অবস্থার উপর। চাহিদা যত অধিক হইবে নির্দিষ্ট যোগান তত অধিক দামে বিক্রয় হইবে। চাহিদা যত কম হইবে নির্দিষ্ট যোগান তত কম দামে বিক্রয় হইবে। একচেটিয়া কারবারী ইচ্ছা করিলে যোগানের পরিবর্তে দামও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। নির্দিষ্ট দামে কতটা বিক্রয় হইবে তাহা নির্ভর করে ক্রেতার চাহিদার উপর। দাম অথবা যোগান যাহাই একচেটিয়া কারবারী নিয়ন্ত্রণ করুক না কেন, তাহার উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। উদ্দেশ্যের দিক হইতে একচেটিয়া কারবার ও প্রতিযোগিতামূলক কারবারের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি একচেটিয়া কারবারীকে নজর রাখিতে হইবে (Conditions influencing a Monopolist): সকল ক্ষেত্রেই দাম চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। একচেটিয়া দাম এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। দীর্ঘকালীন মেয়াদে দাম গড় উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হইতে পারে না—প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। একচেটিয়া বাজারেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। দাম উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা দীর্ঘকাল ধরিয়া কম হইলে একচেটিয়া কারবারী যোগান কমাইবে। ফলে দাম বাড়িবে। দামের নিম্নতম মাত্রা সম্বন্ধে একচেটিয়া ও প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোন তফাৎ নাই। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দাম দীর্ঘকালীন মেয়াদে উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। তাহা হইলে অতিরিক্ত লাভ (abnormal profit) হইবে—প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িবে—যোগান বাড়িয়া দাম কমিবে। একচেটিয়া দাম কিন্তু দীর্ঘকালীন মেয়াদেও গড় ও প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। অতিরিক্ত লাভ হইবে সত্য। কিন্তু ইহার ফলে যোগান বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। কারণ একচেটিয়া কারবার মানেই মোট যোগানের উপর একক কর্তৃত্ব। সুতরাং দাম কমিয়া অতিরিক্ত লাভ মুছিয়া যাইবার ভয়ও নাই।

একচেটিয়া কারবারী দাম বাড়াইতে পারে বলিয়াই খেয়ালমাফিক দাম আদায় করিবে এরূপ ভাবা ঠিক নয়। একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। মুনাফা বাড়াইবার জন্য যদি দাম বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে দাম বাড়াইবে। দাম বাড়াইলে সকল ক্ষেত্রে মুনাফা না বাড়িতে পারে দাম যত বাড়িবে, বিক্রয়ের পরিমাণ তত কমিবে। বিক্রীত একক পিছু লাভ বেশী হইবে। কিন্তু বিক্রয় কম হওয়ায় মোট মুনাফা কমিয়া যাইতে পারে। দাম কমান বাড়ান তাহার মূল উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার মাত্র। সর্বাধিক মুনাফা

ব্যয় (=খ ঙ) সমান হয়। একচেটিয়া কারবারী তাহা হইলে ক খ যোগান দিবে। চাহিদারেখা হইতে দেখা যায় এই পরিমাণ যোগানের চাহিদাদাম হইবে খ গ। অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারী যোগান নিয়ন্ত্রণ না করিয়া খ গ দাম ধার্য করিলেও একই ব্যাপার হইবে। গড ব্যয়=খ ড। প্রতি এককে একচেটিয়া মুনাফা=ড গ। মোট একচেটিয়া মুনাফা=ট ঠ ড গ আয়ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল।

একচেটিয়া কারবারীর দাম বাড়াইবার ক্ষমতার সীমা (Limits of the Power of the monopolist) :

একচেটিয়া কারবার হইলেই চড়া দাম ধার্য হইবে এরূপ ধারণা অমূলক। অধিক দাম আদায় করা একচেটিয়া কারবারীর লক্ষ্য নয়। অধিক মুনাফা করাই তাহার উদ্দেশ্য। মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য দাম যতদূর বাডান দরকার, সে নিশ্চয়ই দাম ততদূর বাডাইবার চেষ্টা করিবে। সে ক্ষেত্রে দাম বাড়াইলে মুনাফা কমিয়া যায়, সেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী নিশ্চয়ই দাম বাড়াইবে না। আমাদের উদাহরণে দেখিয়াছি দাম ১৮৲ ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সে নিজস্বার্থে দাম ১৬৲ ধার্য করিবে।

মার্শাল একচেটিয়া কারবারীর বিবেকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। একচেটিয়া কারবারী সকল সময় মুনাফার লোভে চালিত না হইতে পারে। জনকল্যাণ সে পুরাপুরি অবহেলা না করিতে পারে। সেই খাতিরে সে দাম ১৬৲ না ধার্য করিয়া ১৪৲ও ধার্য করিতে পারে। ইহাই মার্শালের বক্তব্য। বিবেকের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বেশী বড় করিয়া দেখিলে ভুল হইবে। মুনাফা বাড়াইবার জন্য দাম বাড়াইবার প্রয়োজন হইলে একচেটিয়া কারবারী তাহার দাম বাডাইবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পিছপাও হইবে না ধরাই সঙ্গত।

একচেটিয়া ক্ষমতার প্রয়োগের পথে বিবেক বাদেও অন্যান্য অন্তরায় আছে। ঘনিষ্ঠ পরিবর্তের অভাব থাকে বলিয়াই একচেটিয়া কারবারী দাম বাড়াইতে পারে। একচেটিয়া মুনাফা যতক্ষণ নামমাত্র থাকিবে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত মনে ইহা ভোগ করিতে পারে। প্রতিযোগীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা ক্ষীণ। অন্যান্য উদ্যোক্তারা সামান্য লাভের জন্য একচেটিয়া কারবারীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার আসরে নামিবে না। যোগান বাড়ার ফলে দাম কমিয়া সকলেরই সমূহ লোকসান হইতে পারে। অল্পলাভের জন্য কেহ এই ঝুঁকি লইবে না। একচেটিয়া মুনাফা স্ফীত হইলে অন্যান্য উদ্যোক্তারা দ্বিধা করিবে না। দাম অতিরিক্ত চড়াইলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইবার ভয়ও আছে। একচেটিয়া কারবারী খাল কাটিয়া কুমীর ডাকিয়া আনিতে নিশ্চয়ই

ইতস্ততঃ করিবে। সর্বাধিক মুনাফার প্রয়োজনে যে দাম ধার্য করা দরকার, সম্ভাব্য (potential) প্রতিযোগিতার কথা ভাবিয়া সে তাহার চেয়ে কম দাম ধার্য করিতে পারে।

ক্রেতার দিক হইতেও পরিবর্তের আবিষ্কার হইতে পারে। একচেটিয়া কারবারীর উৎপন্ন দ্রব্যের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সহজ অবস্থায় থাকে না। কিন্তু ক্রেতার আয় সীমাবদ্ধ। দাম অত্যধিক বাড়াইলে ক্রেতাকে বাধ্য হইয়া অন্য কোন সস্তা জিনিষ দিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। বিদ্যুতের দাম অধিকমাত্রায় বাড়াইলে জনসাধারণ কেরোসিন ও মোমবাতি দিয়া কাজ চালাইবে। ইহার ফলে বিদ্যুতের চাহিদা বেশ খানিকটা কমিয়া যাইবে ও মুনাফা বিপন্ন হইবে। তখন মুনাফার খাতিরেই দাম কমাইতে হইবে।

নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিবর্ত আবিষ্কার করা কঠিন। চড়া দামেও ইহাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম। এই সব ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী যোগান কমাইয়া ও দাম বাড়াইয়া মুনাফা বৃদ্ধি করিতে প্রলুব্ধ হয়। কিন্তু এখানেও বিপদ আছে। এখানে অনেক লোকের স্বার্থ জড়িত। দাম বেশী চড়াইলে জনসাধারণ ক্ষুব্ধ ও শেষ পর্যন্ত ক্ষিপ্ত হইতে পারে। সরকারী হস্তক্ষেপ অনিবার্য হইয়া উঠিতে পারে। একচেটিয়া মুনাফা কর্পূরের মত উবিয়া যাইতে পারে। একচেটিয়া কারবারী পূর্বাহ্লেই সতর্ক হইতে পারে ও দাম কম করিয়া ধার্য করিতে পারে।

তত্ত্বের দিক হইতে অর্থাৎ মুনাফা সর্বাধিক করিবার জন্য যে দাম ধার্য করা দরকার, কার্যতঃ তাহা অপেক্ষা কম দাম ধার্য হইবে এ কথা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আবার একচেটিয়া মুনাফা একেবারে থাকিবে না তাহাও মনে করা ঠিক নয়। একচেটিয়া মুনাফা থাকিতে হইলে সাধারণতঃ একচেটিয়া দাম প্রতিযোগিতামূলক দাম অপেক্ষা বেশী হইবে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিন্তু একচেটিয়া মুনাফা হওয়া সত্ত্বেও একচেটিয়া দাম প্রতিযোগিতামূলক দাম অপেক্ষা কম হইতে পারে। একচেটিয়া বাজারে অনেক সময় বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ অধিকমাত্রায় পাওয়া যায়। ফলে গোটা ব্যয়রেখাই নীচে নামিয়া আসে। ইহার ফলে দাম কম হইতে পারে। আবার অনেক সময় একচেটিয়া কারবারী চাহিদা বাড়াইবার জন্য দাম কমায়। চাহিদা বাড়ার ফলে উৎপাদন বাড়ান সম্ভব হয়। ক্রমহ্রাসমান ব্যয়বিধি কাজ করিলে ব্যয় কমে। তখন কম দাম ধার্য করা সত্ত্বেও মুনাফা বেশী হয়। চাহিদা বৃদ্ধির ফল একমাত্র সেই ভোগ করিবে ইহা জানা থাকায় সে দাম কম করিয়া ধার্য করিতে সাহস পায়। প্রতিযোগিতা থাকিলে এমনটি হইতে পারিত না। সুতরাং একচেটিয়া সর্বক্ষেত্রে সামাজিক স্বার্থের পরিপন্থী এ কথা বলা যায় না।

বৃহদায়তন উৎপাদন ও প্রতিযোগিতা—এই উভয়বিধ সুবিধার সামঞ্জস্যবিধান করাই আজকার প্রধান সমস্যা।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **What is Monopoly and how does it differ from perfect competition ?**
   একচেটিয়া কাহাকে বলে ? পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার সহিত ইহার তফাৎ কোথায় ?
   [পৃষ্ঠা ২৯৬-২৯৮]
2. **How is Monopoly price determined ?**
   একচেটিয়া দাম কিরূপে নির্ধারিত হয় ? [পৃষ্ঠা ২৯৮-৩০৩]
3. **Can a monopolist charge as high a price as he likes ?**
   একচেটিয়া কারবারী কি খেয়াল-খুসীমত দাম বাড়াইতে পারে ? [পৃষ্ঠা ৩০৩-৩০৫]

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আয় বণ্টন বা বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন উপাদানের দাম

(Distribution or Different Types of Factor Income)

আয় বণ্টন হইতে অর্থনৈতিক বিরোধের সূত্রপাত হয়

নিয়োগকর্তার নেতৃত্বে উপাদানগুলি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় এক বৎসরে যে দ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন হয় তাহাকে আমরা জাতীয় আয় আখ্যা দিয়াছি। উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই জাতীয় আয় বাঁটোয়ারা হয়। ব্যক্তির অভাব পূরণের ক্ষমতা তাহার আয়ের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির আয় কেবলমাত্র মোট আয়ের উপর নির্ভর করে না। মোট আয়ের কতটা অংশ তাহার হিস্যায় পড়িল তাহাও ব্যক্তির আয় নির্ধারণে সাহায্য করে। অর্থনৈতিক বিরোধের উৎপত্তি হয় আয়বণ্টনকে কেন্দ্র করিয়া। কেহই নিজ বখরা বাড়াইবার সুযোগ ছাড়িয়া দেয় না। নিজ অংশ বাড়াইবার ফলে আয় কমিয়া গেলেও গ্রাহ্য করে না। এই মনোবৃত্তির যৌক্তিকতাও কিছু আছে। মোট আয় ১০০৲ এবং আমার $\frac{1}{4}$ অংশ হইলে আমার আয় হইবে ২৫৲। আমার অংশ $\frac{1}{3}$ করিতে গিয়া মোট আয় কমিয়া ৯০৲ হইলেও আমার লোকসান নাই। আমার আয় এখন বাড়িয়া হইবে ৩০৲। অন্য কোন ব্যক্তির আয় নিশ্চয় কমিবে। কিন্তু

আমার অভাব পূরণের ক্ষমতা বাড়িল। ধর্মঘট ও লক্ আউট, সভা ও শোভাযাত্রার পিছনে আছে গোষ্ঠীগত বখরা বাড়াইবার তাগিদ।

বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় কার্যতঃ কিরূপে মোট আয় বাঁটোয়ারা হয় তাহাই আমরা বুঝিবার চেষ্টা করিব। ইহার ঔচিত্য সম্বন্ধে রায় দিবার চেষ্টা করিব না।

মোট আয়ের উপর বণ্টনের প্রভাব

কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা দরকার, আয়বণ্টনের ব্যাপারে নীতির প্রশ্ন একেবারে এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই। আয় বণ্টনের প্রকৃতি মোট আয়ের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। আয় বণ্টনে অধিক বৈষম্য থাকিলে এবং ইহা সাধারণের অভিপ্রেত না হইলে সাধারণ লোক কাজে উৎসাহ বোধ করিবে না। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হইবে। আবার ঢালাও সাম্য হইলেও বিপদ আছে। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাহা হইলে সাধ্যানুযায়ী খাটিবে না। ইহার ফলেও উৎপাদন বাধাপ্রাপ্ত হইবে। নীতিগত সমস্যার সমাধান করিতে হইলেও বস্তুতঃ কি করিয়া আয় বণ্টন হয় তাহা প্রথমতঃ জানা দরকার।

কাহাদের মধ্যে আয় বাঁটোয়ারা হয় (To which factors shares are apportioned) ঃ

মোট আয় উৎপাদনে বহু ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি ব্যক্তির আয় কি করিয়া নির্ধারিত হয় তাহা আলোচনা করা অসম্ভব। মোটামুটি কতকগুলি গোষ্ঠির মধ্যে আয় কিরূপে বন্টিত হয় তাহার আলোচনাই আমরা করিব। উৎপাদনের আদি উপাদান হইল শ্রম ও জমি। বর্তমান অর্থ ব্যবস্থায় মূলধন ও সংগঠনের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। এক বা একাধিক উপাদানের মালিকানা না থাকিলে আয় হইতে পারে না। শিশু, অতি বৃদ্ধ, উন্মাদ বা চিররুগ্ন ব্যক্তি অবশ্য উপাদানের মালিক না হইয়াও জাতীয় আয়ের অংশ ভোগ করে। রাষ্ট্র কিংবা ইহাদের আত্মীয়স্বজন ইহাদের ভরণপোষণ করে। এই আত্মীয়স্বজনের আয় উপাদানের মালিকানা হইতেই আসে। রাষ্ট্র জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ দখল করে। কিন্তু রাষ্ট্রের রাজস্বের অধিকাংশ নাগরিকের আয় হইতে কর মারফৎ সংগৃহীত হয়। আর নাগরিকদের আয়ের উৎস হইল উপাদানের মালিকানা। বণ্টনতত্ত্বে আমরা এই উপাদানগুলির দামনির্ধারণ লইয়া আলোচনা করিব। জমির খাজানা, শ্রমের মজুরি, মূলধনের সুদ ও সংগঠনের মুনাফা কি করিয়া নির্ধারিত হয় তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

একই ব্যক্তি একাধিক উপাদানের মালিক হইতে পারে। একই ব্যক্তি জমির মালিক হিসাবে খাজানা ও মূলধনের মালিক হিসাবে সুদ পাইতে পারে। ব্যক্তি-

বিশেষের আয় নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর—(১) বিভিন্ন উপাদানের কতটা পরিমাণ তাহার মালিকানায় আছে এবং (২) এই উপাদানগুলির দাম। বণ্টনতত্ত্বে আমরা কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিষয়টি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব। অথচ ব্যক্তিগত বণ্টন বুঝিতে হইলে প্রথম বিষয়টিও জানা দরকার। সেইজন্য বলা হয়—বণ্টনতত্ত্বে আমরা **ব্যক্তিগত বণ্টন** (personal distribution) আলোচনা করি না। আমাদের আলোচ্য হইল **কর্ম্মগত বণ্টন** (functional distribution) অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিকোণ হইতে বণ্টনতত্ত্ব ও উপাদানের দাম নির্ধারণতত্ত্ব একই কথা।

উপাদানের দাম কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে (What determines the share of each group) : অন্যান্য দামের মত উৎপাদন-উপাদানের দামও চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নির্ধারিত হয়। পণ্য সামগ্রীর চাহিদা হয় ভোগীর তরফ হইতে। উপাদানের চাহিদা সব সময় সংগঠকের তরফ হইতে সৃষ্টি হয়। অন্যান্য সামগ্রী প্রত্যক্ষভাবে অভাবপূরণ করে। সুতরাং তাহাদের চাহিদা হয়। উৎপাদন-উপাদানের প্রত্যক্ষ উপযোগ নাই। ইহাদের উপযোগ পরোক্ষ। ইহাদের সাহায্যে যে দ্রব্যসম্ভার উৎপন্ন হয়—বাজারে তাহাদের চাহিদা আছে বলিয়াই উপাদানের চাহিদা হয়। পণ্যসামগ্রীর যোগান দেয় সংগঠক। উপাদানের যোগান দেয় উপাদানের মালিক। চাহিদার দিক হইতে বিভিন্ন উপাদানের কোন পার্থক্য নাই। উপাদান নিয়োগ করিয়া মুনাফা হয় বলিয়াই সংগঠক উপাদানের চাহিদা করে। সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই ইহা বলা চলে। যোগানের দিক হইতে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। জমির যোগান সম্পূর্ণ অপরিবর্তনীয়। মূলধনের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত অধিক। শ্রমের যোগানরেখা ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী হইতে পারে। যোগানের বৈশিষ্টের জন্য দাম নির্ধারণের ব্যাপারেও বৈচিত্র্য দেখা দেয়। পরবর্তী চার অধ্যায়ে আমরা এই বৈচিত্র্য আলোচনা করিব।

নিয়োগকর্তার উদ্দেশ্য হইল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া নিয়োগকর্তা উপাদানগুলির পারস্পরিক অনুপাত ঠিক করে। শ্রমের পরিমাণ কিছুটা কমাইয়া মূলধনের পরিমাণ কিছুটা বাড়াইলে যদি মুনাফা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে নিয়োগকর্তা নিশ্চয়ই শ্রমের পরিমাণ কমাইয়া তাহার পরিবর্তে মূলধন নিয়োগ করিবে (Law of substitution)। কোন একটি বিশেষ উপাদান নিয়োগকর্তা কি পরিমাণ চাহিদা করিবে? ইহা নির্ভর করে উপাদানটির বাজারদাম ও প্রান্তিক উপাদানের (marginal productivity) উপর। নিয়োগকর্তার সংখ্যা অনেক। সুতরাং কোন নিয়োগকর্তা এককভাবে উপাদানের বাজারদামের উপর প্রভাব বিস্তার

করিতে পারে না ধরিলে বিশেষ ভুল হইবে না। কোন উপাদানের অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ করিবার ফলে মোট উৎপাদন যতটা বাড়ে তাহাই হইল উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন। প্রান্তিক উৎপাদন যতক্ষণ উপাদানের বাজারদাম অপেক্ষা অধিক থাকিবে, ততক্ষণ সেই উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ নিয়োগকর্তা বাড়াইয়া চলিবে। যে পরিমণে উপাদান নিয়োগ করিলে উপাদানের বাজারদাম ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়, নিয়োগকর্তা উপাদানটির সেই পরিমাণ চাহিদা করিবে। উহার অধিক নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপাদন বাজারদাম হইতে কম হওয়ায় নিয়োগকর্তার লোকসান হইবে।

এই চারিটি উপাদানের সামগ্রিকভাবে নিয়োগের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। সকল শিল্পের দিক হইতে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন যাহা হইবে—উপাদানের বাজারদামও ততখানিই হইবে। কোন একটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন যদি একটি শিল্পে অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, তাহা হইলে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার জন্য অধিক দাম দিতে সক্ষম হইবে। তাহাদের তরফ হইতে এই উপাদানের চাহিদা বাড়িবে। অন্য শিল্প হইতে এই শিল্পে উপাদানটির যোগান বাড়িবে ও প্রান্তিক উৎপাদন কমিবে। অন্য শিল্পে উপাদানটির যোগান কমিবে ও প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িবে। এইভাবে শিল্পগত গতিশীলতার (mobility as between industries) প্রভাবে যে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন সকল শিল্পে সমান হইবে। বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পরিবর্ত সম্বন্ধ (substitution) থাকার ফলে কোন উপাদানের প্রান্তিক উপযোগ তাহার দাম অপেক্ষা অধিক থাকিতে পারে না। তাহা হইলে অন্য উপাদানের পরিবর্তে এই উপাদানটি ব্যবহার করিবার ঝোঁক দেখা দিবে। ফলে ইহার চাহিদা বাড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত দাম বাড়িয়া প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে। কোন উৎপাদনের প্রান্তিক উৎপাদন ও সামাজিক গুরুত্ব একই কথা। উপাদানের দাম তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে।

তত্ত্বের দিক হইতে উপাদানের দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কার্যক্ষেত্রে এই সূত্রের অবাধ প্রয়োগ নানাপ্রকার বাধানিষেধের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। শ্রমিক বা মালিকের সঙ্ঘ, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, প্রথা ও সংস্কার উপাদানের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকালীন মেয়াদে চাহিদা ও যোগানের প্রভাব অগ্রাহ্য করা কঠিন। কিন্তু সময় সময় জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করিয়া বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. What is distributed and amongst whom ?
কি এবং কাহাদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হয় ? [পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৭]

2. What is Functional Distribution ? Why do we not deal with Personal Distribution ?
কর্মগত বণ্টন কাহাকে বলে ? ব্যক্তিগত বণ্টন আমরা কেন আলোচনা করি না ?
[পৃষ্ঠা ৩০৬-৩০৭]

3. What determines the share of each factor ?
বিভিন্ন উৎপাদনের অংশ কিরূপে নির্ধারিত হয় ? [পৃষ্ঠা ৩০৭-৩০৯]

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

খাজানা
(Rent)

অর্থনৈতিক খাজানা কাহাকে বলে ? (What is Economic Rent ?) :

স্থায়ী বস্তুর জন্য নিয়মিত কিস্তিতে দেয় ভাড়াকে সাধারণ ভাষায় খাজানা বলা হয়। অর্থনীতিতে কিন্তু কেবলমাত্র জমি ব্যবহারের জন্য দেয় দামকে খাজানা বলা হয়। জমি কিন্তু আদিম অবস্থায় নাই। কোন জমির উপর বসতবাটী বা দোকানঘর নির্মিত হইয়াছে। কোন জমিতে নলকূপ খনন করিয়া বা বেড়া দিয়া উন্নতি করা হইয়াছে। জমি ভাড়া লইবার সময় এই মানুষের করা উন্নতির সুবিধাগুলিও পাওয়া যায়। ইহার জন্য উপযুক্ত মূল্যও দিতে হয়। এই মূল্য কিন্তু সুদের পর্যায়ে পড়ে। জমি ইজারা দিবার পরও জমির মালিককে অনেক সময় তদ্বির তদারক করিতে হয়। ইহার জন্য জমির মালিককে পারিশ্রমিক দিতে হয়। এই পারিশ্রমিক মজুরির পর্যায়ে পড়ে। জমি ভাড়া লইবার সময় যে নিয়মিত ভাড়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিতে হয় তাহাকে চুক্তি খাজনা (Contract Rent) বলা যায়। ইহা হইতে মূলধনের সুদ ও শ্রমের মজুরি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইবে শ্রেফ জমি ব্যবহারের জন্য দেয় দাম। ইহা হইল **অর্থনৈতিক খাজানা** (Economic Rent)।

অ-পরিবর্তনীয় উপাদানের দামকে খাজানা বলে

জমি প্রকৃতির দান। ইহার যোগান অ-পরিবর্তনীয়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এখানে শূন্য। যে কোন সামগ্রীর যোগান অ-পরিবর্তনীয় হইলে তাহার দামকে অর্থশাস্ত্রে **খাজানা** বলা হয়। জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের যোগানও স্বল্পকালীন মেয়াদে অ-পরিবর্তনীয় হইতে পারে। তখন এই দাম খাজানার সামিল হয়। জমির যোগান কেবলমাত্র স্বল্পকালে নয়—দীর্ঘকালীন মেয়াদেও অ-পরিবর্তনীয়। সেই হিসাবে জমি ব্যবহারের দাম খাজানার চূড়ান্ত (কিন্তু একমাত্র নয়) নিদর্শন।

সমগ্র অর্থ ব্যবস্থার দিক হইতে খাজানা উদ্বৃত্ত। বিশেষ শিল্প বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খাজানা মোটেই উদ্বৃত্ত নয়

জমি প্রকৃতির দান বলিয়া ইহার কোনও উৎপাদন ব্যয় নাই। ইহার জন্য কোন দাম না পাইলেও ইহার যোগান কমিবে না। সুতরাং সামগ্রিকভাবে ইহার যোগান দাম শূন্য। অন্যান্য উপাদানের উৎপাদন ব্যয় আছে। উৎপাদন ব্যয় না পোষাইলে তাহাদের যোগান কমিতে থাকিবে। তাহাদের যোগান বজায় রাখিতে হইলে দাম এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে তাহাদের উৎপাদন ব্যয় সঙ্কুলান হয়। জমির উৎপাদনব্যয় না থাকায় ইহার জন্য যে দামই পাওয়া যাক তাহাকে উদ্বৃত্ত হিসাবে গণনা করা যায়। সেই হিসাবে খাজানাকে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বলা যায়। অবশ্য কোন একটি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় জমিরও যোগান দাম আছে। অন্য শিল্পে সবচেয়ে বেশী যে দাম পাওয়া যায়, অন্ততঃ সেই পরিমাণ দাম না দিলে আলোচ্য শিল্পে জমি ধরিয়া রাখা যাইবে না। এক্ষেত্রে খাজানাকে উৎপাদনব্যয়ের অংশ হিসাবে না দেখিবার অর্থ হয় না। তখন খাজানাকে আর উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বলা চলে না।

রিকার্ডোর খাজানাতত্ত্ব (Ricardo's Theory of Rent) : অর্থনৈতিক খাজানার উদ্ভব কেন হয় এবং ইহার পরিমাণ কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার সূত্রপাত করেন ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো।

অবাধ লভ্য অবস্থায় জমির খাজানা হইতে পারে না

রিকার্ডো কল্পনা করিলেন একটি নূতন দেশ সবেমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনও এখানে বসতি স্থাপন হয় নাই ও চাষ-আবাদ সুরু হয় নাই। কিছু কিছু লোক ধীরে ধীরে এই দেশে আসিতে লাগিল। যথেষ্ট প্রথম শ্রেণীর জমি পড়িয়া আছে। যার যতখানি ইচ্ছা দখল করিয়া চাষ করিতে পারে। এমতাবস্থায় প্রথম শ্রেণীর জমির যোগান অফুরন্ত। জমি অবাধলভ্য দ্রব্য। এ অবস্থায় কেহ জমির জন্য খাজানা পাইতে পারে না। কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণীর জমিতে চাষ হইবে এবং ফসল বিক্রয় করিয়া চাষের খরচ পোষাইবে মাত্র। প্রথম শ্রেণীর জমিতে ধরা যাক ১০০৲ খরচ করিয়া

(মজুরি, সুদ ও স্বাভাবিক মুনাফা বাবদ) ২৫ মণ ফসল পাওয়া যায়। ফসলের দাম ৪্র বেশী হইলে চাষী স্বাভাবিক মুনাফার অতিরিক্ত পাইবে। ফলে আরও জমি চাষ হইবে। ফসলের যোগান বাড়িয়া দাম কমিয়া ৪্ না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ চলিবে। চাষীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকিলে উৎপাদনব্যয়ের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

ধীরে ধীরে লোকসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ফসলের চাহিদাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িল।

যোগান সীমাবদ্ধ হইলে তবেই খাজানার উদ্ভব হয়

ক্রমে ক্রমে সমস্ত শ্রেণীর জমি চাষে আসিয়া যাইবে। চাহিদা মিটাইতে হইলে এখন অপেক্ষাকৃত নীরস দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ না করিয়া উপায় থাকিবে না। এই জমিতে ১০০্ খরচ করিয়া ২৫ মণের কম, ধরা যাক ২০ মণ ফসল পাওয়া যায়। এই জমিতে চাষ পোষাইতে হইলে ফসলের দাম ১০০্ ÷ ২০ = ৫্ হওয়া দরকার। বাজারে সমস্ত ফসল একই দামে বিক্রয় হইবে। সুতরাং প্রথম শ্রেণীর জমির ফসল বিক্রয় করিয়া এখন পাওয়া যাইবে ২৫ × ৫ = ১২৫্। আগন্তুক চাষী দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিলে যে ফল পাইবে প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া জমির মালিককে ৫ মণ বা ২৫্ খাজানা দিলেও অবিকল সেই ফল পাইবে।

২৫্র কম হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ না করিয়া প্রথম শ্রেণীর জমি চাষ করিলে লাভ হইবে বেশী। চাষীদিগের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জমির জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া যাইবে। এই প্রতিযোগিতার ফলে খাজানা বাড়িতে থাকিবে। খাজানা বাড়িয়া কিন্তু ২৫্র বেশী হইতে পারে না। তাহা হইলে চাষীরা নিকৃষ্ট জমির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া উৎপাদনব্যয় সঙ্কুলান হয় মাত্র। এই জমিতে এখন কোন খাজানা হইবে না। ইহা হইবে বিনা খাজানা জমি (no-rent land)।

উৎপাদিকা শক্তির তারতম্যের ফলে খাজানার তারতম্য হয়

উৎপাদনব্যয় সকল জমিতে সমান। উৎকৃষ্ট জমিতে উৎপাদনব্যয়ের অতিরিক্ত যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত হয় তাহাই হইবে উৎকৃষ্ট জমির খাজানা। এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ নির্ভর করে বিনা খাজানার জমি ও আলোচ্য জমির উৎপাদিকা শক্তির পার্থক্যের উপর। চাহিদা বাড়ার ফলে যদি তৃতীয় শ্রেণীর জমি চাষ করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিতে খাজানার উদ্ভব হইবে এবং প্রথম শ্রেণীর জমির খাজানা বাড়িয়া যাইবে।

জমির উৎপাদিকাশক্তি কেবলমাত্র জমির উর্বরতার উপর নির্ভর করে না। জমির অবস্থানের (situation) সঙ্গেও ইহার সম্পর্ক আছে। বাজার হইতে

অনেক দূরে দুরধিগম্য জায়গায় অবস্থিত অতি উর্বর জমিও চাষের উপযুক্ত বিবেচিত হইবে না। উর্বরতা ও অবস্থান উভয় বিষয় ধরিয়া যে জমিতে চাষ করিয়া উৎপাদনব্যয় কোনক্রমে পোষায় তাহাকেই বিনা খাজানার জমি বলা হইবে। এই বিনা খাজানার জমির তুলনায় যে জমির উৎপাদিকাশক্তি যত বেশী হইবে তাহার খাজানাও তত অধিক হইবে।

অবস্থান ও উর্বরতা মিলাইয়া উৎপাদিকা শক্তির হিসাব করিতে হইবে

নিকৃষ্ট জমি চাষ না করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে আত্যন্তিক চাষ করা যাইতে পারে। এ সম্ভাবনাও রিকার্ডোপন্থীরা আলোচনা করিয়াছেন। ক্রমাগত ১০০৲ (উৎকৃষ্ট) জমিতে লাগাইয়া চলিলে ক্রমহ্রাসমান বিধি কার্যকরী হইবে। অতিরিক্ত ১০০৲ নিকৃষ্ট জমিতে নিয়োগ না করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে প্রয়োগ করিলে যদি অধিক ফসল পাওয়া যায় তাহা হইলে চাষী তাহাই করিবে। কিন্তু উৎকৃষ্ট জমিতে ক্রমাগত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে। উভয়বিধ জমিতে সমান প্রান্তিক উৎপাদন না হওয়া পর্যন্ত চাষী নিকৃষ্ট জমিতেই শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া চলিবে। শেষ ১০০৲ নিয়োগ করিয়া তাহার উদ্বৃত্ত কিছু থাকিবে না। কিন্তু পূর্বের প্রতি ১০০৲ নিয়োগ করিয়া ১০০৲র অধিক পাইবে। উৎপাদনব্যয়ের অতিরিক্ত এই উদ্বৃত্তই হইবে উৎকৃষ্ট জমির খাজানা।

ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি কার্যকরী হওয়ায় নিকৃষ্ট জমি চাষ না করিয়া উপায় থাকে না

রিকার্ডোর তত্ত্বের সমালোচনা ও আধুনিক খাজানা তত্ত্ব (Criticism of Ricardo's Theory and the Modern Theory of Rent) : রিকার্ডোর তত্ত্বে বিনা খাজানা জমির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। এই বিনা খাজানা জমির সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট জমিখণ্ডের উৎপাদিকাশক্তির পার্থক্য (differential return) যতখানি নির্দিষ্ট জমিখণ্ডের খাজানা সেই পরিমাণ হইবে। পুরাতন দেশগুলিতে বিনা খাজানা জমি নাই। নিকৃষ্টতম জমির জন্যও খাজানা দিতে হয়। জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলিয়াই এই খাজানা দিতে হয়। সকল জমির উর্বরতা ও অবস্থান এইরকম হইলেও সীমাবদ্ধতার (Scarcity) দরুন জমি ব্যবহারের জন্য খাজানা দিতে হইত। জমির যোগান চাহিদার তুলনায় সীমাবদ্ধ—ইহাই খাজানাতত্ত্বের মূল কথা। রিকার্ডো এই সীমাবদ্ধতার উপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন নাই।

জমির যোগান সীমাবদ্ধ। জমির বিকল্প প্রয়োগ হইতে পারে। যে জমিতে ধানের চাষ হয় সেই জমিতেই আবার ঘাস জন্মানও চলে। নগর এলাকার প্রসারের ফলে গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমির ব্যবহার বাড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ধানচাষের

জমি কমিয়া গিয়াছে। কোন একটি শিল্পে জমির ব্যবহার বাড়াইতে গেলে অন্যান্য শিল্পের ভাগে জমির পরিমাণ কমিবে। এই অন্যান্য শিল্প জমির জন্য যে সর্বোচ্চ দাম দিতে প্রস্তুত অন্ততঃ সেই পরিমাণ খাজানা দিতে রাজী না হইলে প্রথম শিল্পের পক্ষে জমি পাওয়া সম্ভব নয়। জমির যোগান অফুরন্ত হইলে খাজানার উৎপত্তি অসম্ভব হইত। কোন শিল্পে বা প্রতিষ্ঠানে জমির পরিমাণ কমিলে অন্যান্য উপাদানকে এখন কম জমি দিয়া কাজ করিতে হইবে। অন্যান্য উপাদানগুলির জমির সঙ্গে অনুপাত কাম্যতম অনুপাত হইতে আরও সরিয়া আসিবে। ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধি অনুসারে উৎপাদন কমিবে। ১ বিঘা জমি কমাইলে উৎপাদন যতটা কমিবে তাহাই হইবে জমির প্রান্তিক উৎপাদন। অন্যান্য শিল্প জমির প্রান্তিক উৎপাদনের সমান খাজানা দিতে রাজী হইবে। সুতরাং প্রথম শিল্পটিকেও এই পরিমাণ খাজানা দিতে হইবে। অন্যান্য উপাদানের মত জমির দাম অর্থাৎ খাজানাও জমির প্রান্তিক উৎপাদনের উপর নির্ভর করে।

জমির বিকল্প প্রয়োগ যদি না থাকত, তাহা হইলে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উঠিত না। প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা ধরিয়া লইতেন, জমি একটিমাত্র উদ্দেশ্যে (যেমন গম উৎপাদনে) ব্যবহার করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করিলে অন্যভাবে জমি ব্যবহার করা যায় না। খাজানা যতই কম হোক জমি ব্যবহার করিতে না দিবার কারণ নাই। 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' এখানে তাও খাজানা পাওয়া যাইতেছে। অন্যত্র ইহা অব্যবহার্য—সুতরাং কিছুই পাওয়া যাইবে না। এমতাবস্থায় বিনা খাজানার জমি থাকা অসম্ভব নয়। কার্যতঃ একই জমি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। জমির যোগানও সীমাবদ্ধ। সুতরাং জমির সম্ভাব্য প্রয়োগ ক্ষেত্রগুলির যেখানে জমির প্রান্তিক উৎপাদন অধিক সেইখানে জমি ব্যবহার হইবে অধিক পরিমাণে। ফলে সেখানে প্রান্তিক উৎপাদন কমিবে। অন্যত্র পরিমাণ কমায় প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িবে। প্রতিযোগিতা ও জমির অগতিশীলতার ফলে সর্বত্র জমির প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইতে বাধ্য। জমির খাজানা জমির এই সাধারণ প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে।

খাজানা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Rent and Price): দীর্ঘকালীন মেয়াদে দাম ও উৎপাদনব্যয় সমান হইবে। বিনা খাজানা বা প্রান্তিক জমি চাষ করিয়া কোনক্রমে উৎপাদনব্যয় সঙ্কুলান হয় মাত্র। দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইলে ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জমি চাষ হইবে। ইহা আর প্রান্তিক জমি থাকিবে না। আবার দাম এই উৎপাদনব্যয় অপেক্ষা কম হইলে এই ধরণের জমি চাষ করা সম্ভব হইবে না। ইহা অপেক্ষা

উৎকৃষ্টতর জমি প্রান্তিক জমি হইয়া দাঁড়াইবে। যে কোন মুহূর্তে দাম তৎকালীন প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। প্রান্তিক জমির খাজানা নাই। সুতরাং খাজানা দামনির্ধারক উৎপাদনব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। সেইজন্য রিকার্ডো বলিয়াছেন খাজানা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়। খাজানা অধিক অতএব দাম অধিক বলার অর্থ হয় না। বরং দাম বাড়িলে আরও খারাপ জমি চাষ করা সম্ভব হইবে এবং ফলে খাজানা বাড়িবে।

সামগ্রিকভাবে দেখিলে জমির কোনও বিকল্প প্রয়োগ নাই; শ্রম না করিলে শ্রমিক অবসর (leisure) ভোগ করিতে পারে। উৎপাদনের কাজে না লাগাইলে জমিকে অন্যভাবে কাজে লাগান যায় না। সেই হিসাবে জমির যোগানদাম শূন্য। খাজানা পুরাপুরি উদ্বৃত্ত। সেই হিসাবে বলা যায় খাজানা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু কোন একটি প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের তরফ হইতে খাজানা উৎপাদনব্যয়ের অন্তর্গত। খাজানা না দিলে অন্য প্রতিষ্ঠান বা অন্য শিল্পের হাতে জমি সরিয়া যাইবে। শ্রমের মজুরি বা মূলধনের সুদের মত জমির খাজানাও উৎপাদনব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

জমির বিকল্প প্রয়োগ সম্ভব। কিন্তু সকল জমি সকল কাজের পক্ষে সমান উপযোগী নয়। কোন একখণ্ড জমি হয়ত পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই জমিখণ্ড অন্য শিল্পে লাগাইলে ঊর্ধ্বপক্ষে হয়ত ৫০্ খাজানা হইতে পারে। পাটচাষের জন্যও কমপক্ষে ৫০্ দিতে হইবে। পাটের চাহিদা বাড়িলে পাটের দাম বাড়িবে। এই জমির খাজানাও বাড়িবে। অন্য জমি পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। সুতরাং খাজানা বাড়িয়া ১০০্ হইলেও, পাটশিল্পে জমির যোগান বাড়িয়া খাজানা কমিবার আশঙ্কা নাই। অন্য শিল্পে যতটুকু পাওয়া সম্ভব অর্থাৎ ৫০্ উৎপাদনব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। অতিরিক্ত ৫০ (= ১০০্ − ৫০্) হইল সত্যকারের অর্থনৈতিক খাজানা। পাট চাষের জমির যোগান একেবারে অপরিবর্তনীয় বলিয়াই এই অতিরিক্ত ৫০্ খাজানা হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই ৫০্র বেলায় আমরা বলিতে পারি খাজানা দামের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং দাম বাড়িয়াছে বলিয়াই খাজানা বাড়িয়াছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষির উন্নতি এবং খাজানা (Effects of an increase in population and improvements on Land) : জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে। ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জমি চাষ করিতে হইবে এবং উৎকৃষ্ট জমিতে আত্যন্তিক চলিবে। উভয়দিক হইতে খাজানা বাড়িবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে পথঘাট ও গৃহ নির্মাণের জন্য অধিক জমির প্রয়োজন হইবে। শ্রম ও মূলধনের যোগান বাড়িবে। এই বাড়তি শ্রম ও মূলধন খাটাইবার জন্য জমির প্রয়োজন হইবে বেশী। জমির চাহিদা বাড়িবে। ফলে খাজানাও বাড়িবে।

কৃষির উন্নতি বা পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া মানে সাধারণভাবে জমির যোগান প্রকারান্তরে বাড়া। বিঘাপ্রতি ফলন দ্বিগুণ হইলে এখন ১ বিঘা জমি আগেকার ২ বিঘা জমির কাজ করিবে। যোগান বাড়িলে দাম কমে। কৃষির উন্নতি জমির যোগান বাড়ার সামিল। সুতরাং কৃষির উন্নতি হইলে খাজানা কমিবে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **What is Economic Rent?**
   অর্থ নৈতিক খাজানা কাহাকে বলে? [পৃষ্ঠা ৩০৯-৩১০]
2. **How is the rent of land determined?**
   জমির খাজানা কি করিয়া নির্ধারিত হয়? [পৃষ্ঠা ৩১০-৩১৩]
3. **Explain the relation between rent and price.**
   খাজানা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪]

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মজুরি

(Wages)

মজুরি হার কিরূপে নির্ধারিত হয় (How the rate of wages is determined) ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সম্বন্ধে জীবনধারণের তত্ত্ব (Subsistence Theory প্রচারিত হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে শ্রম ও অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সাধারণ পণ্যের মত শ্রমেরও কেনা-বেচা হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিক—বিক্রেতা, আর সংগঠক হইল ক্রেতা। দীর্ঘকালীন মেয়াদে দাম উৎপাদনব্যয়ের সমান হয়। সেই হিসাবে শ্রমের দাম বা মজুরিও শ্রমের উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। শ্রমিকের পরিবার প্রতিপালন করিতে নিম্নতম ব্যয় যাহা প্রয়োজন হয় তাহাই হইল শ্রমের উৎপাদনব্যয়। শ্রমিক পরিবারের ভরণপোষণ না করিতে পারিলে শ্রমিকের যোগান বজায় রাখা সম্ভব নয়। শ্রমিকের মজুরি শেষ পর্যন্ত এই জীবনধারণের ব্যয়ের সমান হইবে। ইহাই সংক্ষেপে এই তত্ত্বের বক্তব্য।

মজুরি = শ্রমের দাম = শ্রমের উৎপাদন ব্যয় = শ্রমিকের পরিবারের খোরপোষ

মজুরি ইহা হইতে অধিক হইলে, শ্রমিকেরা অধিক সংখ্যায় ও সত্বর বিবাহ করিবে এবং অধিক সংখ্যায় সন্তান হইবে। শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া মজুরি কমিবে। আবার মজুরি ইহা হইতে কম হইলে, অনাহার ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধির প্রকোপে শ্রমিকসংখ্যা হ্রাস পাইবে। ফলে মজুরি বাড়িবে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে এই তত্ত্বের কিছুটা পরিবর্তন করিয়া বলা হইল, মজুরি জীবনযাত্রার মানের (Standard of Living) সমান হইবে। প্রত্যেক শ্রমিকগোষ্ঠী নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত। কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদন নয়, কিছু কিছু আরামও (Comforts) এই মানের অন্তর্ভুক্ত। মজুরি জীবনযাত্রার মানের সমান হইবে।

সমালোচনা—জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে একই শ্রেণীভুক্ত সকল শ্রমিকের ধারণা একরকম নয়। তাহাদের মজুরি কিন্তু অভিন্ন। জীবনযাত্রার মান তত্ত্ব অনুযায়ী তাহাদের মজুরির পার্থক্য হওয়া উচিত ছিল। আবার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা মোটামুটি এক হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন শিল্পে (Sweated trades) ভীষণ কম মজুরি দেওয়া হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে মজুরি বাড়িলে সব সময় শ্রমিকসংখ্যা বাড়ে না। শ্রমিকেরা বাড়তি মজুরির কিয়দংশ জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিবার কাজে লাগায়। অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান দ্বারা মজুরি নির্ধারিত না হইয়া বরং মজুরি দ্বারা জীবনযাত্রার মান নির্ধারিত হইয়াছে। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর আপত্তি হইল—ইহা কেবলমাত্র যোগানের সাহায্যে মজুরির ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে। অন্যান্য দামের মত মজুরিও চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই তত্ত্ব শ্রমের চাহিদার ভূমিকা সম্বন্ধে একেবারে নীরব।

প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্ব (Marginal Productivity Theory): মজুরি দীর্ঘকাল জীবনযাত্রার মান অপেক্ষা কম থাকিতে পারে না। কিন্তু স্বল্পকালীন মেয়াদে শ্রমিকদের মজুরী বাড়াইবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। জীবনধারণ করিতে হইলে শ্রমিকের কাজ না করিয়া উপায় নাই। মন্দার বাজারে মজুরী জীবনধারণ অপেক্ষা কম হইলেও শ্রম না করিয়া উপায় নাই। সামগ্রিকভাবে (as a whole) শ্রমের যোগান নির্দিষ্ট ধরিয়া লওয়া যায়। মজুরির পরিবর্তনের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক বাহির করা দুষ্কর। কোন বিশেষ শিল্পে কিন্তু শ্রমের যোগান মজুরি বাড়িলে বাড়ে এবং মজুরি কমিলে হ্রাস পায়।

শ্রমের চাহিদা হয় নিয়োগকর্তার তরফ হইতে। শ্রমের সহিত অন্যান্য উপাদানও —যথা কলকারখানা, প্রয়োজন হয়। স্বল্পকালীন মেয়াদে এই উপাদানগুলি অ-পরিবর্তনীয়। সুতরাং শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইয়া চলিলে এক সময় ক্রমহ্রাসমান

উৎপন্নের বিধি কার্যকরী হইবে। এককভাবে নিয়োগকর্তার মজুরির হারের উপর কোন হাত নাই। অতিরিক্ত প্রতি শ্রমিকের জন্য তাহাকে চলতি হারে মজুরি দিতে হইবে। এদিকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়া চলিবে। যতক্ষণ শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন চলতি মজুরির হার অপেক্ষা অধিক থাকিবে, ততক্ষণ নিয়োগকর্তা শ্রমিকসংখ্যা বাড়াইয়া চলিবে। প্রান্তিক উৎপাদন কমিয়া মজুরির হারের সমান হইলে নিয়োগকর্তা শ্রমিক সংখ্যা আর বাড়াইবে না।

ধরা যাক কোন নিয়োগকর্তা ১০০ জন শ্রমিক নিয়োগ করিয়াছে। শ্রমিকসংখ্যা ১০১ করিলে মোট উৎপাদন ৫ একক বাড়ে ও ১০২ করিলে ৪ একক বাড়ে; ১০৩ করিলে ৩ একক বাড়ে ইত্যাদি। প্রতি এককের দাম বরাবর ২৲ ধরা যাক (অর্থাৎ পণ্যের বাজারে আমরা পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ধরিয়া লইতেছি)। তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন তালিকা এইরূপ হইবে।

শ্রমিক সংখ্যা	প্রান্তিক উৎপাদন	টাকাকড়ির অঙ্কে প্রান্তিক উৎপাদন
১০১	৫	১০৲
১০২	৪	৮৲
১০৩	৩	৬৲

বাজারে ৮৲ মজুরির হার চালু থাকিলে এই নিয়োগকর্তা ১০২ জন শ্রমিক নিয়োগ করিবে। এই অবস্থায় নিয়োগকর্তার চাহিদা ১০৩ হইতে পারে না। বাজারের মজুরির হার ৬৲ হইলে এই নিয়োগকর্তার চাহিদা হইবে ১০৩। চাহিদা অনুযায়ী শ্রমিক না পাইলে নিয়োগকর্তা মজুরের হার বাড়াইতে বাধ্য হইবে। অন্য শিল্প বা প্রতিষ্ঠান হইতে শ্রমিক অধিক মজুরির লোভে সরিয়া আসিবে। শ্রমিক সংখ্যা বাড়ার ফলে এখানে প্রান্তিক উৎপাদন কমিবে—অন্যত্র বিপরীত কারণে প্রান্তিক উৎপাদন বাড়িবে। শ্রমিকের গতিশীলতা ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকার ফলে সর্বত্র প্রান্তিক উৎপাদন সমান হইবার ঝোঁক দেখা দিবে। মজুরির হার এই সাধারণ প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবে। শ্রমিকের যোগান সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট (given) ধরিলেও বিশেষ কোন শিল্পে শ্রমের যোগান পরিবর্তনীয় ধরা হয়।

সমালোচনা—প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ও শ্রমের গতিশীলতা ধরিয়া লওয়া হয়। বাস্তবজগতে শ্রমের বাজারে পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার একান্ত অভাব। শ্রমিকের তুলনায় নিয়োগকর্তার দরকষাকষির ক্ষমতা অনেক বেশী। কাজ না করিলে শ্রমিকের ভাত জুটিবে না। কাজ বন্ধ করিলে নিয়োগকর্তাকে লোকসান দিতে হইবে। তাই বলিয়া তাহাকে অনাহারে থাকিতে হইবে না। শ্রমিকেরা

নিজেদের দুর্বলতা বুঝিয়া সংঘশক্তির (Trade Union) আশ্রয় লইয়াছে। ফলে দুইতরফেই কিছুটা একচেটিয়া অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। নিয়োগকর্তা মুনাফার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করে। সুতরাং তাহার পক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা অধিক মজুরি দেওয়া সম্ভব নয়। শ্রমের মজুরি ঊর্ধ্বপক্ষে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইতে পারে। সমাজের চোখে যাহা জীবনযাত্রার নিম্নতম মান হিসাবে বিবেচিত হয়, মজুরি তাহা অপেক্ষা কম হইতে পারে না। ইহা হইল মজুরির নিম্নতম সীমা। এই দুই সীমার মধ্যে মজুরি কার্যতঃ কত হইবে, তাহা নির্ভর করে নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকসংঘের দরকষাকষি ক্ষমতার উপর। ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা যখন সাধারণভাবে ভাল থাকে, তখন নিয়োগকর্তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অধিক প্রকট হয়। ফলে শ্রমিকের মজুরি প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হইবার ঝোঁক দেখা দেয়। এমন কি একচেটিয়া ক্ষমতা থাকার ফলে যে অতিরিক্ত মুনাফা হয়, তাহার কিছুদংশও শ্রমিকের ভাগ্যে জুটিতে পারে। আবার মন্দার সময় শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা অধিক জোরদার হয়। নিয়োগকর্তারা উৎপাদন বাড়াইবার ব্যাপারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে; ফলে মজুরি কমিয়া জীবনযাত্রার মানের সমান হইবার ঝোঁক দেখা দেয়। এমন কি মন্দা বেশী হইলে মজুরি সাময়িকভাবে জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাও কমিয়া যাইতে পারে। শ্রমিকের সংখ্যা কমিবার ফলেই হউক অথবা শ্রমিকের দক্ষতা বাড়িবার ফলেই হউক, প্রান্তিক উৎপাদন না বাড়িলে মজুরি বাড়া সম্ভব নয়।

৮। **শ্রমিকসংঘ ও মজুরি** (Trade Unions and Wages): বেশীর ভাগ শ্রমিকের শ্রমই একমাত্র সম্বল। মজুরি না পোসাইলেও অনেক সময় শ্রমের যোগান বন্ধ করা সম্ভব হয় না। তাহা হইলে অনাহারে থাকিতে হইবে। অধিকাংশ শ্রমিক বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। অন্যত্র বা অন্য শিল্পে উচ্চতর মজুরির হার চালু থাকিলেও তাহারা সে খবর জানে না। যাহারা জানে তাহারাও নানা কারণে কর্মস্থল পরিবর্তন করিতে অনিচ্ছুক থাকে। শ্রমিকদের এই দুর্বলতার সুযোগ লইতে নিয়োগকর্তা কসুর করে না—প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা কম মজুরি দিয়া নিজ মুনাফা বৃদ্ধি করে। শ্রমিকেরা সংঘবদ্ধ হইয়া এই অবস্থার প্রতিকার করিতে পারে। মজুরি বাড়াইয়া প্রান্তিক উৎপাদনের কাছাকাছি লইয়া যাইতে পারে।

জবরদস্তি করিয়া মজুরি সাময়িকভাবে প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষাও অধিক করা সম্ভব। নিয়োগকর্তা কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবে না। নিজ মুনাফার খাতিরে সে সকল সময় শ্রমিকসংখ্যা এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে প্রান্তিক উৎপাদন চলতি মজুরির সমান হয়। শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘটের ফলে যদি মজুরির হার বাড়ে, নিয়োগকর্তা নিয়োগ কমাইয়া প্রান্তিক উৎপাদন বাড়াইবে। আমাদের উদাহরণে

মজুরি ৬৲ হইতে বাড়িয়া ৮৲ হইলে নিয়োগকর্তা শ্রমিকসংখ্যা ১০৩ হইতে কমাইয়া ১০২ করিবে। দুধ এবং তামাক একই সঙ্গে খাওয়া চলিবে না। শ্রমিকসঙ্ঘ নিজ দাবীতে অনড় থাকিলে মজুরির হার অনেকখানিই বাড়ান যায়। সেক্ষেত্রে বেকারত্ব বাড়িতে বাধ্য। যাহারা কাজে টিকিয়া থাকিবে তাহারা লাভবান হইবে। যে অভাগারা ছাঁটাই হইবে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইবে। মুনাফাকে কেন্দ্র করিয়া যে অর্থব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে মুনাফার ক্ষতি করিয়া কাজ চালান সম্ভব নয়।

দীর্ঘকালীন মেয়াদে প্রান্তিক উৎপাদন না বাড়িলে মজুরি বাড়া সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে সঙ্ঘের করণীয় অনেক কিছু আছে। নিরক্ষরতা দূর করিয়া প্রচার কার্য চালাইয়া প্রশাসনিক ত্রুটি দূর করিতে সাহায্য করিয়া সঙ্ঘ শ্রমিকের দক্ষতা বাড়াইতে পারে। শ্রমিকের দক্ষতা সহযোগী অন্যান্য উপাদানের দক্ষতার উপরও নির্ভর করে। মূলধন যদি অপ্রচুর হয়, যে মূলধন আছে তাহা যদি নিকৃষ্ট ধরণের হয় এবং নিয়োগকর্তার সংগঠন ক্ষমতা যদি না থাকে তাহা হইলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকের দক্ষতা ক্ষুণ্ণ হইবে। অন্যের অপরাধে শ্রমিক আর্থিক শাস্তি পাইবে। এই সকল ত্রুটি দূর করিবার ব্যাপারে নিয়োগকর্তাকে বাধ্য করিবার জন্য সঙ্ঘ ন্যায্যভাবেই আন্দোলন করিতে পারে। মজুরি কমাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা নিয়োগকর্তার সহজাত প্রবৃত্তি। শক্তিশালী শ্রমিকসঙ্ঘ থাকিলে নিয়োগকর্তা এই সহজ পথ অবলম্বন করিতে পারে না। তখন খরচ কমাইবার জন্য রাস্তা বাহির করিবার প্রয়োজন হয়। এইভাবে অনেক সময় নিয়োগকর্তা উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির পথ আবিষ্কার করিতে বাধ্য হয়।

আর্থিক ব্যাপারে শ্রমিকসঙ্ঘের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাই বলিয়া সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা নাই বলা যায় না। আর্থিক ব্যাপারেও সঙ্ঘ মজুরি কিছুটা বাড়াইতে পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি। কেবলমাত্র মজুরি বাড়ানই সঙ্ঘের একমাত্র কাজ নয়। সঙ্ঘের সৌভ্রাত্র্যমূলক কার্যকলাপের (fraternal activities) গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। শ্রমিকদের কাজে দুর্ঘটনা যে কোন সময় ঘটিতে পারে। কাজ সব সময় না থাকিতে পারে। তার উপর আছে আধিব্যাধির প্রকোপ। এই সকল বিপদে সঙ্ঘ শ্রমিকদের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে। সঙ্ঘ ছোটখাট বীমা কোম্পানী হিসাবে কাজ করিতে পারে। নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, খেলাধূলার ব্যবস্থা করা ইত্যাদিও সঙ্ঘ অনায়াসে করিতে পারে। শ্রমবিভাগের ফলে একঘেয়েমি দেখা দিতে পারে। সঙ্ঘ পরিচালনার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিলে এই একঘেয়েমির লাঘব হইতে পারে। অত্যন্ত নিরামিষ মনে হইলেও এইগুলিই সঙ্ঘের ন্যায্য কাজ। সঙ্ঘের গোড়া পত্তনের সময় হয়ত বাহিরের লোকের সাহায্য দরকার হইতে পারে। কিন্তু সঙ্ঘের

নেতৃত্ব যদি বরাবর বাহিরের পেশাদার আন্দোলনকারীদের হাতে থাকে এবং সঙ্ঘ যদি সর্বদা রাজনৈতিক দলগুলির মল্লযুদ্ধের ক্ষেত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রমিকসঙ্ঘের মারফৎ শ্রমিক কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা কম।

আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরি (Money wages and Real wages): শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে যে পরিমাণ অর্থ পায় তাহাকে আর্থিক মজুরি (Money or Nominal wages) বলা হয়। আর্থিক মজুরি সমান হইলেই যে প্রকৃত মজুরি সমান হইবে তাহা নয়। আনুষঙ্গিক বহুবিধ সুবিধা ও অসুবিধা থাকিতে পারে। প্রকৃত মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে এই সুবিধা অসুবিধাগুলির দিকেও নজর দিতে হইবে। অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মূলে আছে অভাবপূরণের তাগিদ। সেইজন্য শ্রমিক শ্রম করিতে রাজী হয়। অভাবপূরণের ব্যাপারে শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে নীট সুবিধা (net advantages) ভোগ করে। তাহাই প্রকৃত মজুরি। প্রকৃত মজুরি বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।

টাকাকড়ি বিনিময়ের মাধ্যম। টাকাকড়ির বিনিময়ে অভাবপূরণের সামগ্রী ও সেবা পাওয়া যায় বলিয়াই লোক অর্থের দাস হয়। মূল্যস্তর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মূল্যের পরিবর্তন হয়। ১৯৩৯ সালে যাহার আর্থিক মজুরি ১০০৲ ছিল, সে হয়ত আজ ৪০০৲ পায়; আর্থিক মজুরি বাড়িলেও তাহার প্রকৃত মজুরি কিন্তু কমিয়া গিয়াছে। এখনকার ৪০০৲র সাধারণ ক্রয়মূল্য ১৯৩৯ সালের ১০০৲র ক্রয়মূল্য অপেক্ষা কম।

অর্থের ক্রয়ক্ষমতা পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকৃত মজুরি পরিবর্তিত হয়।

শ্রমের বিনিময়ে অন্যান্য সুবিধা পাইলে তাহাও হিসাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। কৃষিশ্রমিককে টাকা ছাড়া বিনামূল্যে খাবার ও কিছু পোষাক পরিচ্ছদ দেওয়ার রেওয়াজ আছে। কয়লাখনিতে যাহারা কাজ করে তাহারা বিনামূল্যে কয়লা পায়। পেন্সন, বেতনসহ ছুটি, বিনা ভাড়ায় বা নামমাত্র ভাড়ায় বাসগৃহ, বিনাখরচে ভ্রমণ ইত্যাদি সুবিধাগুলি অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না।

আনুষঙ্গিক সুবিধা

কাজ নিয়মিত কি অনিয়মিত তাহাও দেখিতে হইবে। কোন কোন কাজ কেবলমাত্র মরসুমের সময় হয়, যেমন রাজমিস্ত্রির কাজ বা ফসলকাটার কাজ। আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা জেলেদের মাছধরার কাজও অনিশ্চিত করিয়া তুলে। এই ধরণের কাজে আর্থিক মজুরি যতটা বেশী দেখায়, প্রকৃত মজুরি তাহা অপেক্ষা কম।

অনিয়মিত কাজে প্রকৃত মজুরি কম

মাসমাহিয়ানা বাদে অবসর সময়ে অতিরিক্ত রোজগারের সম্ভাবনা আছে কিনা দেখা দরকার। শিক্ষক অবসর সময়ে ছাত্র পড়াইতে পারেন, হিসাবরক্ষক (accountant) চুক্তির কাজ করিতে পারেন, ড্রাফ্‌টসম্যান প্ল্যান আঁকিয়া রোজগার করিতে পারেন। অনেক কাজেই এই সুবিধা নাই।

বাড়তি রোজগারের সম্ভাবনা

দিন কতঘণ্টা বা বৎসরে কতদিন কাজ করিতে হয় তাহাও দেখা দরকার। একই কোম্পানীতে কেরাণীর চেয়ে দক্ষমিস্ত্রির আর্থিক মজুরি অধিক হইতে পারে। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার কেরাণী মিস্ত্রী অপেক্ষা কম সময় কাজ করে।

কত সময় কাজ করিতে হয়

কোন কোন কাজে দৈহিক ক্লান্তি অধিক মাত্রায় হওয়ায় কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়। রেলগাড়ীর ইঞ্জিনচালককে প্রখর গ্রীষ্ম ও প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে গাড়ী চালাইতে হয়। ফলে তাহাকে অনেক আগেই অবসর গ্রহণ করিতে হয়। আবার অনেক কাজে, যেমন সীসার কাজে, স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়—অনেক সময় অকেজো অবস্থায় থাকিতে হয়। একজন ইঞ্জিনচালক বাৎসরিক ৬০০০ পায়। ২০ বৎসরে সে পায় ৬০০০×২০ টাকা। অন্য কাজ করিলে সে হয়ত ৩০ বৎসর খাটিতে পারিত। সেক্ষেত্রে তাহার প্রকৃত বাৎসরিক মজুরি দাঁড়াইবে $\frac{৬০০০\times২০}{৩০}$ টাকা = ৪০০০ টাকা মাত্র।

আয়ুক্ষয় বা স্বাস্থ্যহানি হয় কিনা

মজুরির পার্থক্যের কারণ (Causes of wage differences): আর্থিক মজুরির পার্থক্য থাকিলেই যে প্রকৃত মজুরির পার্থক্য হইবে তাহা নয়। এ্যাডাম স্মিথ এই প্রসঙ্গে কসাই ও রুটিওয়ালার তুলনা করিয়াছেন। কসাইকে অস্বস্তিকর পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে হয়। সে হিসাবে রুটিওয়ালার পরিবেশ অনেক বেশী স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিপ্রদ। এক্ষেত্রে দুইজনের আর্থিক মজুরি সমান হইলেই প্রকৃত মজুরির পার্থক্য হইত। প্রকৃত মজুরির সমতা বজায় রাখার জন্যই এস্থলে কসাইয়ের আর্থিক মজুরি অধিক হওয়া প্রয়োজন। আর্থিক মজুরির এই ধরণের পার্থক্য প্রকৃত মজুরির পার্থক্য সূচনা করে না।

প্রকৃত মজুরির সমতা রাখার জন্য সময় সময় আর্থিক মজুরি অধিক হয়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিন্তু আর্থিক মজুরির পার্থক্য প্রকৃত মজুরির পার্থক্যেরও ইঙ্গিত দেয়। তাহা না হইলে জমাদারের বেতন বড়বাবুর বেতন অপেক্ষা অধিক হইত। বড়বাবু পাখার তলায় আরামে কাজ করেন। জমাদারকে নোংরা ঘাটিতে হয়। প্রকৃত মজুরি সমান হইতে হইলে, জমাদারের আর্থিক মজুরি অধিক হওয়া দরকার ছিল। অধিক হওয়া দূরে থাক, জমাদারের আর্থিক মজুরি

বস্তুতঃ অনেক কম। সমাজের পক্ষে উকিল মোক্তার চিকিৎসক বা স্থপতি যে সংখ্যক প্রয়োজন, ড়কশ্রমিক বা মুটের প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যায়। ডকশ্রমিকের কাজ চিকিৎসক বা উকিলের কাজ অপেক্ষা অনেক বেশী ক্লান্তিজনক ও অপ্রীতিকর। তাহা সত্ত্বেও চিকিৎসক বা উকিলের রোজগার ডকশ্রমিকের রোজগার অপেক্ষা অনেক অধিক। শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতা (perfect mobility) থাকিলে ডকশ্রমিকেরা দলে দলে চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়া চিকিৎসক হইত। ডকশ্রমিকের যোগান কমিয়া মজুরি বাড়িতে থাকিত। চিকিৎসকের যোগান বাড়িয়া মজুরি কমিতে থাকিত। প্রকৃত মজুরির সমতা না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যাপার চলিতে থাকিত। ডকশ্রমিকের কাজ অধিক অপ্রীতিকর। তাহার ক্ষতিপূরণ-হিসাবে আর্থিক মজুরি বেশী হইত। ডকশ্রমিকের আর্থিক (সুতরাং প্রকৃত) মজুরি কম হওয়ায় শ্রমিকের অবাধগতিশীলতা নাই ইহাই প্রমাণিত হয়। মজুরির পার্থক্য বুঝিতে হইলে গতিশীলতার অভাব কেন হয় জানিতে হইবে।

পরিবার স্থানান্তর করিতে যথেষ্ট খরচ হয়। ইহা ছাড়া নূতন জায়গায় বাসস্থান যোগাড় করার সমস্যাও আছে। যোগানের আধিক্য ঘটিয়া মজুরি কমিলেও শ্রমিক এই সকল অসুবিধার জন্য অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক হয়। ফলে যোগানের আধিক্য ও মজুরির স্বল্পতা থাকিয়া যায়। দীর্ঘকালীন মেয়াদে অবশ্য এই যুক্তি চলিবে না। কিংবা শিল্পগত গতিশীলতার ব্যাপারেও এই ব্যাখ্যা চলিবে না। বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে শ্রমিকদের গতিশীলতার অভাব—দীর্ঘকালীন মেয়াদেও—একেবারে দূর হয় না। শ্রমিকেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে (grades) বিভক্ত। এই সকল শ্রেণীর প্রতিযোগিতা একেবারে নাই বলা চলে না। তবে প্রতিযোগিতার মাত্রা অতি নগন্য (non-competing groups)। আইন বা চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করিতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্যয়বহুল শিক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। দিনমজুর বা চাপরাশীর এই 'প্রবেশমূল্য' (cost of entry) দিবার ক্ষমতা নাই। সন্তানের বৃত্তি বাছিয়া দিবার স্বাধীনতা দরিদ্র পিতামাতার নাই। পরিবেশ ও প্রথার প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য পুরুষানুক্রমে লোককে একই বৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকিতে দেখা যায়। ফলে নিম্নমজুরির বৃত্তিগুলিতে চাহিদা বেশী হওয়া সত্ত্বেও মজুরি কমই থাকিয়া যায়। কারণ গতিশীলতার অভাবে যোগান চাহিদার তুলনায় অধিক থাকিয়া যাওয়ায় প্রান্তিক উৎপাদনও কম থাকে। ফলে মজুরিও কম থাকে। উচ্চমজুরির বৃত্তিগুলিতে যোগান বাড়িবার অসুবিধা থাকায়, প্রান্তিক উৎপাদন ও মজুরি বেশী থাকিয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে নিখুঁত গতিশীলতা থাকিলে কি সকলের মজুরি অভিন্ন হইত? ইহার উত্তর হইবে 'না'। হাতের পাঁচ আঙুল সমান হয় না। সকল লোকের দক্ষতা সমান নয়। লোকের সঙ্গে লোকের তফাত কিছুটা জন্মগত (inborn) আর কিছুটা অর্জিত (acquired)। কোকিল শাবক কাকের বাসায় প্রতিপালিত হইলেও কুহুধ্বনি করিবে। কবিত্বশক্তি, কণ্ঠস্বর ও বিশেষ ধরণের প্রতিভা জন্মগত। প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা না থাকিলে হাজার চেষ্টা করিয়াও তানসেন হওয়া সম্ভব নয়। জন্মের পর পরিবেশের (environment) পার্থক্য জনিত তফাত শিক্ষার সাহায্যে দূর করা সম্ভব। কিন্তু জন্মগত পার্থক্য দূর করিবার কোন পথ আমরা এখনও জানি না। জন্মগত পার্থক্যের ফলে মজুরির পার্থক্য দূর করা যায় না। বর্তমান মজুরির যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহার কিছুটা জন্মগত পার্থক্যের জন্য এবং কিছুটা অর্জিত পার্থক্যের জন্য। মজুরির পার্থক্যের কতখানি কোন্ পার্থক্যের জন্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। সন্দেহ হয় অনেকখানিই অর্জিত পার্থক্যের ফল। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত অসম ভাবে বণ্টিত। সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা (opportunities) পাইলে তাহার পরও মজুরির পার্থক্য যতখানি থাকিবে তাহার জন্য নিঃসন্দেহে জন্মগত পার্থক্য দায়ী হইবে। জন্মগত পার্থক্য কতখান তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই সুযোগ সুবিধা সমান করিয়া গতিশীলতার বাধা দূর করা দরকার। সেইজন্য নেপোলিয়ন বলিয়াছিলেন—প্রতিভার অগ্রগতির পথ খুলিয়া দাও। তারপরও যে পার্থক্য থাকিবে তাহার জন্য কেহ সমাজব্যবস্থাকে দায়ী করিতে পারিবে না। জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষও ধূমায়িত হইবে না।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. How is the rate of wages determined—by the Standard of Living or by Marginal Productivity?
   মজুরির হার কিরূপে নির্ধারিত হয়—জীবনযাত্রার মান অথবা প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা? [পৃষ্ঠা ৩১৫-১৮]

2. How can Trade Unions influence wages?
   মজুরির হার বাড়াইবার ব্যাপারে শ্রমিক সঙ্ঘ কি করিতে পারে? [পৃষ্ঠা ৩১৮-২০]

3. Distinguish between Money wages and Real wages.
   আর্থিক মজুরি ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ৩২০-২১]

4. Why do wages vary in different occupations?
   বিভিন্ন বৃত্তিতে মজুরির হার বিভিন্ন হয় কেন? [পৃষ্ঠা ৩২১-৩২৩]

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সুদ

(Interest)

টাকাকড়ি ধার করিলে, আসল টাকা ফেরৎ দিলেই চলে না। আসল বাদেও কিছু দিতে হয়। এই অতিরিক্ত কিছুকেই আমরা সাধারণভাষায় সুদ বলি। সুদ শতকরা হারে হিসাব করা হয়। অর্থের বিনিময়ে জিনিষপত্র পাওয়া যায়। সেইজন্যই লোক টাকাকড়ি ধার করে। ধারের টাকা দিয়া সরাসরি ভোগ্যদ্রব্য কেনা যায়। কাচামাল যন্ত্রপাতি ঘরবাড়ী ইত্যাদি ক্রয় বা নির্মাণ করিবার জন্য বেশীর ভাগ ধারের টাকা খরচ করা হয়। উৎপাদনের জন্য মূলধনদ্রব্য দরকার। সঞ্চয় না হইলে মূলধনদ্রব্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। নিজস্ব সঞ্চয়ের আশায় থাকিলে পরোক্ষ উৎপাদন কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। টাকাকড়ি ধার করিয়া সংগঠক অন্যের সঞ্চয় কাজে লাগাইবার সুযোগ পায়। মূলধন বা সঞ্চয় ব্যবহার করার জন্য যে দাম দিতে হয় তাহাকে সুদ বলে।

ঋণদাতা ভিন্ন হইলেও তাহাদের টাকার ক্রয়মূল্য ভিন্ন নয়। ঋণগ্রহীতা ঋণ লয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য। সুতরাং ধার কে দিতেছে ঋণগ্রহীতার তাহা দেখিবার দরকার নাই। আবার ঋণদাতার ঋণগ্রহীতা কে তাহা লইয়া ব্যস্ত হইবার কারণ নাই। কারণ সমপরিমাণ ঋণ দিতে হইলে ঋণদাতাকে সমপরিমাণ সঞ্চয় করিতে হইবে। টাকাকড়ির জাতিভেদ নাই। সেই হিসাবে সুদের হার সর্বত্র সমান হওয়া দরকার ছিল। অথচ আমরা জানি সুদের হার কার্যতঃ কখনও এক হয় না।

মোট সুদ ও নীট সুদ (Gross Interest and Net Interest) : সুদের হারের পার্থক্য কেন হয় বুঝিতে হইলে মোট সুদ ও নীট সুদের পার্থক্য জানিতে হইবে। কেবলমাত্র মূলধন ব্যবহারের জন্য যে দাম দিতে হয় তাহাকে নীট সুদ বলা হয়। সুদ বলিয়া যাহা অভিহিত হয় তাহার মধ্যে অন্যান্য উপাদানের দামও মিশ্রিত থাকে। ইহাকে অর্থশাস্ত্রে মোট সুদ বলে। ইহার মধ্যে নীট সুদ বাদে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকিতে পারে।

পরের হাতে ধন নিজের হাতে না আসা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। ঋণগ্রহীতা অসাধু হইতে পারে। অনভিজ্ঞতা, অকর্মণ্য বা আকস্মিক

বিপদ আপদের ফলে ব্যবসায়ে লোকসান হইতে পারে। সদিচ্ছা থাকিলেও তখন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব না হইতে পারে। সুদ দূরে থাকুক আসল টাকা ডুবিয়া যাইতে পারে। এই ঝুঁকি বহনের জন্য ঋণগ্রহীতা স্বভাবতঃই নীট সুদের অতিরিক্ত কিছু দাবি করিবে। ইহা না পাইলে সে যেখানে ঝুঁকি নাই বা খুব কম ঝুঁকি আছে—কেবলমাত্র সেখানেই ঋণ দিবে।

(১) ঝুঁকিবহনের পারিশ্রমিক

যে কোন পরিমাণে টাকা ধার দিতে পারিলে এবং ইচ্ছামত টাকা ফেরৎ পাইতে পারিলে ঋণদাতার খুব সুবিধা হয়। সুবিধাজনক সর্তে লগ্নী করিবার সুযোগ সবসময় মিলে না। ঋণগ্রহীতা হঠাৎ দেনা শোধ করিয়া বসিলে ঋণদাতার অসুবিধা হইতে পারে। কারণ তখন তাহার হাতে বিকল্প লগ্নীব্যবস্থা না থাকিতে পারে। আবার দীর্ঘ সময় টাকা আটকাইয়া গেলেও অসুবিধা হইতে পারে। হাতে টাকা না থাকিলে লগ্নী করিবার সুবর্ণ সুযোগও আঙুলফল টক বলিয়া ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই অসুবিধার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ঋণদাতাকে কিছু দিতে হয়।

(২) অসুবিধার ক্ষতিপূরণ

টাকা ধার দিয়া টাকা আদায়ের জন্য নানারকম ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয়। অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক কিস্তিতে দেনা শোধ করা হয়। ইহার হিসাব রাখা রীতিমত বিরক্তিকর ব্যাপার। কিস্তি আদায়ের জন্য তাগাদা দেওয়া কম ঝামেলার নয়। ইহার জন্য আর্থিক ও কায়িক ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। দেনাদারের হাড়ির খবর জানিবার জন্যও কম মেহনৎ করিতে হয় না। লগ্নীর তদারক করিতে গিয়া নানারকম খাটুনি হয়। ইহার জন্যও ঋণদাতাকে কিছু দিতে হয়।

(৩) শ্রমের মজুরি

সুদের হারের পার্থক্যের কারণ (Reasons for the existence of differing rates of Interest): পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে একটিমাত্র দামে জিনিষের কেনাবেচা হয়। ঋণের বাজারেও যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অনেক হইত এবং লেনদেনের ব্যাপারগুলি আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ে হুবহু এক হইত, তাহা হইলে একাধিক সুদের হার থাকিতে পারিত না। লেনদেনের ব্যাপারগুলি বস্তুতঃ এক রকম নয়। ঝুঁকিবহন, অসুবিধা ও খাটুনির দিক দিয়া যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। জিনিষ পৃথকীভূত হইলে বিভিন্ন দাম হইবে তাহা আমরা আগেই দেখিয়াছি। অন্য ভাবে বলা যায় সুদের হারের পার্থক্য মানে মোট সুদের পার্থক্য। নীট সুদের পার্থক্য ইহা দ্বারা সূচিত হয় না। নীট সুদের সমতা বজায় রাখার জন্যই পার্থক্যের প্রয়োজন আছে।

আসল টাকা ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা সকল ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর আছে। এই অনিশ্চয়তা যেখানে যত বেশী, সুদের হারও সেখান তত অধিক হইবে। বাজারে যাহার অসাধু বলিয়া দুর্ণাম আছে কিংবা যাহার চালচুলা নাই—তাহাকে ধার দিবার ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। উচ্চহারে সুদের লোভ না দেখাইলে কেহ ইহাদের ধার দিবে না। অপরপক্ষে বাজারে যাহাদের সুনাম আছে বা উপযুক্ত জামিন দিবার ক্ষমতা আছে তাহারা অল্পসুদেই ধার পায়। যে সকল অনুন্নত দেশে, রাজনৈতিক অবস্থার ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হয়—সেই সকল দেশে অল্পহারে ধার পাওয়া যায় না। জাতীয়করণ ও বিনা খেসারতে বাজেয়াপ্ত করার ভয়ে ঋণদাতারা সন্ত্রস্ত থাকে। উচ্চহারে সুদ দিবার অঙ্গীকার না করিলে ইহারা ধার দেয় না।

অফিস এলাকায় কাবুলিওয়ালাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। দেনাদার ছুটি লইতে পারে। কাবুলিওয়ালা কিন্তু রৌদ্র এবং বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া হাজিরা দেয়। দরকার হইলে ট্যাক্সি ও ট্রেনে দেনাদারের পিছনে ধাওয়া করে। টাকা আদায়ের জন্য তাহাকে অশেষ ঝকমারি করিতে হয়। সেইজন্য তাহার সুদের হার বেশী হয়।

বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সহজ সম্পর্ক না থাকিলে বাজারের বিভিন্ন অংশে লেনদেনের হার সম্বন্ধে জানাজানি হইবে না। ফলে এক এক অংশে এক এক দরে লেনদেন হইতে পারে। আবার জানাজানি হইলেও গতিশীলতার অভাবে বিভিন্ন দর চালু থাকিতে পারে। মূলধনের বাজারেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে। মফঃস্বলে সুদের হার সহরাঞ্চল অপেক্ষা বেশী। মফঃস্বলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রসারলাভ করে নাই। এখানে ঋণের যোগান কম। সহরাঞ্চলের ঋণদাতারা মফঃস্বলের খোঁজ খবর রাখে না। যাহারা জানে, তাহারাও অপরিচিত জায়গায় লগ্নী করিতে চায় না। ফলে সুদের হারের পার্থক্য থাকিয়া যায়।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদের হার সাধারণতঃ স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হার অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। সময় যত দীর্ঘ হইবে বাজারের অবস্থার আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনাও তত বেশী হইবে। অনিশ্চয়তা তত বাড়িবে। সরকারী ঋণপত্রের ব্যাপারে সুদ ও আসল ফেরৎ না পাইবার আশঙ্কা নাই বলিলেই চলে। কিন্তু সময় যত বেশী হইবে ঋণপত্রের বাজার দাম কমিয়া যাইবার ভয়ও তত অধিক হইবে। মূল্যস্তর বাড়িলে সুদ ও আসলের ক্রয়মূল্য কমিয়া যাইতে পারে। এই অসুবিধা ও অনিশ্চয়তার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদের হার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়।

সরকার ঋণ লইলে টাকা মারা যাইবার ঝুঁকি থাকে না বলিলেই চলে। সরকারী ঋণপত্র দরকারমত বিক্রয় করিয়া নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায়। এই টাকা

আদায়ের জন্য কোন ঝামেলা সহ্য করিতে হয় না। সেইজন্য সরকারী ঋণের সুদের হার সর্বাপেক্ষা কম হয়।

কৃষিঋণের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে সুদ দিতে হয়। গ্রামে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অত্যন্ত অনগ্রসর। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক মোটে নাই। সরকার ও সমবায় সমিতির মারফৎ প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। ঋণের যোগান কম হওয়ায় সুদের হার বাড়িয়া যায়। সহরাঞ্চলের লোক ও প্রতিষ্ঠান গ্রামে লগ্নী করিতে ইচ্ছুক নয়। চড়া সুদের হার সত্ত্বেও ঋণের যোগান বাড়ে না। ফলে সুদের হারও কমে না। কৃষকের সম্বল চাষের জমি ও যন্ত্রপাতি। টাকা আদায়ের জন্য এগুলি ক্রোক করার উপায় নাই। কৃষকের অন্য জামিন রাখিবার সঙ্গতি নাই। অনিশ্চয়তা সেজন্য বেশী। টাকা আদায়ের কষ্টও কম নয়। কিস্তবন্দী ডিক্রী হইলে ত' কথাই নাই। কিস্তি খেলাপ লাগিয়াই থাকিবে। আদালতে অনবরত হাঁটাহাঁটি করিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে সুদ না দিলে কৃষক আদৌ ঋণ পাইবে না।

সংগঠিত শিল্প অপেক্ষাকৃত কম সুদে ধার পাওয়া যায়। এই সব শিল্পে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি জামিন রাখিবার সুবিধা আছে। ইহাদের আয়ের স্থিরতাও বেশী। ঋণের বাজারের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এই সমস্ত কারণে ইহারা অল্পসুদে ধার পায়। ক্ষুদ্র শিল্পের এত সুবিধা নাই। ফলে ইহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক সুদ দিতে হয়।

টাকা আদায়ের বিন্দুমাত্র অনিশ্চয়তা না থাকিলেও সুদের হার অনেক সময় বেশী হয়। বন্ধকী কারবারে অতি উচ্চহারে সুদ দিতে হয়। সোনাদানা বন্ধক রাখিয়া ইহারা ধার দেয়। এখানে নিরাপত্তার মোটেই অভাব নাই। বন্ধকী দ্রব্যের যাহা দাম—ঋণ দেওয়া হয় তাহার চেয়ে অনেক কম। ধার ফেরৎ না পাইলে, বন্ধকী সোনা বিক্রয় করিয়া অনায়াসে টাকা উদ্ধার করা যায়। তথাপি এখানে চড়া সুদ দিতে হয়। বন্ধকী কারবার সকলে করিতে চায় না। ঋণগ্রহীতা গোপনে ঋণ লইতে চায়। বাজারে প্রকাশ্যভাবে যাচাই করিয়া ধার যোগাড় করিবার সাহস তাহার নাই। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কেহ এই ধরণের ধার করে না। দরখাস্ত করিয়া অপেক্ষা করিবার সময় থাকে না। ঋণগ্রহীতা বন্ধক রাখার সঙ্গে সঙ্গে টাকা চায়। এই বিশেষ সুবিধার জন্য তাহাকে উচ্চহারে সুদ দিতে হয়। কৃষকের ক্ষেত্রেও এই ধরণের ব্যাপার দেখা যায়। সরকার কিংবা সমবায় সমিতির নিকট হইতে ঋণ পাইবার ঝঞ্ঝাট খুব বেশী। দরখাস্ত করিতে, জামিনদার যোগাড় করিতে ও অফিসে ঘুরিতে বহু সময় নষ্ট হয়। যে প্রয়োজনে ঋণের দরখাস্ত

করা হইয়াছিল, সেই প্রয়োজন আর থাকে না। ডাক্তার আসিতে আসিতে রোগীর অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠে। মহাজনকে সব সময় হাতের কাছে পাওয়া যায়। যখন দরকার তখনই মহাজনের নিকট হইতে ধার করা যায়। এই বিশেষ সুবিধার জন্য বিশেষ দাম দিতে হয়। সুদের হার অপেক্ষাকৃত অধিক হয়।

সুদের হার কিরূপে নিরূপিত হয় (How the rate of Interest is determined): টাকাকড়ির বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য যে কোন জিনিষ কেনা যায়। টাকাকড়ি ধার দিলে উত্তমর্ণের সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা অধমর্ণের উপর সাময়িকভাবে বর্তায়। অধমর্ণ তখনকার মত অন্যের জিনিষ ব্যবহার করিতে পারে। ইহার জন্য তাহাকে সুদ দিতে হয়। আগেকার দিনে ভোগ্যপণ্য কিনিবার জন্য (consumption loan) লোক ধার করিত। আজকাল বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধার করা হয় উৎপাদনের সুবিধার জন্য (production)। বর্তমান যুগের উৎপাদন সময় সাপেক্ষ (time consuming)। কাঁচামাল কিনিতে, শ্রমিকের মজুরি দিতে ও কারখানাসমূহ নির্মাণ করিতে অর্থব্যয় করিতে হইবে। সম্পূর্ণ (finished) সামগ্রী বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থ ফিরিয়া পাইতে সময় লাগিবে। এই ধরণের উৎপাদন সম্ভব করিতে হইলে উৎপাদককে সঞ্চয় করিতে হইবে অথবা অন্য কাহাকেও সঞ্চয় করিবার ব্যাপারে প্রণোদিত করিতে হইবে। উৎপাদকের নিজের সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করা যায় না। সাত মণ তেলও পুড়িবে না রাধাও নাচিবে না। অন্যের সঞ্চয় বা প্রতীক্ষার (waiting) সুযোগ না পাইলে উৎপাদক লাভ করিতে পারিত না। সঞ্চয় বা প্রতীক্ষা উৎপাদনশীল কাজে লাগান যায় বলিয়াই উৎপাদক সুদ প্রদান করিতে প্রস্তুত থাকে।

ঋণগ্রহীতা কেন সুদ দিতে বাধ্য থাকে

সঞ্চয় বা মূলধন ব্যবহারের ফলে ধনোৎপাদন বৃদ্ধি পায়—একথা উত্তমর্ণ জানে; ধার না দিলে সে নিজেই হয়ত ইহা উৎপাদনশীল কাজে লাগাইতে পারিত। তাহার ধনসম্পদ বৃদ্ধি পাইত। তা ছাড়া ধার না দিলে উত্তমর্ণ এই টাকা দিয়া দরকার হইলে ভোগ্যপণ্য ক্রয় করিতে পারিত। ধার দিবার ফলে অবিলম্বে সন্তোষলাভের সুযোগ হইতে সে বঞ্চিত হইবে। এই দুই কারণে উত্তমর্ণ সুদ দাবি করে। সুদ না দিলে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় হইবে না এবং উৎপাদক প্রয়োজন অনুসারে ধার পাইবে না। ধনোৎপাদন বিঘ্নিত হইবে। উৎপাদনের কাজে মূলধন লাগাইবার সুবিধার দাম হিসাবে সুদ দিতে হয়। অন্য জিনিষের দামের ন্যায় সুদ বা মূলধন ব্যবহারের দামও চাহিদা এবং যোগানের উপর নির্ভর করে।

ঋণদাতা কেন সুদ চায়

ঋণের বা মূলধনের চাহিদা (Demand for Loanable Funds or Capital) : ভোগী বর্তমান ভোগের জন্য ধার চায়। সরকারও নানা কারণে ধার লইতে পারে। সঞ্চয় বা ধারের প্রধান খরিদ্দার হইল নিয়োগকর্তা। কোন জিনিষ যত দূরে সরিয়া যায় তত ক্ষুদ্র দেখায়। আজকাল অভাব ভবিষ্যতের অভাবের তুলনায় অধিক তীব্র মনে হয়। ভোগীর নিকট বর্তমান আয় বর্তমান অভাব মিটাইবার পক্ষে নিতান্ত অপ্রতুল মনে হয়। ভবিষ্যৎ অভাবের তাড়না বর্তমানে অনেক কম। সেজন্য ভোগী ধার করিয়া বর্তমান অভাব মিটাইতে চায়। যতই বেশী ধার করা হইবে, বর্তমান অভাবের তীব্রতা তত কমিবে, কিন্তু ভবিষ্যতের আয় তত বন্ধক পড়িবে। ভবিষ্যতে অভাব মিটাইবার ক্ষমতা কমিতে থাকে। ভবিষ্যৎ অভাবের তীব্রতা বাড়িতে থাকিবে। সুদের হার যত অধিক হইবে, ভবিষ্যৎ আয় তত অধিক দ্রুতবেগে কমিবে। ভবিষ্যৎ অভাবের তীব্রতা তত দ্রুত বৃদ্ধি পাইবে। ধার লইবার আগ্রহ তত শীঘ্র হ্রাস পাইবে। তাহা ছাড়া সকলের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সমান কম নয়। কেহ হয়ত ভবিষ্যতের ১০৫ টাকা বর্তমানের ১০০ টাকার সমান মনে করে। দ্বিতীয় এক ব্যক্তি যাহার দূরদৃষ্টি অধিক, ভবিষ্যতের ১০৪ টাকাকে বর্তমানের ১০০ টাকার সমান মনে করে। সুদের হার শতকরা ৫ টাকা হইলে প্রথম ব্যক্তি ধার লইবে। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি ধার লইতে ইচ্ছুক হইবে না। বরং সে ধার দিতে চাহিবে। বর্তমান ১০০ টাকা তাহার নিকট ভবিষ্যতের ১০৪ টাকার সমান। সুতরাং ধার দিলে সে ভবিষ্যতের ১০৪ টাকার বিনিময়ে ভবিষ্যতের ১০৫ টাকা পাইতেছে। সুতরাং তাহার পক্ষে ধার দিবার আগ্রহ হইবে। সাধারণভাবে বলা যায় সুদের হার যত বেশী হইবে, ভোগীর তরফ হইতে সঞ্চয় ধার লইবার চাহিদা তত কম হইবে।

ভোগীর চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের বিপরীত সম্পর্ক

সরকার ধার লইবার সময় সুদের হার কম কি বেশী তাহা লইয়া বিশেষ ভাবে না। যুদ্ধের সময় যে প্রকারে হোক টাকা চাই। ধার পাইলেই হইল। সুদের হার চড়া হইলেও তখন সরকার পশ্চাৎপদ হইবে না।

ধারের চাহিদা প্রধানতঃ আসে নিয়োগকর্তার তরফ হইতে। নিয়োগকর্তা টাকা ধার লইয়া নানারকম চলতি ও স্থায়ী মূলধনে তাহা লগ্নী করে। তাহার উৎপাদনক্ষমতা ইহার ফলে বাড়ে। মূলধন অধিক বিনিয়োগ হইলে এক সময় ক্রমহ্রাসমান বিধি কার্যকরী হইবে। প্রথম ১০০ টাকা খাটাইয়া হয়ত ১০% লাভ হয়। দ্বিতীয় ১০০ টাকা খাটাইয়া হয়ত ৯% লাভ হয়। তৃতীয় দফায় ১০০ টাকা খাটাইয়া লাভ হয় ৮%। সুদের হার ৯%

মূলধনের পরিমাণ বাড়িলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে। সুতরাং নিয়োগকর্তার চাহিদার সঙ্গেও সুদের হারের বিপরীত সম্পর্ক।

হইলে তৃতীয় ১০০ টাকা ধার লইলে নিয়োগকর্তার লোকসান হইবে। নিয়োগকর্তার চাহিদা ২০০ টাকার অধিক হইতে পারে না। সুদের হার ৮% হইলে তৃতীয় ১০০ টাকাও ধার লওয়া যাইতে পারে। নিয়োগকর্তার চাহিদা হইবে ৩০০ টাকা। নিয়োগকর্তার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা চলে সুদের হার বাড়িলে তাহার চাহিদা কমিবে। সঞ্চয়ের চাহিদা বেশীর ভাগ আসে নিয়োগকর্তার তরফ হইতে। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় **সুদের হার যত বাড়িবে, সঞ্চয়ের চাহিদাও তত কমিবে এবং সুদের হার যত কমিবে সঞ্চয়ের চাহিদাও তত বাড়িবে।**

সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়ে

সুদের হার বাড়িলে লোকের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা বেশী হইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। ধরা যাক ভবিষ্যতে বার্ষিক ১০০৲ পাওয়ার প্রয়োজনে আমি সঞ্চয় করিতে চাই। সুদের হার ৫% থাকিবে মনে করিলে আমি ২০০০৲ সঞ্চয় করিব। সুদের হার ৪% থাকিবে মনে করিলে আমাকে সঞ্চয় করিতে হইবে ২৫০০৲। এক্ষেত্রে সুদের হার কমিলে সঞ্চয়ের প্রয়োজন বাড়িতেছে। সাধারণতঃ সুদের হার বাড়িলে সঞ্চয়ের ইচ্ছাও বাড়িবে।

কিন্তু মোট সঞ্চয় না বাড়িতে পারে

কিন্তু ব্যক্তির সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িলেই যে মোট সঞ্চয় বাড়িবে এরূপ নহে। সঞ্চয় বেশী করিতে হইলে আমাকে ব্যয় কমাইতে হইবে। তাহা হইলে অন্য কাহারও আয় কমিবে ও সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা কমিবে। সঞ্চয় বাড়াইবার উদ্দেশ্যে আমি ধুতি ৩ জোড়ার পরিবর্তে ২ জোড়া কেনা শুরু করিলাম। দোকানদারের ঘরে ধুতি অবিক্রীত থাকিবে। দোকানদার পাইকার হইতে কেনা কমাইয়া দিবে। পাইকার বস্ত্র উৎপাদককে কম করিয়া অর্ডার দিবে। ফলে নিয়োগ কমিবে; অন্য কাহারও আয় কমিবে এবং সঙ্গে সঞ্চয়ের ক্ষমতাও কমিবে। মোট সঞ্চয় না বাড়িতে পারে।

মোট সঞ্চয় বাড়িলেও ঋণের যোগান না বাড়িতে পারে

আবার সঞ্চয় বেশী হইলেই যে ঋণের যোগান বাড়িবে তাহা নয়। টাকাকড়ির মস্ত সুবিধা হইল ইহা যে কোন সময় যে কোন জিনিষ কেনার ব্যাপারে লাগান যাইতে পারে। সাধারণ গ্রহণ-যোগ্যতা মানে সাধারণ ক্রয়ক্ষমতা। ধার দিলে ঋণপত্র পাওয়া যাইবে। ঋণের সুদও পাওয়া যাইবে। ধার চাহিবামাত্র ফেরৎ পাওয়া যায় না। ঋণ দিবার পর অন্য সুযোগ উপস্থিত হইলেও ঋণপত্র দিয়া সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা যায় না। কোন জিনিষ অতি সস্তায় পাওয়া গেলেও আপশোষ করা ছাড়া উপায় নাই। মারোয়াড়ীরা সেইজন্য পাগড়ীর মধ্যে নগদ টাকা রাখে। নগদ

নগদ টাকা কেন লোক পছন্দ করে

টাকা হাতে রাখিবার অন্য কারণও আছে। হঠাৎ আপদবিপদ হইতে পারে। সেজন্যও কিছু নগদ টাকা দরকার। আয় কিছু সময় বাদে বাদে—যেমন সপ্তাহান্তে বা মাসান্তে হয়। ব্যয় কিন্তু প্রতিদিনই লাগিয়া আছে। সেজন্যও হাতে নগদ টাকা রাখিবার প্রয়োজন হয়। এই সকল বিভিন্ন কারণে লোকে হাতে নগদ টাকা রাখা পছন্দ করে (Liquidity preference)। নগদ টাকা রাখার অসুবিধাও আছে। ঋণ দিলে সুদ পাওয়া যায়। নগদ টাকা রাখিলে সুদ পাওয়ার আশা ছাড়িতে হয়। সুদের হার যত অধিক হইবে, নগদ টাকা রাখার ব্যয় তত বাড়িবে। ঋণ দিবার প্রলোভন তত জোরদার হইবে। সাধারণভাবে বলা যায় সুদের হার বাড়িলে ঋণের যোগানও বাড়িবে।

নগদ টাকা পছন্দ। সুদের হার বাড়িলে ঋণের যোগান বাড়িবে

বিনা সুদে বা অতি অল্প সুদেও কিছু ঋণের যোগান হইতে পারে। কিন্তু ইহাতে নিয়োগকর্তাদের ঋণের চাহিদা মিটিবে না। ঋণের যোগান অল্প হইলে মূলধনে অধিক লগ্নী করা যাইবে না। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন অধিক থাকিয়া যাইবে। নিয়োগকর্তাদের মধ্যে ঋণ পাইবার জন্য কাড়াকাড়ি লাগিয়া থাকিবে। সুদের হার বাড়িবে। অনেকে আর নগদ টাকা রাখা পছন্দ করিবে না। ঋণের যোগান বাড়িবে। চাহিদাও কিছু কমিবে। যে সুদের হার চালু থাকিলে ঋণের চাহিদা ও যোগান সমান হয়, শেষ পর্যন্ত বাজারে সুদের হার তাহাই হইয়া দাঁড়াইবে।

ঋণের চাহিদা তালিকা		ঋণের যোগান তালিকা	
সুদের হার	ঋণের চাহিদা	সুদের হার	ঋণের যোগান
৫	৯,০০০	৫%	৭,০০০
৬%	৮,০০০	৬%	৮,০০০
৭%	৭,০০০	৭%	১০,০০০

ঋণের চাহিদা ও যোগানের অবস্থা যদি উপরিলিখিত তালিকানুযায়ী হয়, তাহা হইলে বাজারে শেষ পর্যন্ত ৬% সুদের হার চালু থাকিবে। সুদের হার ইহা অপেক্ষা কম হইলে চাহিদা যোগান হইতে অধিক হইবে। নিয়োগকর্তাদের মধ্যে ঋণ পাইবার প্রতিযোগিতার ফলে সুদের হার বাড়িবে। আবার সুদের হার ৬% হইতে হইলে যোগান চাহিদা হইতে বেশী হইয়া পড়িবে। লোকে নগদ টাকা যতটা হাতে রাখিতে চায়, হাতে রহিয়া যাইবে তাহা অপেক্ষা অধিক নগদ টাকা। লোকের ঋণপত্র ক্রয়ের আগ্রহ বাড়িবে। ফলে সুদের হার কমিবে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. Distinguish between Gross Interest and Net Interest.
মোট সুদ ও নীট সুদের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ৩২৪-৩২৫]

2. Why do rates of interest vary ?
বিভিন্ন সুদের হার কি করিয়া একই সময় চালু থাকিতে পারে বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৮]

3. Why does a borrower agree to pay interest ?
ঋণগ্রহীতা সুদ দিতে কেন প্রস্তুত থাকে ? [পৃষ্ঠা ৩২৮]

4. Why does a lender demand interest ?
ঋণদাতা সুদ কেন চায় ? [পৃষ্ঠা ৩২৮]

5. How is the rate of interest determined ?
সুদের হার কি করিয়া নির্ধারিত হয় ? [পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩০]

ষড়বিংশ অধ্যায়

মুনাফা
(Profit)

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা (Gross Profit and Net Profit) : কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে হইলে নানাবিধ উপাদান ক্রয় বা ভাড়া করিতে হয়। মজুর, কেরাণী ও ম্যানেজার নিয়োগ করিতে হইবে। কারখানাগৃহ ভাড়া লইতে হইবে। হয়ত বা জমি ইজারা লইবার প্রয়োজন হইবে। ব্যাঙ্ক হইতে ধার গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপাদানগুলির মালিকদিগকে চুক্তিমত দাম দিতে হইবে। উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থ পাওয়া যাইবে। বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থ হইতে সংগঠক ব্যতিরেকে অন্যান্য উপাদানের মালিকের প্রাপ্য মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাকে সাধারণ ভাষায় মুনাফা বলে। অর্থশাস্ত্রে ইহাকে বলা হয় মোট মুনাফা (gross profit)।

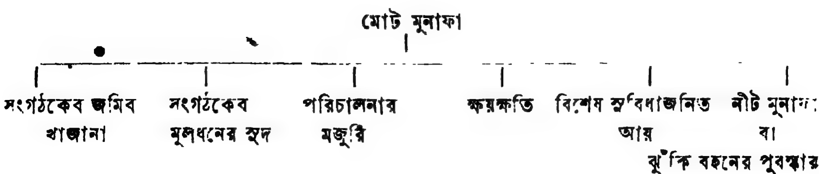
অনেক ক্ষেত্রে সংগঠকের নিজস্ব জমি এবং মূলধন থাকে। এই জমি অন্যকে ভাড়া দিলে খাজানা পাওয়া যাইত। সেইরূপ এই মূলধন অন্যত্র লগ্নী করিলে সুদ পাওয়া যাইত। সংগঠক নিজেই এই জমি ও মূলধনের মালিক। এই খাজানা ও সুদ বাহিরের কাহাকেও দিতে হয় না। সেজন্য এই খাজানা ও সুদ বাদ না দিয়াই মোট মুনাফা হিসাব করা হয়। এই খাজানা ও সুদ সংগঠকের প্রাপ্য বটে—কিন্তু সংগঠনের

জন্য নয়। জমি ও মূলধনের মালিক হিসাবে সংগঠক ইহা পান। সেইজন্য মোট মুনাফা হইতে এই অনুমিত খাজানা ও সুদ বাদ দিয়া নীট মুনাফার (net profit) হিসাব নিকাশ করিতে হয়।

মূলধনদ্রব্যের ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি (depreciation) আছে। ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য যথাবিহিত বরাদ্দ না করিলে ভবিষ্যতে উৎপাদন ব্যাহত হইবে। কলা-কৌশলের পরিবর্তনের ফলে অদ্যকার মূলধনদ্রব্য আগামীকাল অচল (obsolete) হইয়া যাইবে। এই খাতেও কিছু বরাদ্দ না করিলে কালের গতির সঙ্গে তাল রাখা অসম্ভব হইবে—প্রতিযোগিতায় সরিয়া আসিতে হইবে। ক্ষয়ক্ষতি এবং তদতিরিক্ত আর কিছু বাদ দিয়াই মুনাফা হিসাব করিতে হইবে।

কপিরাইট, পেটেণ্ট, ব্যবসায়ের সুনাম এবং আইনসিদ্ধ বা স্বাভাবিক একচেটিয়া অধিকার থাকার ফলে মোট মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এই সব বিশেষ সুবিধার (specil gains) বাজার দাম ধার্য করা (capitalisation) সম্ভব। এই জাতীয় সুযোগের বলে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাহাকে সুদের পর্যায়ে ধরাই সঙ্গত। নীট মুনাফা বাহির করিতে হইলে বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থ হইতে এই সুদ বাদ দিতে হইবে।

উপরি-উক্ত তিন খাতে বাদ দিবার পর মোট মুনাফার বাকী অংশ সংগঠকের পারিশ্রমিক বলিয়া ধরা যায়। পরিচালনা (Co-ordination and control) এবং ঝুঁকি বহন করা (Uncertainty bearing) সংগঠকের কাজের দুইটি গুরুত্ব-পূর্ণ দিক। সংগঠকের পারিশ্রমিক দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) পরিচালনার জন্য এবং (২) ঝুঁকি বহন করার জন্য প্রাপ্য অংশ। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদরা সংগঠক ও ধনিকের কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। সুদ ছাড়া আরও কিছু মোট মুনাফার মধ্যে থাকে—এ সত্যটুকু তাঁহাদের কিন্তু দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহার নাম তাঁহারা দিয়াছিলেন—পরিচালনার পুরস্কার (wages of superintendence and management)। এই পারিশ্রমিক বিশেষ ধরণের শ্রমের মজুরি হিসাবে ধরিলে ভুল হইবে না। এই অংশটুকুও মোট মুনাফা হইতে বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা সংগঠক ঝুঁকি বহন করার দরুণ পায়। আধুনিক অর্থশাস্ত্রবিদরা এই অবশিষ্টাংশকে নীট মুনাফা নামে অভিহিত করেন।



মুনাফার প্রকৃতি (Nature of Profit): উৎপাদন হয় বাজারে বিক্রয়ের আশায়। উৎপাদন সুরু করা ও উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিয়া অর্থলাভ করা—এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট সময়ের ব্যবধান থাকে। ভবিষ্যতে বাজারের অবস্থা কি হইবে তাহা আজ সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কাজে হাত দিতে হইবে। টাকাকড়ি খরচ করিয়া কাঁচামাল কিনিতে হইবে, শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইবে ইত্যাদি। যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইবে—উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া সেই পরিমাণ অর্থ নাও পাওয়া যাইতে পারে। বর্তমান যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রকৃতির মধ্যেই অনিশ্চয়তা নিহিত আছে। উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইলে কাহাকেও এই অনিশ্চয়তা বহন করিতে হইবে। জমি, শ্রমিক ও মূলধন হইতে যে ধরণের কাজ পাওয়া যায়, অনিশ্চয়তাবহন তাহা হইতে স্বতন্ত্র ধরণের কাজ। সেই হিসাবে ইহাকে উৎপাদনের চতুর্থ উপাদান হিসাবে ধরা যায়। সংগঠক উৎপাদনের অনিশ্চয়তা বহন করেন বলিয়াই নীট মুনাফা পান।

মুনাফা ও অন্যান্য উপাদানের আয় (Profit and other Factor Incomes): শ্রমিক, ধনিক এবং জমির মালিককে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তিমাফিক মজুরি, সুদ ও খাজানা দিতে হয়। ব্যবসার লাভ লোকসানের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ নাই। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে ইহাদের দাবি মিটাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সংগঠক পাইবেন। এই অবশিষ্টাংশ (Residue) বেশী অথবা কম হইতে পারে। আবার বাজার খুব খারাপ হইলে অবশিষ্ট কিছু না থাকিতেও পারে। এমন কি ঋণাত্মক অবশিষ্ট অর্থাৎ লোকসানও হইতে পারে। অন্যান্য উপাদানের আয় কখনও শূন্য বা ঋণাত্মক হইতে পারে না। পরিচালনার ব্যাপারে সকল সংগঠকের দক্ষতা সমান নয়। কোন কোন সংগঠক নিজগুণে ঝুঁকি হ্রাস করিতে পারেন। বাজারের গতিপ্রকৃতি অনুমানে কেহ অপেক্ষাকৃত অধিক দক্ষ। পরিচালনার পারিশ্রমিক এই সকল সংগঠকের স্বভাবতঃই বেশী। আবার কোন কোন সংগঠক পেটেন্ট বা একচেটিয়া সুবিধার অধিকারী। এই সমস্ত কারণে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফার বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। নীট মুনাফার পার্থক্য কিন্তু এত প্রকট নয়। দুইটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকের মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। প্রথমটির সংগঠক নিজের পকেট হইতে সম্পূর্ণ মূলধন যোগান দিয়াছেন। দ্বিতীয়টির সংগঠক ৫ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে ধার করিয়াছেন। প্রথমটির মোট মুনাফা দ্বিতীয়টির মোট মুনাফা অপেক্ষা অনেক বেশী হইতে পারে। তাই বলিয়া নীট মুনাফা প্রথমটার বেলায় বেশী না হইতে পারে। যে সমস্ত শিল্পে অনিশ্চয়তা অধিক, সেই সকল শিল্পে

নীট মুনাফাও বেশী হইবে। নতুন কোন শিল্পে ঝুঁকি বেশী। বিলাসদ্রব্যের চাহিদা সহজেই বদলায়—ফলে বিলাসদ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে ঝুঁকি বেশী হয়। এই ধরণের শিল্পে নীট মুনাফা অধিক না হইলে কোন সংগঠক এই সকল শিল্পে লাগিয়া থাকিবে না। একই শিল্পে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি কম বেশী হইতে পারে না। ইহাদের মুনাফার পার্থক্য বাস্তবিকপক্ষে মোট মুনাফার পার্থক্য। নীট মুনাফা সকল প্রতিষ্ঠানের সমান।

মুনাফা ও দাম (Profit and Price): সংগঠককে আগে অর্থব্যয় করিতে হয়। অর্থাগম হয় পরে। মুনাফার আশাতেই সংগঠক অর্থব্যয় করে। বাজারে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় হওয়ার পরে সংগঠক প্রকৃতপক্ষে (actually) কি পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিল বুঝা যাইবে। জিনিষ অধিক দামে বিকাইলে অর্জিত মুনাফা (realised profit) প্রত্যাশিত (anticipated) মুনাফা অপেক্ষা বেশী হইতে পারে। দাম পড়িয়া গেলে, অর্জিত মুনাফা কম হইতে পারে। অর্জিত মুনাফা দামের উপর নির্ভর করে। বাজার দাম অর্জিত মুনাফার উপর নির্ভর করে না।

অর্জিত মুনাফা বরাবর প্রত্যাশিত মুনাফা অপেক্ষা কম হইতে পারে না। অর্জিত মুনাফা বারবার কম হইলে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান কারবার গুটাইবে- ফলে যোগান কমিয়া দাম বাড়িবে এবং অর্জিত মুনাফা বৃদ্ধি পাইয়া প্রত্যাশিত মুনাফার নাগাল পাইবে। স্বল্পকালীন মেয়াদে প্রত্যাশিত মুনাফা না পাইলেও সংগঠক উৎপাদন চালাইয়া যাইতে পারে। দীর্ঘকালীন মেয়াদে মুনাফার প্রত্যাশা সফল না হইলে, সংগঠক আর ঝুঁকি বহন করিবে না। ফলে উৎপাদন কমিয়া দাম বাড়িতে থাকিবে। এই হিসাবে বলা যায় দাম প্রত্যাশিত মুনাফার উপর নির্ভর করে। মুনাফার ব্যাপারে খামখেয়ালি প্রত্যাশা করিলে চলিবে না। সমান ঝুঁকিবিশিষ্ট অন্য শিল্পে যে পরিমাণ মুনাফা পাওয়া যায়, সেই পরিমাণ মুনাফাই প্রত্যাশা করা চলে। শেষ পর্যন্ত এই পরিমাণ মুনাফা না পাইলে সংগঠক শিল্পান্তরে যাইবে অথবা মজুরির বিনিময়ে অন্যের অধীনে কাজ করিবে। ইহাকে স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) বলে। স্বাভাবিক মুনাফা দীর্ঘকালীন দামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দীর্ঘকালীন দাম এরূপ হইতে হইবে যাহাতে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জিত হয়। স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অধিক অর্জিত হইলে সংগঠকের সংখ্যা বাড়িবে এবং উৎপাদন বাড়ার ফলে দাম কমিবে। ইহা অপেক্ষা কম অর্জিত হইলে সংগঠকের সংখ্যা কমিবে এবং উৎপাদন কমার ফলে দাম বাড়িবে।

॥ আদর্শ প্রশ্নমালা ॥

1. **Distinguish between Gross Profit and Net Profit.**
   মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। [পৃষ্ঠা ৩৩২-৩৩৩]

2. **Explain the nature of Profit. How does it differ from other factor incomes ?**
   মুনাফার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। অন্যান্য উপাদানের আয়ের সঙ্গে মুনাফার পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৩৫]

3. **Discuss the relation between Profit and Price.**
   মুনাফা ও দামের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝাইয়া দাও। [পৃষ্ঠা ৩৩৫]

উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী (১৯৬০)

ELEMENTS OF ECONOMICS AND CIVICS

ECONOMICS—FIRST PAPER

1. Explain how price is determined in a market under perfect competetion.
2. Discuss the functions and utility of trade Unions. What are the principal weaknesses of trade union movement in India ?
3. What is meant by 'co-operation' ? Describe the different types of co-operative societies which prevail in India.
4. What is capital ? What measures would you adopt to increase the accumulation of capital in India ?
5. Give a brief account of the aims and objectives of India's Five Year Plans.
6. What is inflation ? How does inflation affect businessmen and wage-earners ?
7. Comment on the advantages and limitations of production by joint-stock concerns.
8. Discuss the functions of a Central Bank.
9. What are the principal features of an under developed economy ? Illustrate your answer with special reference to Indian conditions.
10. Indicate the importance of the village and small-scale industries in our economy. What measures would you suggest so that they may develop side by side with our large-scale industries ?
11. Define a tax. Discuss the merits and defects of direct and indirect taxes.

CIVICS—SECOND PAPER—Group A

1. Define a State. Is West Bengal a State according to your definition Explain your answer.
2. Explain what you mean by Democracy. What are its merits and defects ?
3. Why is it considered desirable to separate the powers of the legislative, executive and judicial organs of a government ?
4. Define a citizen. What are the hindrances to good citizenship ?
5. What is meant by Liberty ? How is it related to Law ?
   Or, Distinguish between unitary and federal forms of government. Is India unitary or federal ?

Group B

6. "India is a Sovereign Democratic Republic".—Explain what is means.
7. Indicate the powers of the President of the Indian Union. How is he elected ?
8. What are the powers and functions of the Legislature of West Bengal ?
9. State the composition and functions of the Supreme Court of India.
10. What are the fundamental rights of the Indian citizen under the constitution of India ?
11. Describe the constitution and functions of District Boards in India.